শিশু সাথী
সুখেন

সাথীদের প্রতি

তিরিশ বরষ ধরি,
গড়িতে চেয়েছি তোমাদিকে আমি
মনের মতন করি।
মুখেতে দিয়াছি সুমধুর ভাষা,
বুকেতে দিয়াছি মুকুলিত আশা,
গুণীর আশীষ বহিয়া এনেছি
নিজে অঞ্জলি ভরি।

... ...

এসেছে আমার জন্ম-লগন নব বরষের পহেলা প্রাতে,
সাদরে সকলে আগ্রহ করি মিলিয়াছ আসি আমার সাথে।
নব কলেবরে নূতন ভূষায় নবীন সুবেশে এসেছি সাজি';
হাসাব, নাচাব, মাতাব এবার—পাইবে অতুল বিভব-রাজি।

—শিশুসাথী

REPUBLIC
D.G.B
T

ডিরেক্টর বাহাদুর কর্তৃক সমগ্র বঙ্গের বিদ্যালয়সমূহের লাইব্রেরীর জন্য অনুমোদিত

প্রতিষ্ঠিত—বাং ১৩২৯ সাল ; ইং ১৯২২ সন

৩১শ বর্ষ
১ম সংখ্যা

বৈশাখ,
১৩৫৯

বার্ষিক মূল্য ৪৲ টাকা] [প্রতি সংখ্যা ।৶০ আনা

সূচী

সূচী

শিশুসাথীর নিয়মাবলী

১। বৈশাখ মাস হইতে শিশুসাথীর বর্ষ আরম্ভ। বৎসরের যে কোন সময়ে গ্রাহক হইলে প্রথম সংখ্যা হইতেই পত্রিকা লইতে হয়। ষাণ্মাসিক বা ত্রৈমাসিক মূল্য গ্রহণ করা হয় না।

২। প্রতি বাংলা মাসের ১লা তারিখে শিশুসাথী বাহির হয়। কোন মাসের পত্রিকা না পাইলে স্থানীয় ডাকঘরে খোঁজ করিয়া মাসের ১৫ই তারিখের মধ্যে ডাকঘরের লিখিত উত্তরসহ আমাদিগকে জানাইতে হয়। নতুবা অপ্রাপ্তসংখ্যা মূল্য দিয়া লইতে হইবে।

৩। গ্রাহকগণ ঠিকানা পরিবর্ত্তন করিলে বাঙ্গালা মাসের ২০শে তারিখের মধ্যে কার্য্যাধ্যক্ষকে সে সংবাদ জানাইতে হইবে।

৪। পত্রিকার মোড়কে গ্রাহকের নাম-ঠিকানার উপরে গ্রাহক-নম্বর দেওয়া হয়। আমাদের নিকট লিখিত প্রত্যেক পত্রেই গ্রাহকদের স্ব স্ব **গ্রাহক-নম্বর** উল্লেখ করা প্রয়োজন; নতুবা কোন বিষয়ে অনুসন্ধান বা ঠিকানা পরিবর্ত্তন করা সম্ভবপর নয়।

শিশুসাথী কার্য্যালয়—৫নং বঙ্কিম চাটার্জ্জি ষ্ট্রীট (কলেজ স্কোয়ার), কলিকাতা

[প্রথম প্রকাশ—১৩২৯ সাল, ইং ১৯২২]

৩১শ বর্ষ } বৈশাখ, ১৩৫৯ { ১ম সংখ্যা

শুভ নববর্ষ

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

মঙ্গলময় হে নববর্ষ, সব মঙ্গল কর।
বাঙলাকে তুমি নূতন করিয়া গড়।

সব ক্ষুদ্রতা, দুঃখ দৈন্য নাশো,
পূর্ণানন্দে হাসাও এবং হাসো ;
সবাকারে ভালবাসিতে শিখাও,
সকল শঙ্কা হর।

বলিষ্ঠ দেহ, বলিষ্ঠতর প্রাণ—
এই বাঙলার কিশোরকে কর দান,
শুদ্ধ বিবেক, ভাবাঢ্য মন,
প্রতিভা প্রখরতর।

কহ রাজসূয়-অশ্বমেধের কথা,
আনো বৈদিকী পুণ্য পবিত্রতা,
সপ্ত নদীর পুণ্য সলিলে
মঙ্গলঘট ভর।

চিহ্ন

শ্রীঅমিতা চট্টোপাধ্যায়

বালীগঞ্জের ট্রামে চেপে সুবিমল বাড়ী ফিরছিল। দেশপ্রিয় পার্ক আসতে আর বড় বেশী দেরী নেই—ওখান থেকে তাদের বাড়ী এক মিনিটের রাস্তা। লেক মার্কেট ছাড়িয়ে যেতেই সুবিমল উঠে দাঁড়াল। এইবার নামবার ব্যবস্থা করতে হবে। যা অসম্ভব ভীড়—এখনই পা-দানীর দিকে এগিয়ে গিয়ে না দাঁড়ালে হয়ত ঠিক জায়গায় নামতেই পারা যাবে না। সুবিমল পায়ে পায়ে নামবার মুখে এগিয়ে গেল। ঠিক এই সময় হঠাৎ ট্রামটা থেমে যাওয়ায় একটা জোর ঝাঁকানী খেয়ে সে একদিকে ঠিকরে পড়ল। আর একটু হলেই হয়ত পড়ে যেত, কিন্তু পাশেই একটি ছেলে ওকে ধরে ফেললে। আসন্ন পতনের হাত থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে সুবিমল তার কৃতজ্ঞ দৃষ্টি নিমেষের মধ্যে ছেলেটির মুখের ওপর স্থাপন করে তাড়াতাড়ি গাড়ী থেকে নামতে গেল। ওঠা-নামার জায়গায় এমন বিশ্রী ভীড় জমেছে যে, যথেষ্ট পরিশ্রম করে ভীড় ঠেলে মাটিতে যদি বা এক চরণ স্থাপন করলে, কিন্তু আর এক চরণ কোন মতেই আর অগ্রসর করতে পারলে না। সুবিমলের মনে হ'ল তার পাঞ্জাবীর পিছন ধরে কে যেন সজোরে টানছে। হেঁচকা এক টান মেরে নিজেকে মুক্ত করে নিল সে। জামাটা একান্তই নতুন ছিল, তাই ছিঁড়ল না, নয়তো পিছনের অংশের মায়া ত্যাগ করেই নামতে হ'ত ওকে।

বাড়ী ফিরতেই মা কাছে এসে স্মিতমুখে বললেন, কলেজে ভর্ত্তি হয়ে এলি তো? ফিরতে এত দেরী হ'ল কেন খোকা?

সুবিমল জুতোটা খুলে এক পাশে সরিয়ে রেখে মাকে প্রণাম করে হেসে বললে, হ্যাঁ, ভর্ত্তি হয়েই এলুম মা।

থাক থাক, হয়েছে রে—যেতে আসতে অত পায়ের ধুলো নিতে হবে না তোর, আমি এমনিতেই আশীর্ব্বাদ করছি—ভাল লেখাপড়া হোক, জীবনে উন্নতি কর।—বলতে বলতে স্নেহের আবেগে মায়ের চোখে জল এসে পড়ল।

রুমাল দিয়ে কপালের ঘাম মুছে শ্রান্তকণ্ঠে সুবিমল বললে, দেরীর কথা বলছ মা! ট্রামে এত ভীড় যে তুমি কল্পনাই করতে পারবে না। সব চেয়ে মুস্কিল হচ্ছে নামা। এই দেখ না পাঞ্জাবীটার কি অবস্থা! এটা যে ইস্ত্রী ভেঙে আজই পরেছি, বলে না দিলে কেউ কি বিশ্বাস করবে?...হ্যাঁ, ব্যাগটা তুলে রাখ তো মা;

কিন্তু পকেটে হাত দিয়েই চমকে উঠল সুবিমল। বুকের রক্তগুলো যেন ছলাৎ করে উপচে পড়ে যেতে চায়। এ-পকেট ও-পকেট হাতড়েও ব্যাগটা পাওয়া গেল না। ওর মুখের অবস্থা এবং ব্যস্ত ভাব দেখে মা শঙ্কিত-কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন, ব্যাগটা হারাল নাকি রে খোকা? কত টাকা ছিল?

ম্লান হয়ে সুবিমল বললে, টাকা অবশ্য ওতে অনেক ক'টাই ছিল—প্রায় পনেরো হবে। কিন্তু তার জন্যে আমার তেমন দুঃখ হচ্ছে না মা, যত দুঃখ হচ্ছে ব্যাগটার জন্যে। ওটা আমার এক বন্ধুর স্মৃতিচিহ্ন ছিল।—বলতে বলতে সুবিমলের গলাটা দুঃখে ভারী হয়ে উঠল।

মা সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, যা গেছে আর তো ফিরবে না, দুঃখ করে কি হবে! তুই সেই ভাত খেয়ে বেরিয়েছিলি, এখন দুপুর রোদ্দুর—যা একটু বিশ্রাম করগে।

মুখটা নীচু করে ক্ষুণ্ণমনে সুবিমল ওর ঘরে চলে যায়। বিছানায় শুয়ে শুয়ে বার বারই মনে পড়ছে সেই ব্যাগটার কথা। যে দিয়েছিল ওটা, সে আজ কোথায়? আহা! এতদিন ধরে সে তার প্রিয় বন্ধুর দেওয়া উপহারটা রেখে দিয়েছিল—আজ কিনা সেটা হারিয়ে গেল! হারাবে আর কোথায়? এ নিশ্চয়ই পকেটমারের কর্ম্ম। ট্রামে যা অসম্ভব ভীড় আর ঠেলা-ঠেলি! সুবিমলের মনে পড়ল সে যখন পড়ে যাচ্ছিল, তখন একটি লোক তাকে ধরে ফেলে পতনের হাত থেকে উদ্ধার করেছিল। এক নিমিষের ঘটনা, তবুও

আবছা মনে পড়ল সুবিমলের সেই লোকটার চেহারা। মলিন ছিন্ন সার্ট গায়ে, চুলগুলো এলোমেলো, রোগা ও লম্বা দেহ। সুবিমলের সন্দেহ হয় সেই লোকটার ওপর। উপকার করতে গিয়ে মস্ত অপকার করে ফেলেছে সে টাকার লোভে। তা যাক টাকাগুলো—কিন্তু ব্যাগটা, শেষে অসিতের দেওয়া ব্যাগটা চুরি গেল!

নিঃসঙ্গ দুপুরে একলা শুয়ে শুয়ে সুবিমলের অনেক পুরানো কথাই মনে পড়ছে। পূর্ব্ববঙ্গের কথা—ঢাকার কথা। অসিত আর সুবিমল একই ক্লাশে পড়ত ঢাকার স্কুলে। ছোটবেলা থেকেই সুবিমল সেই স্কুলে পড়ে আসছিল—বরাবর প্রথম হয়ে। তারপর সে যখন অষ্টম শ্রেণীতে পড়ে, তখন অসিত এসে ওদের স্কুলে ভর্তি হ'ল। অসিতের পড়াশুনার ধারা দু'চারদিন লক্ষ্য করে

সচকিত হয়ে উঠল সুবিমল—না, সাধারণ ছাত্র নয় অসিত। নিজের প্রতিষ্ঠা বজায় রাখতে হলে পড়াশুনায় আরও মন দিতে হবে তাকে। দেখতে দেখতে ক্লাশের মধ্যে দুটো দল গড়ে উঠল অসিত আর সুবিমলকে ঘিরে। এক পক্ষ বললে, এবার আর সুবিমলকে ফার্স্ট হতে হচ্ছে না, অসিত ফার্স্ট হবে। অন্য পক্ষ সুবিমলকে উৎসাহ দিলে,—অসিত পড়াশুনায় ভাল বটে, তবু সুবিমলের স্থান অধিকার করতে পারবে না।

কিন্তু বছরের শেষে পরীক্ষার ফল প্রকাশ হতে জানা গেল, অসিত কুড়ি নম্বর বেশী পেয়ে ফার্স্ট হয়েছে। সুবিমলের সেই প্রথম পরাজয়। তারপর থেকে বরাবর অসিত হয়েছে প্রথম আর সুবিমল দ্বিতীয়। তবু সুবিমলের মনে কোন ক্ষোভ ছিল না, সে তো যোগ্য লোকের কাছেই পরাজিত হয়েছে। নম্বর নিয়ে রেষারেষি থাকলেও তারা ছিল পরস্পরের বন্ধু।

বায়স্কোপের ছবির মত মনের পটে কত স্মৃতিই না একের পর এক ভেসে ওঠে! দশম শ্রেণীতে যখন তারা উঠল, অসিত একদিন একটা চামড়ার ব্যাগ এনে বললে, এটা তোর পছন্দ হয় সুবি?

সত্যিই ব্যাগটা ভারী সুন্দর ছিল। সুবিমল বললে, বাঃ বেশ সুন্দর তো! কত দাম রে?

অসিত হেসে ব্যাগটা ওর হাতে দিয়ে বলেছিল, এটা তুই নে, তোর জন্যেই কিনেছি।

—বাঃরে, আমার জন্যে তুই এটা কিনতে গেলি কেন?

—এমনি···

তারপর এক রকম ঠাট্টার ছলেই বলেছিল অসিত—যে রকম দিন কাল পড়েছে, মানুষের জীবনের তো কোন স্থিরতা নেই। এটা না হয় তোর কাছে আমার স্মৃতিচিহ্ন হয়ে থাকবে।

উপহাস করে একদিন অসিত যে কথা বলেছিল, বাস্তবে কোন দিন তা ঘটবে সুবিমল স্বপ্নেও ভাবে নি।

প্রবেশিকা পরীক্ষার যখন আর বেশী দেরী নেই, এমন সময় ঢাকায় ভীষণ দাঙ্গা সুরু হ'ল। সেই মারামারি আর উপদ্রবের মধ্যে সুবিমলরা কোনও রকমে কলকাতার এক প্রান্তে ছিটকে এসে পড়ল। আর সব যে কে কোথায় গেল, কোন খবর পাওয়া গেল না। অবস্থা যখন একটু শান্ত হ'ল, তখন সুবিমল অসিতকে চিঠির পর চিঠি লিখলে। কোন উত্তর এল না।

তারপর একটি বছর কেটে গেছে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে সুবিমল বৃহত্তর শিক্ষা-মন্দিরে প্রবেশের অধিকার লাভ করেছে। এমন দিনে অসিতের কথা বারে বারেই মনে পড়েছিল তার। দু'জনে এক সাথে কলেজে পড়ার স্বপ্ন দেখেছিল—আরও কত না ভবিষ্যতের রঙিন চিত্র মানসপটে এঁকে রেখেছিল তারা। সাম্প্রদায়িকতার বিষাক্ত বাষ্পে সে-সব চিরতরে মুছে গেছে।

ভাবতে ভাবতে কখন যে সে ঘুমিয়ে পড়ছিল, সুবিমলের মনে পড়ে না। ঘুম ভাঙল সুখন চাকরের ডাকে। বেলা তখন পড়ে গেছে। সুখন বললে, দাদাবাবু, আপনাকে কে ডাকছে।

সুবিমল তাড়াতাড়ি শয্যা ত্যাগ করে বললে, কে ?

—একটি লোক আপনার নাম করে ডেকে দিতে বললে।

—আচ্ছা বসতে বল, আমি যাচ্ছি।

বিশৃঙ্খল চুলগুলো চিরুণী ও ব্রাশ দিয়ে সুবিন্যস্ত করে জামাটা গায়ে দিয়ে সুবিমল বসবার ঘরের দিকে চলল দেখা করতে। কিন্তু পর্দা সরিয়ে ঘরে প্রবেশ করে সে যেমন আশ্চর্য্য হ'ল, ঠিক সেই পরিমাণে বিরক্তিও বোধ করল। কে একটা লোক বসে রয়েছে—একে তো সে চেনে না! আর এ রকম লোকের তাঁর কাছে প্রয়োজনই বা কি থাকতে পারে, সুবিমল ভেবে পেল না। ছেঁড়া কাদা-লাগা জুতো সমেত পা রেখেছে দামী কার্পেটের ওপর। ময়লা শতচ্ছিন্ন জামা আর তেলবিহীন রুক্ষ চুলের অধিকারী হয়ে ঐ সুদৃশ্য কোচের ওপর বসতে কি ওর এতটুকু সঙ্কোচ হয় না!

—কে ? কাকে চাই ?—একটু রূঢ় স্বরেই সুবিমল জিজ্ঞেস করে ওকে।

লোকটি ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াল, তারপর এক পা এগিয়ে গিয়ে বললে, সুবিমল তুমি—

—হ্যাঁ আমিই সুবিমল, তোমার কি দরকার তাই জানতে চাই। আমি তো চিনি না তোমাকে।

লোকটি ব্যথিত কণ্ঠে বলে উঠল, আমাকে চিনতে পারছ না সুবিমল ? আমাকে ভুলে গেছ ?

সুবিমল ভাল করে চোখ মেলে দেখতে লাগল লোকটির দিকে। হ্যাঁ একটু চেনা চেনা বোধ হয় যেন মুখটা। হঠাৎ বিস্ময়ে চীৎকার করে উঠল সুবিমল, এ কি, অসিত, তুই ?

ঠিক তেমনি করে অসিতও বলে ওঠে, সুবিমল—সুবি…

সুবিমল তাড়াতাড়ি এগিয়ে অসিতের একটা হাত ধরে বললে, তোকে সত্যিই আমি চিনতে পারি নি অসিত! এ কি চেহারা হয়েছে ভাই তোর।

অসিত একটু ম্লান হাসল শুধু। সুবিমল আগ্রহভরে শুধাল, আমার খবর তুই পেলি কেমন করে অসিত ?

—বলছি পরে। আগে তোর কথা বল সুবি, কি পড়ছিস এখন ?

সুবিমল বললে, আজই তো কলেজে ভর্ত্তি হয়ে এলাম। গত বার গোলমালের জন্য পরীক্ষা দিতে পারি নি।

অসিত একাগ্র দৃষ্টিতে সুবিমলের মুখের দিকে চেয়েই রইল।

—জানিস অসিত, সুবিমল বলতে থাকে, আজ সারা দুপুর কেবল তোর কথাই ভেবেছি। তোর দেওয়া সেই ব্যাগটা আজ ট্রামে আসতে গিয়ে হারিয়ে গেছে।

অসিত কোনও কথা বললে না—অদ্ভুত দৃষ্টিতে তেমনি চেয়ে রইল।

সুবিমল প্রশ্ন করলে, তুই আজকাল কি করছিস অসিত ?

অসিত আবার একটু ম্লান হাসল। বললে, সে সব বলছি পরে। তোর মা বাবা সব ভাল আছেন তো?

সুবিমল ঘাড় নেড়ে জানাল তাঁরা ভালই আছেন। তারপর একটু চুপ করে থেকে অভিমানের সুরে বললে, আমার কথাই শুনবি—তোর কথা আমার জানতে ইচ্ছে করে না? কাকাবাবু, কাকীমা সব কোথায়, কেমন আছেন?

হঠাৎ অসিত খুব গম্ভীর হয়ে গেল। ভারী কণ্ঠে একটা নিঃশ্বাস চেপে বললে, বাবা তো ঢাকার দাঙ্গায় মারা গেছেন।

চমকে উঠল সুবিমল। অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত চিত্তে প্রশ্ন করল, তোর মা, বোন ওরা সব?

—ওরাও কেউ নেই সুবিমল!

—সে কি! কেউ বেঁচে নেই?

ঠিক তেমনি ম্লান আর ভারী গলায় বললে অসিত, না সুবি, এ জগতে আপন বলতে আজ আর আমার কেউ বেঁচে নেই। সেই গোলমালের মধ্যে বাবাকে হারালুম। আত্মীয়-স্বজন কে যে কোথায় ছিটকে পড়ল, কারুর সাহায্য পেলুম না। শেষে রাত্রির অন্ধকারের আবরণে মাকে সঙ্গে নিয়ে ছোট বোনটির হাত ধরে কোন রকমে বেঁচে পালিয়ে এসেছি। শিয়ালদা স্টেশনে ছিলুম মাস কতক। বর্ষার জলে ভিজে ভিজে মা, বোন দু'জনেরই অসুখ করল। কঠিন অসুখে সাহায্য যেটুকু পেয়েছিলুম ওদের বাঁচবার পক্ষে যথেষ্ট ছিল না। যখন সংসারে কোন বন্ধনই আর রইল না, তখন রাজপথে এসে দাঁড়ালুম। জীবনে ভদ্রভাবে বাঁচবার জন্যে যত রকম পথ আছে, চেষ্টা করে দেখেছি—কোন উৎসাহ কোথাও পাই নি।

সুবিমল পলকহীন চোখে অসিতের মুখের ওপর চেয়ে থাকে। এ কি সব সে শুনছে! স্বপ্ন নয় তো? দু হাতে চোখ রগড়ে দেখল সুবিমল—ওই তো অসিতের কপালে সেই কাটার দাগ, ফুটবল খেলতে গিয়ে কেটে গিয়েছিল। না, স্বপ্ন দেখে নি সুবিমল। এ সব সত্যি, অতি নির্ম্মম সত্যি।

হঠাৎ সুর পালটে অসিত বললে, আমি কেমন করে তোর খোঁজ পেলুম জানতে খুব ইচ্ছে হয় না সুবি?

অসিত ধীরে ধীরে একটা ব্যাগ তার ছেঁড়া জামার পকেট থেকে বের করল। বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে যায় সুবিমল। আশ্চর্য্য! সকালের সেই হারানো ব্যাগটা অসিতের কাছে গেল কেমন করে? অনেকগুলো প্রশ্ন ওর কণ্ঠে এসে ভীড় জমায়, কিন্তু একটা কথাও সে বলতে পারে না। শুধুই অবাক চোখে চেয়ে থাকে অসিতের হাতের দিকে। তারপর অস্ফুট স্বরে এক সময় বলে উঠল—ওটা তুই পেলি কোথা অসিত?

একটা অদ্ভুত হাসি ফুটে উঠল অসিতের ঠোঁটের কোণে।...ভারী আশ্চর্য্য লাগছে না?

একদিন তোকে এটা আমি উপহার দিয়েছিলুম, আজ এটা আবার আমার কাছেই ফিরে এসেছে।... হঠাৎ বিকট স্বরে চীৎকার করে উঠল অসিত, আমি চোর...আমি এটা চুরি করেছি তোর পকেট থেকে...

বাজ পড়লে লোকে যেমন চমকে ওঠে, ঠিক তেমনি চমকে উঠল সুবিমল।

অসিত বলতে লাগল, আজ চৌরঙ্গীর দিকে একটা কাজের খোঁজে গিয়েছিলুম। বিফল হয়েই ফিরছিলুম বলে কোন দুঃখ ছিল না। ও আমার অভ্যস্ত। ট্রামে একটা লোক দেখলুম হঠাৎ আমার গায়ের ওপর টলে পড়ল। ওকে সামলাতে গিয়ে দেখি পকেটে মানিব্যাগ। অনেক দিন থেকেই পেটে কিছু পড়ে নি, তাই লোভ সামলাতে পারলুম না। তোকে আমিও চিনতে পারি নি সুবি! বস্তির ভাঙা ঘরে ফিরে এসে ব্যাগটা যখন খুললুম, চমকে উঠলুম।

একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে থামল অসিত। মন্ত্রমুগ্ধের মত সুবিমলও সব শুনে যাচ্ছিল। এত বড় বিস্ময়ও ভগবান ওর জন্যে সঞ্চয় করে রেখেছিল।

ব্যাগটা খুলে একটা ছবি সুবিমলের সামনে মেলে ধরে অসিত বললে, মনে পড়ে সুবি, এটা আমরা দু'জনে ঢাকার স্টুডিওতে তুলেছিলুম, সেই বড়দিনের ছুটিতে?

সুবিমলের চোখ দুটো দুঃখের জলে চক্‌-চক্‌ করে উঠল। এত নীচে নেমে গেছে অসিত! স্কুলের সেই ফার্স্ট বয়—যার সম্বন্ধে সকলে কত উচ্চ ভবিষ্যদ্বাণী করত, আজ তার জীবনের এই পরিণতি!
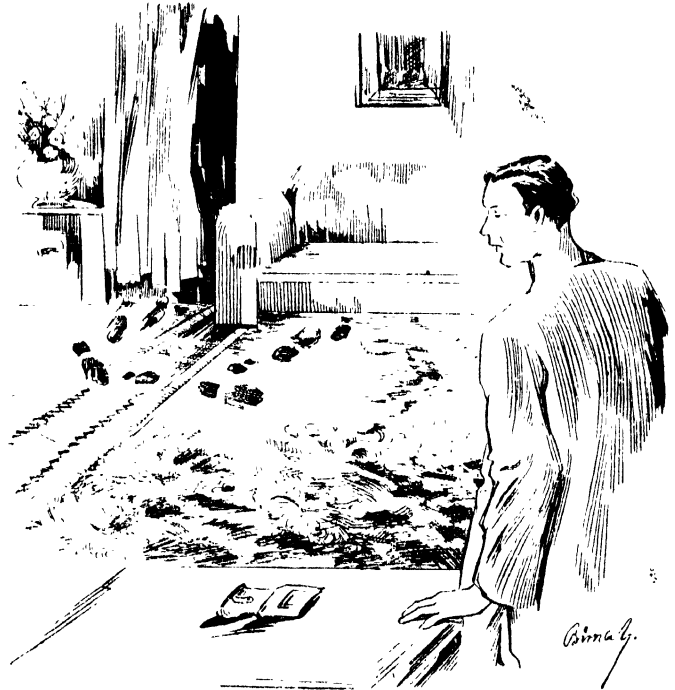
অসিত বলে চলল, ছবিটা দেখে পুরানো কথা সব মনে পড়ল। তা ছাড়া ব্যাগে তোর ঠিকানা লেখা একখানা খামও ছিল। তাই ফিরিয়ে দিতে এলুম এটা।

ব্যাগটা টেবিলের ওপর রেখে অসিত উঠে দাঁড়াল।

গভীর বিস্ময় থেকে নিজেকে জোর করে মুক্ত করে সুবিমল বললে, দাঁড়া অসিত, তোর জন্যে আগে কিছু খাবার আনতে বলি। গল্পের মাঝে এতক্ষণ সে কথা মনেই হয় নি।

সুবিমল তাড়াতাড়ি বাড়ীর ভেতর চলে গেল।

দু' এক মিনিট পর সুবিমল যখন ফিরে এল তখন ঘর শূন্য। অসিত নেই, টেবিলের ওপর ব্যাগটা তেমনি পড়ে আছে। ধীরে ধীরে সেটা হাতে তুলে নিল সুবিমল—ওদের দু'জনের সেই ছবিটা নেই। নিষ্পলক চোখে ব্যাগটার দিকে চেয়ে ভাবতে থাকে সুবিমল, হারানো স্মৃতিচিহ্ন ফিরে পেতে গিয়ে আজ যা হারাল সে, সে ক্ষতি কি এ জীবনে পূরণ হবে!

ব্যাপারটা স্বপ্ন বলে উড়িয়ে দেবার জন্য দু'হাত দিয়ে চোখদুটো রগড়াতে থাকে সুবিমল। সহসা মোহাচ্ছন্ন দৃষ্টি কার্পেটের এক জায়গায় এসে স্থির নিবদ্ধ হয়ে যায়। না, ওই তো সুদৃশ্য কার্পেটের বুকে অসিতের ছিন্ন মলিন জুতোর কাদার ছাপ সুস্পষ্ট হয়ে ফুটে রয়েছে।...

প্রতিভার আবাহন

শ্রীঅক্ষয়কুমার চক্রবর্ত্তী

বাংলা ১২৮৯ সাল—এখন থেকে প্রায় সত্তর বছর আগেকার কথা।

আষাঢ়ের মেঘ-মেদুর একটি সন্ধ্যা। কলকাতার রামবাগান অঞ্চলের বিখ্যাত দত্ত-পরিবারে আজ উৎসবের সমারোহ। ঐতিহাসিক ও সাহিত্যিক রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের কন্যা কমলার আজ বিয়ে।

সকাল থেকে সানাই-এর একটানা রাগিণীর আলাপে দিক্‌দেশ মুখরিত। ব্যস্ত লোকজনের ইতস্তত: ছুটাছুটি আর ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের হৈ-হুল্লোড়ে প্রকাণ্ড বাড়িখানা যেন ফেটে পড়তে চায়।

পাত্রীর পিতা তখনকার দিনের বিলাত-ফেরত সিভিলিয়ান—বাংলার সাহিত্যিকের আসরে তাঁর আসন সুপ্রতিষ্ঠিত। তাই সমধর্ম্মী ক'একজন বিখ্যাত সাহিত্যিকও এই বিবাহ-উৎসবে যোগদানের জন্য আমন্ত্রিত হয়েছেন।

সন্ধ্যা-সমাগমে বরপক্ষ ও অন্যান্য অভ্যাগতদের আগমন শুরু হয়েছে। বরও যথাসময়ে বরাসনে উপবিষ্ট হয়েছেন—পুরনারীদের উলুধ্বনিতে উৎসব আজ উৎসাহে ভরা। নিমন্ত্রিত সাহিত্যিকগণও একে একে আসন গ্রহণ করলেন। একটু রাত করে এলেন সাহিত্য-সম্রাট্ বঙ্কিমচন্দ্র।

বঙ্কিমচন্দ্র তখন বাংলার সাহিত্য-জগতে দিক্‌পাল। তাঁর দুর্গেশনন্দিনী, আনন্দমঠ, কৃষ্ণকান্তের উইল, কপালকুণ্ডলা বাংলা সাহিত্যে যুগান্তর এনে দিয়েছে। তাঁর মত মর্য্যাদাবান সুপ্রতিষ্ঠ সাহিত্যিক শুধু বাংলায় কেন, সারা ভারতে একজনও ছিলেন না। তাঁর অভ্যর্থনায় সাহিত্যিকগণ উৎফুল্ল মনে এগিয়ে এলেন। রমেশচন্দ্র তো অতি উৎসাহে ছুটে এসে একগাছি মালা তাঁর গলায় পরিয়ে দিলেন। আনন্দে চারিদিকে করতালি বেজে উঠল।

রবীন্দ্রনাথ (১৯ বছর বয়সে)

ঠিক এমনি রসঘন মুহূর্ত্তে উনিশ-কুড়ি বছর বয়সের সৌম্যদর্শন এক তরুণ এগিয়ে এসে সাহিত্য-সম্রাট্‌কে অভিবাদন জানালেন। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর দিকে চেয়েই উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন। রমেশ বাবুকে উদ্দেশ করে বললেন—রমেশ, একটু ভুল হয়ে গেছে ভাই! আমি তার কিছুটা সংশোধন করে নিতে চাই।

ভুল যে কোথায়, ঠিক ধরতে না পেরে সবাই উন্মুখ হয়ে চেয়ে রইলেন বঙ্কিমচন্দ্রের দিকে।

বঙ্কিমবাবু তখন বললেন—রমেশ, তুমি 'সন্ধ্যাসঙ্গীত' পড়েছ ?—

রমেশ বাবু মাথা নেড়ে 'না' জানালেন।

বর্ত্তমান ক্ষেত্রে 'সন্ধ্যাসঙ্গীত'-এর সঙ্গে কি যোগাযোগ থাকতে পারে, কেউ তা বুঝতে পারেননি, নতুন একজন লেখকের নবপ্রকাশিত কবিতার বই সম্বন্ধে কারও আগ্রহশীল থাকার কথাও নয়। তাই হতবাক হয়ে চেয়ে রইলেন সবাই। বঙ্কিমচন্দ্র তদ্গতভাবে আবৃত্তি করলেন—

"যেথায় পুরানো গান যেথায় হারানো হাসি
যেথা আছে বিস্মৃত স্বপন,
সেইখানে সযতনে রেখে দিস গানগুলি,
রচে দিস সমাধি-শয়ন।"

আহা! কি সুন্দর কথাগুলি, কি মাধুর্য্যময় শব্দের বিন্যাস!

তারপর সেই তরুণটিকে দেখিয়ে বললেন—সন্ধ্যাসঙ্গীত এঁরই রচিত। এ মালা আজ তাই এঁরই প্রাপ্য।

নিজের কণ্ঠ হতে মালাগাছি খুলে নিয়ে গভীর অনুরাগে স্বহস্তে তা তরুণ কবির গলায় পরিয়ে দিলেন। সমাগত জনগণ নির্ব্বাক হয়ে গেলেন। স্তব্ধ বিস্ময়ে চেয়ে রইলেন সেই প্রশস্ত-ললাট, সুন্দর দর্শন প্রতিভায় দীপ্ত তরুণটির পানে অপলক নেত্রে।

সবার দৃষ্টিতে একই প্রশ্ন—কে এই তরুণ? বঙ্কিমচন্দ্রের মালার উত্তরাধিকারী হবার সৌভাগ্য যার হ'ল আজ এতটুকু বয়সে, নিজহাতে যাঁকে তিনি সম্মানিত করলেন আজ এভাবে, নিশ্চয়ই এঁর মাঝে মহত্তর সম্ভাবনার অঙ্কুর প্রতিভাবান সাহিত্যিকের চোখে ধরা পড়েছে।

এখনও কি বলে দেওয়া দরকার হবে, এ যুবকটি কে আর কি তাঁর পরিচয়?—

সেদিনের সেই তরুণ বিশ্বমানবের মুক্তির বাণী সাধক আমাদের বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ।

দুর্বাসার দুর্ভোগ

শ্রীদুর্গামোহন মুখোপাধ্যায়

রাজা অম্বরীষ খুব নামজাদা সাধুপুরুষ। ব্রত-পার্বণ, দান-ধ্যান যে কত করেছেন, তার আর সংখ্যা নেই।

একবার কার্তিক মাসের একাদশী তিথিতে ব্রত ক'রে দ্বাদশীতে ব্রাহ্মণদের অতি সমাদরে ভোজন করিয়ে হাজার হাজার হৃষ্টপুষ্ট গাভী দান করলেন। তারপর তাঁদের অনুমতি নিয়ে নিজে আহার করবার যেমনি উপক্রম করেছেন, অমনি এসে হাজির হলেন দুর্বাসা মুনি।

অম্বরীষ অমনি উঠে প্রণাম ক'রে মুনিকে আহারের জন্য সবিনয় অনুরোধ জানালেন।

দুর্বাসা ঋষি খুব খুশি হয়ে বললেন, "বেশ তো, আমি কালিন্দী নদীতে স্নান ক'রে এসে খাচ্ছি।"

ঋষি গেলেন স্নান করতে।

দ্বাদশী তিথি তখন শেষ হয়-হয়। এক মুহূর্তেরও কম সময় বাকি আছে। এরই মধ্যে উপবাস ভঙ্গ করা চাই-ই, নইলে মহাপাপ হবে। কিন্তু দুর্বাসা ঋষি ফিরে আসছেন না। কী করা যায়! অতিথিকে ফেলে জলগ্রহণ করা মহাপাপ, আবার দ্বাদশী তিথি শেষ হওয়ার পূর্বেই উপবাস ভঙ্গ না করাও মহাপাপ। অম্বরীষ ব্রাহ্মণদের সঙ্গে পরামর্শ ক'রে শুধু একটু জল মুখে দেওয়া স্থির করলেন। কারণ এতে খাওয়াও হবে না, নিয়ম রক্ষাও হবে।

রাজা তো জল একটু মুখে দিলেন। একটু পরেই দুর্বাসা ঋষি ফিরে এলেন।

ঋষি তো; কাজেই রাজার জল মুখে দেওয়াটা তিনি টের পেলেন। নেয়ে এসেছেন, ক্ষিধেও পেয়েছে একেবারে আগুনের মত; কাজেই রাগের চোটে কাঁপতে কাঁপতে বললেন, "রাজা অম্বরীষ, তোমার এত বড় স্পর্ধা! কী নিষ্ঠুর তুমি! অতিথিকে ফেলে নিজে খেয়ে ব'সে আছ, আর হাত জোড় ক'রে বিনয় দেখাচ্ছ! আমাকে অপমান করতে সাহস কর তুমি! দেখাচ্ছি তোমাকে।"

কারণে ও অকারণে ভীষণ রেগে উঠে অভিশাপ দেওয়ায় দুর্বাসা ছিলেন অদ্বিতীয়। এই জন্য তাঁকে ভয় করত না সারা জগতে এমন কেউ ছিল না।

ঋষির কাণ্ডজ্ঞান লোপ পেয়ে গেল। তিনি মাথার একটা জটা ছিঁড়ে ফেললেন, এবং তা দিয়ে এক ভীষণমূর্তি বীরপুরুষ তৈরি করলেন। মূর্তিটা দেখতে দেখতে জ্বলে উঠল। প্রজ্বলিত পুরুষ খড়্গ হাতে ক'রে রাজার দিকে আসতে লাগল। রাজা তো অটল-অচল।

ভগবান দেখলেন অম্বরীষ নিরপরাধ, দুর্বাসারই দোষ। ভক্তের বিনা দোষে এই নিগ্রহ দেখে তিনি আর স্থির থাকতে না পেরে সুদর্শন চক্র দিয়ে ধ্বংস ক'রে দিলেন সেই ভীষণ পুরুষকে। তারপর সেই চক্র ছুটল দুর্বাসার দিকে।

দুর্বাসা দৌড়াতে লাগলেন প্রাণের ভয়ে; কিন্তু যাবেন কোথায়? পাহাড়ে-পর্বতে, বনে-জঙ্গলে যেখানে যান, সেখানেই দেখতে পান সুদর্শন চক্র ঠিক আসছে। আর কোন উপায় নেই দেখে তিনি গিয়ে উঠলেন ব্রহ্মার কাছে।

ব্রহ্মা বললেন, "তুমি বিষ্ণুর পরম ভক্তের অপকার করেছ, তাই বিষ্ণুই তোমাকে এই দণ্ড দিয়েছেন। তোমাকে রক্ষা করতে পারি এমন ক্ষমতা আমার নেই। কী করতে পারি বল; আমার ক্ষমতা থাকলে কি আর তোমাকে বাঁচাতাম না? দেখ যদি শিব তোমায় বাঁচাতে পারেন।"

ঋষি হতাশ হয়ে শিবের কাছে ছুটে গেলেন কৈলাসে। গিয়েই আশ্রয় প্রার্থনা করলেন।

শিবও জবাব দিলেন ব্রহ্মারই মত; তিনি ঋষিকে যেতে বললেন বিষ্ণুর কাছে।

পেছনে সুদর্শন চক্র তাড়া করছে, বিলম্ব করা যায় না। কাজেই দুর্বাসা ছুটলেন বৈকুণ্ঠে। কাঁপতে কাঁপতে গিয়ে পড়লেন বিষ্ণুর চরণে।

বিষ্ণু বললেন, "ঠাকুর, আমি কী করতে পারি বল? অপরাধ করেছ অম্বরীষের কাছে, রক্ষা করব আমি?"

দুর্বাসা বললেন, "এখন তা হলে উপায় কি প্রভু ?"

"তুমি অম্বরীষের কাছে গিয়ে ক্ষমা চাও। এ ছাড়া তো কোন উপায় দেখি না।"

এবার ঋষি প্রাণপণ বেগে ছুটে গিয়ে পড়লেন অম্বরীষের পায়ে।

ব্রাহ্মণ প্রাণভয়ে পায়ে পড়েছেন দেখে রাজা অম্বরীষ অত্যন্ত লজ্জিত ও দুঃখিত হলেন। রাজার প্রার্থনায় চক্র শান্ত হ'ল, দুর্বাসাও প্রাণে বেঁচে গেলেন।

অম্বরীষের মহত্ত্ব দেখে দুর্বাসা বিস্মিত হলেন এবং তাঁর চিরকল্যাণ কামনা করলেন। এবার রাজার সঙ্গে আহার ক'রে ঋষি সুস্থ হলেন।

জন্ম-তিথিতে

শ্রীবেণু গঙ্গোপাধ্যায়

কবি-দাদুর জন্ম-তিথি
বোশেখ মাসের পঁচিশে।
সবুজ, অবুঝ প্রণাম জানা
ছন্দ ও গান রচি সে।
কাব্যে কবির শিশুর বুলি
ছন্দ-দোলায় উঠত দুলি,
শিশুর মত মন যে কবির
চির-নবীন রুচি সে।

সকাল হতে শিশুর দলে
গাঁথছে ফুলের মালিকা;
যাগ দিয়েছে ফুল-চয়নে
যতেক বালক-বালিকা।
আনন্দ আজ উপচে পড়ে
বাংলা মায়ের ঘরে ঘরে,
টগর বেলা ভুঁইচাঁপাতে
পূর্ণ অর্ঘ্য-থালিকা।

কবির উদয় আনন্দময়
পুণ্য বোশেখ মাসেতে;
অধিবাস যে হচ্ছে কবির
লক্ষ ফুলের বাসেতে।
আজ আকাশে, আজ বাতাসে
পদধ্বনি কাহার ভাসে—
সারি সারি প্রদীপ জ্বলে
কবির আসার আশেতে।

দস্যি, দামাল, শান্ত, চপল
প্রণাম জানাও চরণে;
দাও রে ঢেলে শ্রদ্ধা মনের
বিশ্বকবির বরণে।
কবির মত হও সাহসী
বিজয়ী হও কলুষ নাশি,
কর্মে ফোটাও কবির বাণী
নিত্য নূতন ধরণে।

এঁরাই মানুষ

শ্রীরবীন্দ্রকুমার বসু

হালিসহরের পাশ দিয়ে গঙ্গা বহে যাচ্ছে।

সাধক কবি মার নামে গান রচনা ক'রে নিজের দেওয়া অপূর্ব সুরে গঙ্গায় দাঁড়িয়ে আবেগভরে গাইছেন। যেমন সেই গানের পদ, তেমনি সুন্দর কণ্ঠস্বর, তেমনি ভক্তিভাব।

নবদ্বীপের রাজা কৃষ্ণচন্দ্র গঙ্গার ওপর দিয়ে যাচ্ছেন নৌকা ক'রে। সেই অপূর্ব কণ্ঠস্বর তাঁর কানে এলো, মুগ্ধ হয়ে গেলেন উনি। ভাবে তাঁর চোখ দিয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়তে লাগলো। মার নাম এমনি দরদ দিয়ে ইতিপূর্বে আর কাউকে তিনি গাইতে শোনেন নি। কালীভক্ত কৃষ্ণচন্দ্র মার নাম-কীর্তন শুনে ভাবে বিভোর। তিনি তখনো এই সাধক কবিকে চিনতেন না। মনে মনে বললেন: কে এই মহাপুরুষ?

আর একদিন।

বাংলার নবাব সিরাজদ্দৌলা নৌকা ক'রে গঙ্গার ওপর দিয়ে যাচ্ছেন। মুর্শিদাবাদ থেকে আসছেন কলকাতায়। দূর থেকে তিনি শুনলেন—সাধক কবির গান।

নবাব তাঁর অনুচরদের জিজ্ঞাসা করেন: কে এমন গান গায়? আহা! কী মধুর কণ্ঠস্বর! কী চমৎকার গানের ভাব! দেখো তো কে?

অনুচরেরা তখন নৌকার ওপর সিধে হয়ে দাঁড়িয়ে ঘাটের দিকে ভালো ক'রে চায়। বলে: একজন হিন্দু গঙ্গার জলে দাঁড়িয়ে গান করছেন।

: এমন গান তো আমি জীবনে শুনি নি। তোমরা শীঘ্র নৌকা ঐ ঘাটে ভিড়াও।

ঘাটে ভিড়লো নবাবের নৌকা। নবাব খুব কাছ থেকে একমনে গান শুনলেন।

সাধক কবির গান শেষ হলো, নবাব ইসারায় তাঁকে নিজের নৌকায় আসতে বললেন। সাধক কবি নৌকায় এলে নবাব বললেন: তুমি আমাকে গান শোনাও। আমি আজ প্রাণভরে তোমার গান শুনবো।

সাধক কবি তখন বাংলার বদলে হিন্দি গান গাইলেন। নবাব শুনে বললেন: হিন্দি গান নয়। যে গান এতক্ষণ তুমি গাইছিলে গঙ্গায় বুক পর্যন্ত ডুবিয়ে, সেই গান—সেই মিষ্টি বাংলা গান। আমি বাংলার নবাব। বাংলাই আমি ভালবাসি।

সাধন-সঙ্গীত গাইলেন তখন সেই সাধক কবি। যতক্ষণ গান গাইলেন তিনি, ততক্ষণ নবাব মন্ত্রমুগ্ধের মত তন্ময় হয়ে রইলেন। গান শেষ হলে দেখা গেল—নবাব সিরাজদ্দৌলার চোখ অশ্রুবিন্দুতে চক্‌চক্‌ করছে।

কিছুক্ষণ পর নবাব চোখ মুছে আর্দ্রকণ্ঠে ধীরে ধীরে বললেন : তুমি আমার সঙ্গে চল মুর্শিদাবাদ। আমার দরবারে তোমাকে রাজগায়ক ক'রে রাখব। তুমি যা চাও, তাই পাবে। ধন-দৌলত, রাজার ঐশ্বর্য—যাবতীয় সুখের বস্তু।

কবি নবাবের প্রলোভনে মৃদু হাসি হাসলেন। বললেন : নবাব বাহাদুর! আপনি যেখানে যাচ্ছেন, যান। বৃথা প্রলোভনে আমাকে আপনি জয় করতে পারবেন না। আমার আশা আপনি ত্যাগ করুন। '

ব'লেই সাধক কবি নৌকা থেকে সহসা গঙ্গার জলে ঝাঁপ দিলেন। তারপর সাঁতার কেটে উঠলেন তীরে।

এই কবি হলেন কালীসাধক শ্রীরামপ্রসাদ সেন। ইনি অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে হালিসহরের কুমারহট্ট গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায় তাঁর কবি-প্রতিভায় মুগ্ধ হয়ে তাঁকে 'কবিরঞ্জন' উপাধি দেন। রামপ্রসাদ সংস্কৃতে এবং পারসীতেও অসাধারণ পণ্ডিত ছিলেন। 'বিদ্যাসুন্দর কাব্য', 'শ্রীশ্রীকালী-কীর্তন', 'পদাবলী' এবং 'আগমনী ও বিজয়া গান' তাঁর রচনা। বিদ্যাসুন্দর ছাড়া ঐ অন্যান্য গুলি আর কোন কবি রামপ্রসাদের পূর্বে রচনা করেন নি। তাঁর পদাবলীর সাধন-সঙ্গীত অত্যন্ত সহজভাষায় লেখা। গানের সুরের, তালের এবং ভক্তির দিক দিয়ে রামপ্রসাদ ছিলেন সম্পূর্ণ মৌলিক। তিনি একাধারে সুকবি, সুগায়ক এবং সত্যিকারের সাধক পুরুষ। অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে রামপ্রসাদ তাঁর কাব্য, কবিতা, সাধন-সঙ্গীত রচনা করেন। তাঁর 'আগমনী ও বিজয়া গান' বাংলাসাহিত্যে হীরকখণ্ডস্বরূপ। এতে তিনি বলছেন—

'রাণী ভাসে প্রেমজলে দ্রুতগতি চলে,
খসিল কুন্তলভার।
নিকটে দেখে যারে, সুধাইছে তারে,
গৌরী কতদূর আর গো ॥'

* *

'যেতে যেতে পথ, উপনীত রথ,
নিরখি বদন উমার ;
বলে মা এলে মা এলে, মা কি মা ভুলেছিলে,
মা বলে এ কি কথা মরি গো।'

* *

'তব দেহ পাষাণ এদেহে পাষাণ প্রাণ,
এই হেতু এতক্ষণ না হলো বিদায় ॥
তনয়া পরের ধন, বুঝিয়া না বুঝে মন,
হায় হায় একি বিড়ম্বনা বিধাতার ॥'

* *

'ওগো রাণি নগরে কোলাহল, উঠ চল চল,
নন্দিনী নিকটে তোমার গো।
চল বরণ করিয়া, গৃহে আনি গিয়া
এসো না সঙ্গে আমার গো ॥'

* *

সাধক কবি রামপ্রসাদ সেন যখন জানতে পারলেন, তাঁর কন্যা জগদীশ্বরীর রূপ ধ'রে স্বয়ং মা ভবানী তাঁকে বেড়া বেঁধে দিয়ে চ'লে গিয়েছেন,; তখন তিনি নিমিষের মধ্যেই মার ধ্যানে ধ্যানস্থ হয়ে পড়লেন। তাঁর চোখ দিয়ে শ্রাবণের ধারার মতো ভক্তি-অশ্রু গাল বেয়ে

গড়িয়ে পড়তে লাগলো। তিনি চোখ বুজে গাইতে লাগলেন সেই অপূর্ব রামপ্রসাদী সুরে :—

'যেই ধ্যানে এক মনে, বের হয়ে দেখ কন্যারূপে,
সেই পাবে কালিকা তারা। রামপ্রসাদের বাঁধছে বেড়া।'

সাধক রামপ্রসাদের সাক্ষাৎ দেবী অন্নপূর্ণা-দর্শন হয়েছিল। কাশীধামে যখন তিনি দেবীর আদেশ পেয়ে চলেছিলেন তাঁকে গান শোনাতে, তখন মাঝপথে দেবী তাঁকে অন্তরীক্ষ থেকে বললেন : বাবা রামপ্রসাদ! তোমার কষ্ট ক'রে কাশী যেতে হবে না। তুমি বাড়ী ফিরে যাও বাড়ী ব'সে তোমার গান আমায় শুনিও। রামপ্রসাদ তখন ভক্তি-অশ্রু মিলিয়ে গাইলেন :—

'আর কাজ কি আমার কাশী?
মায়ের পদতলে পড়ে আছে গয়া গঙ্গা বারাণসী ॥
হৃৎকমলে ধ্যানকালে, আনন্দসাগরে ভাসি।
ওরে কালীর পদ কোকনদ, তীর্থ রাশি রাশি ॥'

কালীপ্রতিমাকে বিসর্জন দেবার পূর্বে সাধক রামপ্রসাদ গঙ্গার জলে দাঁড়িয়ে নিজের জীবন ত্যাগ করতে চাইছেন। তখন তিনি দেবীর ধ্যানে ধ্যানস্থ হয়ে গাইছেন :—

'···ব্রহ্মময়ী, কর্ম্ম ডুরি দে না কেটে।
প্রাণ যাবার বেলা এই করো মা,
যেন ব্রহ্মরন্ধ্র যায় গো ফেটে ॥'

সিদ্ধপুরুষ রামপ্রসাদের কথা শুনলেন দেবী। গান শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে এক অলৌকিক ঘটনা ঘটলো। রামপ্রসাদের ব্রহ্মরন্ধ্র সহসা বিদীর্ণ হয়ে এক অপূর্ব জ্যোতিমালা শূন্যে, শূন্য হতে শূন্যে সেই স্বর্গের দিকে ধীরে ধীরে মিলিয়ে গেলো।

কাগজ নিয়ে খেলা

শ্রীননীগোপাল চক্রবর্তী

খেলনা ম্যাজিক

কাগজ দিয়ে একটা ফুল তৈরীর কথা আজ বলব। এটা শুধু ফুলই নয়—এর হাতলটা ধরে ডানদিকে ঘুরালে কতকগুলি নানা রংয়ের ফুল দেখা যাবে, আবার সেই হাতলটারই বাঁ দিকে ঘুরালে দেখা যাবে কিছুই নেই! একটা সুন্দর ম্যাজিক নয় কি? এই ফুলগুলি আবার বেশ গুটিয়ে রাখা যায় (২ চিত্র)। এটা তৈরী করতে লাগবে—

পিচবোর্ডের টুকরো—৩"×২"—৭ খানা

এগুলির একদিকে নাম দাও ক, খ, গ, ঘ, ঙ, চ, ছ এবং অপর পিঠে লিখে নাও A, B, C, D, E, F, G.

কাগজের সরু ফালি বা পাতলা সরু ফিতে ৮।৯ আঙ্গুল লম্বা ও ১ আঙ্গুল চওড়া—১৮টা।
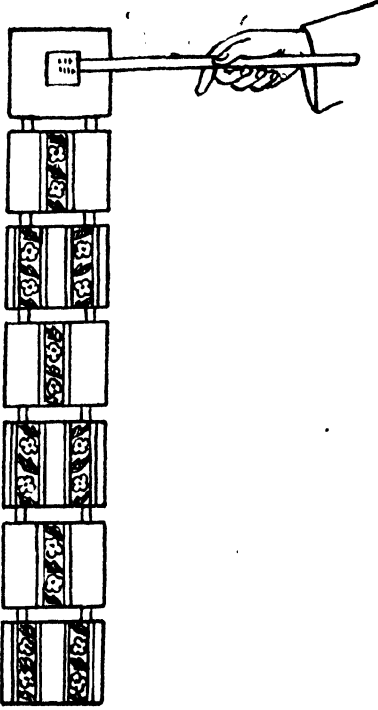
খুব পাতলা বিভিন্ন রংয়ের কাগজ: এ দিয়ে ফুল তৈরী করতে হবে। চার-পাঁচ ইঞ্চি কাগজকে পিচবোর্ডের লম্বানুযায়ী (৩") কেটে নিয়ে ওটাকে ¼ ইঞ্চি পরিমাণ সরু ভাঁজ করে নাও। তারপর এর ডান বা বাঁ দিকে কাঁচি দিয়ে কেটে মুখটা ছুঁচলো করে রাখ। এখন ঐ কাগজটির ভাঁজ খুললে ওর একধারে খাঁজকাটা ফুলের মত হবে।

এইবার ঐ কাগজটার অন্য মুখটা কুঁচকে নিয়ে—ফুলের একদিক ঐ পিচবোর্ডে এবং অন্যদিক ঐ কাগজের সরু ফালির সঙ্গে এঁটে দিলে ঐ ফুল ইচ্ছামত খোলা ও বন্ধ করা যাবে। ফুলগুলি পিচবোর্ডের টুকরোর কখ, গঘ, ঙচ এবং অন্য পিঠে BC, DE এবং FGর সঙ্গে আটকাতে হবে।

এখন ঐ ১৮টি কাগজের সরু ফালির সম্বন্ধে বলা যাচ্ছে: পিচবোর্ডের ক খ প্রভৃতি যেদিকে লেখা—

ক র উপর—৩ নং ফালি ও খ—নীল রং ফুল

ঘ র উপর—৯-১০ ফালি ও গ—লাল রং ফুল

চ র উপর—১৫-১৬ ফালি ও ঙ—হলুদ রং ফুল

এবং পিচবোর্ডের AB প্রভৃতি যে দিকে লেখা—

B র উপর ৪-৫ ফালি ও C—নীল রং ফুল

D র উপর ১০-১১ ফালি ও E—সবুজ রং ফুল

১-২ ফালি A র উপরিভাগে দুই পাশে দুটোর মুখ এঁটে 'ক' দিয়ে এনে B র উপরিভাগের দুই পাশে এঁটে দিতে হবে।

৩ ফালি A গোড়ার মাঝখানে এঁটে 'খ' এর উপর দিয়ে B র নীচে নিয়ে এঁটে দিতে হবে।

৪-৫ ফালি 'খ' র নীচে দুই পাশে দুটির মুখ এঁটে C র উপর দিয়ে 'গ'র নীচের দিকে দু পাশে এঁটে দিতে হবে।

৬ ফালি : গ এর উপরে মাঝখানে অপর মুখ এঁটে দিতে হবে।

৭ ফালি : ঙ র উপরাংশের মাঝখানে এক মুখ এঁটে D-র উপর দিয়ে ঘুরিয়ে 'ঘ'র উপর দাও—মাঝখানে আর এক মুখ আঁটতে হবে।

G F E D C B A ২
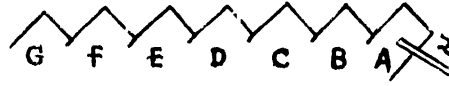
৮ ফালি : C র নীচের দিকে মাঝখানে এক মুখ এঁটে 'ঘ' উপর দিয়ে ঘুরিয়ে এনে D র নীচের মাঝখানে আর এক মুখ আঁটতে হবে।

৯-১০ 'C' র উপরাংশের দুই পাশে ঐ দুটির দুই মুখ এঁটে 'গ' র উপর দিয়ে ঘুরিয়ে এনে D র উপরাংশের দুই পাশে অপর দুই মুখ আঁটো।

সাতটা পিচবোর্ডের টুকরো পর পর পাতলা কাগজের সরু ফালি দিয়ে এবং ঐ ফালি ও পিচবোর্ডের সঙ্গে ফুল এঁটে দিলে অবস্থাটা এইরূপ দাঁড়াবে :

ফুল—ঐ পিচবোর্ডের দুটো অন্তর একটায় ফুল থাকবে না—খালি থাকবে।

২নং পিচবোর্ডের একদিকে লাল ও অপরদিকে নীল ফুল

৩নং পিচবোর্ডের একদিকে নীল ও অপরদিকে লাল ফুল

৫নং পিচবোর্ডের একদিকে লাল ও অপরদিকে হলুদ ফুল

৬নং পিচবোর্ডের একদিকে সবুজ ও অপরদিকে নীল ফুল

পিচবোর্ডের টুকরো—১নং পিছনে দুপাশে দুটো সরু ফালি; এই ১নংকে ডানদিকে ঘুরালেই ওটা ২নং এর সঙ্গে মিশে ২নং এর নীল ফুলটিকে প্রকাশ করে দেবে।
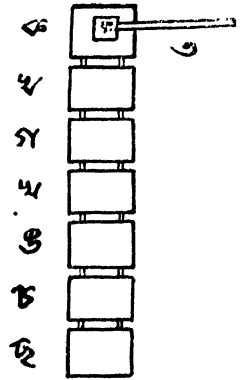
এইরূপে ২নং টুকরোটি ৩নং এ লাগতেই ২-৩ এর মধ্যবর্তী নীল ফুল দুটিকে প্রকাশ করবে। এইরূপে ৩নং ৪নংকে ধাক্কা দেবে এবং ৪নং ৫নংকে, ৫নং ৬নংকে এবং ৬নং ৭নংকে ধাক্কা দিতে মনে হবে পিচবোর্ডগুলি বুঝি ডবল করেই সাজানো আছে।

হাতলের ডানদিকে ঘুরালে ফুল দেখা যাবে, পরক্ষণেই বাঁ দিকে ঘুরালে দেখা যাবে কিছুই নেই!

লেখাটি পড়ে এই ফুল-তৈরী একটা জটিল ব্যাপার বলে মনে হতে পারে; কিন্তু হাতে তৈরী করতে গেলে এটা সহজ হয়ে আসবে।

সোনার বাঙ্‌লার পালা-পার্ব্বণ

[নৃত্য-নাটিকা]

শ্রীঅখিল নিয়োগী

[এই নাটিকাটি মেয়েরা সঙ্গীত ও নৃত্যের ভেতর দিয়ে সুন্দরভাবে রূপদান করতে পারবে। প্রথমে সূত্রধর প্রতিটি নৃত্যের বিষয়-বস্তু বলে দেবে, তারপর সুরু হবে নৃত্য। নেপথ্য থেকে গান গাওয়া হবে। এই নৃত্য-নাট্যের ভেতর দিয়ে বাঙ্‌লাদেশের বারো মাসে তের পার্ব্বণ ফুটিয়ে তোলা হয়েছে।]

সূত্রধর। আমাদের সোনার বাঙ্‌লা—পালা-পার্ব্বণের দেশ। এখানকার নরনারীরা বারো মাসে তের পার্ব্বণ পালন করে থাকে। সুজলা সুফলা বাঙ্‌লার মাটিতে একদিন যেমন সোনা

ফলত, তেমনি কণ্ঠে কণ্ঠে ধ্বনিত হয়ে উঠত—কীর্ত্তন, বাউল আর আগমনী গান। বাঙ্‌লাদেশের প্রতিটি উৎসবের সঙ্গে তাই নৃত্য-গীতি জড়িয়ে আছে। বৈশাখের প্রথমেই সুরু হচ্ছে নববর্ষের গান।

(ছেলেমেয়েরা নৃত্য-গীতের ভেতর দিয়ে নববর্ষকে বরণ করে নিচ্ছে। পরিধানে তাদের নব-বস্ত্র, কণ্ঠে তাদের ফুলের মালা, ছন্দে ও সঙ্গীতে তারা সঞ্জীবিত হয়ে উঠেছে।)

নববর্ষের গান

এ নববর্ষে নতুন সূর্য্য জাগে
সোনালী কিরণ সবাকার চোখে লাগে!
হাতে তুলে নে না আপন নিশান—
সমবেত সুরে গারে আজি গান—
সাগরের জল জেগেছে আজিকে—
সেথায় জোয়ার লাগে!
ময়দানে আজ দাঁড়া সারে সারে—
যত তোরা ভাই-বোন,
নব বরষের ওঠে জয়-গান
কান পেতে সবে শোন্!
কাজ করে যাবি এ নব বছরে—
ফুল সম ফুটে থাক্ ঘরে ঘরে,
লক্ষ্য-পরাণ প্রণতি জানায়ে ঈশের আশিস্ মাগে!
এ নববর্ষে নতুন সূর্য্য জাগে!

সূত্রধর। জ্যৈষ্ঠ মাসে বাঙলাদেশের মায়েরা ষষ্ঠীব্রতের আয়োজন করে থাকেন। হাতে তাঁদের বরণডালা, পুণ্য বারি আর দূর্ব্বার গোছা। বাড়ীর ও গাঁয়ের ছেলেমেয়েদের তাঁরা আশীর্ব্বাদ করেন—ষাট্ ষাট্ ষাট্। মায়েদের পরনে থাকে গরদের সাড়ি, স্নানের পর চুল চূড়া করে বাঁধা, পায়ে আল্‌তা—একেবারে মা লক্ষ্মীর প্রতিমূর্ত্তি। যাঁর নামে গান গাওয়া হয়, তিনি হচ্ছেন ছেলেমেয়েদের দেবতা মা ষষ্ঠী। তাঁর বাহন হচ্ছে বেড়াল।

(একটি মেয়ে মা ষষ্ঠী সেজে দাঁড়িয়ে থাকবে—অন্যান্য মেয়েরা নাচতে নাচতে গানটি গাইবে)

ষষ্ঠীব্রতের গান

মা ষষ্ঠীর ছেলেমেয়ে—ষাট্! ষাট্! ষাট্!
তোমার পায়ে গড় করে মা, বসতে দেবো খাট।
বেড়াল-বাহন ষষ্ঠী মাগো—
ধনে-মানে সুখে রাখো—
মোদের যতেক নাতনী-নাতি পাবে রাজ্যপাট!
ও জননী, কৃপা করো, ক্ষম মোদের ঘাট!
মা ষষ্ঠীর ছেলেমেয়ে—ষাট্! ষাট্! ষাট্!

সূত্রধর। আষাঢ় মাসে চাষা আর চাষা-বৌরা ফসল বোনার উৎসব করে।

(একদল মেয়ে চাষা সাজবে—আর একদল সাজবে চাষা-বৌ। দল বেঁধে একদিকে দাঁড়াবে চাষার দল, অন্যদিকে চাষা-বৌরা। তখন তাদের সুরু হবে সমবেত ফসল বোনার নাচ। পেছন থেকে আর একদল মেয়ে যথারীতি গান গাইবে।)

ফসল বোনার গান

চাষা। হাওয়া ডাকে ও চাষা ভাই, চল্‌তো ক্ষ্যাতে যাই।

চাষা-বৌ। যাইও না—যাইও না কিষাণ, মাথায় মাথাইল নাই!

চাষা। দিও না রে মাথার কিরা—

ম্যাঘ যে জমে আকাশ ঘিরা—

লাঙল চালাই মাঠের জমি নরম করি ভাই—

চাষা-বৌ। ক্ষ্যাতে ফসল ফল্‌লে মোদের মানা কিছুই নাই।

চাষা। তবে চল্‌না ক্ষ্যাতে যাই।

... ...

চাষা। আমরা যদি চালাই রে হাল—

চাষা-বৌ। আমরা ছড়াই বীজ—

চাষা। চন্দনেরই মতন মাটি—

চাষা বৌ। উঠবে ধানের শীষ!

চাষা। মধুর বাতাস দোলায় যদি মোদের সোনার ধান,

চাষা-বৌ। আমরা তো'গোর সঙ্গে গামু ফসল বোনার গান।

সূত্রধর। শ্রাবণ মাসে বাঙ্‌লাদেশ মা মনসার ভাসানের গানে মুখরিত হয়ে ওঠে। নদী-মাতৃক অঞ্চলে সুরু হয় নৌকো বাচ।

(একটি মেয়ে মা মনসা সেজে মাঝখানে দাঁড়াবে—আর মেয়েরা নাচতে নাচতে মনসা ভাসানের উৎসব করবে। নেপথ্য থেকে গান ভেসে আসবে।)

মনসা-ভাসানের গান

বিষহরি মা মনসা সর্পকুলের রাণী,
মঙ্গলঘট বসায়ে মা শুন্‌বো তোমার বাণী॥
করল হেলা তোমার কথা চাঁদ সদাগর,
তাই ত রে তার সাত পুত্র মরিল পর পর!
মা মনসা প্রণাম জানাই জোড় করি দুই পাণি,
পদ্মা দেবী পদ্ম ফুলে আপন বলে জানি!

মা মনসা তোমার বরে বাঁচ্‌লো লখিন্দর
বেহুলা তাই সিঁথেয় সিঁদুর পরে অতঃপর॥
শ্রাবণ মাসে প্রতি গাঁয়ে চলে নাওয়ের বাচ—
দুধ-কলাতে পুষ্ট হয়ে সাপরা করে নাচ—
শিবের মেয়ে চরণ রাখো, পদ্ম দেবো আনি—
বিষহরি মা মনসা, সর্পকুলের রাণী॥

সূত্রধর। ভাদ্র মাসের জন্মাষ্টমী উৎসব বাঙ্‌লাদেশে সর্ব্বজন-বিদিত। কংসের কারাগারে জন্ম নিয়ে বাপের কোলে চেপে শ্রীকৃষ্ণ কি ভাবে বৃন্দাবনে মা যশোদার কাছে আশ্রয় পেলেন, সে কাহিনী বাঙ্‌লার ঘরে ঘরে গীত হয়।

(একটি মেয়ে বাসুদেব সেজে খেলার পুতুল শ্রীকৃষ্ণকে কোলে নেবে। অন্ধকার, বিদ্যুৎ চম্‌কাচ্ছে। শেয়াল পথ দেখিয়ে চলেছে। দেবকন্যারা যেন নৃত্যের ভেতর দিয়ে উৎসব করছে। সঙ্গে আছে সুমিষ্ট কণ্ঠের গান।)

জন্মাষ্টমীর গান

আকাশে কি মেঘের ঘটা বিজ্‌লি চমক্ দিল—
কংস-ভয়ে ওই বাসুদেব কৃষ্ণে তুলে নিল!
কারাগারে জন্ম যে তার
যাবে এবার যমুনা-পার—
ভাগ্য-গুণে বৃন্দাবনে মা যশোদা ছিল!

যমুনাতে এক হাঁটু জল—শেয়াল দেখায় পথ—
এবার বুঝি দেবতাদের পুরবে মনোরথ।
এমন দিনে জন্মে কানাই—
আনন্দেতে আয় সবে গাই,
তালের বড়া খেয়ে নন্দ নাচিতে লাগিল॥

সূত্রধর। শরতের আগমনের সঙ্গে বাঙ্‌লাদেশে ফুটে ওঠে কাশ আর শিউলী,—সেই সঙ্গে জেগে ওঠে বাউলের কণ্ঠে আগমনী গান। মায়ের প্রাণের আকুলতা বাউলের কণ্ঠে মূর্ত্ত হয়ে ওঠে।

(একটি মেয়ে উমা-বিরহ-কাতর মায়ের ভূমিকায় মূক অভিনয় করবে। সঙ্গে তার সহচরীর দল এই গানটি নৃত্যের ছন্দে গাইবে।)

আগমনীর গান

এবারে উমা এলে যেতে আমি দেবো না রে!
কৈলাসে মার সোনার বরণ কালি হলো বারে বারে!
জামাই আমার ভিখারী যে—
ভিক্ষা করে বেড়ায় নিজে—
(তাই) রুক্ষ চুলে তেল পড়ে না, ছিন্নবাসে দেখবো মারে॥

(মা যে) শাঁখা-সিঁদুর সার করেছে, মোতিমালা নেই ত' গলে—
পাগ্‌লা ভোলা ধুত্‌রা ফুলে ভোলায় তারে কতই ছলে।
এবার এলে মা জননী—
করবো তারে চোখের মণি
মায়ের বুকে থাকবে উমা, যাবে না আর ভূতের দ্বারে ॥

সূত্রধর। কার্ত্তিক মাসে বাঙ্‌লার ঘরে ঘরে ভাইফোঁটা উৎসব হয়। বোনেরা ভাইদের অমর করবার জন্যে কপালে চন্দন-তিলক পরিয়ে দেয়।

(ভাইফোঁটা অনুষ্ঠানের মত চন্দন, প্রদীপ, শঙ্খ, খাবার ইত্যাদি সাজিয়ে ছোট দুটি ভাইবোনকে মঞ্চের মাঝখানে বসিয়ে দিতে হবে। বোনেরা নৃত্যে যোগ দেবে। গান গাইবে যথারীতি।)

ভাইফোঁটার গান

আমরা বোনের দল!
ভাই দ্বিতীয়ায় যোগ দিবি কে মোদের সাথে চল।
জ্বালবো মোরা ঘিয়ের প্রদীপ
চন্দনে ভাই পরবি কে টিপ্‌?
মিষ্টি দিলে হাতে হাতে উঠবে কোলাহল—
ফোঁটা নেবার লগন এলো, ভায়েরা চঞ্চল ॥

যমুনা বোন যম রাজারে ফোঁটা দিল কবে?
মোদের ফোঁটায় ভায়ের দলে সবাই অমর হবে।
ভাইবো'নের এই মধুর পরব—
আমরা করি তাহার গরব,
ভাইফোঁটাতে প্রীতির রাখী বাঁধবি কে ভাই বল?
আমরা বোনের দল!

সূত্রধর। অগ্রহায়ণ মাসে কৃষাণদের ঘরে ঘরে নবান্ন উৎসব। নতুন ধানের গন্ধে বাঙ্‌লার আকাশ-বাতাস মধুর হয়ে ওঠে। চাষা আর চাষা-বৌরা আনন্দে সুখের দিনের স্বপ্ন দেখে।

(আষাঢ় মাসের মতো চাষার দল আর চাষা-বৌয়ের দল মঞ্চের দু'ধারে সারি দিয়ে দাঁড়াবে। সুরু হবে তাদের নবান্নের নৃত্য। নেপথ্যের সঙ্গীত তাদের সাহায্য করবে।)

নবান্নের গান

চাষা। সোনা ধানে ভরল গোলা—
রাখ্‌না সোনা তোলা তোলা—
ঢোলক বাজা ওরে চাষী ভাই!
চাষা-বৌ। লক্ষ্মীমায়ের পড়ল চরণ,
তাই ত রে ধান সোনার বরণ—
চাষা। দুখীর ঘরে চিন্তা ত আর নাই!
চাষা-বৌ। নতুন চালের সঙ্গে মেশাই নারিকেল আর গুড়,
চাষা। কুটুম্বেরে ডাক্‌রে কাছে আছে যে জন দূর!

চাষা-বৌ। নবান্ন আজ ঘরে ঘরে,
চাষা। চাষীর হাসি উপচে পড়ে,
উভয়ে। মেঠো সুরে বাঁশের বাঁশী বাজছে কেবল তাই ; ঢোলক বাজা ভাই!

সূত্রধর। পৌষ মাষের শেষের দিন বাঙ্লার ঘরে ঘরে পৌষ-পার্ব্বণ উৎসব। রদ্দুরে পিঠ দিয়ে কচি কলাপাতায় পিঠে খেতে কত মজা! বাঙ্লাদেশের ছেলেমেয়েরা পৌষ-পার্ব্বণে যে আনন্দ করে তা ভোলবার নয়।

(নৃত্যের ভেতর দিয়ে এই উৎসবকে ফুটিয়ে তুলতে হবে। একদল মেয়ে ছেলে সাজবে, আর এক দল মেয়ে। মঞ্চে তাদের সমবেত নৃত্য অতি সহজেই দর্শকবৃন্দের প্রশংসা অর্জ্জন করবে। সঙ্গে ত গান আছেই।)

পৌষ-পার্ব্বণের গান

পৌষ মাসের শেষ দিনটা লাগে বড় মিঠা—
রদ্দুরেতে পিঠ দিয়ে ভাই ছেলেরা খায় পিঠা!
গাঁয়ের বধূ ঢেঁকির পাড়ে গুঁড়ো করে চাল—
দুধ দুয়েছে কলসী ভরা এবার উনুন জ্বাল!
গুড়ের হাঁড়ি রাখ্লি কোথা? কড়ায় কেবল ঢাল।
আন্না ইটা—সিটা—
লাগে বড় মিঠা
পৌষ মাসের পিঠা!

আস্কে পিঠা, চিতৈ পিঠা, চন্দ্রপুলি, ক্ষীর—
পুলি পিঠা, পাটি সাপ্টা দেখেই লাগে ভীড়!
ছেলের দলে গোছা গোছা আনে কলার পাত
নলেন গুড়ের সুবাসে ভাই পল্লী হলো মাৎ!
পাশাপাশি যাওনা বসে, দাও সবে সাথ্ সাথ্।
(আজ) ভর্ত্তি সবার ভিটা,
(তাই) লাগে বড় মিঠা
পৌষ মাসের পিঠা!

সূত্রধর। মাঘ মাসে বিদ্যার দেবী বীণাপাণির আরাধনা সুরু হয় ঘরে ঘরে। ছেলেমেয়েরা খাগের কলম কাটে, দোয়াত ধুয়ে পরিষ্কার করে, বই সাজিয়ে সরস্বতীর পায়ের তলায় দেয়। অঞ্জলি দেয় সবাই মিলে।

(একটি মেয়ে দেবী সরস্বতী সেজে মঞ্চের মাঝখানে দাঁড়াবে—আর ছেলেমেয়েরা নেচে নেচে উৎসব করবে গানের সুরে।)

বাণী-বন্দনার গান

আয় ভাই-বোন, বাণী-বন্দনা আজি—
মায়ের চরণে অঞ্জলি দিতে কুসুমে ভরে নে সাজি।
খাগের কলম রাখ ডান হাতে—
কাঁচা দুধ সবে ঢাল না দোয়াতে—
নিষ্ঠাই তোর হউক মন্ত্র, মিথ্যাতে নহে রাজি।
বাণী-বন্দনা আজি।

জ্ঞানের প্রদীপ জ্বাল ভাই-বোন দেশে দেশে ঘরে ঘরে,
আপন বিদ্যা দান করে দিবি আজি সকলের তরে।
সর্ব্বশুক্লা মোদের জননী—
অজ্ঞান মনে জ্বাল মহামণি—
জীবন তোদের বিকশিত হোক যেন শতদলরাজি।
বাণী-বন্দনা আজি।

সূত্রধর। ফাল্গুন মাসে জ্যোৎস্না-ধোয়া দোল-পূর্ণিমার উৎসব। রাধাকৃষ্ণের দোলকে কেন্দ্র করে সেই প্রাচীন যুগ থেকে চলে আসছে আবীর-কুঙ্কুমের রঙীন খেলা।

(এই উৎসবে রাধা ও কৃষ্ণ সেজে দুটি মেয়ে মঞ্চের মাঝখানে দাঁড়াবে, আর তাদের ঘিরে সখীরা নৃত্য করবে। এই নাচে রাধাকৃষ্ণও অংশ গ্রহণ করবে। পিছন থেকে ভেসে আসবে সঙ্গীত।)

দোল-পূর্ণিমার গান

রাধা-কৃষ্ণ দোলে।
মধুবনে কি বাঁশরী, মন-প্রাণ ভোলে।
গোপিনীরা জ্যোছনায় খেলিছে হোরি—
রাধা শ্যাম মাঝখানে মরি লো মরি!
ময়ূর মনের সুখে পেখম তোলে।

পূর্ণিমা চাঁদে বল ফাগে কে রাঙায়,
শুক-সারী শিস দিয়ে ইতি-উতি চায়।
যমুনার কালো জলে কি মুখ ভাসে
যে প্রাণে জোয়ার জাগে ছুটে যে আসে।
পিক তার কুহুতান পঞ্চমে তোলে।

জ্যোছনায় ভোলে—
রাধাকৃষ্ণ দোলে।

সূত্রধর। চৈত্র মাসে বেজে ওঠে গাজনের ঢাক। তাই ত নেচে ওঠে ছেলেবুড়ো সবাইকার মন। বাঙলাদেশের গাজনের নাচ জনগণের মনের সঙ্গে মিতালী পাতিয়েছে।

(শিব আর দুর্গা সেজে মঞ্চের মাঝখানে দু'জন দাঁড়াবে; আর তাদের ঘিরে নাচবে সন্ন্যাসী আর সন্ন্যাসিনীর দল। ভূত-প্রেত যদি থাকে তাতেও আপত্তি নেই। এই গাজন উৎসবের সঙ্গে বছরের পালা-পার্ব্বণ হয় শেষ।)

গাজনের গান

এবার ভোলা ভুল করে ভাই ভাং খেয়েছে ভারী—
গাজনের বাজনা বাজা, আয় না তাড়াতাড়ি।
(ড্যা ড্যা ড্যাং—ড্যা ড্যাং ড্যা ড্যাং)
মান করে তাই উমা রাণী যাবে বাপের ঘর,
ভেবে আকুল ভোলা কি যে করবে অতঃপর।
ইঁদুর-বাহন গণেশ দাদা মুখ করেছে ভারী,
তোরা আয় না তাড়াতাড়ি।
(ড্যা ড্যা ড্যাং—ড্যা ড্যা ড্যাং)

নন্দী দাদা ভৃঙ্গী দাদা যাবে মায়ের সাথে—
সিদ্ধিদাতা গণপতি চোখের জলে কাঁদে।
সাপগুলি সব কিল্‌বিলিয়ে সুড়সুড়ি দেয় নাকে,
শিবের বাহন ষাঁড় যে রে ভাই
শিং উঁচিয়ে ডাকে।
তাই ত ভয়ে মহেশ্বরের ছাড়েই বুঝি নাড়ি—
তোরা আয় না তাড়াতাড়ি।
(ড্যা ড্যা ড্যাং—ড্যা ড্যাং ড্যা ড্যাং)

—যবনিকা—

নাতি-মহারাজ

শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র দাশগুপ্ত

দাদু, আমি মহারাজ, মন্ত্রীজী তুমি মোর,
শাস্ত্রী, দিদিমা, তুমি, থাকো গে আগ্‌লে দোর।

সম্মুখে দেখ্‌লেই কোরো মোরে কুর্ণিশ।
মাইনে? যা চাও নেবে, হোক্ লাখ দশ বিশ ॥

চুপ্ চুপ্! এইবার সুরু হবে দরবার।
মন্ত্রীজী, রাখো দে[illegible] কি কি আছে কর্‌বার ॥
কোন্ হ্যায়? দ্যাখো ক[illegible] বাইরে কে কি বা চায়।
দেখ্‌তে তো হবে যেন সবে স্ফু[illegible] পায় ॥

কি চাও তুমি হে বাপু? খাও নাই তিনদিন?
এটা কি লঙ্গরখানা? কিনে খেয়ো সোয়াবিন।
তোমার কাপড় নেই? গিয়েছ কি দোকানে?
টাকা দিলে হাতী মিলে, কি না পায় সেখানে!
তোমার যা কিছু ছিল সবই নিয়ে গ্যাচে চোর?
ধরো নাই তারে? পেলে বেঁধে এনো কাছে মোর।

মন্ত্রী, কি হচ্ছে ও?—দরবারে কর গান?
শাস্ত্রী, সাহস এত, পিক ফ্যালো খেয়ে পান?
দূর্ দূর্, বেয়াদপ, এ কি বাড়ী পেয়েছিস্?
যা যা চ'লে এক্ষুণি, হ'লি তোরা ডিস্‌মিস্।

পথ-নির্দ্দেশ

শ্রীহরিপদ চক্রবর্ত্তী

এ দুর্দ্দিনে পুরানো মনোমালিন্যের জের টেনে আর লাভ নেই। চন্দ্রকুমার বাবু মনস্থির করে ফেললেন। স্ত্রী অবলা দেবীকে ডেকে বললেন, 'মাণিকের সম্বন্ধে আমি বিশেষভাবে ভেবে দেখেছি। তাকে আসতে লিখে দিই, কি বলো?'

অবলা দেবী নিঃস্পৃহস্বরে বললেন, 'তা যা খুশী করতে পার। তবে কিশোর যেন ওর সঙ্গে মিশে বখে না যায়, সেদিকে খেয়াল রেখো।'

চন্দ্রকুমার বাবু একটু আহত হলেন। তাঁর ছোট ভাইএর ছেলে মাণিকের সঙ্গে মিশে নিজের ছেলে খারাপ হবে কেন? ভাগ্যের পরিবর্ত্তনে আজ তিনি পয়সার মুখ দেখেছেন, আর ছোট ভাই দেশে জমিজমা নিয়ে কোন রকমে দিন গুজরাণ করছে। আজ বহুদিন ঝগড়াঝাটি করে বাড়ী ছেড়ে এলেও তাঁরা তো এক বংশেরই ছেলে, এক মায়ের পেটের ভাই। তাঁর সঙ্গে তাঁর ভাইএর তফাৎ কি? তাই স্ত্রীর কথায় মনে মনে বিরক্ত হলেও মুখে তা প্রকাশ করলেন না। শুধু বললেন, 'না, সে ভয় নেই। মাণিক খুব ভালো ছেলে। ওখানে পড়াশোনার ভালো রকম সুবিধে না থাকার জন্যই এখানে আসা। আর ভগবান যখন আমাকে এত দিয়েছেন, তখন মাণিককে মানুষ করার কর্ত্তব্য আমাকে ভুললে চলবে কেন? আমি কালকেই চিঠি দিচ্ছি ওকে পাঠানোর জন্য।'

কিশোর বেড়িয়ে ফিরল খানিকক্ষণ পরে। চন্দ্রকুমার বাবু ডেকে বললেন, 'শোন্ কিশোর, তোর এক দাদা আসছে দেশ থেকে। এখানে পড়াশোনা করবে। তোর ঘরেই থাকবে। দুটিতে মিলে বেশ মনোযোগ দিয়ে লেখাপড়া করবি।'

কিশোর তার জীবনে কখনো দাদার কথা শোনে'নি। তার জন্ম কলকাতায়, স্বচ্ছলতায় মানুষ। তাই বলল, 'কোন্ দাদা বাবা?'

চন্দ্রকুমার বাবু মনে মনে চটে গেলেন। কিন্তু সেজন্য কিশোরকে তো দোষ দেওয়া যায় না। কিশোরের দোষ কি? দাদা সম্বন্ধে কিশোরের অজ্ঞতা বাস্তবিক তাঁরই দোষে। সরিকি ঝগড়ার ফলে তিনি দেশের সঙ্গে কোন সম্পর্ক রাখেন নি। কালেভদ্রে দেশে গেলেও ছেলে আর স্ত্রীকে কখনো সেখানে নিয়ে যান নি। আজ ছেলের কাছে তাই একান্ত আপন জনের পরিচয় দিতে গিয়ে পুরানো স্মৃতিতে তাঁর মন ডুবে গেল। আস্তে আস্তে সব বললেন ছেলেকে। সমস্ত বলে মনে মনে বেশ আত্মপ্রসাদ অনুভব করলেন।

কিশোর সব শুনে বলল, 'বেশ হবে বাবা! মাণিকদা এলে বেশ দু'জনে থাকা যাবে।'

চন্দ্রকুমার বাবু নিশ্চিন্ত মনে মৃদু হাসলেন।

কয়েকদিন পর নিশকুমার বাবু ছেলেকে নিয়ে ভাইএর বাড়ী এলেন। কলকাতায় এসে হকচকিয়ে গেলেন প্রথমটা। দাদার ঐশ্বর্য্য দেখে একটু অবাক হলেন। গ্রামে থাকতে এতটা ধারণা করতে পারেন নি। মাণিক বেশ সুখেই থাকবে ভেবে আনন্দিত হলেন তিনি।

কিশোর কিন্তু তার মাণিকদাকে দেখে মোটেই খুশী হতে পারে নি। রোগাপটকা একটা ছেলে। গায়ে আধময়লা একটা টুইলের সার্ট, পরনে মালকোচা মারা মোটা ধুতি, পায়ে জুতো নেই। এই মাণিকদার জন্য উচ্ছ্বসিত হয়েছিল সে? ওর সঙ্গে এক ঘরে থাকতে হবে? একসঙ্গে পড়াশোনা করতে হবে? অসম্ভব। মাকে গিয়ে বলল, 'মা, ঐ নোংরা ছেলেটা নাকি আমার দাদা? ওর সঙ্গে একত্র থেকে পড়াশোনা করা আমার পোষাবে না। তুমি বাবাকে বলে দিও।'

অবলা দেবী মাণিকের আগমনে মোটেই খুশী হন নি। অথচ স্বামীর অহেতুক উদারতায় মনে মনে বিরক্ত হলেও মাণিকের আগমনে বাধা দিতেও পারেন নি। তাই ছেলের কথায় নির্লিপ্ত ভঙ্গীতে বললেন, 'আমাকে এর মধ্যে জড়িয়ো না বাপু। তুমিই তোমার বাবাকে বোলো।'

'আচ্ছা আমিই বলব,'—উষ্ণ-স্বরে জবাব দিল কিশোর।

চাকরকে ডেকে চন্দ্রকুমার বাবু যখন কিশোরের ঘরেই মাণিকের শোয়ার ও পড়াশোনার বন্দোবস্ত করতে গেলেন, তখন কিশোর কথাটা তার বাবাকে বলল।

চন্দ্রকুমার বাবু খানিকক্ষণ চেয়ে রইলেন ছেলের দিকে। তারপর বললেন, 'তোমার অসুবিধা কি?'

কিশোর বলল, 'ওর সঙ্গে থাকলে আমার পড়াশোনা হবে না। একটা পাড়াগেঁয়ে জংলীর সঙ্গে দিনরাত একঘরে থাকা আমার পোষাবে না।'

চন্দ্রকুমার বাবু মহাবিরক্ত হয়ে জবাব দিলেন, 'চুপ করো, অযথা চেঁচামেচি করো না। আমি যা করছি তা তোমার ভালোর জন্যই। মাণিক খুব ভালো ছেলে। তার সঙ্গে থাকলে তোমার ভালো ছাড়া খারাপ হবে না।'

মুখ গোঁজ করে রইল কিশোর। চন্দ্রকুমার বাবু নিজের কর্ত্তব্যে মন দিলেন।

নিশিকুমার বাবু দিন দুই রইলেন কলকাতায়। কালীঘাটে মায়ের মন্দির দর্শন করে, ছেলেকে নানা রকম উপদেশ দিয়ে ফিরে গেলেন দেশে। মাণিক সম্পূর্ণ অচেনা পরিবেশে নতুন করে জীবন সুরু করল।

ইতিমধ্যে মাণিক ভর্ত্তি হয়েছে ক্লাশ 'সেভেন'এ, ভবানীপুরের একটা নামকরা স্কুলে। কিশোরও সেই স্কুলেই পড়ে। কিন্তু চন্দ্রকুমার বাবু যা আশঙ্কা করেছিলেন, শেষ পর্য্যন্ত তাই সত্য হ'ল। কিশোর কিছুতেই মাণিকের সঙ্গে বনিয়ে চলতে পারল না। চন্দ্রকুমার বাবুর কাছেও মাণিকের চালচলন মাঝে মাঝে বেয়াড়া বলে মনে হয়। তার চলাফেরা সব দীন দরিদ্রের সঙ্গে। ঐ তো সেদিন এতগুলি পেণ্ট, সার্ট করে দিলেন। তার মধ্যে ক'টা অবশিষ্ট আছে? কে কোথায় জামাকাপড়ের অভাবে কষ্ট পাচ্ছে, তাকে হুট্‌ করে নিজের জামা দিয়ে দেওয়া চাই। কে কোথায় নাকি দু'দিন না খেয়ে আছে, মাণিকের হাতখরচের টাকাটা ওখানে বরবাদ হয়ে যায়। এই ধরনের আরো কত কি! তাদের মত লোকের নাকি ঐ সব নোংরা ভিখিরীদের সঙ্গে এত মেলামেশা করা পোষায়? মাণিককে ডেকে কতবার তিনি বলেছেন, 'এদের সঙ্গে তোর এত দহরম-মহরম কিসের?'

মাণিক ব্যথিত স্বরে জবাব দেয়, 'জ্যেঠামশায়, তুমি যদি ওদের দুঃখ দেখ, তবে তুমিও না দিয়ে পারবে না। ওরা যে কত অসহায় তা' চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না।' বলতে বলতে মাণিকের চোখ ছলছল করে আসে।

কড়া কথা বলতে গিয়েও চন্দ্রকুমার বাবুর মুখে আটকে যায়। কিন্তু মাঝে মাঝে তিনি মাণিকের জন্য বড় চিন্তিত হয়ে পড়েন। এত কম বয়সে চারদিকে মন বিক্ষিপ্ত হয়ে গেলে পড়াশোনা যে কিছুই হবে না। নিশিকেই বা কী জবাব দেবেন তিনি! ছেলের ভালো রকম পড়াশোনা হবে বলেই না এখানে রাখা। তাই যদি না হ'ল তো তাকে এখানে রাখা কেন? পরে চন্দ্রকুমার বাবু দোষী হবেন না তো? কিন্তু চন্দ্রকুমার বাবু অনেক ভেবে দেখেছেন, মাণিক আর যাই করুক কোন অন্যায় করে না।

মাঝে মাঝে কিশোর এসে নালিশ জানায় মাণিকের নামে, 'জানো বাবা, আজ মাণিকদা একটা বস্তিতে গিয়েছিল। আমাকে বললে, তুই বাড়ী যা, আমার একটু দেরী হবে।...ওই বস্তিতে শুধু নোংরা ভিখিরীদের আড্ডা।'

চন্দ্রকুমার বাবুর ভাবনা বেড়ে যায়। এর কোন সমাধানই তাঁর চোখে পড়ে না। জোর করে বাধা দিতে গেলে জেদ চেপে যাবে। সারাক্ষণ চোখে চোখেও রাখা যাবে না। কী যে করা যায়? সমস্যা অন্য দিকেও দেখা দিল। কিশোর মাণিককে তার ঘরে রাখতে রাজী নয়। মাণিক নোংরা, সারাদিন টো-টো করে ঘুরে এসে অনেক রাত্তির অবধি পড়াশোনা করে, কিশোরের ঘুমের ব্যাঘাত করে ইত্যাদি নানা রকম আপত্তিতে শেষ পর্য্যন্ত চন্দ্রকুমার বাবুকে

মাণিকের জন্য আলাদা ঘর নির্দ্দিষ্ট করতে হ'ল; তাকে কড়া গলায় শাসনও করলেন, 'তুমি যদি এমন বাউণ্ডুলে হয়ে ঘুরে বেড়াও, তবে এখানে থেকে লেখাপড়া করা সম্ভব নয়। তোমার বাবাকে আমি চিঠি লিখে দেব।'

মাণিক কোন জবাব দেয় না। তবে তার চালচলন অনেকটা ঘরমুখী করে তোলে। স্কুলে যাওয়া আসার পথে কিশোরকে বোঝায়, 'দেখ কিশোর, মানুষের জীবনে একমাত্র কাজ হ'ল মানুষের সেবা করা। স্বামী বিবেকানন্দের জীবনী পড়েছিস্? তার মধ্যে আছে স্বামীজীর কথা—প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই ভগবান আছেন। অতএব মানুষের সেবা করলেই ভগবানের সেবা করা হয়।'

কিশোর খিলখিল করে হেসে ওঠে, বলে, 'আমাদের পাড়ায় ঐ যে একটা ভিখিরী আসে, সারা গায়ে দগদগে ঘা, ওর মধ্যেও ভগবান আছেন?'

শান্তস্বরে জবাব দেয় মাণিক, 'আছেন বৈ কি ভাই!'

কিশোর অবিশ্বাসের হাসি হাসে।

মাণিক আবার বলে, 'নিজের জীবন দিয়েও যদি কারু উপকার করা যায়, তবে তাই করা উচিত।'

কিশোর ব্যঙ্গ করে বলে, 'স্বামীজী বুঝি বলেছেন, ঐ ভিখিরীদের সব বিলিয়ে দাও? তুমি বুঝি সেই জন্যেই ঐ সব নোংরা জীবদের সঙ্গে সব সময় ঘুরে বেড়াও?'

মাণিক জবাব দেয়, 'তা নয়, তবে যার যা সাধ্য সে ভাবে অন্যের দুঃখ মোচন করা কর্ত্তব্য।'

কিন্তু কিশোরকে সে তার মনোভাব কিছুতেই বুঝিয়ে উঠতে পারে না। কিশোর খালি ঠাট্টা করে, তাকে অবজ্ঞা করে।

এমন সময় একটা সর্ব্বনাশ ঘটে গেল। কিশোর আর মাণিক আসছিল স্কুল থেকে। একটা ছোট ছেলে রাস্তা পার হওয়ার সময় হঠাৎ একটা ট্যাক্সি ছুটে এসে তার উপর পড়বার উপক্রম করতেই মাণিক ছুটে গিয়ে এক ধাক্কায় ছেলেটাকে একপাশে সরিয়ে দিল। ছেলেটা বাঁচল বটে, তবে মাণিক নিজেকে সামলাতে পারল না। ট্যাক্সির একটা প্রচণ্ড ধাক্কায় ছিটকে গিয়ে পড়ল পাঁচ হাত দূরে। মুহূর্ত্তে একটা বিপর্য্যয় ঘটে গেল। হৈ-চৈ আর অজস্র সোরগোলের মধ্যে কিশোর কিছুই বুঝতে পারল না। লোকজন ধরাধরি করে ঐ ট্যাক্সিতেই মাণিককে হাসপাতালে নিয়ে গেল। কিশোর ছুটে বাড়ী এল। বাবা তখনও আপিস থেকে ফেরেন নি। মাকে গিয়ে বলল দুর্ঘটনার কথা। অবলা দেবী কেঁদে উঠলেন, 'কি সর্ব্বনাশ। এখন উপায়?'

ফোন করে চন্দ্রকুমার বাবুকে আনা হ'ল বাড়ীতে। খবর পাওয়া গেল শম্ভুনাথ পণ্ডিত হাসপাতালে মাণিক আছে। স্ত্রী ও ছেলেকে নিয়ে গেলেন সেখানে। গিয়ে দেখেন, মাণিক শুয়ে আছে, তার সর্ব্বাঙ্গে ব্যাণ্ডেজ মুখে ডাক্তারের বাঁধা। শুনলেন, তখনও জ্ঞান ফিরে আসে নি

মাণিকের। বাঁচার আশা খুবই কম। চন্দ্রকুমার বাবু বাড়ী ফেরবার পথে ভাইকে শীঘ্র আসার জন্য একটা টেলিগ্রাম পাঠিয়ে দিলেন।

সেদিন রাত্রেই মারা গেল মাণিক। পরদিন খবরের কাগজে একটা বড় ছবি দিয়ে 'ছোট ছেলের আত্মত্যাগের মহান্ দৃষ্টান্ত' শিরোনামায় অনেক প্রশংসাবাদ করা হয়েছে মাণিকের। বলা হয়েছে, এমন ছেলের জন্য গর্ব্ব বোধ করতে পারে বাংলাদেশ। অকালে জীবনদীপ নির্ব্বাপিত না হলে এসব ছেলেরাই দেশকে গৌরবের উচ্চতম শিখরে নিয়ে যেতে পারত।...আরো অনেক কিছু লেখা হয়েছে কাগজে। সর্ব্বশেষে মাণিকের শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করা হয়েছে।

চন্দ্রকুমার বাবু বড় আঘাত পেলেন। কিশোরও কেমন স্তব্ধ হয়ে গেছে। তার চোখের সামনেই এক মুহূর্ত্তে কী যে ঘটে গেল! মাণিকদাকে সে কত ঠাট্টা করেছে, কিন্তু মাণিকদা যে কত বড়, সে যেন আজ নতুন করে টের পেল। অসহ্য ব্যথায় তার শুধু কান্না পেতে লাগল।

রাত অনেক হয়েছে। চন্দ্রকুমার বাবু আর অবলা দেবী বসে বসে মাণিকের কথাই আলোচনা করছেন। তার বাবা এলে কি জবাব দেবেন, সেইটে এক মহা সমস্যার ব্যাপার। হঠাৎ কিশোরের ঘর থেকে একটা কান্নার শব্দ শুনে চমকে উঠলেন তাঁরা। এত রাত্রে ওর ঘরে আলো জ্বলছে কেন? কিশোর কি স্বপ্নে কাঁদছে নাকি? তাড়াতাড়ি তাঁরা কিশোরের ঘরের দিকে গেলেন। ভেজানো দরজা ঠেলে ঘরে ঢুকে স্তম্ভিত হয়ে রইলেন দু'জনে। আজকের খবরের কাগজে মাণিকের যে ফটোটা বেরিয়েছে, কিশোর তার উপর মাথা ঠুকছে আর কান্নাজড়িত স্বরে বলছে, 'আমায় মাফ করো মাণিকদা! তোমায় আমরা কেউ চিনতে পারি নি। তোমায় কত ঠাট্টা করেছি। এখন থেকে তুমি যে সব কথা বলেছ, আমি সব পালন করব। তুমি আমাকে যে পথ দেখিয়ে গিয়েছ আশীর্ব্বাদ করো, আমি যেন সেই পথে চলতে পারি সারাজীবন।' তারপর দু'হাতে সেই ফটোটি চেপে ধরে ডুকরে কেঁদে উঠল কিশোর!

বছরের জন্মকথা

শ্রীনারায়ণচন্দ্র চন্দ

শীতের হাওয়ায় অনেক গাছের পাতা ঝরে গিয়েছিল; গাছে ফুল ছিল না, ফল ছিল না। তখন শুকনো ডালপালা দেখে মনে হয়নি এরা আবার বেঁচে উঠবে। শীতের শেষে ফাগুনের হাওয়া যখন বইতে সুরু করল, এদের ভিতর যেন প্রাণ জেগে উঠল। শুকনো ডালে কচি পাতার মুখ দেখা দিল। কয়েক দিনের মধ্যেই সারা গাছ ছেয়ে গেল রেশমী ঝালরের মত পাতার ঝাঁকে।

হাওয়ায় পাতাগুলো ঝিলমিল করতে লাগল। কোন কোন গাছে শুক্‌নো ডালে ফুলের কুঁড়ি ভরে এল; বাতাসে সুবাস ছড়াল, মৌমাছি এল গুন্‌গুনিয়ে। এমনি করে শীতের শেষে বসন্ত এল: মানুষের মনেও এল পুলক। চৈত্র মাসের শেষ দিকে নূতন বছরের উৎসব পালনের জন্য আয়োজন. চলতে লাগল।

নববর্ষ উৎসব কেমন করে পালন করা হবে, কি গান হবে, কি ব্রত গ্রহণ করা হবে, এই সব আলোচনার জন্য একদিন ছাত্রদল বাসায় এসে হাজির। কমল তাদের দলের অধিনায়ক। সব কাজ সে নিখুঁত সুন্দর করে করতে চায়। তার বন্ধু সুবিনয়ের মন কৌতূহলে ভরা; নূতন জিনিস দেখার ও শেখার আগ্রহ তার অসীম। মেঝেতে মাদুর বিছিয়ে সবাই বসল। সুবিনয় বলল—কখন্ থেকে প্রথম বছর গোণা সুরু হয়েছে, আমাদের শুনতে ভারী ইচ্ছা হয়েছে।

ছোটদের চোখমুখে বুদ্ধি-মেশানো আনন্দের আলো দেখলে মন খুব খুসী হয়। বললাম—বেশ! বছরের কথা শুনতে হলে তোমাদের বহু যুগ আগের মানব-সভ্যতার গোড়ার কথা কিছুটা শুনতে হবে।

ছেলেদের চোখ উৎসাহে জল্‌জল্ করতে লাগল।

—সূর্য্য থেকে উৎপত্তি হবার পরে কতকাল ধরে যে পৃথিবী মহাশূন্যে ঘুরপাক খাচ্ছে, তা সঠিক বলা সহজ নয়। প্রথমে পৃথিবী ছিল একটি বিরাট আগুনের গোলকের মত। ক্রমে শীতল হ'ল; জল, মাটি, পাথর, গাছপালা এবং নানা কিম্ভূতকিমাকার প্রাণীর সৃষ্টি হ'ল। তখনও মানুষের উৎপত্তি হয়নি। এই ভাবে কত কোটি যুগ চলে গেল। তারপর ধীরে ধীরে ক্রমবিকাশের ফলে মানুষ এল পৃথিবীতে। মানব সভ্যতার পত্তন করল তারা। সেই সভ্যতার ধারাই আজ পর্য্যন্ত চলে এসেছে।

—এখন থেকে প্রায় ছয় হাজার বছর আগে মিশর দেশে প্রথম বছর গণনা সুরু হয়। মিশর দেশকে বলা হয় সবচেয়ে প্রাচীন সভ্যতার দেশ। তখন লোকের ধারণা ছিল, সূর্য্য এবং আকাশের অন্য সব জ্যোতিষ্ক পৃথিবীর চারদিকে ঘোরে, পৃথিবী স্থির থাকে। মিশরের কতক লোক আকাশের এই জ্যোতিষ্কগুলোকে খুব ভাল করে লক্ষ্য করত। তারা দেখল, একদিন ঠিক সূর্য্য অস্ত যাবার সময় পূব আকাশে দিগন্ত রেখার ওপর একটি তারা দেখা যায়। তারপর দিন থেকে একটু একটু করে উপরের দিকে উঠতে থাকে। ক্রমে সূর্য্যাস্তের সময় তাকে আর দিগন্তরেখায় দেখা যায় না, দেখা যায় আকাশের কিছুটা উপরে। এই ভাবে সরতে সরতে আবার কিছুদিন পরে সে তারাটি ঠিক সেই আগের জায়গাটিতে—সূর্য্য ডুবে যাবার সঙ্গে সঙ্গে পূব আকাশে উদিত হয়। মিশরীয়রা এই তারাটির নাম দিয়াছিল সোথাস্। আর এই তারাটির পৃথিবীর চারদিকে এক পাক ঘুরে আসার সময়কে বলত 'সোথিক চক্র'। এইভাবে হ'ল বছর গণনার সূচনা।

সুবিনয় শুধাল—কতদিনে তাদের বছর ধরা হ'ত?

—দিন রাত্রির প্রভেদ বুঝতে শুধু মানুষের কেন অন্য ইতর প্রাণীরও কোন অসুবিধা হয়নি। পূর্ণিমা থেকে অমাবস্যা পর্য্যন্ত এবং আবার পূর্ণিমা পর্য্যন্ত মানুষ সহজেই হিসাব করতে পারত। মিশরীয়গণ ত্রিশ দিন করে মাস ধরে তিনশো ষাট দিনে এক বছর ধরত; কিন্তু দেখা যেত 'সোথাস্' তারাটি দেখা দিত আরো পাঁচ দিন পরে। 'সোথাস্' দেখা না যাওয়া পর্য্যন্ত নূতন বছর সুরু হ'ত না, ঐ পাঁচদিন দেশের মধ্যে উৎসব চলত।

নরেশ বলল—বাঃ! তাদের তো মজাই ছিল। পৃথিবী সম্বন্ধে তাদের কি ধারণা ছিল?

—মিশরীয়রা সূর্য্যকে পূজা করত; এর নাম দিয়েছিল 'রা'। তাদের ধারণা ছিল রা দেবতা নৌকাতে করে পূব আকাশ থেকে রওনা হয়ে পশ্চিম কূলে গিয়ে পৌছান। সেখান থেকে মাটির তলাকার সমুদ্রপথে তিনি আবার ভোরে পূব আকাশে দেখা দেন। তখনকার দিনের লোকেরা মনে করত পৃথিবী চ্যাপ্টা থালার মত। বিরাট একটি স্থলভাগ স্থির হয়ে রয়েছে, সূর্য্যই পৃথিবীর চারদিকে ঘুরছে। গ্রীস দেশের পণ্ডিত টলেমী এই মত প্রচার করেন—সে এখন থেকে প্রায় উনিশ শত বছর আগেকার কথা। চৌদ্দশ' বছর এই মত সকলে সত্য বলে মেনেছে। পরে ১৪৭৬ খৃষ্টাব্দে পোল্যাণ্ড দেশের কোপর্নিকস নামে এক সন্ন্যাসী পণ্ডিত এই মত পরিবর্ত্তন করেন। তিনি বলেন, সূর্য্য স্থির হয়ে আছে, পৃথিবীই তার চারদিকে ঘুরপাক খাচ্ছে। এই মত এখন সবাই আমরা সত্য বলে জানি।

সুবিনয় আবার শুধাল—কোন্ মাস থেকে বছর গোণা হ'ত? মাসগুলোর নাম কি করে হ'ল?

—বেশ ভাল প্রশ্ন। প্রাচীন গ্রীস ও রোম সভ্যতায় খুব উন্নত ছিল। ইংরেজী মাসের নামগুলো তাদের দেবতা ও বিখ্যাত লোকদের নাম থেকে দেওয়া হয়েছে, যেমন—জানুয়ারী—রোমান দেবতা জেনাস থেকে; ফেব্রুয়ারী—রোমানদের দেবতা ফেব্রাসের নাম অনুসারে; মার্চ—গ্রীক্ দেবতা মার্স থেকে; মে—মার্কারী নামক দেবতার জননী মেইয়ার নাম থেকে; জুন—গ্রীক্ দেবী জুনোর নাম থেকে; জুলাই—রোমের বিখ্যাত বীর জুলিয়াস সীজারের নাম থেকে—এই রকম।

—একটা মজার কথা এই যে, সকল দেশের লোকেরা একই মাস থেকে নূতন বছর গুণতে সুরু করে না। আগে ইংলণ্ডে ২৫শে ডিসেম্বর থেকে বছর গোণা হ'ত। বিজয়ী উইলিয়াম নামে এক রাজা ১লা জানুয়ারী সিংহাসনে বসেন। তিনিই ১লা জানুয়ারী থেকে ইংরেজী মতে বছর গণনা চালু করেন। ইহুদীদের মধ্যে একসঙ্গে দুইটি বছর গণনা হ'ত; পবিত্র বছর আরম্ভ হ'ত মার্চ মাসে, সাধারণ বছর সুরু হ'ত সেপ্টেম্বর মাস থেকে। এথেনীয়ানরা জুন মাসকে বছরের প্রথম মাস ধরত, ম্যাসিডনবাসীদের বছরের প্রথম মাস সুরু হ'ত ২৪শে সেপ্টেম্বর থেকে।

শিবাপদ বলল—অন্য দেশের লোকদের কথা শুনলাম। আমাদের দেশে বছর গোণা হ'ত কোন্ মাস থেকে, বলুন না।

—আমাদের দেশে আগে অগ্রহায়ণ মাস ছিল বছরের প্রথম মাস। কেন তার কারণ বলছি। ভারতবর্ষ কৃষিপ্রধান দেশ। যে মাসে হায়ন অর্থাৎ ব্রীহি ধান্য প্রচুর ফলে, সেই মাস থেকেই লোকেরা বছর গোণা সুরু করেছে। মাঠে মাঠে সোনার বরণ নূতন ধান পেকে উঠত, নূতন ধানে নবান্ন করে লোকে আনন্দ-উৎসবের মধ্য দিয়ে নববর্ষ উৎসব পালন করত। চন্দ্র-সূর্য্যের গতি লক্ষ্য করে বছর গণনা তখন হ'ত না। পরে গ্রহ-নক্ষত্রের গতিবিধি সম্বন্ধে ভারতীয় বৈজ্ঞানিকগণ যখন অনেক তথ্য জানতে পারলেন, তখন থেকে বৈশাখ মাসকে বছরের প্রথম মাস ধরে গণনা সুরু হ'ল।

—রাত্রির আকাশে আমরা অসংখ্য তারকার ঝিকিমিকি দেখতে পাই। এদের মধ্যে কতক ছোট, কতক কিছুটা বড় দেখায়; কতক খুব কাছাকাছি জটলা করে আছে, কতক আছে কিছু দূরে দূরে। এই নক্ষত্রের অনেকগুলোর নাম দেওয়া হয়েছে; আর যে সকল নক্ষত্র মিলে এক একটি দল বেঁধে আছে, সে দলেরও নাম দেওয়া হয়েছে। এই দলকে বলা হয় রাশি। পৃথিবী লাটিমের মত নিজের মেরুদণ্ডের উপর ঘুরছে, আর পশ্চিম দিক থেকে পূর্ব্ব দিকে এগিয়ে চলেছে। এই জন্য আমরা সূর্য্যকে বছরের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন রাশির কাছ দিয়ে যেতে দেখি। এই থেকেই হয়েছে পৃথক্ পৃথক্ মাসের নাম। বিশাখা, জ্যেষ্ঠা প্রভৃতি নক্ষত্রের নাম অনুসারে আমাদের মাসগুলোর নাম হয়েছে। ১লা বৈশাখ থেকে আমাদের নূতন বছরের সুরু।

—গোলাকার পৃথিবী বিরাট প্রদীপের মত জ্বলন্ত সূর্য্যের সামনে ২৪ ঘণ্টায় একবার করে পাক ঘুরছে—তার ফলে আলোকিত ভাগে দিন ও আঁধার ভাগে রাত্রি হচ্ছে। এইভাবে দিন রাত্রি সৃষ্টি করতে করতে পৃথিবী শূন্যপথে এগিয়ে যেতে যেতে তিনশো পয়ষট্টি দিন ছয় ঘণ্টা নয় মিনিটে সূর্য্যের চারদিকে একপাক ঘুরে আসছে। পৃথিবীর এই সূর্য্য প্রদক্ষিণকে বলা হয় বছর। ভাবতেও বেশ মজা লাগে। সূর্য্যের মেয়ে পৃথিবী যেন দিনরাত্রির ভিতর দিয়ে আলো-আঁধারের মালা গেঁথে চলেছে, ৩৬৫টা সাদা কালো ফুলে সে মালাটি পূর্ণ। জন্মের পর থেকেই সে তার পিতাকে প্রদক্ষিণ করতে সুরু করেছে। পৃথিবীর সন্তান মানুষ বুদ্ধি খাটিয়ে আবিষ্কার করেছে এই রহস্য। তারা সীমাহীন কালের ওপর বছরের 'মাইল পোষ্ট' বসিয়ে সময়ের দূরত্ব মাপতে শিখেছে। আমরা এখন তাই অতীতের সাথে বর্ত্তমানের, বর্ত্তমানের সাথে ভবিষ্যতের কোন সময়ের দূরত্ব বছর দিয়ে সঠিকভাবে বুঝতে পারি। বছর, মাস, দিন, ঘণ্টা এসব বাদ দিলে আমাদের এখন মোটেই চলে না। যাঁরা প্রথমে এদিকে মাথা খাটিয়েছেন, তাঁদিগকে নমস্কার করি।

জীয়ন পুতুল

শ্রীমণীন্দ্র দত্ত

[এক বুড়ো ছুতোর, নাম তার গোপীনাথ, সবাই বলতো গোপীখুড়ো, কিন্তু ঠাট্টা করে ডাকত বাঙ্‌লার-পাঁচ। সে তার বন্ধু ডাকবাবাজীর কাছ থেকে এক টুকরো কাঠ চেয়ে নিয়ে তৈরী করল এক জীয়ন পুতুল; নাম রাখলে তার পুতুলকুমার। পুতুলকুমার হাসে নাচে খেলে ইস্কুলে যায়, আরো কত কি করে। পুতুলকুমারের প্রথম জীবনের সে-সব কাণ্ডকারখানার কথা তোমরা পাবে ১৩৫৭এর শিশুসাথীতে। শেষটায় পুতুলকুমার পড়ে যায় একদল ডাকাতের হাতে। ডাকাতরা ওকে বেজায় মারধর করে ফাঁসী লটকে রেখে যায় একটা গাছে। পাশেই ছিল একখানা ধবধবে সাদা রঙের বাড়ী। সেখানে থাকত এক নীলপরী।—এখান থেকে শুরু হ'ল পুতুলকুমারের জীবনের দ্বিতীয় পর্যায়।]

—এক—

সাদা বাড়ীর জানালাটা খুলে গেল। দেখা গেল নীলপরীর মুখ। আপন মনেই সে বলল : আহা বেচারী পুতুলকুমার!

মোমের মত সাদা হাত দুখানি তুলে সে তিনবার হাততালি দিল। অমনি কোথা হতে উড়ে এসে জানলায় বসল একটি চিল।

চিল বলল : হুকুম কর নীলপরী!

নীলপরী বলল : ওই যে দেখছ বুড়ো বটগাছের ডালে ঝুলছে পুতুলকুমারের দেহ, এখুনি উড়ে যাও ওখানে। তোমার ঠোঁট দিয়ে ওর গলার ফাঁস খুলে ওকে নিয়ে এস আমার কাছে।

চিল বলল : জো হুকুম।

চোখের নিমিষে উড়ে গেল চিল। ফিরে এল পুতুলকুমারের অচেতন দেহ ঠোঁটে ঝুলিয়ে।

নীলপরী কোলে তুলে নিল পুতুলকুমারের দেহ। ঘরের মধ্যে রূপোর খাটে তাকে শুইয়ে দিল। পাখীর পালকের বালিশ দিল তার মাথায়। হাওয়া করতে লাগল ময়ূরের পাখায়।

দেখতে দেখতে হাজির হলেন তিনজন ভিষক্—কাক, প্যাঁচা আর বাকনবীশ ঝিঁঝিপোকা।

প্রথম এগিয়ে এলেন কাক মশায়। রোগীর নাড়ী দেখলেন, নাক দেখলেন, পায়ের আঙুল দেখলেন টিপে টিপে। তারপর বললেন হেঁড়ে গলায় : আমার তো মনে হয় এ কাঠের পুতুল মরে ভূত হয়ে গেছে। আর কপালদোষে যদি না মরেই থাকে, তা'হলে বুঝতে হবে বেচারী এখনো বেঁচেই আছে।

এগিয়ে এলেন প্যাঁচা মশায়। তিনি বললেন : মাননীয় ভিষক্ মহাশয়ের কথার আমি প্রতিবাদ করছি। আমার মনে হয় কাঠের পুতুলটি এখনও বেঁচেই আছে। তবে কপালদোষে যদি না বেঁচেই থাকে তা'হলে বুঝতে হবে বেচারী মরেই গেছে।

এবার কথা বললেন বাকুনবীশ ঝিঁঝিপোকা : বহুদর্শী ভিষকের কর্তব্য হ'ল মুখ ভার করে চুপ করে থাকা। অতএব আমি রোগের বিষয় কিছু বলতে চাই না। তবে একটি কথা—

নীলপরী সাগ্রহে বলল : বলুন।

—কথাটি এই যে, এ-মুখ আমার চেনা!

যেমনি কথাটি বলা অমনি পুতুলকুমারের অচেতন দেহ হঠাৎ থর্থর্ করে কেঁপে উঠল।

—ওই যে দেখছেন কাঠের পুতুলটি, ও একটি হাড়পাজি—

পুতুলকুমার পিটপিট করে একবার তাকিয়েই আবার চোখ বুজল।

—ও একটি পাকা বদমায়েস, অকর্মা, ভবঘুরে—

পুতুলকুমার তাড়াতাড়ি মুখ ঢাকল বিছানার চাদরে।

—আপনারা জানেন কি, ওই অবাধ্য ছেলের শোকেই ওর বুড়ো বাবা আজ মরতে বসেছে?

ঝিঁঝিপোকার শেষ কথাটি শুনে পুতুলকুমার এবার হাঁউ-মাঁউ করে কেঁদে উঠল।

কাকমশায় ঘাড় নেড়ে বললেন : মরা মানুষ যখন কাঁদছে, তখন বুঝতে হবে ওর বাঁচবার আশা আছে।

প্যাঁচা মশায় সংগে সংগে বলে উঠলেন : অত্যন্ত দুঃখের সহিত আমি আপনার কথার প্রতিবাদ করছি। আমার মতে, মরা মানুষ যখন কাঁদে তখন বুঝতে হবে মরতে তার ইচ্ছা নেই।

কথা কাটাকাটি করতে করতে তিন ভিষক্ বিদায় হলেন। নীলপরী পুতুলকুমারের কপালে হাত দিয়ে দেখল, তার খুব জ্বর হয়েছে।

তাড়াতাড়ি এক গ্লাস ওষুধ এনে বলল : এই ওষুধটা খেয়ে নাও।

পুতুলকুমার ওষুধের দিকে চেয়ে কাঁদো-কাঁদো গলায় শুধাল : ওষুধ মিঠে না তেতো?

—ওষুধটা তেতো, তবে এতে তোমার খুব উপকার হবে।

—উহুঁ, তেতো ওষুধ আমি খাব না।

—আমার কথা শোন, খাও।

—উহুঁ।

—খাও, ওষুধ খেলে তোমায় মিছরি দেব।

—আগে দাও।

সোনার কৌটা থেকে এক টুকরো মিছরি তুলে নীলপরী বলল : এই দ্যাখো মিছরি।

—আগে মিছরি আমায় দাও, তবে ঐ তেতো জল খাব।

—ঠিক খাবে?

—হ্যাঁ ঠিক।

নীলপরী মিছরির টুকরোটা দিতেই পুতুলকুমার সেটিকে মুখে পুরে দিল। আরাম করে মিছরি চিবুতে চিবুতে সে বলল: আহা রে! মিছরি যদি ওষুধ হ'ত তা'হলে কি মজাই না হ'ত!

—এইবার ওষুধটা খেয়ে নাও।

পুতুলকুমার ওষুধটা হাতে নিল। একবার নিল নাকের কাছে। আবার নিল ঠোঁটের কাছে। তারপর বলে উঠল: না, না, এ তেতো ওষুধ আমি খেতে পারব না।

—না খেয়েই কি করে তুমি বুঝলে যে ওষুধটা তেতো?

—ও আমি এমনি বুঝতে পারি।

—তা'হলে খাবে না?

—তা কি বলছি। তবে আর এক টুকরো মিছরি দাও—

নীলপরী আর এক টুকরো মিছরি তাকে দিল। মিছরি খেয়ে পুতুল-কুমার ওষুধের গ্লাস হাতে নিল। কিন্তু ওষুধ খেতে কি আর সাধ যায়। অনেক রকম করে চোখ-মুখ পাকিয়ে শেষে সে বলে উঠল: কি করে ওষুধ খাব?

—কেন?

—পায়ের নিচের বালিশটায় বড্ডই অসুবিধা হচ্ছে।

—বেশ, বালিশ সরিয়ে দিলাম।

—জানালাটা যে একটু খোলা রয়েছে—

—বেশ জানালা বুজিয়ে দিলাম।

—কী মুশকিল রে বাবা, পুতুলকুমার এবার চেঁচিয়ে কেঁদে উঠল: না, না, ও তেতো ওষুধ আমি কিছুতেই খাব না।

—তুমি কি বুঝতে পারছ না তোমার অসুখ খুব বেশি।

—হোক গে।

—ওষুধ না খেলে তুমি মরে যাবে।

—যাই যাব।

—মরতে তুমি ভয় কর না?

—মোটেই না। তেতো ওষুধ খাওয়ার চেয়ে মরে যাওয়া অনেক ভাল।

বলার সংগে সংগে একটা দমকা হাওয়ায় ঘরের দরজা খুলে গেল। ঘরে ঢুকল চারটি কাল খরগোস। তাদের কাঁধে ছোট একখানি মরার খাট।

তাদের দেখেই পুতুলকুমার আঁতকে উঠে বিছানায় বসল। ভয়ে ভয়ে শুধাল: তোমরা এখানে কেন?

চার খরগোস এক সাথে বলে উঠল: তোমায় নিতে।

—আমাকে নিতে? আমি তো এখনো মরিনি!

—এখনো মরনি, তবে কয়েক মিনিটের মধ্যেই তুমি মরবে। তুমি যে ওষুধ খাওনি।

পুতুলকুমার এবার চেঁচিয়ে উঠল: নীলপরী! ও নীলপরী! শিগগির আমাকে ওষুধ দাও; আমি মরতে চাই না—মরতে চাই না।

দুই হাতে ওষুধের গ্লাসটা জোর করে ধরে পুতুলকুমার এক চুমুকে ওষুধটা খেয়ে ফেলল।

খরগোসগুলো বলে উঠল: যাক, এ যাত্রা তুমি বেঁচে গেলে। এবার আমরা চলি।

খরগোসরা চলে গেল। পুতুলকুমার এক লাফে খাট থেকে নেমে পড়ল। উঃ সে যে একেবারে ভাল হয়ে গেছে। ওষুধটা কী ভালই ছিল।

নীলপরী শুধাল: তবে যে বড় ওষুধ খেতে চাইছিলে না?

পুতুলকুমার বলল: ওটা কি জান? ওটা ছোট ছেলেদের স্বভাব। রোগের চেয়ে আমাদের ওষুধকেই বেশি ভয়।

নীলপরী হেসে বলল: বল কি? মৃত্যুভয়ের চেয়েও বেশি? ডাকব না কি কাল খরগোসদের?

পুতুলকুমার নীলপরীকে জড়িয়ে ধরে বলল: দোহাই তোমার, আর তাদের ডেকো না। বাপ্ রে! কী কাল কাল ওদের চেহারা! যমদূতই বটে!

নীলপরী হো-হো করে হেসে উঠল: বেশ, বেশ! আর তাদের ডাকব না। এইবার বল তো দেখি, কি করে তুমি ডাকাতদের হাতে পড়লে?

পুতুলকুমার তার পাঁচ মোহর রোজগারের কথা, এক মোহর খরচের কথা, আর রাতে চলতে গিয়ে ডাকাতের হাতে পড়ার কথা—একে একে সব কথাই নীলপরীকে বলল।

(ক্রমশঃ)

নববরষের প্রথম প্রণাম লও

শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য

ভগবান! তুমি নববরষের প্রথম প্রণাম লও,
কথা কও! কথা কও!
আশার কুঞ্জে মনমালঞ্চে ফুটাও কুসুম নব,—
সেই কুসুমেরে সঁপিব চরণে তব।
জীবন-দেবতা লীলাসুন্দর করুণাসাগর তুমি,
শ্যামল করেছ কত বরষের হৃদয়ের মরুভূমি,
আমার আঁখির করুণ কামনা অনিমেষ চেয়ে আছে
তোমারে লভিতে কাছে।
দুঃখ সুখের রৌদ্রে ছায়ায় করেছি তোমার স্তব,
শুনেছি কত না কল্লোল কলরব।
কত দুর্দ্দিনে ঝঞ্ঝা বাদলে জীবনের হোলো ক্ষয়,
কত বরষের পিছু পিছু ছুটে পরাণের অপচয়!
যুগে যুগে এসে কিশলয় সম ঝরাপাতা হয়ে গেনু,
কত ব্যথা সয়ে গেনু।
আবার এসেছি শিশু হয়ে তব মাটির এ খেলাঘরে
তোমারে আমার বারে বারে মনে পড়ে।
ভোরবেলাকার চম্পা চামেলি সন্ধ্যাবেলার যুঁথি,
পান্থশালার আঙিনায় বসে করিছে তোমার স্তুতি।
ধ্যানে আর কত করিব ধারণা, ভুবন-ভুলানো রূপে
এসো তুমি চুপে চুপে!
তোমাতে আমাতে খেলা হবে আজ ওগো সুন্দর সাথী!
পোহালো কি নভে বিদায় বরষ বাতি!
নবচেতনার মঙ্গল দীপ তুলে ধরো ভগবান!
বিশ্ববীণার তারে তারে যেন বেজে ওঠে তব গান।

ম্যাজিকের খেলা

পি. সি. সরকার

মজার মোমবাতি

আমার লেখা একটি ম্যাজিকের বইতে 'ম্যাগ্নেটিক রুলার' (Magnetic Ruler) নাম দিয়া একটা খেলা শেখান হইয়াছে। তাহাতে বলা হইয়াছে, কি ভাবে যাদুকরের খালি হাতের তলাতে একটি রুলার, যাদুর কাঠি, কলম, পেন্সিল প্রভৃতি অত্যাশ্চর্য্যভাবে লাগিয়া থাকে। আসলে কিন্তু যাদুকরের যে হাতে ঐটি আটকাইয়া থাকে, তাহার অপর হাতের একটি অঙ্গুলি দিয়া ঐটি ধরা হয়। খেলাটি দেখিতে খুবই সুন্দর এবং সাধারণে সহজে ঐ কৌশল বুঝিয়া উঠিতে পারে না। আমার মজার মোমবাতি খেলাটি সেই খেলারই উন্নত সংস্করণ।

টেবিলের উপর একটি বড় মোমবাতি জ্বলিতেছে। যাদুকর তাহার দুই হাতের অঙ্গুলিগুলিকে প্রদত্ত চিত্রের মত একের মধ্যে অন্যটি প্রবিষ্ট করাইয়া লইলেন এবং সকলের সমক্ষে সেই হাত দুইটি দ্বারা মোমবাতিকে বেষ্টন করিলেন। দর্শকগণ তাহার সবগুলি আঙ্গুলিই দেখিতেছেন—কিন্তু কি
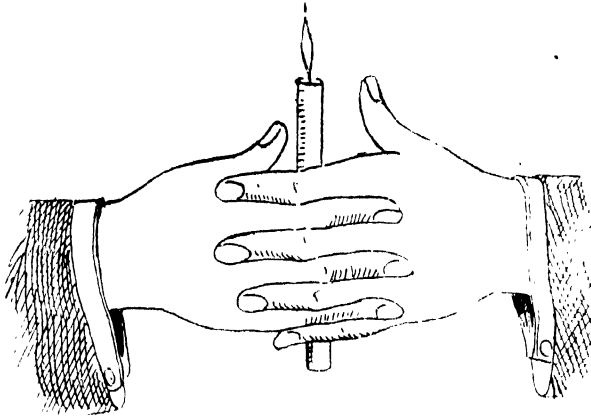
প্রথম চিত্র (বাহিরের দৃশ্য)

মজা! যাদুকরের হাতের সহিত জ্বলন্ত মোমবাতি ভাসিয়া উঠিল। উহা হাতের মধ্যে আটকাইয়া রহিয়াছে, কিছুতেই পড়িয়া যাইতেছে না। সকলে উহা দেখিয়া বিস্মিত হইয়া যাইবেন। আমি যত জায়গায় এই খেলাটি দেখাইয়াছি—সব জায়গাতেই সকলে অবাক হইয়াছেন। আমি কোথাও মোমবাতি, কোথাও যাদুর কাঠি বা কোথাও রুলার দিয়া এই খেলা করিয়াছি। বড় বড় শিক্ষিত

বুদ্ধিমান দর্শকগণ এই খেলা দেখিয়া অবাক হইয়াছেন। আসলে কিন্তু খেলাটা এত সহজ যে মনে হইলেই হাসি পায়—দর্শকগণ এই সহজ ব্যাপারটা কল্পনাই করেন না—সকলেই ভাবেন সুতা দিয়া বাঁধা আছে, কোনও অদৃশ্য ক্লিপ (Clip) আছে বা ম্যাগ্নেট (Magnet) আছে।

প্রথম চিত্রে দেখান হইয়াছে যাদুকরের হাতে কি ভাবে মোমবাতিটি আটকাইয়া রহিয়াছে; দ্বিতীয় চিত্রে ইহার মূল কৌশল বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছে। এইটি দেখিলে হাসি পাইবে, কারণ স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে, যাদুকর তাহার লুকান একটি আঙ্গুল দিয়া ঐটি ধরিয়া আছেন। খেলার প্রকৃত বাহাদুরী হইল ঐ একটি আঙ্গুল কৌশলে চুরি করার উপর। চিত্র দেখিয়া নিজে নিজে বাড়ীতে চেষ্টা করিলেই ইহা সহজেই বুঝা যাইবে। প্রথম চিত্র দেখিলে মনে হয় যে ডান বাম দুই হাতেরই পাঁচ পাঁচ দশটি আঙ্গুল দেখা যাইতেছে—কিন্তু তাহা ঠিক নহে, এক হাতের পাঁচটি ও
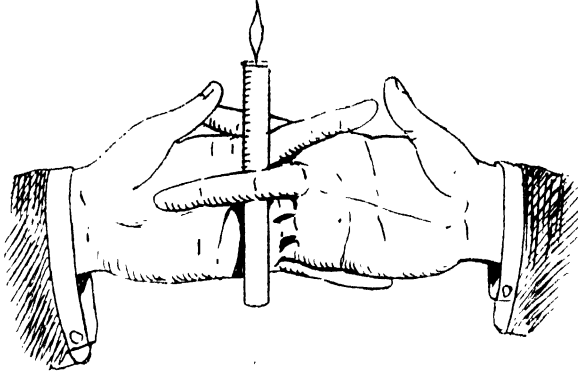
দ্বিতীয় চিত্র (ভিতরের দৃশ্য)

অপর হাতের চারিটি আঙ্গুল মাত্র দেখা যাইতেছে। কিন্তু যত বুদ্ধিমান দর্শক হউক না কেন, তিনি কিছুতেই ইহা বুঝিতে পারিবেন না। ইহা মানুষের চক্ষুর ও মনের একটি দুর্ব্বলতা এবং আমরা যাদুকরগণ সেই দুর্ব্বলতার পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করিয়া থাকি। যাদুকর এক হাতের মধ্যমা অঙ্গুলি চুরি করিয়া ভিতরে রাখিয়া বাকী অঙ্গুলিগুলি দিয়া একটির মধ্যে অপরটি প্রবিষ্ট করেন।

প্রদত্ত চিত্র দেখিয়া বাড়ীতে অভ্যাস করিতে হয়। প্রথমে পেন্সিল, কলম, রুলার দিয়া অভ্যাস করিয়া ক্রমে ভারী গোলাকৃতির জিনিস—যেমন যাদুর কাঠি, মোমবাতি প্রভৃতির অভ্যাস করিতে হয়। কয়েক ঘণ্টা অভ্যাস করিলেই যথেষ্ট। জ্বলন্ত মোমবাতি দিয়া এই খেলা করিলে বেশ দেখায়। আমেরিকার কোন কোন যাদুকর আঙ্গুলের ডগায় জ্বলন্ত দিয়াশলাই কাঠি কৌশলে প্রবিষ্ট করিয়া লইয়া আগুনের শিখাটিকে এদিক ওদিক হাটিয়া বেড়াইতে দেখান। খেলাটি খুবই সুন্দর।

ভাল্লু আর জনি

শ্রীসুধা দেবজা

মঙলুর দেশী কুকুর ভাল্লু যেদিন সেন সাহেবের ছেলে মিন্টুর বিদেশী দামী কুকুর জনিকে কামড়ে দিলে, আর জনি নেংচাতে নেংচাতে পালিয়ে এল, সেদিন মঙলুর দলের ছেলেদের কি হাসি! ওদের পাড়ার ছোট ছোট নেংটীপরা ছেলেগুলো হাসতে হাসতে দু'তিন বার ডিগ্‌বাজিই খেয়ে নিলে। জনির জন্য মিন্টুর দুঃখ হচ্ছিল বই কি—ওর অবস্থা দেখে প্রায় কান্না পেয়ে গিয়েছিল; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে রাগ হয়ে গ্যাল তার চেয়ে বেশী মঙলুর ওপর, মঙলুর কুকুর ভাল্লুর ওপর তো বটেই, জনির 'পরেও কম নয়।—হতভাগা ওই দেশী কুকুরটাকে সামলাতে পারলে না? এত যে রোজ মাংস খাওয়ার ঘটা—সাবান মাখাও, বেড়াতে নিয়ে যাও, বিছানা দাও, রুটি বিস্কিট—কোন্‌টাতে কম?—তা ছাড়া মিন্টুর চকোলেটের ভাগ, কোকোর ভাগও কম পায় না সে!—ওষুধ ডাক্তার এসব তো লেগেই রয়েছে! মা কুকুরের ওপর অত আহ্লাদ দেখতে পারেন না—কম গাল মন্দ খেতে হয় মিন্টুকে মার কাছে জনির হাজারো গণ্ডা আবদার মেটাবার জন্য!—বল তো হারাল গোটা পাঁচেক—তবু বাবুর খেলতে বল চাই—না হলে মিন্টুর বই খাতা নিয়ে টানাটানি লাগাবে!—ভাল পেতলের বল্টু বসান বগলস্‌ প্রায় এক জোড়া জুতোর সমান দামী! নবাবী শুধু! কাজের বেলায় অষ্টরম্ভা! ওদিকে বাড়ীতে কোনো ভদ্রলোক এলে তাড়া লাগাবে—যেন চোর ঢুকে যথাসর্বস্ব লুটে নিলে! সেদিন মাসীমা এলে কি তাড়াটাই না লাগালে—ভদ্রমহিলা সটান আছাড় খেয়ে পড়েই মূর্ছা গেলেন—আর মিন্টুর যা ভোগান্তিটা হ'ল, তা শুধু সেই জানে! মা তো প্রায় সেই দিনই দিয়েছিলেন কুকুর সুদ্ধু ওকেই ত্যাজ্যপুত্তুর করে—কেবল জনিটা বাবারও খুব আদরের তাই! কিন্তু সেই থেকে মাসীমা আর আসেন না। আসেন না—মানে মিন্টুর মজাদার সিনেমা দ্যাখা, গাড়ী নিয়ে এখানে ওখানে ঘুরে বেড়ানো, রকম রকম সৌখীন জিনিসপত্র উপহার পাওয়া—সবই বন্ধ! এবারে জন্মদিনে একসেট্‌ নতুন ব্যাডমিণ্টন আদায় করবার ইচ্ছে ছিল—আর কি সে মুখ রেখেছে জনি? অথচ জনির তোয়াজ তা বলে একটুও কমায় নি মিন্টু!—হতভাগা তাগ্‌ড়াও তো কম হয়নি! কুকুর প্রদর্শনীতে পুরস্কারও পেলে, আর একটা এঁটো-খাওয়া কুকুরের সঙ্গে পেরে উঠল না—এই তো বাহাদুরী!

ব্যাপারটা হচ্ছে—মঙলুদের ওখান দিয়ে শেকল ধরে জনিকে বেড়াতে নিয়ে যেতে ওদের কুকুরগুলোর চেঁচামেচি রোজই শোনে, আজও তাই! ওর হাসিই পাচ্ছিল—কান উঁচু পেট মোটা কুকুর—তার আবার অত তেজ! মঙলু তাড়াতাড়ি তার কুকুরটাকে টেনে ধরলে—মিন্টুই তো বললে—'দাও না ছেড়ে, দেখি কি করে?' মঙলু ভাল্লুকে ছেড়ে দিতেই মিন্টুই জনিকে উত্তেজিত করতে লাগল শিস্‌ দিয়ে; কিন্তু জনির খানিকক্ষণ শুধু পাঁয়তারাই চলল—মাটিতে শুয়ে পড়া, কখনো

বাঘের মত ওত পাতা, তারপর লাফিয়ে দু'পায়ে খাড়া হয়ে সিংহের মত কেশর ফুলিয়ে গর্জন—এই সব রকমারি কসরৎই চলছে—কিন্তু ঐ পর্যন্ত। ভাল্লু ওসব কিছুই করলে না—কোনো কায়দা-কানুনের ধারই সে ধারে না! যতক্ষণে জনি তার ঘাড়ে লাফিয়ে পড়ে বাগিয়ে ধরতে যাবে, ততক্ষণে সে দাঁতমুখ খিঁচিয়ে একটা সাংঘাতিক ভঙ্গি করে ঝাঁপিয়ে পড়ে জনির পেছনের পা'টায় দাঁত বসিয়ে দিলে—জনি নীচে পড়ে গ্যাল, চক্ষের পলকে ভাল্লু এক থাবায় ওর চোয়ালের কাছটা ফাটিয়ে দিলে। আর কি?—জনি কেঁউ-কেঁউ শব্দ তুলে নেংচাতে নেংচাতে পালিয়ে এল—ফোলা ল্যাজ পেটের তলায় ঢুকিয়ে। ভাল্লুর তখনকার চেহারা কি ভীষণ হিংস্র মনে হ'ল! জনির রক্তাক্ত ক্ষত-বিক্ষত দেহ দেখে মিনুটুর আর জ্ঞান রইল না। তখনো কিন্তু

ভাল্লু জনিকে তাড়া করে আসছে। মিনুটু একটা ঢিল ছুঁড়ে মারলে—তাতেও তার ভ্রূক্ষেপ নেই, যতক্ষণ না মঙলু এসে ওকে ধরলে। মঙলুর ডাক শোনার সঙ্গে সঙ্গেই সে মঙলুর কাছে এসে দাঁড়াল। দাঁড়িয়ে জনিকে আর মিনুটুকে দাঁত খিঁচিয়ে ধমকাতে লাগল ভোক্ ভোক্ করে,—যেন সীমান্তরক্ষী শান্ত্রী বিপক্ষের পরাজিত সৈন্যদলকে নিজেদের সীমানার বাইরে তাড়িয়ে দিচ্ছে।

সেদিন বাড়ী ফিরতে এই দুর্দশার পরেও মা বললেন—'দেবে কবে একদিন ঐ কুকুরের ঠ্যাঙের মত তোমারও হাঁটুশুদ্ধ চিবিয়ে দেখো!'

দু'তিন দিন হয়ে গ্যাল এখনো পা সারেনি জনির—সকালবেলায় পায়ে ব্যাণ্ডেজ বেঁধে এক গা পাউডার মেখে বারান্দায় বসে আছে জনি—সেন সাহেব দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ওর গা ব্রাস করিয়ে দিচ্ছেন চাকরকে দিয়ে, চোখ বুজে ঘাড় ঘুরিয়ে গলা উঁচু করে জনি আরাম উপভোগ করছে—যেন মস্ত বড় যুদ্ধ জয় করে আহত বীর ফিরে এসে সেবা-শুশ্রূষা ভোগ করছেন। মিনুটুকে দেখে সেন সাহেব বললেন—'তুমি মন খারাপ করো না মিনুটু—যদি জনির পা না সারে, তবে ওদের কুকুরটাকে মেরে ফেলব গুলি করে—দেখবে সব জব্দ হয়ে যাবে।' এতক্ষণে মিনুটুর একটু সান্ত্বনা হ'ল—ভাল্লুর

জয়ে মঙ্‌লুদের হাসির হুল্লোড়টা—ওর তখন থেকে কানে বাজছে! বিকালে মিন্টু চলল—এই অতি আরামদায়ক খবরটা মঙ্‌লুকে জানিয়ে আসতে—এখন থেকে যেন ভাল্লুকে সাবধানে রাখে! হাঁ; মিন্টুদের দামী কুকুরকে কামড়ে দেওয়া অমন যা-তা কথা নয়! গুলি খেয়ে মরতে হবে ভাল্লুকে, তখন হাসাহাসির মজা বেরিয়ে যাবে মঙ্‌লুদের! এই কথাটি বললে মঙ্‌লুর মুখটা কেমন হয়ে যাবে, তাই ভাবছে মিন্টু। ওকে দেখলেই আজকাল মঙ্‌লু বলে—'হে বাবু, তুর সাহেব কুথাকে গেল? পাটি সারলে উয়াকে ইসকুলে পড়া করতে দিস্। এথাকে এলে কুন দিন ছুঁচোতে উয়ার কান কেটে লিবেক।' জনিকে ওরা সাহেব বলে—জনি শীতের সকালে চক্‌চকে কলার পরে জামা গায়ে পাউডারের গন্ধ ছড়িয়ে উর্দিপরা চাপরাশীর সঙ্গে বেড়াতে বেরোত, তাই নিয়ে এই ঠাট্টা! মুখ বুজে অপমান সইতে হয় মিন্টুকে। আজ সে তার শোধ তুলবে।

কিন্তু ওদের পাড়ার দিকে যাবার পথেই দেখলে তীরধনু বর্শা নিয়ে সাঁওতাল ছেলেরা ছুটেছে মহা হুল্লোড় তুলে, আগে আগে ভাল্লু ছুটেছে। নদীর তীর ধরে সব চললে একটা ঝোপের ভেতর। মিন্টুও দূর থেকে পেছন পেছন যাচ্ছে। 'ইলুল্ লেলেলে' বলে সব চীৎকার করে বেরিয়ে এল। 'ওরে বাবা! এ যে ভীষণ এক সাপ!' দূর থেকে মিন্টু দেখছে কি প্রকাণ্ড ফণা তুলে দাঁড়িয়েছে! সাপটাকেই তাড়া করে ওরা এত দূরে নিয়ে এসেছে। এখন সেটা ফণা তুলে ফিরে দাঁড়িয়েছে। এক লাফে ভাল্লু তার সামনে এসে মারলে এক থাবা—এত ত্রস্তে আর এত জোরে যে, সাপটা ছোবল মারবার আর ফুরসৎই পেলে না। ফের মাথা তুলবার আগেই নিমেষের মধ্যে ওর পেটে কামড়ে ধরে ভাল্লু এমন করে আছড়াতে লাগল এত বড় সাপটাকে যে সে এক আশ্চর্য ব্যাপার; কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে সে সাপটাকে টুকরো টুকরো করে ফেললে। তীর বর্শা কিছু দরকারই হ'ল না। মঙ্‌লুর দলের ছেলেরা শিকার করে ফিরছিল বোধ হয়, কাঁধে মরা দুটো জন্তু, ওরা বলে 'কটাস্'। পথে এই কাণ্ড! মিন্টুকে দেখতে পেয়ে মঙ্‌লু বললে, 'হে বাবু, তুর সাহেব কুথাকে? উয়ার পাটি সারলেক নাই? ডাক্তার কি করবে? আমাকে লিয়ে যাস্, একটো পাতা দিয়ে বেঁধে দিব তো পরদিন উঠে ভ্যাঁড়াবে।'

মিন্টুর আর ভাল্লুকে গুলি করে মারবার ইচ্ছে নেই, ভাল্লু অনেক দরকারী কুকুর—জনির মত পোষাকি নয়! বনবিড়াল ঢুকে খেয়ে গ্যাল ওদের পায়রাগুলো, জনি শুধু চ্যাঁচালে, কিছু করতে পারলে না। ওদের দুটো রাজহাঁস অমন সুন্দর, সাপে কেটে মেরে ফেলেছে, জনি কিছুই করতে পারেনি। জনি পারে শুধু মানুষকে তাড়া করতে, কিন্তু ভাল্লু সাপখোপ মানে না, কে জানে মঙ্‌লু সাথে থাকলে ও হয়ত বাঘের সাথেও লড়াই করতে ছুটতে পারে দরকার হলে!

মিন্টু বললে, 'ভাল্লুকে যদি সাপে কাটত কি করতে তা'হলে?'

'ইস্‌সি! তো উয়াকে কেটে কি সাপটাকে জেতা ফিরতে দিতম? বর্শাতে গিঁথে লিতাম তো।'

মঙ্‌লুর রকম দেখে মনে হ'ল, এক্ষুনি সে ভাল্লুর যে কোনো শত্রুকে বর্শাটা ছুঁড়ে মারবে।—

মিনুটুর মনে হ'ল, মঙ্‌লু ভাল্লুকে বিপদের মুখে পাঠিয়ে দিয়ে নিজে নিরাপদে দাঁড়িয়ে থাকে না। মঙ্‌লুর সাহসই ভাল্লুকে অমন দুর্দান্ত সাহসী করে তুলেছে। দরকার নাই ভাল্লুকে গুলি করে, সে বাবাকে বলে দেবে।

মিনুটু মঙ্‌লুকে বললে, 'আমাকে বর্শা ছোঁড়া—তীর ছোঁড়া শিখিয়ে দেবে?'

মঙ্‌লু হেসেই আটখানা—'তু কাড় (তীর) ধরবি—তুর হাথে লাগবেক নাই? কি মারবি?'

অন্য একটা ছেলে বললে, 'ইন্দুর!'—

মিনুটু মঙ্‌লুর হাতটা চেপে ধরে বললে, 'হ্যাঁ, ইঁদুর সাপ বাঘ সব। তোমাকে শেখাতেই হবে। আমি রবিবারে রবিবারে আসব।'

মঙ্‌লু আর হেসে উড়িয়ে দিলে না, সত্যি কাড় ধরতে লাগবার মত হাত মিনুটুর নয় তা বুঝলে।

'তুর লেগে লতুন কাড় লিতে হবেক।'

ভাল্লু কিন্তু দু-একবার দাঁত খিঁচোলে, তবু মঙ্‌লু তার মাথায় চাপড় মেরে বললে, 'চিল্লাস্‌ ক্যানে হে? ই স্যাঙাৎ (বন্ধু), পরকে কি কাড় দিব?'

উইলিয়াম টেল

শ্রীআদিনাথ সেন

অল্পদিন পূর্বে আমাদের রিপাব্লিকের বাৎসরিক উৎসব হইয়া গিয়াছে। ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দে গান্ধীজি, নেতাজি প্রভৃতির চেষ্টায় স্বাধীনতা পাইয়া, দুই বৎসরে আমাদের শাসনপদ্ধতি নির্ধারিত হয়। সেই দিনটি যেন গান্ধীজি, নেতাজি এবং পূর্ববর্তী বিপ্লবীদের কার্যের সহিত সর্বদা মনে থাকে, সেইজন্য এই উৎসব। প্রায় দুই শত বৎসর পূর্বে আমেরিকার স্বাধীনতা ঘোষণা হয়। এখনও প্রতি বৎসর সেই দিনটি জর্জ ওয়াসিংটন প্রভৃতির কার্য-কলাপের সহিত সশ্রদ্ধ স্মরণ করা হয়। মহৎ লোকের আদর্শ অন্যকে উন্নত হইতে প্রেরণা দেয়, মানব-কল্যাণের হেতু হয় এবং দেশের সুনাম বাড়াইয়া তোলে। সেই জন্য বার্ষিকী জন্মসভায়, স্মৃতিসভায়, চলচ্চিত্রে মহাপুরুষদের উপযুক্ত সম্মান দেখাইবার চেষ্টা করা হয়। লিভিংষ্টোনের জীবনের স্মৃতি কি ভাবে স্কটল্যাণ্ডে জাগ্রত রাখা হইয়াছে, গত মাঘ মাসে তাহা বলা হইয়াছে। সুইটজারল্যাণ্ডের ৬০০ বৎসর পূর্বেকার স্বাধীনতা যুদ্ধে উইলিয়াম টেলের অবদানের কথা বলা হইতেছে।

ইউরোপের ক্রীড়াভূমি বলিয়া আখ্যাত সুইটজারল্যাণ্ডে ইন্টারলেকেন একটি প্রসিদ্ধ সহর, পাহাড়বেষ্টিত থুন ও ব্রীয়েঞ্জার হ্রদের মাঝখানে অবস্থিত। আল্পস পর্বতমালার সুন্দর শিখরগুলি, অগণিত গ্লেসিয়ার এবং বহু জলপ্রপাত ও হ্রদ এই স্থানটিকে মনোরম করিয়াছে। বৈদ্যুতিক রেলগাড়ীতে ও সুনির্মিত রাস্তায় মোটরে সহজে পৌছান যায় সেখানে। পর্বতবেষ্টিত চৌদ্দটি বড় সুদৃশ্য হ্রদে শতাধিক কেলিপোতে ভ্রমণের আনন্দ পাওয়া যায়। বিশ্রামের জন্য সর্বত্রই বাংলো মেলে। ইউরোপের চারিটি প্রসিদ্ধ নদীর উৎপত্তিস্থান কাছাকাছি হইলেও, হ্রাইন জার্মানির মধ্য দিয়া উত্তর

সপরিবারে উইলিয়াম টেল

দিকে উত্তর সাগরে, হ্রোন ফ্রান্সের মধ্য দিয়া দক্ষিণ দিকে মেডিটারেনিয়ানে, ইন্ নদী হইতে ডানিউব পূর্বদিকে রুশিয়ার মধ্য দিয়া কৃষ্ণসাগরে এবং টিসিনো নদী হইতে দক্ষিণ-পূর্বে ইটালীর মধ্য দিয়া পো নদী দক্ষিণ-পূর্বে আড্রিয়াটিক সাগরে হাজার হাজার মাইল চলিয়া হাজার মাইল ব্যবধানে সমুদ্রে পতিত হইয়াছে। দশ ও বার মাইল দীর্ঘ দুইটি সুড়ঙ্গে আল্পস পর্বতের ভিতর দিয়া রেলের রাস্তা। পশুপালন বেশী লোকের উপজীবিকা হইলেও ঘড়ি নির্মাণে ইহারা অতুলনীয়। প্রাকৃতিক শোভা সন্দর্শন, গিরি আরোহণ, বরফের উপর ভ্রমণ ইত্যাদি উদ্দেশ্যে দেশ-বিদেশ

হইতে সুইটজারলাণ্ডের কেন্দ্রস্থল বলিয়া অনেক লোক ইণ্টারলেকেনে আসেন। এখানে মুক্ত আকাশের নীচে পাহাড়ের গায়ে প্রকৃতির কোলে, প্রতি বৎসর নির্দিষ্ট সময়ে প্রতি সপ্তাহে প্রাচীনকালের গৃহ, দুর্গ, গির্জা, লোকজন, সাজসজ্জা ইত্যাদির সমাবেশে, ৩৫০এর উপর স্থানীয় লোকের দ্বারা উইলিয়াম টেলের গল্প অভিনীত হয়। ইহাও একটি বিশেষ আকর্ষণ। ইহার উদ্দেশ্য দেশের স্বাধীনতার ইতিহাসের প্রথম সোপান সম্বন্ধে সর্বসাধারণকে সর্বদা সজাগ রাখা। বহু দেশে, বহু ভাষায়, বহুরূপে উইলিয়াম টেলের ছেলের মাথায় আপেল রাখিয়া বিদ্ধ করার গল্প স্বদেশপ্রেমের জলন্ত দৃষ্টান্তরূপে প্রচারিত হইয়াছে।

চতুর্দশ শতাব্দীতে সুইটজারল্যাণ্ড অনেকগুলি রাষ্ট্রে (ক্যাণ্টন) বিভক্ত হইয়া অষ্ট্রিয়ার অধীনে কতকগুলি শাসনকর্তা দ্বারা নির্দয়ভাবে শাসিত হইত। অত্যাচারের ও প্রতিশোধের দৃষ্টান্ত স্বরূপ অভিনয় দেখান হয়—যখন হ্রদের পার্শ্বস্থ গ্রাম্য দৃশ্যে গৃহপালিত পশু পাহাড়ের গায়ে চরিয়া ফিরিতেছিল, এমন সময় স্ত্রীকে আক্রমণ করার দরুন গভর্ণরকে হত্যা করিয়া বর্গাটেন অশ্বারোহী অনুচরদের অনুসরণ হইতে পলাইয়া আসে। শাসনের ভয়ে ছেলেরা হ্রদ পার করিয়া দিতে অস্বীকার করে, কিন্তু উইলিয়াম টেল উহাকে আশ্রয় দেন। আর একটি দৃষ্টান্তে, স্থানীয় লোকদের বাড়ী তৈয়ারী বন্ধ করার আদেশ হওয়ায় উৎকণ্ঠিত গৃহস্থ ষ্টাফাচারকে তাহার স্ত্রী গার্ট্রুড্ আক্রমণ ও রক্ষার উদ্দেশ্যে অন্য স্বাধীনতাকামী রাষ্ট্রের সহিত দলবদ্ধ হইবার জন্য প্ররোচনা দেন।

আরও এক দৃষ্টান্তে গৃহস্থ ফুষ্টের গৃহে, হালের সর্বোৎকৃষ্ট বলদের জোড়া বাজেয়াপ্ত করিতে উদ্যত রক্ষীকে আঘাত করিয়া পলাতক আর্নল্ড, ষ্টাফাচারের কাছে শুনিতে পায় যে, শাসনকর্তা তাহার পিতাকে গ্রেপ্তার করিবার, সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করিবার ও গরম লৌহশলাকায় চক্ষু উৎপাটিত করিবার আদেশ দিয়াছেন। তখন প্রতিকারের নিমিত্ত তিনজনে চুক্তিবদ্ধ হইলেন। পরে উচ্চ-ভূমিতে ৩৩ জন, উক্ত ৩ জনের নেতৃত্বে, শাসনকর্তার অত্যাচারের প্রতিকারের নিমিত্ত প্রতিজ্ঞা করেন। মোট কথা, দেশের কি ধনী, কি দরিদ্র সকলেই দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে বদ্ধপরিকর হন। এদিকে লুসান হ্রদের উপর আণ্টওর্ক রাষ্ট্রের দুর্দান্ত শাসনকর্তা জেস্‌লার, অষ্ট্রিয়ার আধিপত্য জারি করিতে, চৌরাস্তায় একটি লাঠির উপর তাহার টুপি রাখিয়া প্রত্যেককে উহার নিকট নতজানু হইয়া মাথা নোয়াইতে আদেশ করিলেন। টেলের গৃহে তাহার পরিবারের বাধা সত্ত্বেও, টেল তাহার পুত্রকে লইয়া বাহির হইয়া গেলেন। নির্ভীক, মহানুভব, যুদ্ধবিদ্যায় পারদর্শী উইলিয়াম টেল এই আদেশ অমান্য করায় পুত্রের সহিত গ্রেপ্তার হইয়া গভর্ণর জেস্‌লারের নিকট নীত হন। টেলের উপর জেস্‌লারের ভীষণ বিদ্বেষ ছিল,—কারণ এক সময় কোন নির্জন গিরিপথে টেলের সঙ্গে যাইবার সময় পাছে টেল তাহাকে আক্রমণ করিয়া বসে, এই ভয়ে জেস্‌লার মূর্ছিত হইয়া পড়েন এবং সর্বসাধারণে ইহা জানিতে পারে। এখন গভর্ণর আদেশ করিলেন—"তোমার অব্যর্থ লক্ষ্যের বিষয়ে অনেক বড়াইয়ের কথা শুনিয়াছি, তোমার ছেলের মাথার উপর একটি আপেল রাখিয়া বাণে

বিদ্ধ করিতে পারিলে, তুমি মুক্তি পাইবে।" টেলের পুত্রকে স্থির রাখিবার নিমিত্ত বাঁধিয়া তাহার মাথার উপরে আপেলের লক্ষ্যভেদ করিতে টেলকে বাধ্য করা হয়। টেল তূণ হইতে একটি বাণ কোমরবন্ধে গুঁজিয়া দ্বিতীয়টিকে অতি সন্তর্পণে ছাড়িয়া ঠিক মত আপেল বিদ্ধ করিলেন। গভর্ণর প্রথম বাণটির বিষয় প্রশ্ন করিলে টেল উত্তর করিল—উহা তোমার জন্য, যদি লক্ষ্যভ্রষ্ট হইতাম তবে উহা তোমাকে বিদ্ধ করিত। হ্রদের অপর পারে টেলকে কারাগারে পাঠাইবার আদেশ দিয়া গভর্ণর তাঁহার ক্রোধ প্রশমিত করিলেন। কিন্তু টেল হ্রদমধ্যে লাফাইয়া পড়িয়া পলায়ন করিলেন।

কিছুদিন পরে জঙ্গলের পথে একটি দরিদ্র পশুপালকের স্ত্রী তাহার স্বামীর কয়েদ হইতে মুক্তি প্রার্থনা করায় জেস্‌লার তাহাকে দলিত করিয়া যাওয়ার কালে, টেলের অব্যর্থ বাণে জেস্‌লারের মৃত্যু হয়। টেল গৃহে ফিরিলে সকলে তাহাকে সম্বর্ধনা করে। প্রকৃত ইতিহাসে এই সময়ে তিনটি রাষ্ট্র মিলিত হইয়া অষ্ট্রিয়ার প্রবল যুদ্ধবাহিনী হারাইয়া স্বাধীনতার ভিত্তি স্থাপন করে। ক্রমে ক্রমে আরও রাষ্ট্র যোগ দিয়া ২২টিতে বর্তমান রাষ্ট্র গঠিত হয়।

প্রসিদ্ধ জার্মান কবি সিলার এই স্বাধীনতার সংগ্রামকে নাট্যাকার প্রদান করেন। ইন্টার-লেকেনে প্রকৃতির রঙ্গমঞ্চে দক্ষিণ দিক হইতে লুসান হ্রদের শৈলময় কূল হইতে রাস্তা, গৃহস্থ ষ্টাফাচারের গৃহ, গির্জা, ধনী ফুষ্টের মধ্যযুগের পাথরের গৃহ, পাহাড় হইতে নামিবার রাস্তা, নীচের জলের উৎসের পশ্চাতে গরীব জেলেদের কুটীর, উপরে উইলিয়াম টেলের বাসগৃহ, উচ্চভূমি, অগ্রভূমিতে চৌরাস্তা বা প্রাঙ্গণ—প্রত্যেকটি দৃশ্যের ভিন্ন ভিন্ন পটভূমিরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে। চমৎকার ভাবে আচ্ছাদিত দর্শকের গ্যালারীতে ২০০০ লোক বসিতে পারে।

এস, এস বৈশাখ

শ্রীনীলরতন দাশ

ঝরা পত্রের মর্ম্মর মাঝে চৈত্রের অবসান,
পুরানো বছর বিদায় লইল গাহি' বিষাদের গান।
ভুলি' আজ যত অতীতের কথা,
বিগত বেদনা, পুরাতন ব্যথা,—
বরণ করিব নূতন অতিথি বাজাইয়া শুভ শাঁখ;
এস, এস তুমি নববরষের সহচর বৈশাখ!

ফুল-ফোটানোর গানে তুমি কর বনানীরে বিহ্বল,
তটিনীরে কর স্রোতচঞ্চল, আকাশেরে উজ্জ্বল।
আলোকে, বাতাসে, জ্যোছ্‌না-ধারায়—
ভ'রে দাও ধরা গানে, সুষমায়;
জাগাও সবার মনে মনে তুমি পুলকের শিহরণ,
ধ্বনিয়া উঠুক বুকে বুকে নব জীবনের স্পন্দন!

কিশোরের স্বাস্থ্য

শ্রীমনতোষ রায়

যে কর্ম্ম-পদ্ধতি এবং সংস্কৃতি দ্বারা মানুষের কল্যাণ সাধিত হতে পারে, এমন অমূল্য ধনের সন্ধান দিয়ে গেছেন যাঁরা—নববর্ষে ভারতের সেই মহাঋষিদের শ্রদ্ধানত মস্তকে প্রণাম করি। তাঁদের মহামূল্য-দান আমরা মাথা পেতে গ্রহণ করব এবং তার সাহায্যে অজ্ঞানতা, রোগ-শোক, জরা দূর করে দেহ-মনের পূর্ণ সাত্বিকতায় প্রকাশ পেতে চেষ্টা করব। তোমাদের জন্য পরিবেশন করব ঋষি-প্রবর্ত্তিত "আসন ব্যায়াম", যা আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা নির্ব্বিশেষে নিঃসঙ্কোচে অভ্যাস করতে পারে এবং যা দ্বারা দেহ-মনের প্রকৃত উন্নতির পথের সন্ধান লাভ করতে পারে।

আমার নির্দ্দেশিত ব্যায়াম থেকে তোমরা যে সব ব্যায়াম বর্ত্তমানে অভ্যাস করছ—তার সঙ্গে প্রত্যহ ক'একটা করে আসন-প্রক্রিয়া ব্যায়ামের শেষে অভ্যাস করবে, তার ফলে যে উপকার হবে এবার সে কথাই আলোচনা করব।

আমাদের সাধারণ ব্যায়ামাদির ফলে যে রক্ত উত্তেজিত হয়ে দেহের প্রতি কোণে দৌড়াদৌড়ি করে বেড়ায়, তার কাজে সাহায্য করবার জন্য একটি বিশেষ প্রয়োজনীয় জিনিসের আবশ্যক—তার চাহিদা শুধুমাত্র সাধারণ ব্যায়ামে পরিপূরণ হয় না; সেই জিনিসটিকে বলা হয়—'গ্রন্থিরস'। এই গ্রন্থিরস নিঃসরণ হতে পারে যদি আসনের সঙ্গে সম্বন্ধ রাখ।

আমাদের এই ক্ষুদ্র দেহে অফুরন্ত গ্রন্থির সমাবেশ রয়েছে। সেগুলির নাম ক্রমশ জানতে পারবে এবং প্রতি গ্রন্থির (গ্লাণ্ড) এবং তার রসের কি উপকারিতা তা'ও ধীরে ধীরে সংক্ষেপে বলব। এই সব গ্রন্থির রস নিঃসরণের ব্যতিক্রম হলে এই ক্ষুদ্র দেহে দেখা দেয় বিরাট রোগের সূচনা।

রক্তের সঙ্গে এদের পূর্ণ যোগাযোগ না থাকলে রক্তের জোর পর্য্যন্ত থাকে না। তাই রোগের সাহায্যকারী রোগ-বীজাণুর সৈন্য-সামন্তরা রক্ত-সৈন্যদের আক্রমণ করে যুদ্ধে আহ্বান করে এবং তাতে অনায়াসে রক্ত-সৈন্যদের পরাজিত করে মনের আনন্দে দেহাভ্যন্তরে সেই রোগের বীজাণু-সৈন্যরা আধিপত্য বিস্তার করে ও একটি বিরাট দুর্গ গড়ে রাখে—অনাগত শক্তিশালী সৈন্যদের পরাভূত করবার জন্য। কাজেই সেই রক্ত-সৈন্যের ক্ষমতা বৃদ্ধি করবার একমাত্র উপায় প্রকৃতির নিয়মাধীনে দেহ-মনের ব্রত করা, যার কল্যাণে পূর্ণ স্বাস্থ্য লাভের আকাঙ্ক্ষা সফল হতে পারে।

তাই ব্যায়াম শেষে প্রত্যেক শিক্ষার্থীর কোন অভিজ্ঞ আসন-বিশারদের কাছ থেকে নির্দ্দেশ নিয়ে কিছু না কিছু আসন অভ্যাস করা নিতান্ত উচিত। কেন জান?—ব্যায়াম করলে রক্তের প্রাবল্য হয়। সেই প্রবল স্রোতের মধ্যে যদি ক্ষুদ্র কোন ভাসমান পদার্থ ফেলে দেওয়া যায়, তবে তাকে পলকে টেনে নিয়ে যাবে। আসন অভ্যাস করলে গ্রন্থিরস খুব সামান্যরূপে নিঃসরণ হয়, তা

রক্তস্রোতকে চলাচলে কোন বাধা দেয় না, অথচ শরীরের প্রত্যেক গাঁটে গাঁটে, শিরায় শিরায় ঐ গ্রন্থিরসের ছোঁয়ায় গাঁট ও শিরাদির জীবনী শক্তি প্রখর করিয়ে চলাচলের পথটিকে আরও সচল করে রাখে। কাজেই কোন রোগ-বীজাণু সহসা শরীরে প্রবেশ করে রক্তের ক্ষমতা নষ্ট করতে পারে না, উপরন্তু রক্তের রোগ ধ্বংস করার ক্ষমতা লাভ হয় প্রচুর এবং প্রত্যহ আমরা যা খাই সেই খাদ্যাদি পরিপূর্ণ ভাবে হজম করার মত প্রয়োজনীয় রসের সৃষ্টিতে পূর্ণ ক্ষমতা দান করে। ফলে বদহজম, কোষ্ঠকাঠিন্য, মাথা ধরা, বুক ব্যথা, বাত রোগ, টনসিলের রোগ ইত্যাদি বহুবিধ রোগের করাল গ্রাস থেকে মুক্তির সন্ধান লাভ করা যায়।

নিম্নলিখিত কথাগুলি আসন-ব্যায়ামকারীদের আজীবন প্রয়োজনে আসবে।

(১) প্রতি আসন কমপক্ষে তিন বার করে অভ্যাস করা উচিত। বয়স ভেদে আসনের স্থিতি ও বিশ্রামের নির্দ্দেশ আছে। (২) প্রতিটি আসনের অভ্যাসকালে ২০ থেকে ৪০ সেকেণ্ড পর্য্যন্ত থাকা যায় এবং ঐ একই সময় বিশ্রাম নিতে হয়। (৩) প্রতি আসন আভ্যাসকালে দম সাধারণভাবে নিতে এবং ছাড়তে হবে—কখনো যেন দম বন্ধ করা না হয়। (৪) বিশেষ কোন রোগের জড়তা থাকলে যে সব চিত্র ও ব্যাখ্যা পরের সংখ্যাগুলিতে দেওয়া হবে, সে অনুযায়ী সকাল সন্ধ্যায় উপরি উক্ত নিয়মে দু'বেলা অভ্যাস করা যেতে পারে। (৫) আসন অভ্যাসের পূর্ব্বে—সামান্য গরম জলে সিকি ভাগ পাতিলেবুর রস এবং খানিকটা সৈন্ধব নুন মিশিয়ে এক কাপ থেকে এক গ্লাস পর্য্যন্ত (বয়স ভেদে) পান করে আসন অভ্যাস সুরু করতে হবে, এবং অভ্যাসকালেও সামান্য সামান্য পান করা যেতে পারে। তবে প্রথম খানিকটা অবশ্য পান করতে হবে, তাতে পেটের ভেতর যে সব নোংরা আবর্জ্জনা জমে থাকে—তাকে মলদ্বারে আনতে চূড়ান্ত সাহায্য করে।

অভ্যাস-শেষে পূর্ণ বিশ্রাম যথা—১৫ থেকে ৩০ মিনিট বিশ্রাম করে বেলের সরবৎ (পাতলা করে) পান করা যেতে পারে। তাতেও যদি পেটে ক্ষুধা থাকে তো ফেনভাত, মুড়ি বা যা হোক কিছু সুপাচ্য খাদ্য খাওয়া উচিত।

বিকেলে যারা আসন অভ্যাস করবে তারাও ঐভাবে গরম জল পান করতে পারে। আর সকালে একদিন বেলের সরবৎ, অপর দিন ছোলা, কিশমিশ, চিনাবাদাম ভিজিয়ে (রাত্রে ভিজিয়ে) হজমের তৎপরতা বুঝে খাবে।

এর পর থেকে তোমাদের আসনের নানা রকম ছবি দিয়ে ভাল করে অভ্যাস-প্রণালী ও তাদের উপকারিতা ইত্যাদি বুঝিয়ে দেব।

একটা কথা মনে রেখো—সাধারণ ব্যায়াম যারা করে না তারা খালি খালি আসনও অভ্যাস নিয়মিত করতে পারে; কোন ক্ষতি নেই তাতে, বরং লাভ আছে অনেক।

স্নেহের ভাইবোন,

নতুন বছরের শুভেচ্ছা নাও। নতুন বছরে অনেক আশা নিয়ে তোমাদের কাঁচা কচি হাতের লেখাগুলোর আলোচনা করতে বসলুম। তোমাদের লেখনী দিনে দিনে জয়যুক্ত হোক্, এই কামনা করি।

পথচারী ঃ—শিবনাথ গুপ্ত।

পথে পথে ঘুরি ভিখিরীর মত
মনের বাসনা মরে শত শত
ছিন্ন কাঁথায় লক্ষ টাকার স্বপ্ন দেখি যে ভাই!
পায়ের তলায় কিছু নাই, তাই আকাশের পানে চাই!

মনের নিখুঁত ছাপ যখন কবিতার ওপর সত্য হয়ে ফুটে ওঠে, তখন কবিতা সুন্দর ও সার্থক হয়। তোমার মন কবিতার ভাষায় কথা কয়ে উঠেছে, তাই তোমার এই কবিতা রচনা সার্থক হয়েছে। ছন্দের দিকে লক্ষ্য রেখো। সংশোধনটুকু দেখে নিও।

পরাজয় ঃ—অণিমা সেন।

তোমার গল্পে পরাজয় হ'ল কার? ধনী কেমন করে চাষার উদারতার কাছে নতি স্বীকার করল, তাই দেখাতে চেয়েছ গল্পটিতে—কিন্তু শেষে আবার কি খেয়াল চাপল তোমার মাথায়? গরীব চাষাকে ঘটনাচক্রে বড়লোক বানিয়ে দিলে কেন? চাষা ত চাষাই ছিল ভাল। এ যে দেখছি চাষারই পরাজয় হ'ল। শেষ অংশটুকু বাদ দিলে গল্প তবু একরকম দাঁড়িয়ে যেত।

বর্ষপ্রাতে ঃ—দিলীপকুমার জানা।

আজ বরষের প্রথম প্রভাতে উঠিল বনানী সাজি,
চৈত্র রাতের নবপল্লবে উঠিল বাজনা বাজি;
ফুল-বীথিকায় ফুল ফুটে ওঠে শুভ্র রজনীগন্ধা,
নববরষের প্রথম প্রভাতে বায়ু বহে মধুছন্দা।

এই কয়টি পঙ্‌তিতে ছন্দের মিল হয়েছে ভাল। অন্যগুলির যেখানে দোষ আছে, সংশোধন করে নাও।

—মধুকর

রবীন্দ্রনাথ ও শিশু

শ্রীমৃদুলকান্তি বসু (প্রাঃ ৬৪২৫)

বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে মানুষের শিশু মনটি যে কোথায় চাপা পড়ে যায়, তা সে বুঝতেই পারে না। তবু অসাধারণ প্রতিভাশালীরা অনেক সময় বয়সের আবরণ সরিয়ে এক একবার তাদের শিশু মনে উঁকি দেন। এরকম করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ; কারণ বয়সের পরিণতির সাথে সাথে তাঁর দেহের পরিবর্ত্তন হলেও, তাঁর বিচিত্র কল্পনাময় চিরদিনের কাঁচা শিশু মনটি সাথে সাথেই থেকে গেছে। প্রৌঢ় হয়েও তিনি অনুভব করেছেন শিশু মনের প্রতিটি আবেগ-চঞ্চল অনুভূতি। তাই তাঁর লেখনী থেকে বেরিয়ে এসেছে 'শিশু' ও 'শিশু ভোলানাথ' শিশুমনের বার্ত্তা নিয়ে।

শিশুর যোগ অবিচ্ছিন্ন থাকে প্রকৃতির সাথে, প্রকৃতির সাথেই সুরু হয় তার সহজ সরল বিচিত্র খেলা। তারই মাঝে গড়ে ওঠে সে। তবু এরই মাঝে আর এক জনের অতি ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে সে আসে—তিনি শিশুর মা। মা-ই তার কল্পনার কেন্দ্র। তিনি শুধু তার শিক্ষকই নন, খেলা থেকে গল্প বলা পর্য্যন্ত সব কিছুরই তিনি সঙ্গী।

কিন্তু মা'র আঁচলের বাইরে বাস্তবতার কঠিনতায় ঘেরা বাবা ও মাষ্টার মশাইকে দেখেই শিশুর অবাক লাগে। বাবার কাজের সঙ্গতি সে খুঁজে পায় না; তাই সে বলে বাবার সম্বন্ধে—

"করেন সারা বেলা লেখা লেখা খেলা।"

সে অবাক হয়ে ভাবে— "ঠাকুরমা কি বাবাকে কখ্‌খনো
রাজার কথা শোনায়নিকো কোনো ?"

আর মাষ্টার মশাই সম্বন্ধে তো সে রীতিমত ভীতিবিহ্বল। বেত্রাবতার মাষ্টার মশাইয়ের সাথে তার শিশুমনের খাপ খায় না। তাই শিশুদের সাথে তার মিল নেই।

শিশু কল্পনা-বিলাসী। মায়ের আঁচলে ঘেরা তার ছোট জগতেও কল্পনার পাখায় ভর দিয়ে সে বেড়ায়। তাই তার সাধ হয় অদ্ভুত—বাস্তবের সাথে কোনো সাদৃশ্যই খুঁজে পাওয়া যায় না। শিশুর এই ইচ্ছার পিছনে কাজ করে তার অনুকরণ-প্রয়াসী ও বৈচিত্র্য-পিপাসু মন। শিশু যা দেখে তাই হতে চায়! মাষ্টার মশাই হয়ে তাই সে বেত হাতে বিড়ালছানাটিকে পড়াতে বসে বলে—"আমি আজ কানাই মাষ্টার পড়ো মোর বিড়ালছানাটি।" আর তার বৈচিত্র্য-পিপাসু মন বাস্তব জীবনের দৈনন্দিন ঘটনা থেকে যা কিছু নূতন তারই দিকে ছোটে। তাই রামায়ণের রাম হয়ে বনে যেতেও আপত্তি নেই তার। স্তিমিত গ্যাসের আলোতে গলির মোড়ে "লণ্ঠনটি ঝুলিয়ে হাতে" পাহারাওয়ালা হতে বা বাগানের মালীর সাথে মাটি কোপাতেও আপত্তি নেই তার। মধু মাঝির নৌকো দেখে সে মাঝি হতে চায়—"মা যদি হও রাজী বড় হলে আমি হব খেয়াঘাটের মাঝি।"

বাস্তব ও কল্পনার সীমারেখা তার কাছে স্পষ্ট নয়; অসম্ভব বলে কিছুই তার প্রকৃতিতে নেই। সব জিনিসই সে সম্ভব বলে মনে করে। তাই সে চাঁপাফুল হয়ে গাছে ফোটার কল্পনা বা কুকুরছানা

হবার কল্পনাকে খুবই স্বাভাবিক বলে ভাবে। শিশু বলে—"যদি খোকা না হয়ে আমি হতেম তোমার টিয়ে—"

মার কাছে সে সর্ব্বদা প্রমাণ করতে চায় যে, সে একজন মস্ত লোক। ছোট বলে তার অক্ষমতা নিয়ে সবাই যে তার প্রতি তাচ্ছিল্য দেখায়, সে মোটেই সেটা বরদাস্ত করতে পারে না। তাই সে নিজেকে খুব বড় মনে করতে চায়। তার মনোরাজ্যে অসম্ভবের স্থান নেই; মায়ের মুখে-শোনা রাজপুত্রের মত বীরপুরুষ হতে তার কোনো বাধা নেই। সে মাকে নিয়ে বহুদূর দেশে যাবে। ডাকাতের দল মাকে আক্রমণ করলে সে নিজেই তলোয়ার দিয়ে তাদের কেটে ফেলবে; মাকে এসে বলবে—"লড়াই গেছে থেমে।" মা তখন বলবে—

"ভাগ্যে খোকা সঙ্গে ছিল কি দুর্দ্দশাই হোত তা না হলে।"

খোকা মাকে দেখাতে চায় যে সে একজন বিজ্ঞ, সে আর ছোট নেই। তাই সে ছোট বোনের কথায় ভুল ধরে— "গণেশকে ও বলে মা গামুশ।

তোমার খুকি কিছু বোঝে না মা,

তোমার খুকি ভারী ছেলেমানুষ।"

গুরুজনদের শাসন যখন তাকে বিরক্ত বিব্রত করে, তখন সে ভাবে যে সেও একদিন বড় হবে। অবশ্য তার জগতের নিয়মে শুধু সেই বড় হয়ে উঠবে; তখন দাদাকেও শাসন করবে সে। আলমারী খুলতে শিখে সে তখন ঝিকে যত খুশি টাকা মাইনে দেবে। কেউ যদি তাকে ছোট বলে ভাবে, সে তাদের ভুল ভেঙ্গে দিয়ে বলবে—"খোকা তো আর নেই হয়েছি যে বাবার মতো বড়।"

রবীন্দ্রকাব্যে শিশুর অন্যতম গুণ তার প্রশ্ন করার অভ্যাস। শিশু গাছের ফাঁকে চাঁদ দেখে তাকে ধরবার সুযোগ খোঁজে। তার দাদা তাকে চাঁদের দূরত্বের কথা বলে তিরস্কার করলেও সে কান দেয় না; কারণ সে বলে— "মা আমাদের চুমো খেতে মুখটি করে নীচু,

তখন কি মার মুখটি দেখায় মস্ত বড় কিছু।"

বিশ্বজগতের অদ্ভুত নিয়ম বুঝতে পারে না সে। তাই অবাক হয়ে তার সম্বন্ধে সে প্রশ্ন করে—

"রাতের বেলা দুপুর যদি হয় দুপুর বেলা রাত হবে না কেন?"

এভাবে শিশুমনের প্রতিটি দিক মূর্ত্ত হয়ে উঠেছে রবীন্দ্রকাব্যে। যে অসংখ্য সুন্দর কল্পনার ভেতর দিয়ে গড়ে ওঠে তাদের জীবনগুলি, তারই অনুভূতিগুলিকে তিনি মূর্ত্ত করেছেন। শিশুমনের সূক্ষ্ম বিশ্লেষণের সাথে সাথে শিশুমনের সুন্দর জীবন্ত ছবি এঁকে তিনি যেন তাদের জন্য পরমপিতার প্রার্থনার অধিকার পেয়েছেন— "ইহাদের করো আশীর্ব্বাদ;

ধরায় উঠেছে ফুটি শুভ্র প্রাণগুলি

নন্দনের এনেছে সম্বাদ

ইহাদের করো আশীর্ব্বাদ।"

খেলাধূলা

—অষ্টাবক্র—

আরও একটি বছরকে পেছনে ফেলে আমরা সামনে এগিয়ে চলেছি। জাতীয় জীবনের প্রতি ক্ষেত্রে ভারতের তরুণ দলকে আজ নূতন করে সংকল্প গ্রহণ করতে হবে—বিশ্বসভায় মাতৃভূমি ভারতকে গৌরবের আসনে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য। এ বছরটি ক্রীড়ার দিক থেকে ভারতের পক্ষে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। বিশ্ব অলিম্পিক প্রতিযোগিতার বিভিন্ন বিভাগে ভারতের ক্রীড়াবিদদের ভারতের পতাকা উড্ডীন করবার দায়িত্ব নিতে হবে। ওদিকে ভারতের ক্রিকেট দলকে ইংলণ্ড সফরে ভারতের সুনাম প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। আমরা নববর্ষে জীবনের সকল ক্ষেত্রে ভারতের সাফল্য কামনা করি।

জাতীয় হকি প্রতিযোগিতায় বাংলার সাফল্য—ভারতের জাতীয় হকি চ্যাম্পিয়ানশিপের জন্য আন্তঃরাজ্য হকি প্রতিযোগিতা এবার কলকাতাতে হয়ে গেল। বাংলা দল দীর্ঘ ১৩ বৎসর কাল পরে এবার আবার চ্যাম্পিয়ানশিপ অর্জ্জন করে ফুটবলের মত হকিতেও প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করেছে। এবার এই চ্যাম্পিয়ানশিপের ফাইন্যালে বাংলাকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে হয় দুর্দ্ধর্ষ পাঞ্জাব দলের সঙ্গে। পাঞ্জাব গত তিন বৎসর পর পর এই প্রতিযোগিতায় জয়ী হয়ে রেকর্ডের সৃষ্টি করেছে এবং এ বৎসরও তারা যে ভাবে খেলছিল, তাতে বাংলা দল যে বিজয়ী হবে এ কথা কেউ আগে থেকে ভাবতে পারে নি। ফাইন্যালের প্রথম দিনের খেলাটিতে উভয় দল একটি করে গোল করায় খেলাটি অমীমাংসিত থেকে যায়। দ্বিতীয় দিন খেলাটি পুনরনুষ্ঠিত হয় এবং তাতে বাংলা ২-১ গোলে জয়লাভ করে। জাতীয় হকি প্রতিযোগিতায় বাংলার এটা তৃতীয় সাফল্য। এর আগে ১৯৩৬ ও ১৯৩৮ সালে বাংলা ফাইন্যালে যথাক্রমে মানভাদার ও ভূপাল রাজ্যকে পরাজিত করে চ্যাম্পিয়ান আখ্যা লাভ করে।

এবার জাতীয় হকি প্রতিযোগিতায় বিভিন্ন রাজ্যের প্রতিনিধিমূলক টিমগুলির খেলা দেখে মনে হয়, ভারতে হকি খেলার মানও নেমে গেছে। বিশ্ব অলিম্পিকে ভারতকে তার বিশ্বজয়ী আখ্যা রাখতে হলে কঠোর অনুশীলন প্রয়োজন।

বিশ্ব অলিম্পিকে ভারতীয় হকি টিম নির্ব্বাচন—আসন্ন বিশ্ব অলিম্পিক প্রতিযোগিতায় যোগদানের জন্য ভারতের হকি টিম নির্ব্বাচনের প্রাথমিক পর্ব্ব শেষ হয়েছে। অলিম্পিকে হকিতে ভারত ১৯২৮ খৃষ্টাব্দ হতে অপরাজেয় হয়ে রয়েছে। এই সম্মান অক্ষুণ্ণ রাখতে হলে ভারতকে প্রকৃত প্রতিনিধিমূলক দল পাঠাতে হবে। সেইদিকে দৃষ্টি রেখেই ভারতের হকি কর্ত্তৃপক্ষ ২৭ জন খেলোয়াড় নির্ব্বাচন করেছেন। এই ২৭ জনকে ছয় সপ্তাহ কাল কলকাতায় শিক্ষা শিবিরে লক্ষ্ণৌর এন. এন. মুখার্জি, বাংলার ফ্রাঙ্ক ওয়েলস ও পাঞ্জাবের হরবেল সিংহের তত্ত্বাবধানে অনুশীলন করতে হবে।

ইংলণ্ড সফরে ভারতের ক্রিকেট টিম নির্ব্বাচিত—ভারতের ক্রিকেট কন্‌ট্রোল বোর্ড ইংলণ্ড সফরের জন্য ভারতীয় টিম নির্ব্বাচন করেছেন। বহু আলোচনা ও গবেষণার পর তাঁরা যে ১৭ জন খেলোয়াড়ের নামের তালিকা ঘোষণা করেছেন, তাতে একদিকে কতকগুলি প্রত্যাশিত নাম বাদ পড়ায় যেমন বিস্ময়ের সঞ্চার হয়েছে, অন্যদিকে তেমনি দেশের তরুণ খেলোয়াড়দের দলভুক্ত করা হয়েছে বলে আনন্দ ও উৎসাহের সৃষ্টি হয়েছে। নির্ব্বাচিত তালিকায় বিজয় মার্চেন্ট, লালা অমরনাথ ও বিনু মানকড়ের নাম না থাকায় ভারতীয় দল যে দুর্ব্বল হয়েছে, তাতে কোন সন্দেহই নেই।

বিজয় মার্চেন্ট ক্রিকেট থেকে অবসর নেবেন বলে ঘোষণা করেছেন। তবে শোনা যাচ্ছে, বিলেত হতে দলের পক্ষ থেকে তাঁর ডাক পড়লে তিনি হয়ত শেষ পর্য্যন্ত যেতে পারেন। যে ভাবে টিম নির্ব্বাচন করা হয়েছে, তাতে ওপনিং ব্যাটসম্যান নিয়ে সমস্যা দেখা দেবে। পঙ্কজ রায়ের জুটি হয়ে প্রথমে কে নামবেন তাই হ'ল প্রশ্ন। নির্ব্বাচকদের মনের তলায় হয়ত মন্ত্রীর কথা ভাবা আছে। তিনি উইকেটকীপার ব্যাটসম্যান হলেও প্রবীর সেন তাঁর তুলনায় শতগুণে ভাল। উইকেটকীপার এবং ব্যাটিংয়েও মন্ত্রী কি করবেন তা এখন বলা যায় না। তার পর লালা অমরনাথ কেন যে টিম থেকে বাদ পড়লেন বুঝা গেল না। অমরনাথ ব্যাট, বল এবং ফিল্ডিংয়ে যে কোন দলের সম্পদ। বিশেষ করে বিলেতে উইকেটে তাঁকে দিয়ে মানকড়ের অভাব খানিকটা পূরণ করা যেত, নির্ব্বাচকমণ্ডলী সে কথা ভুলেই গেছেন। তৃতীয়তঃ বর্ত্তমান বিশ্বের শ্রেষ্ঠ স্পিনবোলার মানকড়কে দলে নেবার জন্য কন্‌ট্রোল বোর্ড আগে থেকে চেষ্টা না করায় সকলেই ক্ষুন্ন হয়েছেন। যাই হোক, আমরা ভারতীয় দলের সাফল্য কামনা করি।

জাতীয় ক্রিকেট প্রতিযোগিতায় বোম্বাই বিজয়ী—এ বছর ভারতের ক্রিকেট চ্যাম্পিয়ানশিপের খেলায় বোম্বাই দল ফাইন্যালে গত বৎসরের বিজয়ী হোলকার দলকে পরাস্ত করে রণজী-স্মৃতি ট্রফি লাভ করেছে। বোম্বাইয়ের ব্রেবোর্ণ ষ্টেডিয়ামে ছয় দিনের এই খেলাটি পঞ্চম দিনেই শেষ হয়ে যায়। প্রথম চার দিন খেলাটিতে তীব্র প্রতিযোগিতা চললেও পঞ্চম দিনে বোম্বাইয়ের বোলাররা হোলকার দলের বিপর্য্যয় ঘটায়। ফলে বোম্বাই দল ৫৩১ রাণে বিজয়ী হয়।

রণজী ট্রফির খেলায় বোম্বাই দল আগেও পাঁচবার বিজয়ী হয়েছে। এইবার নিয়ে বোম্বাই দল মোট ছয়বার রণজী ট্রফি লাভের গৌরব অর্জ্জন করেছে। এই খেলা হচ্ছে ১৮ বছর, তার মধ্যে ছ'বার চ্যাম্পিয়ান হয়েছে বোম্বাই দল। অন্য কোন দলের পক্ষে ছ'বার জেতা সম্ভব হয়নি।

এশিয়ান চতুর্দ্দেশীয় ফুটবল—সিংহলের রাজধানী কলম্বোতে এশিয়ার চারটি ফুটবল-প্রিয় দেশ—ভারত, পাকিস্থান, বর্মা ও সিংহলের মধ্যে চতুর্দ্দেশীয় প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হ'ল। প্রতিযোগিতাটি এ বছরই আরম্ভ হয়েছে এবং প্রতি বছরই হবে বলে স্থির হয়েছে। প্রতিযোগিতাটি লীগ খেলার ভিত্তিতে পরিচালিত হয়েছে। ভারত সিংহলকে তিন গোলে ও বর্মাকে চার গোলে পরাজিত করে এবং পাকিস্থানের সঙ্গে খেলাটি ড্র হয়। ওদিকে পাকিস্থানও সিংহল ও বর্মাকে

পরাজিত করে এবং ভারতের সঙ্গে খেলাটি ড্র হয়। কাজেই ভারত ও পাকিস্থান উভয় দলই সমান সমান পয়েন্ট লাভ করে। তবে ভারত গোল দেয় সাতটি আর পাকিস্থান মোট তিনটি। কাজেই লীগ প্রতিযোগিতার নিয়মানুযায়ী ভারতই চ্যাম্পিয়ান হবার অধিকারী। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, সিংহল ফুটবল ফেডারেশান এই প্রতিযোগিতায় ভারত ও পাকিস্থান উভয় দলকেই যুগ্মভাবে চ্যাম্পিয়ান করে এক সমস্যার সৃষ্টি করেছেন। ভারতীয় দলের ম্যানেজার মিঃ নাইডু এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারেন নি। তিনি প্রতিবাদ জানিয়ে এসেছেন এবং বিষয়টি নিখিল ভারত ফুটবল ফেডারেশানের সমক্ষে উপস্থিত করবেন বলে জানিয়েছেন।

আমাদের কথা

গত চৈত্র সংখ্যার শিশুসাথীতে প্রকাশিত 'চৈত্র' শীর্ষক প্রথম কবিতাটি অপর একখানি মাসিক পত্রিকা শুকতারায় প্রকাশিত হইয়াছে দেখিয়া, আমরা সুকবি শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়কে অনুযোগ করিয়া পত্র লিখিয়াছিলাম। তদুত্তরে তিনি লিখিয়াছেন—"শুকতারায় ও শিশুসাথীতে আমার 'চৈত্র' শীর্ষক একই কবিতা প্রকাশিত হইয়াছে। ইহা আমার পক্ষে অতীব লজ্জার কথা এবং বিশেষ অন্যায়। শিশুসাথীর ও শুকতারার মাননীয় সম্পাদক মহাশয়দের নিকট এবং পাঠক-পাঠিকাদের কাছে এ-জন্য আমি ক্ষমা চাই। ভবিষ্যতে এরূপ যাহাতে আর কিছুতেই না হয়, সেদিকে যথেষ্ট সতর্ক থাকিব।

"একই কবিতা আমি ইচ্ছা করিয়া দুইটি পত্রিকায় পাঠাই নাই। 'চৈত্র' শীর্ষক কবিতা আমার লেখা ছিল তিনটি। কোন্‌টি শিশুসাথীতে দেওয়া হইল তাহা ঠিক খেয়াল করিতে না-পারার জন্যই একই কবিতা শুকতারাতেও ভুলক্রমে পাঠানো হইয়া যায়। যখন বুঝিতে পারিলাম, তখন আর উপায় নাই। মাত্র এইটুকুই আমার সপক্ষে বক্তব্য।"

আশা করি, এই অনিচ্ছাকৃত ত্রুটির জন্য পাঠক-পাঠিকাগণ আমাদিগকে মার্জনা করিবেন।

নববর্ষ উৎসব

সব পেয়েছির আসরের অনুষ্ঠান

যুগান্তর ছোটদের পাততাড়ির প্রযোজনায় এবং স্বপনবুড়োর পরিচালনায় সব পেয়েছির আসরের ছেলেমেয়েরা আগামী ১লা বৈশাখ দেশবন্ধু পার্কে (শ্যামবাজার) সকাল ৮টায় নববর্ষ উৎসব পালন করিবে। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করিবেন পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল ডাঃ হরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায়। অনুষ্ঠানের উদ্যোক্তাগণ দেশের ছেলেমেয়েদের দলে দলে যোগ দিতে অনুরোধ জানাইয়াছেন।

নূতন ধাঁধা

১। নাম কি তোমার? যাচ্ছ কোথায়?
অসুখ তোমার কি?
শুনে আমার প্রশ্ন সকল, জবাব দিল একটি কেবল,
তাতেই আমি সকল প্রশ্নের জবাব পেয়েছি।

—কুমারী অনুরাধা দাস (১১৫৩৩)

২। দু' অক্ষরে এমন একটি পদবীর নাম বল, যার প্রথম অক্ষর বাদ দিলে অপর একটি পদবী হয়।

—উৎপল হালদার (১২৮১৮)

৩। ৩২কে এমন চারটি ভাগে বিভক্ত কর যে, প্রথম ভাগে ৩ যোগ করিলে, দ্বিতীয় ভাগ থেকে ৩ বিয়োগ করিলে, তৃতীয় ভাগকে ৩ দিয়া গুণ করিলে এবং চতুর্থ ভাগকে ৩ দিয়া ভাগ করিলে যোগ বিয়োগ গুণ ও ভাগফল একই হইবে।

—সন্তোষকুমার সেনশর্মা (১১৮৬২)

৪। কল্পনায় আছি আমি, নাহি কিন্তু মনে,
কাননেতে থাকি আমি, নাহি থাকি বনে;
কলিকাতা রই আমি, ঢাকাতেও থাকি,
তবু মোরে নগরেতে না পাবে নিরখি।

—গোলাম কাদের (১০৭০৬)

দ্রষ্টব্য—চারিটি ধাঁধার উত্তর ঠিক হওয়া চাই এবং ১৫ই বৈশাখের ভিতর উত্তরগুলি আমাদের হাতে পৌঁছা চাই। নামের সাথে গ্রাহক-নম্বর দিতে হইবে।

শুভ নববর্ষে আমরা আমাদের গ্রাহক-গ্রাহিকা, পাঠক-পাঠিকা ও লেখক-লেখিকাদের স্বাস্থ্য সুখ ও দীর্ঘজীবন কামনা করি

দ্রষ্টব্য—সুনীল স্মৃতি-প্রতিযোগিতার ফলাফল আগামী জ্যৈষ্ঠ মাসে প্রকাশিত হইবে।

সম্পাদক—শ্রীআশুতোষ ধর
৫নং বঙ্কিম চাটার্জ্জি ষ্ট্রীট, কলিকাতা, শ্রীনারসিংহ প্রেস হইতে
শ্রীপরেশনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সূচী

ডিরেক্টর বাহাদুর কর্তৃক সমগ্র বঙ্গের বিদ্যালয়সমূহের লাইব্রেরীর জন্য অনুমোদিত

প্রতিষ্ঠিত—বাং ১৩২৯ সাল ; ইং ১৯২২ সন

৩১শ বর্ষ
২য় সংখ্যা

শিশু সাথী

জ্যৈষ্ঠ,
১৩৫৯

বার্ষিক মূল্য ৪৲ টাকা]

[প্রতি সংখ্যা ।৵০ আনা

সূচী

[প্রথম প্রকাশ—১৩২৯ সাল, ইং ১৯২২]

৩১শ বর্ষ } জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫৯ { ২য় সংখ্যা

জ্যৈষ্ঠ এলো

শ্রীপ্রভাকর মাঝি

জ্যৈষ্ঠ এলো শুনছো খুকু, ঘূর্ণি হাওয়ার সনে,
ঝাঁঝাঁ রোদের গুমোট এসে লাগছে বাতায়নে।
ইস্ কি গরম—বেজায় গরম! প্রাণটা রাখা দায়,
এমন দিনে সখ করে কি পদ্য লেখা যায়?
টস্‌টসিয়ে ঘাম ঝরে যায়—ঐ তো খোকাবাবু
ঘামাছিদের চুলকানিতে একেবারে কাবু।

জ্যৈষ্ঠ এলো চুপে চুপে আম-কাঁটালের দেশে,
মিষ্টি মধুর গন্ধটুকু উঠছে সেথায় ভেসে।
একঠেঙে তালগাছেতে ঐ নরম শাঁসের তরে
ঠিক দেখেছি, বাবলু ভূতোর নোলাতে জল ঝরে।
রাঙামাটির পথ ভরেছে কুর্চি-চাঁপা ফুলে,
রাখাল ছেলের বাজছে বাঁশী বৃদ্ধ বটের মূলে।

জ্যৈষ্ঠ এলো উদাস-করা ঘুঘুর করুণ স্বরে,
খুসির জোয়ার উথলে উঠে মনের গোপন পুরে।
আম বাগানে মণ্টু-কেলো ছুটবো দলে দলে,
ঝাঁই ঝাঁই ঝাঁই সাঁতার দিব কাজলা দীঘির জলে।
বন্ বন্ বন্ সবুজ মাঠে উড়াবো ডাঁশ ঘুড়ি,
তার সাথে কোন্ নিরুদ্দেশে মনটা যাবে উড়ি।

মুক্ত স্বাধীন ফিরবো মোরা—ভয় করি বা কারে?
লম্বা ছুটির খবর নিয়ে জ্যৈষ্ঠ এলো দ্বারে।

আগামী দিনের আলো

শ্রীঅরুণবরণ চক্রবর্তী

বাবার মুখ মলিন—মার মুখেও হাসি নেই। কী যেন হয়েছে সংসারটার মধ্যে। বিশু যেন বুঝেও বুঝে উঠতে পারে না। বেশ তো চলে যায় দিন। খাচ্ছে-দাচ্ছে—স্কুলে যাচ্ছে—বিকেলে খেলছে; সংসারে যার যা কাজ সে তাই করছে। দিন তো ঠিকই চলে যায়। তবু সমস্ত আবহাওয়াটার মধ্যে কেমন যেন একটা অস্বস্তিকর ভাব। কাকীমার মুখখানা তো বেশ খুশিতে ভরা। কাকার মুখে তো কোন চিন্তার ছায়া নেই। বাড়ী কাঁপে তাঁর দাপটে। কাকার ছেলে কাশী—তারই সঙ্গে এক ক্লাসে পড়ে—স্কুলে যায় তারই সঙ্গে—সেও তো বেশ চটপটে ফিটফাট; এবার যদিও ফেল করেই ক্লাসে উঠেছে। এমন কি বাড়ীর ঝি-চাকরগুলোর চালচলনও তো বেশ স্বচ্ছন্দগতি। বিশু ভাবে আর আশ্চর্য হয় বাবা-মার কথা চিন্তা করে। বাবা-মার কথা ভাবতে ভাবতে তার মুখেও বুঝি একটা কালো ছাপ পড়েছে।

অংকের মাস্টার মশাই ধরে ফেললেন তার এই ভাবান্তর।

তুমি ক্লাসের ফার্স্ট বয়। তোমার এ অংক ভুল হলো কী করে?

গত রাতে যে সে তার মাকে আঁচল দিয়ে চোখের জল মুছতে দেখেছিলো, আর সেই দেখেই যে মাথার ভিতরটা তার কেমন করে উঠেছিলো, একথা সে বলবে কী করে মাস্টার মশাইকে।

কাল রাতে স্যর ভয়ানক মাথা ধরেছিলো।

ও তাই বুঝি মুখখানা আজ শুকনো?—সস্নেহে হাত বুলোলেন তার পিঠে অংকের মাস্টার মশাই। ভালো ছেলে বলে মাস্টার মশাইরা সবাই তাকে খুব ভালোবাসেন।
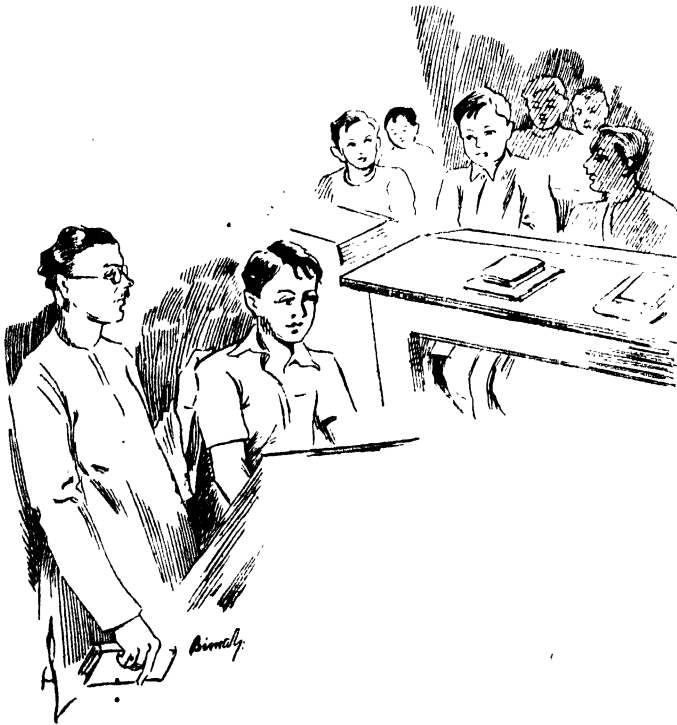
কাশী মাস দুয়েকের ছোট বিশুর চেয়ে। স্কুল থেকে বাড়ী ফেরার পথে জিজ্ঞেস করলো: কাল রাতে তোর মাথা ধরেছিলো দাদা? বাবার কাছে ওষুধ ছিলো। খেলি না কেন?

এমনিই সেরে গেলো কিনা—তাই আর খাইনি।

প্রায় সমবয়সী হলেও বিশুর স্বাভাবিক বুদ্ধি কাশীর চেয়ে বেশি। সংসারের ঘোরপ্যাচ না বুঝলেও, বাবা-মার এই ভাবান্তর তাকে খানিকটা অভিজ্ঞ করেছে সংসার সম্বন্ধে। ইদানীং কাকা-কাকীমার কাছে যেন সে ঘেঁসতে পারছে না। তাঁদের কাছে গেলে তারা যেন হঠাৎ কেমন গম্ভীর হয়ে যান—হয়তো একটু বিরক্তও হন। আর কাকীমার চেয়ে কাকাই বোধ হয় বেশি। সত্যিই যদি তার মাথা ধরতো, তা'হলেও সে যেতে পারতো না কাকার কাছে। কিন্তু কাশীকে সে এ বিষয়ে কোন কথাই বললো না। তার শিশুমন অভিজ্ঞের মত রায় দিলো, তার মনের কোন কথা কাশীকে বলা উচিত নয়। ... ...

দিন তিনেক পর। স্কুল থেকে এসে বিশু মাকে বললো, ক্লাসে মা আজ নাম ডেকেছিলো যাদের মাইনে বাকী পড়েছে।

কার কার?

আমার আর কয়েকজনের।

শুধু কি তোমার নাম—না কাশীরও?

না, কাশীর নাম তো ডাকে নি।

বিশু লক্ষ্য করলো মার মুখের ওপর একটা কালো ছায়া পড়লো।

সেদিন তো তোমার কাকা গিয়েছিলেন মাইনে দিতে। তোমার মাইনে কি দেন নি?

দিলে নাম ডাকবে কেন মা? কাকাকে আমি জিজ্ঞেস করবো?

মার মুখের ওপর কালো ছায়াখানা গভীর হলো। তিনি বললেন, না, তোমাকে জিজ্ঞেস করতে হবে না। যা ব্যবস্থা করবার আমি করবো।

সেদিন সন্ধ্যাবেলা স্কুলের একজন মাস্টার মশাই বাড়ীতে এলেন পড়াতে। একঘরেই বিশু ও কাশী পড়ে। বাৎসরিক পরীক্ষা এগিয়ে এসেছে। বিশু ভাবলো, কাকা বোধ হয় এইজন্যেই এঁকে ঠিক করেছেন। গত বারে সে ফার্স্ট হয়ে উঠেছে। যদি একটু সাহায্য পায় এই মাস্টার মশায়ের, তা'হলে এবারে আরো অনেক বেশি নম্বর পেয়ে সে ফার্স্ট হতে পারবে। মনে মনে সে খুবই খুশি হলো। খানিক বাদে ঘরে ঢুকলেন কাকীমা। বাইরের লোকের সঙ্গে তিনি কথা বলেন। মাস্টার মশাইকে বললেন, কাশীকে এবার পাস করাতেই হবে—বুঝলেন মাস্টার মশাই! ওর জন্যেই আপনাকে রাখা। বিশুর জন্যে তো চিন্তার কোন কারণ নেই, ও ভালো ছেলে।

সবিস্ময়ে বিশু লক্ষ্য করলো তার কথা বলবার সময় কাকীমার খুশিতে উজ্জল মুখখানা সহসা কেমন যেন বিষাদে মাখা হয়ে গেলো।

কাকীমা বলে চললেন, এ বংশের ছেলে ফেল করবে, এর চেয়ে দুঃখের আর কিছু নেই। যেমন করেই হোক, এবার ওকে পাস করিয়ে ক্লাসে ওঠাতে হবে।

মাস্টার মশাই সহাস্যে বললেন, আমি চেষ্টা করবো, এই পর্যন্ত বলতে পারি। কী জানেন, ছেলের আপনার মাথা খারাপ নয়—কিন্তু পড়ে না।

কাকীমা প্রতিবাদ করে উঠলেন, খুব পড়ে তো। বিশুর চেয়েও বেশি পড়ে।

মাস্টার মশাই হাসলেন, তা'হলে বলতে বাধ্য হবো, কাশীর মাথাই ভালো না।

কাকীমা দেখলেন, কথায় আর পেরে উঠবেন না। সুতরাং তিনি অন্দরমহলের দিকে পা বাড়ালেন। যাবার সময় বলে গেলেন, আপনি চেষ্টার ত্রুটি করবেন না—আমাদের দিক থেকেও কোন ত্রুটি হবে না। ... ...

রাত তখন কত কে জানে। মাকে জড়িয়ে ধরে ঘুমোচ্ছিলো বিশু। হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেলো। আবার হয়তো ঘুমিয়েই পড়তো, মা ও বাবার চাপা গলার শব্দে ঘুম যেন আর এলো না। তাঁদের কথা তাকে এমনভাবে আকৃষ্ট করলো যে সে উৎকর্ণ হয়ে শুনতে লাগলো।

বাবা বললেন, এতদূর অধঃপতন হয়েছে পরেশের। সংসারে কয়েক মাস টাকা দিতে পারিনি বলে ও শুধু কাশীর মাইনেটা দিয়ে এলো?

মা বললেন, তোমার কাজের কোন সুবিধা হলো না?

না, এখনো তো হলো না। কেন যে রাগ করে কাজটা ছেড়ে দিলাম—এখন তাই ভাবছি। কিন্তু না ছেড়েও তো কোন উপায় ছিলো না। আত্মসম্মানে বড় আঘাত লাগলো।

মা দীর্ঘনিঃশ্বাস ছেড়ে বললেন, কিন্তু এখন যে প্রতি মুহূর্তে আত্মসম্মানে আঘাত পড়ছে।

বাবা খানিকক্ষণ চুপ করে রইলেন, তারপর মাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, অধীর হয়ো না। ব্যবস্থা একটা হবেই।

কিন্তু বিশুর স্কুলের মাইনের ব্যবস্থাটা আগে কর। ফাইনাল পরীক্ষা এগিয়ে এলো।

হ্যাঁ কালই করছি। আর যদি কোন ব্যবস্থা করে উঠতে না পারি, আমার আংটিটা—

অন্ধকারের মধ্যেও বিশু স্পষ্ট বুঝতে পারলো মা যেন আঁতকে উঠলেন—তোমার আংটিটা!

আর কোন কথা তিনি বলতে পারলেন না। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলেন।

মাকে কাঁদতে দেখলে সন্তানের চোখ ফেটে বুঝি জল আসে। বিশুর দু'চোখ ভরেও জল এলো। মাকে আরো নিবিড় করে জড়িয়ে ধরে মায়ের বুকের মধ্যে সে মুখ লুকালো।

সকালে ঘুম থেকে উঠে বিশু দেখলো বাবা বিছানায় নেই। বাবা তো দেরী করেই ওঠেন। এতো সকালে গেলেন কোথায়? মাও নেই। তিনি বোধ হয় রান্নাঘরে গেছেন। আজকাল মা একাই রান্না করেন। এটাও একটা জিজ্ঞাসা বিশুর মনে। আগে তো মা আর কাকীমা মিলে মিশে সংসারের কাজকর্ম সব করতেন। আজকাল মা একাই সব করেন। কেন? কাকীমার

কি শরীর খারাপ ? ন', তাও তো নয়। তিনি তো দিব্যি সুস্থ শরীরে ঘুরে ফিরে বেড়ান। তবে ? মনের কাছ থেকে কোন সদুত্তর সে পায় না। কাল রাতের কথাগুলো হঠাৎ মনে পড়ে বিশুর। কিন্তু সব কথা সে বুঝতে পারে নি। গণ্ডগোল যে একটা হয়েছে সংসারটার মধ্যে, এটা সে ঠিক বুঝতে পেরেছে। কিন্তু বাবার চাকরি না থাকাতেই যে সব গণ্ডগোলের সৃষ্টি হয়েছে, এতখানি বোঝবার মত বয়স হয়নি বিশুর।

স্কুল থেকে ফিরে বিশু শুনলো, বাবা সারাদিন বাড়ী আসেননি। এমন তো কত দিন হয়। বাবার জন্যে আজ কিন্তু মন কেমন করছে বিশুর। সারাদিন বাড়ী আসেননি—তা'হলে তো খানওনি। সারাদিন লোকে না খেয়ে থাকে কেমন করে ? বাবার খাওয়া হয়নি বলে মাও সারাদিন খাননি। বাবার খাওয়া হয়নি বলে মাও খাবেন না ? মানুষ রাগ করলে খায় না—যেমন বিশু কখনো কখনো রাগ করলে খায় না। মা কি তা'হলে রাগ করেছেন ? কিন্তু তা' তো মনে হচ্ছে না। মাকে এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করবে, এমন সাহসও আজ নেই বিশুর। মার মুখখানা বড় কালো। মার কালো মুখ দেখলে বড় ভয় করে বিশুর।

বাবা এলেন যখন তখন রাত নটা। পড়াশুনা খাওয়া দাওয়া সেরে বিশু তখন শুয়েছে। বাবা এসেই কাকাকে ডেকে পাঠালেন। কাকা এলেন, বসলেন, একটা সিগারেট ধরালেন। আশ্চর্য লাগলো বিশুর। কই আগে তো কাকা কখনো বাবার সামনে সিগারেট খেতেন না। আজকাল খান কেন ? শিশুমনের এ প্রশ্ন নিরুত্তরই রয়ে গেলো।

বাবা বললেন, বিশুর মাইনেটা বুঝি দেয়া হয়নি এ মাসের ?

কেমন যেন অভদ্রভাবে কাকা উত্তর দিলেন, আমি আর কত চালাবো বলুন। আর দু'দিন পরে সংসারই তো অচল হয়ে পড়বে। অনেক টাকা ধার হয়ে গেছে চারদিকে।

বাবা কোন কথা বললেন না। পকেট থেকে কতগুলো টাকা বের করে কাকাকে দিয়ে বললেন, এই নও পঞ্চাশ টাকা। আংটিটা বাঁধা দিয়ে এলাম। বিশুর মাইনেটা কাল দিয়ে দিও।

কাকা টাকাগুলো হাতে নিয়ে উঠে চলে গেলেন।

... ...

ক্লাসে পড়া না পারায় কাশী সেদিন শাস্তি পেলো বাংলা শিক্ষকের কাছে। কিন্তু তার রাগ পড়লো দাদার ওপর। সে তো পাশেই বসেছিলো। ইঙ্গিত করা সত্ত্বেও বলে দিলো না কেন ? তা'হলে তো গাট্টা খেতে হতো না মাথায়।

এই নিয়ে স্কুল থেকে বেরিয়ে রাস্তায় একবার ঝগড়া করেও শান্তি হয়নি কাশীর। বাড়ীতে এসে নালিশ করলো কাকীমার কাছে। কাকীমাও যাচ্ছেতাই করে গালিগালাজ করলেন তাকে। কিন্তু বিশু আশ্চর্য হলো কাকীমা তার কথাটা একবার শোনবার চেষ্টাও করলেন না বলে। আরো আশ্চর্য হলো, তার মা দাঁড়িয়ে সব দেখলেন আর শুনলেন, কিন্তু কিছুই বললেন না।

রাত্রে মাকে একা পেয়ে বিশু জিজ্ঞেস করলো, মা, বাবা নাকি টাকা আয় করেন না?

চমকে উঠলেন তিনি। কে—কে—কে বললো ওকে এ কথা? বিশুর শিশুমনে যাতে এই সব সাংসারিক নোংরামির কোন রকম রেখাপাত না হয়, তার জন্যে তিনি ও তাঁর স্বামী সবিশেষ চেষ্টিত। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, কে বললে তোমাকে একথা?

কেন, বিকেলে কাশী বলেছে। আমার সঙ্গে ঝগড়া করে স্কুল সুদ্ধ ছেলের সামনে আমাকে বলেছে। আমরা সবাই নাকি ওর বাবারটা খাই।

খানিকক্ষণ স্তম্ভিত হয়ে রইলেন তিনি। তারপর বললেন, তুমি ছেলেমানুষ, এসব বিষয় নিয়ে মাথা ঘামিও না।

মার কাছ থেকে কোন সোজাসুজি উত্তর না পেয়ে বিশু কিন্তু মাথা আরো বেশি করে ঘামায়। তা'হলে কাশীর কথাই ঠিক। মা ও বাবার সেদিন রাতের কথাগুলো এখন যেন সে বুঝতে পারছে। মা কেন ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদেছিলেন, তাও যেন স্পষ্ট হলো আজ। বাবাকে অবজ্ঞা করে কাকা তাঁর সামনে আজকাল সিগারেট খান এই কারণেই নয় কি? আর কিছু চিন্তা করতে পারে না সে। তার শিশু-মস্তিষ্কে সব কিছু যেন এলোমেলো হয়ে যায়। বাবার অক্ষমতার জন্যে নিজেকেও বিশুর আজ যেন কেমন সংকুচিত লাগে—ছোট লাগে।

... ...

ফাইনাল পরীক্ষার আর বেশি দেরী নেই। মার কাছে বসে বসে অংক করছিলো বিশু। প্রাইভেট মাস্টারমশাই একদিন মাত্র দেখিয়ে দিয়েছিলেন, আর দেন নি। হয়তো বা কাকীমার কোন ইঙ্গিত ছিলো।

মা বললেন, বিশু, এবার কিন্তু অংকতে মোট নম্বর রাখা চাই।

নিশ্চয়ই রাখবো।

বিশু একমনে অংক কষে যেতে লাগলো। ... ...

ফাইনাল পরীক্ষার ফল বেরিয়েছে।

হেডমাস্টারমশাই নিজেই ক্লাসটিচারকে নিয়ে প্রতি ক্লাসে যাচ্ছেন, আর নাম ডাকছেন ছেলেদের। চতুর্থ শ্রেণীতে এসে তিনি সর্বাগ্রে নাম ডাকলেন বিশুর—শ্রীমান বিশ্বনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রথম।

বিশু এগিয়ে গেলো। হেডমাস্টারমশাই সস্নেহে তাকে কাছে টেনে নিলেন—তার হাতে দিলেন বাৎসরিক পরীক্ষার রিপোর্টখানা।

তারপর তিনি অন্যান্যদের নাম ডাকতে শুরু করলেন। কাশীর নাম ডাকলেন শেষের দিকে। এবারও সে পাশ করতে পারেনি প্রাইভেট টিউটর রাখা সত্ত্বেও। ... ...

বাড়ী ফিরেই সিঁড়িতে দেখা হলো কাকীমার সঙ্গে। বিশুকে দেখেই কাকীমা যেন আঁতকে উঠলেন। কেন? সে ফার্স্ট হয়েছে বলে? কাশী ফেল করেছে বলে? কিন্তু কাশী তো এখনো বাড়ী আসেনি—আর সেও তো এলো এই মাত্র। কাকীমা জানলেন কী করে পরীক্ষার ফলাফল? বিশু যেন কী বলতে যাচ্ছিলো তাঁকে। তিনি এক দৌড়ে ওপরে চলে গেলেন। নীচে আর নামলেন না। কেমন যেন বিশ্রী লাগলো বিশুর।

ঘরে ঢুকে মাকে প্রণাম করে দাঁড়াতেই মা তাকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। মার বুকের স্পন্দন বিশু তার নিজের বুকের স্পন্দন দিয়ে অনুভব করতে লাগলো। মার মুখে ভাষা নেই। অত্যন্ত আনন্দে ভাষা যেন মূক হয়ে গেছে। শুধু জলভরা দুটি চোখের মধ্যে ফুটে উঠেছে বিশুকে কেন্দ্র করে একটি উজ্জ্বল ভবিষ্যতের আশা।

বিশু মার চোখের দিকে খানিকক্ষণ তাকিয়ে থেকে বুকের মধ্যে মুখ লুকালো

স্মরণ-শক্তি

দুর্দ্দম যাত্রী

কী করে মনে রাখা যায়—এই ভাবনাটা সকলকেই বিব্রত করে ছেলেবেলা থেকে। পরীক্ষা মানেই কার স্মরণ-শক্তি কত তীক্ষ্ণ তারই বিচার।

আগে কিছু অদ্ভুত স্মরণশক্তির কথা বলি। আমাদের 'বেদ' চারিটি লিপিবদ্ধ থাকেনি প্রথমে। তা কয়েক পুরুষ ধরে মুখে মুখেই ছিলো। ভাবো কী সাংঘাতিক ব্যাপার!

আরো কাছাকাছি যুগে এলে আমরা দেখি যে, রঘুনাথ শিরোমণি সমগ্র ন্যায়শাস্ত্র মিথিলা থেকে কণ্ঠস্থ করে নিয়ে বাংলায় চলে এলেন। কারণ ন্যায়শাস্ত্রের স্বত্বাধিকারী পক্ষধর মিশ্র তা কাউকে লিখে আনতে দিতেন না।

কিছুদিন আগে স্বামী বিবেকানন্দ অবাক করেছিলেন এক বিখ্যাত ইউরোপীয় পণ্ডিতকে। কোন বই তিনি একবার মাত্র চোখ বুলিয়ে তার কত পাতায় কি আছে তা হুবহু বলতে পারতেন।

লর্ড মেকলে বাজী রেখে একরাত্রে গোটা 'প্যারাডাইস লষ্ট' মুখস্থ করেছিলেন। তিনি যে-কোন বই একবার পড়ে কমা, ফুলষ্টপ অবধি ঠিক বলতেন।

এঁরা সব শ্রুতিধর পর্য্যায়ের লোক। একবার কোন কথা শুনেই যাঁর মনে থাকে তাঁকে বলা হয় শ্রুতিধর। পৃথিবীতে যে কয়টি আশ্চর্য্য বস্তু আছে এঁরাও সেই শ্রেণীভুক্ত।

তবে দেখা গেছে, প্রথমের দিকে অনেক বড় বড় লোকেরই স্মৃতিশক্তি অত্যন্ত কম ছিলো। নিউটন সাহেব এতো স্মৃতিশক্তি-হীন ছিলেন যে জ্যামিতির স্বতঃসিদ্ধগুলোও তাঁর মনে থাকতো না। শুনলে অবাক হবে যে, তাঁকে নীরেট বোকা বলে স্কুল থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছিলো। পরে সেই নিউটন হয়েছিলেন গণিতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পণ্ডিত।

ঠিক এমনি ভাগ্য ছিলো আমাদের দেশের ছেলে বোপদেবের। স্কুল থেকে বহিষ্কৃত হয়ে তিনি এক পুকুরের ঘাটে বসে নিরাশ মনে ভাবছিলেন নিজের দুর্ভাগ্যের কথা। এমন সময় স্নান সেরে একটি মহিলা জলপূর্ণ কলসী নিয়ে চলে গেলেন। বোপদেব আশ্চর্য্য হয়ে দেখলেন, পাথরের যে অংশে কলসী নামানো হয়, সেটি দিব্যি গোল হয়ে ক্ষয়ে গেছে। কলসীর ধার ঘর্ষণে পাথরের ক্ষয় এই দৃষ্টান্ত তাঁর জীবনে আনল নূতন পথ-নির্দ্দেশ। আর সেই বোপদেব পরে লিখে গেলেন 'মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ'।

পৃথিবীর সেরা বৈজ্ঞানিক আলভা এডিসনের কিছুই মনে থাকতো না ছেলেবেলায়। মাত্র তিন মাস স্কুলে পড়ার পরে বেতন না দেওয়ার জন্যে তাঁর নাম কেটে দেওয়া হলো। ভালো ছাত্র হলে গরীব বলে না হয় ফ্রি পড়তে পেত। কিন্তু এতো বোকা যে তার আর কোন কথাই নেই। তাঁর মাথাটি ছিলো দেহের তুলনায় অস্বাভাবিক বড়ো। একবার স্কুলের ডাক্তার তাঁর শরীর পরীক্ষা করে

বলেছিলেন যে, মাথাটা যখন এতো বড়, তখন এ ভবিষ্যতে পাগল হয়ে যেতে পারে। ... ... এডিসনের ভাগ্যে স্কুল-কলেজে পড়া আর জোটেনি। কিন্তু বিজ্ঞান-জগতে তাঁর দানই আজ স্কুল-কলেজের পাঠ্য।

যাক ওসব কথা। এখন দেখা যাক কেন এমন হয়। একথা অনেকটা ঠিক যে, আমাদের সাধ্যের বাইরে অনেক জিনিস আছে। কিন্তু চেষ্টা আর পরিশ্রম—অবিরত—অক্লান্ত, আমাদের সে লক্ষ্যে নিয়ে যায়, এমন কি অনেককে অনেক সময় সেখানে পৌঁছেও দেয়।

মস্তিষ্ক ইন্দ্রিয়ের আধার। সেখানে কতকগুলো cell বা জীবকোষ আছে স্মরণশক্তির জন্য। তাদের বৃদ্ধির (development) উপর স্মরণশক্তি নির্ভরশীল। আমাদের মধ্যে অনেকেরই এই জীবকোষগুলো বৃদ্ধিতে এবং পুষ্টিতে সম্পূর্ণ, কিন্তু আমরা এদের যথাযথ ব্যবহার করি না। কাজেই ঘষামাজার অভাবে এগুলো দিন দিন মলিন হয়ে পড়ে, আর স্মরণশক্তি হ্রাস হয় দেখতে দেখতে। আলস্য পৃথিবীর সমস্ত প্রতিভার প্রায় ৯০ ভাগ নষ্ট করেছে।

এই জীবকোষগুলোর সম্পূর্ণ বৃদ্ধি আবার বিভিন্ন লোকের হয় বিভিন্ন সময়ে। এর কারণ যে কি তা আজও ঠিক হয়নি ভালো করে। তবে দেখা গেছে যে, পারিপার্শ্বিক অবস্থা এতে বিশেষ সাহায্য করে। যাদের ঘরে পড়াশুনার আবহাওয়া খুব বেশী, তাদের ঘরের ছোট ছেলেমেয়েরা অনেক প্রেরণা পায় প্রথম থেকেই। এতে বংশানুক্রমের (heridity) প্রভাব যে কার্য্যকরী তা বলা চলে না। পারিপার্শ্বিক অবস্থাই এতে সব-কিছু।

এখন প্রশ্ন এই যে, স্মরণশক্তি বাড়ানো যায় কিনা? নিশ্চয় যায়। মস্তিষ্কের ঐ জীবকোষ-গুলোর জন্যে দরকার পুষ্টিকর খাদ্য। শুধু খাদ্য দিলেই আবার চলবে না—তাদের রীতিমত ব্যায়ামের দরকার। খাদ্য হিসাবে চাই—চিনি, মাছ, দুধ, ঘি ও ছানা। আর ওদের ব্যায়ামের জন্যে চাই—চিন্তা। ইংরেজীতে বলে—"Little reading, much thinking."

একাগ্রতা, ধৈর্য্য ও উৎসাহ চাই সর্ব্বপ্রথম। নিজের মনকে সম্পূর্ণভাবে নিজের আয়ত্ত করা চাই—তা'হলে আপনা থেকে আসবে মনোযোগ। বাইরে, এমন কি পাশে হাজার গল্পগুজব হোক না কেন, তাতে কান থাকবে না।

মন একেবারে এককেন্দ্রিক হবে। এ কেমন করে হয়?—শুধু অভ্যাসে এবং অধ্যবসায়ে। একটা কথা বার বার মনে করো যে—মা'র পেট থেকে কেউ কিছু শিখে আসেনি, সকলকে শিখতে হয়েছে এই পৃথিবীতে আসার পর। সবাই তোমার মত কাঁপা হাতে অ-আ লিখতে সুরু করেছিলেন। তাঁদের বাকী জীবন কেবল পরিশ্রমের আর স্বেদবিন্দুর ইতিহাস।

জানো, ঘুম আসবে বলে বিদ্যাসাগর মশাই চোখে সরষের তেল দিতেন, জ্বালা করলে আর ঘুম আসতো না। তিনি মাঝে মাঝে মাথার টিকি বেঁধে রাখতেন ছাদের সিলিঙে দড়ি দিয়ে। ঘুমে ঢুললে টিকিতে টান পড়ে ঘুম ছুটে যেতো। বিদ্যাসাগরের পিছনে আছে অভ্যাস, অধ্যবসায় আর পরিশ্রম—বিদ্যাসাগরের পিছনে আছে বহু বিনিদ্র রজনীর ইতিহাস।

এমনি ছিলেন আর একজন গ্রীস দেশে। যদি ঘুমের বশে ঢুলেন তাই চারপাশে তীক্ষ্ণ তীক্ষ্ণ অস্ত্র ঝুলিয়ে রাখতেন মনীষী ডিমস্থিনিস। আমি তোমাদের এসব করতে বলি না—শুধু বলি, এঁদের মত অভ্যাস করায়ত্ত করতে। কেমন করে? চেষ্টায়—বার বার চেষ্টায়।

আমি জয় করবো—আমার নাম থাকবে প্রথম পাতায়, এই পণ করে বসো, দেখবে পৃথিবী তোমার পায়ের তলায়।

এমন অনেক ছেলে আছে যারা সারাক্ষণ পড়ে, কিন্তু কই তারা তো পরিশ্রমের ফল পায় না। এটা কেমন জানো—হাতীতে লাঙ্গল যুতে চাষ করার মত। হাতী লাঙ্গল টেনে অনেক বেশী গর্ত্ত করবে ঠিকই, কিন্তু পায়ের চাপে তা সঙ্গে সঙ্গেই বসে গিয়ে যে কে সেই। ঐ ছেলেটি ঘ্যান্ ঘ্যান্ করে পড়ে ঠিকই, কিন্তু তবু তার বিফলতার কারণ তার নিজের মধ্যেই। সে যা পড়ে তা পড়ার পর ভাবে না—এই প্রথম কারণ। দ্বিতীয় কারণ—সে ভাবতে পারে না। কারণ সে বুঝতে পারেনি। আবার না বুঝার কারণ এই যে, ঐ পাঠ্য বুঝবার মত তার জীবকোষের বৃদ্ধি হয়নি, অর্থাৎ তার জীবকোষ প্রথম পাঠ ভালো করে পায়নি, তাই দ্বিতীয় পাঠের বোঝা বইতে চাইছে না। কাজেই জিনিসটা তার মাথায় ঢুকছে না। সে হয়ত ক্রমাগত পড়ে পড়ে ঐ পাতাটি দিন দুই ঠিক মুখস্থ বলতে পারবে। ঐ মুখস্থ বলা কেমন করে হয় জানো—হাঁটবার সময় ডান পা ফেললেই যেমন বাঁ পা আপনা আপনি পড়ে যায়, ঠিক তেমনি।

জীবকোষের খাদ্য আর ব্যায়ামের পর চাই বিশ্রাম। পরীক্ষার সময় অনেকক্ষণ একযোগে পড়ার পর এটা চাই-ই। কেউ এই সময় গান শুনে, কেউ বা কবিতা কি গল্প পড়ে, কেউ বা গল্প-সল্প করে। এতে উপকার কতখানি হয় জানি না। তবে পাঠ্য পুস্তকের একঘেয়েমি থেকে অনেকটা আরাম পাওয়া যায়। কিন্তু আসল বিশ্রাম হলো ঘুম। ঘুমে ঐ জীবকোষগুলোর শক্তি অত্যন্ত বৃদ্ধি পায় এবং তাতে ধারণশক্তি যে কত তীব্র হয় কি বলব। এই যে ঘুম, এ ঘুম প্রয়োজনের। প্রতি ২৪ ঘণ্টায় অন্ততঃ ছয় ঘণ্টা ঘুম চাই-ই। বিদ্যাসাগর, ডিমস্থিনিস যে ঘুম দূর করতেন, তা অতিরিক্ত ঘুম।

তোমার স্মরণ-শক্তি বস্তুতঃ তোমারই হাতে প্রধানতঃ। তাতে পারিপার্শ্বিক অবস্থা গ্রাহ্য, তবে গৌণ নিঃসন্দেহ। আগ্নেয়গিরির মত যার পণ—তার অটল মনঃসংযোগ সব-কিছু উড়িয়ে দিয়ে নিয়ে যাবেই সার্থকতার পথে।

মনঃসংযোগের একটি গল্প বলে শেষ করবো। পারস্য সম্রাট্ জারাক্সিসের সৈন্যদল যখন থার্মোপলির যুদ্ধের পরে এথেন্স শহর দখল করে চারদিকে লুটতরাজ করে বেড়াচ্ছে, তখনও গণিতজ্ঞ আর্কিমিডিস সমুদ্রের বালিতে বসে আঙ্গুল দিয়ে জ্যামিতির সূত্র সমাধানে ব্যস্ত। গরীব, অর্থ নেই, কাগজ জুটবে কোথায়? তার বদলে সমুদ্রের বালুতীর, আর দোয়াত-কলমের বদলে আঙ্গুল।

পারস্যের সেনারা এসে তাঁকে ঘিরে দাঁড়ালো—তবুও তাঁর খেয়াল হলো না, শেষে তাঁকে কাটবার জন্তে একজন তরবারি তুলতেই তার ছায়া পড়লো জ্যামিতির ছবির উপরে। তখন অবাক

হয়ে আর্কিমিডিস চোখ তুলতেই দেখলেন, কে একজন তার উদ্যত তরবারি সজোরে নামাচ্ছে তাঁকে কাটতে। তিনি চীৎকার করে উঠলেন, "সাবধান—চিত্রটি যেন না মুছে যায়···" এই তাঁর শেষ কথা।

আশ্চর্য্য! মৃত্যুর সামনেও তিনি একবারটি ভাবলেন না নিজের কথা—ভাবলেন শুধু জ্যামিতির ছবির কথা—ভয় পাছে ওটি মুছে যায়! এতে প্রমাণ হলো—যে কাজ তিনি করতেন তাকে ভালবাসতেন প্রাণের চেয়েও।

আজ কোথায় সে আর্কিমিডিস—এগিয়ে এসেছে শুধু আমাদের সামনে কালজয়ী আর্কিমিডিস। তাঁর সেই মনঃসংযোগ ও কর্ম্মের প্রতি অনুরক্তি এখনও অম্লান সন্ধ্যাতারার মত জ্বল-জ্বল করছে—ইঙ্গিত করছে পথের—যে পথে হাঁটে মানুষের মত মানুষ।

অগ্নিদেবের অগ্নিমান্দ্য

শ্রীহরিপদ চক্রবর্ত্তী

অগ্নি যে সর্ব্বভুক্—সব খেয়ে হজম করে দেয়, কোন-কিছুতেই অরুচি নেই, সেই আগুনেরও এক সময় কেমন করে অগ্নিমান্দ্য হয়ে আহারে অরুচি হয়েছিল, আবার কি করে তিনি সুস্থ হয়ে আহারে রুচি ফিরে পেয়েছিলেন, সেই গল্পটা আজ তোমাদের বলব।

আমাদেরই এই দেশে—যেখানে আজ আমরা এক ফোঁটা খাঁটি ঘি চক্ষে দেখতে পাচ্ছি না, সেই দেশে একসময় মণে মণে খাঁটি গাওয়া ঘি আগুনে আহুতি দিয়ে যজ্ঞ করা হোত। আর সে রকম যজ্ঞ যে শুধু রাজরাজড়া বা দেশের বড়লোকেরাই করতেন তা নয়, প্রত্যেক গৃহস্থকে প্রত্যহ কিছু পরিমাণ ঘি অগ্নিতে আহুতি দিতেই হোত। এর নাম ছিল নিত্য যজ্ঞ এবং এই সব যজ্ঞাদির জন্য যথেষ্ট দুধ-ঘির দরকার হওয়ায় গোপালন এবং গোরক্ষা আমাদের দেশের লোকেরা একটা ধর্ম্মকর্ম্ম বলে মনে করতেন। এর জন্য প্রত্যেক গৃহস্থের অনেকগুলি করে গরু থাকত—আর সেই সব গরুর যত্ন করে খেতে দেওয়া, তাদের দুধ মন্থন করে ঘি তৈরি করা, সে কালের গৃহস্থ মেয়েদের নিত্যকার কাজ ছিল। গৃহস্থের অবিবাহিতা মেয়েরা গরুর দুধ দোহন করত বলে মেয়েদের একটা নাম হয়েছে 'দুহিতা'।

যাক, তোমাদের যে গল্প বলছিলাম—অগ্নির কেমন করে অগ্নিমান্দ্য হয়েছিল। শুনা যায়, এক সময় আমাদের দেশে শ্বেতকী নামে এক রাজা এক যজ্ঞ করেছিলেন—মহামুনি দুর্ব্বাসা হয়েছিলেন তাঁর পুরোহিত এবং সেই যজ্ঞে বার বৎসর ধরে ঘি বর্ষণ করে অগ্নিতে আহুতি দেওয়া হয়েছিল। বার বৎসর ধরে ক্রমাগত খাঁটি গাওয়া ঘি খেয়ে খেয়ে অগ্নির হয়ে গেল অগ্নিমান্দ্য অর্থাৎ অজীর্ণ রোগ।

শ্বেতকী রাজার যজ্ঞ অতুল সংসারে। দ্বাদশ বৎসর যজ্ঞ কৈল অবিরাম।
দুর্ব্বাসা আহুতি দেন মুষলের ধারে॥ তিন লোক চমৎকার শুনি যজ্ঞ নাম॥
সেই হবি খাইয়া হইল মন্দানল।
ব্যাধিযুক্ত অগ্নিদেব হইল দুর্ব্বল॥

অজীর্ণ রোগ হওয়ায় অগ্নিদেবের আহারে রুচি নষ্ট হয়ে গেল। তিনি খুব অস্বস্তি বোধ করতে লাগলেন। তা তো হবেই, ক্রমাগত অত ঘি খেলে আর পেট খারাপ হবে না! ঘি-দুধ ভাল জিনিস, খাওয়াও ভাল, কিন্তু ক্রমাগত অধিক পরিমাণে ঘি-দুধের জিনিস খেলে কি সহ্য হয়, না আহারে রুচি থাকে? ঘি-দুধের জিনিসের সঙ্গে অন্যান্য শাকসব্জী জাতীয় জিনিসও খাওয়া দরকার।

অগ্নিমান্দ্য হওয়ায় অসুস্থ অগ্নিদেব তার প্রতিকারের কথা জিজ্ঞাসা করতে গেলেন ব্রহ্মার কাছে। ব্রহ্মা তখন তাঁকে কিছু কাঁচা গাছগাছড়া খাওয়ার উপদেশ দিলেন, কিন্তু হুতাশনের আহারের জন্য অত কাঁচা গাছ কোথায়? কার বাগানে গাছ খেতে যাবেন, কে তাড়া করবে? কোথাও সুবিধা করতে না পেরে শেষে অগ্নিদেব এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের বেশ ধরে হস্তিনাপুরে শ্রীকৃষ্ণ আর অর্জ্জুনের কাছে গিয়ে বললেন, "বাবা, আমি অগ্নিদেব—বার বৎসর ধরে যজ্ঞে ঘি খেয়ে আমার অজীর্ণ হয়েছে। ব্রহ্মা বললেন, কিছু কাঁচা গাছগাছড়া খেলে সেরে যাবে। তা তোমরা আমায় কিছু কাঁচা গাছগাছড়া খাওয়াও, আমি সুস্থ হয়ে উঠি।"

সে সময় উত্তর ভারতের রাজধানী ছিল হস্তিনাপুর, আর সেই হস্তিনাপুরের কাছেই ছিল

এক প্রকাণ্ড জঙ্গল যার নাম ছিল 'খাণ্ডব বন'। অগ্নিদেবের প্রার্থনায় শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জ্জুন তাঁকে সেই খাণ্ডব বনটা খেতে হুকুম দিলেন এবং পাছে কেউ আগুন নিবিয়ে দিয়ে অগ্নিদেবের ঔষধ আহারে বাধা দেয়, সেই জন্য নিজেরা অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে সেই জঙ্গলের চারদিকে পাহারা দিতে লাগলেন। কৃষ্ণার্জ্জুনের হুকুম পাওয়া মাত্রই অগ্নিদেব খাণ্ডব বনে প্রবেশ করলেন। দেখতে দেখতে চারদিকে দাউ-দাউ করে আগুন জ্বলে উঠল। কৃষ্ণার্জ্জুনের কড়া পাহারায় দেবরাজ ইন্দ্র পর্য্যন্ত সে আগুন নেবাতে পারলেন না। পনের দিন—পনের রাত ধরে সেই অগ্নিকাণ্ড চলল। বনে যত গাছপালা ছিল সব পুড়ে ছাই হয়ে ত গেলই, সেখানে যত হিংস্র জন্তু-জানোয়ার ছিল তারাও কেউ পালাতে পারল না—সবাই যে যার বাসায় থেকে পুড়ে মরল। পনের দিনের সেই অগ্নিকাণ্ডে সমস্ত বনটি পুড়ে বৃক্ষশূন্য সমতল ক্ষেত্রে পরিণত হোল। অগ্নিদেব মনের আনন্দে অসংখ্য কাঁচা গাছ এবং জন্তু-জানোয়ারের কাঁচা চর্ব্বি ভক্ষণ করে পরিতৃপ্ত হলেন। তাঁর অরুচি দূর হোলে, অগ্নিমান্দ্যও সেরে গেল। তিনি সুস্থ হয়ে কৃষ্ণার্জ্জুনের এই মহৎ কার্য্যের জন্য শ্রীকৃষ্ণকে চক্র এবং অর্জ্জুনকে কপিধ্বজ রথ ও প্রসিদ্ধ গাণ্ডীব ধনু উপহার দিলেন।

গল্পটায় দেখা গেল, কৃষ্ণার্জ্জুনের এই মহৎ কার্য্যের জন্য অগ্নিদেব তাঁদের প্রতি খুব সন্তুষ্ট হয়েছিলেন। তা তো হবারই কথা—মনের মত কাজ করলে কে না সন্তুষ্ট হয়! কিন্তু এক জনের তৃপ্তির জন্য এই যে এত বড় বনটা পুড়িয়ে ছাই করে ফেলা হোল, আর তার ভিতর শত শত জীবজন্তুকে পুড়িয়ে মারা হোল—এটা কি করে মহৎ কাজ হতে পারে? কিন্তু সত্যই এটা তাঁদের সময় উপযোগী মহৎ কাজ বলেই গণ্য হয়েছিল। কেন তাই বলছি।

আজকাল তোমরা যে ধরনের ইতিহাস পড় এবং ইতিহাসের সে সব প্রশ্নের উত্তর জেনেই ইতিহাস পড়া শেষ কর, সেটা কতকটা এইরূপ—

"গজনী মামুদ কোন্ সালেতে
ঢুকলো এসে এই দেশেতে?
কাহার পরে মোগল বাবর
করলো জয় সে দিল্লী সহর?

কোন্ বীর সে কোন্ সালেতে
পানিপথের ময়দানেতে
লড়াই করে হিমুর সাথে
বসলো দিল্লী মসনদেতে?"

কিন্তু আমাদের দেশের প্রাচীন কালের এ ধরনের ইতিহাস নাই। রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি মহাকাব্যের নানা গল্প-উপাখ্যানের মধ্যেই আমাদের দেশের প্রাচীন ইতিহাস লুকান আছে। এই সব মহাকাব্যের মধ্যে এমন এক একটা গল্প আছে, যা পড়ে শুধু আষাঢ়ে গল্প বলে উড়িয়ে দেওয়া ছাড়া তার মধ্যে কোন সত্য আছে বলে বিশ্বাস করা যায় না। অথচ সেই সবের মধ্যেই আমাদের দেশের গৌরবময় প্রাচীন ইতিহাসের পরিচয় পাওয়া যায়। এখন দেখা যাউক এই গল্পটার মধ্যে কি ইতিহাস আছে।

দেশের লোকসংখ্যা বাড়তে থাকলে লোকের বাস এবং চাষ আবাদ ইত্যাদির জন্য দেশের

মধ্যে পতিত বন জঙ্গল পরিষ্কার করে কাজের উপযোগী জায়গা বার করে নিতেই হবে, নয় ত অল্প জায়গায় বেশী লোকের সঙ্কুলান হয় না। প্রাচীন কালের এই চেষ্টারই একটা ইতিহাস পাওয়া যায় এই খাণ্ডব দহনের গল্পের মধ্যে।

কেটে বন পরিষ্কার করার চেয়ে আগুন দিয়ে বন পরিষ্কার করা সহজ হয়, তাই সেই সময় উত্তর ভারতের রাজধানী হস্তিনাপুরের আশে পাশে জায়গা বাড়াবার জন্য শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জ্জুন পরামর্শ করে তার নিকটবর্ত্তী বনটায় আগুন লাগিয়ে দেন। কিন্তু এই সব প্রয়োজনের কথা সকলে হয়ত বুঝতে পারবে না। অত বড় বনটায় আগুন দিলে কত বনবাসী মুনি-ঋষির আশ্রম নষ্ট হতে পারে, কত শত জীবজন্তু পুড়ে মারা যাবে, ইত্যাদি সব কারণ দেখিয়ে অনেক আপত্তি তুলে হয়ত এই দরকারী কাজটায় বাধা দিতে পারত। তখন জোর করে কাজটা করতে গেলে জনমতের বিরুদ্ধে কাজ করতে হয়। সেই জন্য জনমতের কোন রকম বিক্ষোভ সৃষ্টি না করে অগ্নিদেবের প্রার্থনা রূপ দেবকার্য্য বলে নির্ব্বিবাদে কাজটা সমাধা করা হয়েছিল। অযথা জনমতের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ সৃষ্টি না করে ঐরূপ কোন কৌশল পূর্ব্বক কার্য্য সমাধা করাই বিশেষ বুদ্ধির পরিচয়। শ্রীকৃষ্ণের এই কার্য্যের উল্লেখ করে মহাভারতকার আমাদিগকে এই শিক্ষাই প্রদান করেছেন। ইহা একটি উচ্চাঙ্গের রাজনীতির কথা। তা'হলে শ্রীকৃষ্ণ শুধু ভক্তের ভগবান নন, তিনি রাজনীতিকদেরও গুরুস্থানীয়।

আবাহন

শ্রীশিবানী দত্ত

একটি কোরক কচি লতাপাতা-ঘেরা,
একটি কোমল প্রাণ শত-আশা-ভরা
ধরার প্রাঙ্গণে ;
পেলব তনুর 'পরে রাঙ্গা রঙ ঢালা
দখিন হাওয়ায় তারে দিয়ে যায় দোলা
কহি কানে কানে—
ওরে তুই ওঠ জাগি,
ধরাতলে তোর লাগি,
চাহি কত জনা!

চাঁদ কহে আমি আছি,
গান গাহে মৌমাছি,
কবি আনমনা।
ওরে তুই গৌরবে
ফুটি উঠি সৌরভে
আয়, আয় বাহিরে,
ধরায় আলোর হাট
পুলকিত মাঠ ঘাট
তোর পথ চাহিরে।

কেষ্টর কাণ্ড

শ্রীলীনা দত্তগুপ্তা

কেষ্টকে তো চেন ? চেন না ? আরে ঐ যে পাকড়াশীদের ভোম্বলের সঙ্গে দিনরাত খেলে বেড়ায়,—ঐ সীতাবলদীর মোড়ে গো—

হ্যাঁ—সেদিন কেষ্ট কি করেছে জান ? ওর মা বিষ্টুকে (কেষ্টর দাদা) ডেকে বললেন,—"ওরে বিষ্টু, যা তো বাবা একপো দই কিনে নিয়ে আয়।" বিষ্টু এখন কলেজের ফার্ষ্ট ইয়ারের ছাত্র, মেজাজটা একটু উঁচু সুরে বাঁধা। কথায় কথায় দোকান বাজার যেতে তার মহা আপত্তি। নাক সিটকে বললে,—"আঃ—একটু দইএর জন্য আবার আমাকে দোকানে যেতে হবে ? সকালে গেলাম, তখন কেন বলনি ?—কেষ্টকে পাঠাও।"

মা বললেন,—"ও ছেলে মানুষ, পারবে ?"

"ঐ তো রাস্তার মোড়ে দোকান।" বলে বিষ্টু—তার বন্ধুর বাড়ী চলে গেল।

কেষ্টর মা আর কি করেন—কেষ্টকেই বলে কয়ে হাতে পয়সা দিয়ে দই কিনতে পাঠালেন। বললেন,—"দেখিস রে কেষ্ট, দোকানদারকে টাট্‌কা ভাল দই দিতে বলিস।"

কেষ্ট দই কিনে ফেরবার পথে ভোম্বলের সঙ্গে দেখা। আগের দিনের অসমাপ্ত খেলা শেষ করবার জন্য ভোম্বল ওকে ধরে পড়ল।

কেষ্টর কি ? সে তো এ-ই চায়। কাগজ-কলমের সঙ্গে সম্পর্ক তার খুবই কম। পড়াশোনার কথা উঠলেই মুখ শুকিয়ে আমসি। কিন্তু খেলার কথা বলে দেখ—মুখে তখন কথার যেন খই ফোটে। সারাদিন টই টই করে ঝোপে ঝাড়ে ঘুরে বেড়াবে। কোথায় কার বাগানে জামরুল আর জলপাই, আমড়া আর আম পাকল, সব কেষ্টর নখদর্পণে। সে সব ফলের অধিকাংশই কেষ্ট আর ভোম্বলের হাত এড়াতে পারে না। যথাসময় ঠিক সেগুলো তাদের হস্তগত হয়ে পকেটস্থ হয়, পরে উদরস্থ।

যা হউক ভোম্বল হ'ল নেহাৎ অন্তরঙ্গ বন্ধু, তার কথা কি কেষ্ট ফেলতে পারে ? সে দইএর ভাঁড়টা ভোম্বলদের রোয়াকে রেখে দিব্যি খেলায় মেতে গেল।

ঘণ্টা দুই পরে কেষ্টর খেয়াল হ'ল—নজর গেল দইএর দিকে। তাও লাট্টু লেগে দইটা কাত হয়ে পড়ে গিয়েছিল বলে। তাড়াতাড়ি দইএর ভাঁড়টা তুলে—কেষ্টর তো চক্ষুস্থির। অর্দ্ধেক দই-ই পড়ে গেছে !—"কি হবে ভাই ? এখন মা যে বকবে !" বলে কেষ্ট দইএর ভাঁড়টা হাতে নিয়ে করুণচোখে তাকাল ভোম্বলের দিকে। যত দুষ্টুই হোক ভোম্বলও একটু হকচকিয়ে গেল,—কারণ সেই তো কেষ্টকে আটকে রেখেছিল খেলবার জন্য। ভোম্বল ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে ফ্যাল-ফ্যাল করে

চেয়ে রইল কেষ্টর মুখের দিকে। কিন্তু দুষ্টুমীতে দলের সেরা কেষ্টই। ভণ্টে, ভোম্বল, টুট্টা, ফুটা, ক্যাবলা—সবার আগে তার মাথায়ই যত দুষ্টুবুদ্ধি খেলে, বললে,—"ঠিক হয়েছে রে ভোম্বল,—যা

তো—তোদের বাড়ীর ভেতর থেকে যদি একটু গরম জল এনে দিতে পারিস।"

ভোম্বল বললে,—"গরম জল দিয়ে কি করবি?"

—"তুই আন তো।"

ভোম্বল ভেতরে গিয়ে দেখল, মা রান্নাঘরের উনুনে চাএর জল চাপিয়ে রেখে পাশের ঘরে ছোট বোনটিকে হরলিকস্ খাওয়াচ্ছেন। ভোম্বল চুপচাপ প্রায় ফুটন্ত গরম জল এক কাপ কেষ্টকে এনে দিল। কেষ্ট গরম জলটা দইএ ঢেলে বেশ করে মিশিয়ে নিয়ে চলল বাড়ীর দিকে। বাড়ী পৌঁছতেই কেষ্টর মা এগিয়ে এলেন। এত দেরী দেখে তিনি ব্যস্ত হয়ে ঘর বার করছিলেন; বললেন—"এত দেরী হ'ল যে?"

কেষ্ট মুখখানা শুকনো করে বললে—"কি করব? টাট্‌কা দই তৈরী ছিল না যে! দই রান্না করতেই তো এত দেরী হ'ল,—এই দেখনা হাতে নিয়ে, এখনও কেমন গরম গরম আছে।"

ছেলের কথা শুনে কেষ্টর মা হাসবেন না কাঁদবেন ভেবে পেলেন না। দইটা হাতে নিয়ে তিনি হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন কেষ্টর পিট্‌পিটে চোখ দুটোর দিকে চেয়ে।

আরো তাড়াতাড়ি

শ্রীদিলীপ ঘোষ

বেড়িয়ে ফিরছিলুম মিনতি আর বুবুকে নিয়ে। সন্ধ্যে হয়ে আসছিল। ফুটপাথের ধারে ধারে পোষ্টগুলো বৈদ্যুতিক আলোর বিদ্রূপ দিয়ে দিগন্তপ্রসারী দিনের ম্লান রশ্মিকে উপহাস জানাতে সুরু ক'রে দিয়েছে। পিছিয়ে পড়া মিনুর হাতে একটু টান দিয়ে বললুম, কি শামুকের মত চলেছিস, তাড়াতাড়ি আয়।

অভিমানে মিনু গলা ভারী ক'রে বললো, বড়দার যেন কি, খালি ধমক। সত্যিই যেন শামুকের মতো চলছি আমি। এই নাও, আরো তাড়াতাড়ি হাঁটতে হবে নাকি?

মনের অভিমান বেশী ক'রে ফুটিয়ে তুলে মিনতিরাণী ছোট ছোট পদক্ষেপ আরেকটু বাড়িয়ে দিলো। আর ওর ওই সামান্য কথার অভিমান আমার মনে একটা কেমন সন্দেহের ইসারা জাগিয়ে তুললো। তাই তো, সত্যিই কি মিনু শামুকের মত হাঁটছে? কিন্তু তা হয় কেমন ক'রে? মনের মধ্যেই যেন সেই সন্দেহের শামুক তার খোলস থেকে শুঁড়ওলা মুখ বাড়িয়ে চলা সুরু ক'রে দিলো। কিছুদিন আগে কতকগুলো শামুক ধ'রে পরীক্ষা ক'রে দেখছিলুম। শামুকের গতি পরীক্ষা। তিন-চারটে শামুককে সার বেঁধে একটা খড়ির লাইনের ধারে সাজিয়ে রেখে হিসেব করেছিলুম, কতটুকু যেতে শামুকের কতখানি সময় লাগে। তা নেহাৎ কম লাগে না, ঘড়ির ঘর গুণে দেখেছিলুম দু'ফুট যেতে শামুকের গড়পড়তা প্রায় কুড়ি মিনিটের মত সময় লাগে।

ব্যাপারটা বুঝিয়ে ব'লে অভিমানিনী মিনুকে শান্ত করবার চেষ্টা করলুম, ঠোঁট ফুলিয়ে সে বললো, ওসব শুনতে চাইনে, চকোলেট কিনে দাও।

দিতে হলো, বুবুও বাদ গেলো না অবশ্য। চকোলেটের কাগজটা ছিঁড়তে ছিঁড়তে মিনুর উদ্দেশ্যে সে তার একটু স্বভাব-সুলভ খুনসুড়ি নিক্ষেপ করলো, শামুক বলতেই তো নিজের স্বরূপ ধরা প'ড়ে গিয়ে মহারাণীর রাগ হয়ে গেলো, দেখি তো এখন কত জোরে চলতে পারিস?

কিন্তু মিনতি ওসব ঠুনকো কথায় কান দেয় না। পাকা পলিটিসিয়ানের মত চকোলেটের মুখক্রিয়ার ফাঁকে ফাঁকে বললো, দাঁড়া না, হাতের দুটো শেষ হোক। এক্ষুনি চোখের পলকে বাড়ী পৌঁছে যাবো।

চোখের পলকে? বুবুকে বললুম, মানে কী জানিস এই কথাটার?

একটা পুচ্‌কে মেয়ের মুখ থেকে যে কথা বেরিয়েছে, বুবু তার মানে জানবে না? চকোলেটটা জিভ দিয়ে গালের একপাশে ঠেলে দিয়ে বললো, এর মানে তো খুব তাড়াতাড়ি।

হেসে বললুম, তাই মনে হয়। কিন্তু আসলে ঠিক তার উল্টো। কারণ দেখ, চোখের ফাঁক কতখানি হয় সাধারণতঃ? সিকি ইঞ্চির মত, নয় কি? তা'হলে পলক ফেলবার সময় এইটুকুই যেতে হয় চোখের পাতাকে, কেমন? এখন হিসেব ক'রে দেখা গেছে, এটুকু যেতে চোখের পাতার প্রায় এক সেকেণ্ডের পাঁচশো ভাগের এক ভাগের মত সময় লাগে। তার মানে, এর গতিবেগ হলো, এই ধর ঘণ্টায় সাত মাইলের মত। এ আর কি এমন বেশী?

হিসেবটা শুনে মিনু বুঝলো না হয়তো কিছুই, কিন্তু বেশ ভাবিত হয়ে পড়লো, তার অমন তাড়াতাড়ি যাওয়ার তুলনাটা খোপে টিকলো না দেখে আর একটা কিছু হয়তো বলতো, কিন্তু তার চেয়ে মূল্যবান কাজে ব্যস্ত ব'লে ক্ষান্ত রইলো।

বুবুকে বলতে লাগলুম, মানুষ কি রকম গতির নেশায় পাগল বুঝে দেখ, একদিন হয়তো সত্যিই ছিল, যখন এই ঘণ্টায় সাত মাইল মানেই বেশ দ্রুতগতিই বোঝাতো। কিন্তু ক্রমে ক্রমে মানুষের প্রয়োজন যত বাড়তে লাগলো, ততই সে মাথা খাটাতে সুরু করলো কি ক'রে দূরত্বকে কমিয়ে আনা যায়, অর্থাৎ নিজের গতিকে বাড়াতে পারা যায়। আবিষ্কার হলো নানা রকম চাকাওলা গাড়ীর। সেগুলোর সংগে পোষ-মানানো জানোয়ার জুতে দূরত্বকে কমিয়ে আনবার চেষ্টা চললো অল্প সময়ের মধ্যে। ক্রমে ক্রমে আবিষ্কার হলো ষ্টীম এঞ্জিন আর পেট্রোল এঞ্জিনের। তাদেরও কত উন্নতি হলো গতির দিক দিয়ে। পঞ্চাশ-ষাট মাইল রাস্তা অতিক্রমের সময় কমতে কমতে এসে লাগলো এক ঘণ্টা আধ ঘণ্টায়। তাতেও তৃপ্তি নেই। এলো এরোপ্লেন, ট্রেনের দশ ঘণ্টার পথ প্লেনে এক ঘণ্টায় পেরিয়েও থামলো না গতি-পাগল মানুষের মন। জোরে ছোটার দ্বন্দ্ব লাগলো মানুষে আর প্রকৃতিতে। বাতাস বয় ঘণ্টায় দশ মাইল, মানুষ তাকেও ছাড়ালো। ঝড়ের গতি পঞ্চাশ-ষাট মাইল; তাও পেছিয়ে পড়লো মানুষের অগ্রগতির মুখে। আর কি? জয়ের উল্লাসে মাতোয়ারা হয়ে উঠলো মানুষ; বাকী ছিল শব্দের গতি। সে প্রায় সাড়ে সাতশো মাইল ঘণ্টায়। তাকেও পরাজিত করলো আজকালকার রকেট প্লেন—শব্দের চেয়েও জোরে ছোটে। কি রকম মজার, বুঝলি? রকেট প্লেনে উঠে মনে কর একটা পট্‌কা ফাটিয়েই তাতে ষ্টার্ট দিলি। কি হবে জানিস্? গন্তব্য স্থানে গিয়ে পৌছেও পরে আবার শুনতে পাবি সেই বিস্ফোরণের আর একটা আওয়াজ। তার মানে, তুই পৌছবার পরে তার শব্দ গিয়ে পৌছলো।

তা'হলে বোধ হয়— একটা ঢোঁক গিলে শেষ চকোলেটটাকেও মুখের মধ্যে আলটপ্‌কা ফেলে বললো বুবু, তা'হলে বোধ হয় একমাত্র আলোকেই হারাতে পারেনি মানুষ, তাই না?

হ্যাঁ, ঠিক বলেছিস। প্রকৃতির একমাত্র ওইটেই রয়েছে মোক্ষম জিনিস। সেকেণ্ডে প্রায় এক লক্ষ ছিয়াশি হাজার মাইল হলো এই আলোর গতি। আচ্ছা, পুরাণের সেই গল্প শুনেছিস্? কার্তিক গণেশের ঝগড়ার গল্প? একবার দুই ভাইয়ে লেগে গেল মহা ঝগড়া, কে আগে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড

ঘুরে আসতে পারে। কার্ত্তিকের তো মহা আনন্দ। তার বাহন রয়েছে ময়ূর। একবার চ'ড়ে বোঁ-ও ক'রে সারা ব্রহ্মাণ্ড বেড়িয়ে আসতে খুবই অল্প সময় লাগবে। আর গণেশ নিজে যেমন হোঁৎকা, তার বাহনও সেই রকম এক নেড়ে ইঁদুর, নড়তে-চড়তেই তো দিন কাবার। এই না ভেবেই কার্ত্তিক ময়ূরের ঘাড়ে চেপে দিল তার পালকে মোচড়। ময়ূর যখন উড়ে অনেক দূর বেরিয়ে গেছে, তখন গণেশের মাথায় এলো এক বুদ্ধি। সে দেখলে, তার মা-ই তো এই ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করেছেন, ব্রহ্মাণ্ড মানেই তার মা। তাই সে হেলেদুলে তার মায়ের চারপাশে এক পাক ঘুরে ভক্তিভরে প্রণাম্ ক'রে গ্যাঁট হয়ে রইলো ব'সে। এদিকে কার্ত্তিক সারা ব্রহ্মাণ্ড ঘুরে চার-পাঁচটা ময়ূরের পালক খুলে নিয়ে হাওয়া দিয়ে গায়ের ঘাম শুখোতে শুখোতে এসে যখন হাজির হলো, দেখে যে গণেশ তাকিয়ায় হেলান দিয়ে, শুঁড় উঁচিয়ে খুব নাক ডাকাচ্ছে! কার্ত্তিক বললো, কি তুমি যে এখনও বেরোওনি? আমার তো সব ঘোরা হয়ে গেলো।

আড়ামোড়া ভেঙে উত্তর দিলো গণেশ, হুঁঃ, তোমার কত আগে আমার ঘোরা শেষ হয়ে গেছে!

সব শুনে কার্ত্তিক ঠাকুর কি বললো? গণেশের কথা মেনে নিয়ে হার স্বীকার করলো? —ঘাড় উঁচু ক'রে বুবুর প্রশ্ন।

করবে না কেন? গণেশেরই তো ন্যায় জিৎ। কিন্তু কার্ত্তিক যদি আর একটু বুদ্ধি খাটাতো, তা'হলে গণেশকে নির্ঘাৎ হারিয়ে দিতে পারতো সে।

কি ক'রে বড়দা?—বুবুর আগ্রহ। তার প্রিয় ঠাকুর কার্ত্তিকের পরাজয় তার খুব মনে লেগেছে।

বললুম, কেন, সে যদি এমন কোন এরোপ্লেনের মত জিনিস বানিয়ে নিত স্বর্গের কারিগর বিশ্বকর্ম্মাকে দিয়ে যার গতি আলোর গতির সমান, তা'হলেই তো সে হুট্ বলতেই ব্রহ্মাণ্ড, মানে ধর, এই সারা পৃথিবীটা ঘুরে আসতে পারতো। কেননা, যাকে প্রদক্ষিণ করতে পেটমোটা গণেশের যদি খুব কম ক'রে এক সেকেণ্ড সময়ও লাগে, কার্ত্তিক সেই মেশিনে চ'ড়ে আলোর সমান গতিতে সেইটুকু সময়ের মধ্যেই সাতবার পৃথিবীটাকে পাক দিয়ে আসতে পারতো, তাই না?

বুবু গম্ভীরভাবে ঘাড় নেড়ে সায় দিলো।

জীয়ন পুতুল

শ্রীমণীন্দ্র দত্ত

নীলপরী শুধাল : মোহর চারটি কোথায় রেখেছ তুমি ?

—মোহর ? ইচ্ছা করেই পুতুলকুমার একটু মিথ্যে বলল : মোহর আমি হারিয়ে ফেলেছি।

অমনি অবাক ব্যাপার। যেই মিথ্যে বলা অমনি পুতুলকুমারের লম্বা নাক আরো দু আঙুল লম্বা হয়ে গেল।

—কোথায় হারালে ?

—ওই বনের মাঝে।

নাকটা বেড়ে গেল আরো দু আঙুল।

নীলপরী বলল : এই বনেই যখন হারিয়েছে, তখন খুঁজলেই পাওয়া যাবে। এ বনে কিছুই হারায় না।

ফ্যাসাদে পড়ল পুতুলকুমার। আমতা-আমতা করে বলল : না, না, আমি ভুল বলেছি। ওষুধ খাবার সময় মোহর চারটি আমি গিলে ফেলেছি।

বার বার তিনবার মিথ্যে বলার ফলে দেখতে দেখতে পুতুলকুমারের নাক গেল ভয়ানক লম্বা হয়ে! এত লম্বা হ'ল যে, কোন দিকেই সে আর ঘুরতে ফিরতে পারে না। কী মুশকিল! এদিকে ঘুরতে যায় তো জানলায় খোঁচা লাগে, ওদিকে ঘোরে তো নাক লাগে দেয়ালে।

ভাব দেখে নীলপরী হো-হো করে হেসে উঠল।

পুতুলকুমার শুধাল : তুমি হাসছ কেন ?

—হাসছি তোমার মিথ্যে কথার বহর দেখে।

—কি করে তুমি জানলে যে আমি মিথ্যে বলেছি ?

—ছাখো মিথ্যে কখনো চাপা থাকে না। ও অনায়াসেই আমি বুঝতে পারি।

—কেমন করে ?

—শোন তবে। মিথ্যে দু'রকম—লম্বচরণ আর লম্বনাসিকা। তোমার মিথ্যাগুলো লম্বনাসিকা দলের, তাই—

হাসতে হাসতে নীলপরী বাইরে যাবার জন্য পা বাড়াল। পুতুলকুমার তাকে জড়িয়ে ধরে কাঁদ-কাঁদ গলায় বলল : এবার তুমি আমায় রক্ষা কর নীলপরী, আমি আর কখনো মিথ্যে বলব না।

—ঠিক বলছ ?

—হ্যাঁ।

নীলপরী হাতে তালি দিল। আর দেখতে দেখতে হাজার হাজার কাঠঠোকরা পাখী এসে পুতুলকুমারের নাক ঠোকরাতে শুরু করে দিল। লম্বা নাক আবার ছোট হয়ে গেল।

পুতুলকুমার হাঁপ ছেড়ে বাঁচল। বলল: তুমি খুব ভাল নীলপরী, আমি তোমাকে খুব ভালবাসি!

নীলপরী বলল: আমিও তোমাকে ভালবাসি। তুমি কেন আমার কাছেই থাক না? তুমি হবে আমার ছোট ভাইটি, আমি হ'ব তোমার দিদি। কি বল?

—সে তো খুব ভাল কথা। কিন্তু—আমার বাবা?

—সে কথা আমি আগেই ভেবে রেখেছি। আজ রাতেই তোমার বাবা এখানে এসে পড়বেন।

—কী মজা! কী মজা! বাবা আসবে! আচ্ছা নীলপরী, আমি তা'হলে এগিয়ে যেয়ে তাঁকে সংগে করে নিয়ে আসি না কেন? বাবাকে দেখবার জন্য আমার মনটা বড়ই ছটফট্ করছে।

—যাবে যাও। তবে খুব সাবধান। আবার যেন বদলোকের কথায় ভুলো না।

—না না, আমি একেবারে সো—জা চলে যাব।

পুতুলকুমার তীরের মত ছুটে চলল।

যেতে—যেতে—পথের মাঝে তার দেখা হয়ে গেল—কার সংগে বলতো?

সেই যুগলমূর্তির সাথে—খোঁড়া শেয়াল আর কানা বেড়াল।

শেয়াল বলল: আরে ভাই পুতুলকুমার, তুমি এখানে?

পুতুলকুমার জবাব দিল: আর বল কেন? তোমরা তো চলে গেলে, এদিকে আমি পড়লাম ডাকাতের হাতে—

কানা বেড়াল বলল: ডাকাতের হাতে পড়েছিলে তুমি? আ-হা-হা—

কানা বেড়ালের থাবার দিকে নজর পড়তেই পুতুলকুমার শুধাল: ওকি, তোমার থাবা কি হ'ল?

বিড়াল থতমত খেয়ে বলল: এই—এই—

তাড়াতাড়ি শেয়াল গলা খুলল : নিজের গুণের কথা নিজের মুখে ও বলবে না পুতুলকুমার! শোন আমি বলছি। এই তো একটু আগে পথের পাশে দেখি এক বুড়ো বাঘ খিদেয় ধুকছে। সখার আমার দয়ার শরীর। দেখেই ওর চোখে জল এল। কিন্তু সংগেও কিছু নেই। কি আর করে, নিজের খাবাটাই দাঁতে কেটে তাকে দিয়ে দিল। বেচারি খেয়ে তো বাঁচুক! আ-হা-হা। সেই দাতাকর্ণের পরে এমন দান আর কে কবে করেছে?

বাঁ হাতে চোখ মুছে শেয়াল শুধাল : কিন্তু তুমি এখানে এসেছ কেন পুতুলকুমার?

—আমি চলেছি বাবার খোঁজে?

—তোমার সেই মোহরের কি হ'ল?

—আমার পকেটেই আছে। তবে একটি খরচ হয়ে গেছে সরাইখানায়।

—তবে আর কি, এখনি চল হুতোম প্যাঁচার দেশে। চার মোহর তোমার চার হাজার হয়ে যাবে। ভাবনা কি?

—আজ তো আমি যেতে পারব না। বাবা আসছে যে। আর একদিন বরং যাব।

—আজ না হলে তো হবে না।

—কেন?

—আজগুবির মাঠটা কিনে নিয়েছেন এক ভদ্রলোক। কাল থেকে আর কাউকে সেখানে মোহর পুঁততে দেওয়া হবে না। আজই চল।

পুতুলকুমার একটু ভাবল। বাবার কথা একবার মনে পড়ল। তারপর ভাবল, দুর্ ছাই, আগে টাকা তো পাই, তারপর বাবার সাথে দেখা তো হবেই। বলল : বেশ, এখনি চল।

চলল তারা আজগুবির মাঠে।

সব বোকাদের দেশ পেরিয়ে হুতোম প্যাঁচার দেশের শেষে আজগুবির মাঠ।

শেয়াল বলল : এইখানে হাত দিয়ে মাটি খুঁড়ে মোহরগুলো পুঁতে দাও।

পুতুলকুমার তাই করল।

—বাস্। এইবার এক ছুটে চলে যাও এখান থেকে। খবরদার পিছন ফিরে চেয়ো না। কুড়ি মিনিট পরে ফিরে এলেই দেখবে ছোট একটি চারা গাছ গজিয়েছে। তার ডালে ডালে ঝুলছে থোকা থোকা মোহর। যত মোহর চাই তোমার ছিঁড়ে ছিঁড়ে পকেট ভরে নিয়ে যাবে।

পুতুলকুমার খুশিতে আটখানা। বলল, বল কি? এত মোহর পাব?

—তবে আর বলছি কি? আচ্ছা, তা'হলে এবার আসি আমরা। নমস্কার পুতুলকুমার।

পথে নামল যুগলমূর্তি। পুতুলকুমারও সেখান থেকে দিল এক ছুট্। পিছন ফিরে চাইল না একটিবারও। (ক্রমশঃ)

ভারতের ছায়াছবি

শ্রীনীলরতন দাশ

একদা ভারতে রাজস্থানের রাজন্যগণ যবে
মোগলের পায়ে স্বাধীনতা বলি দিল একে একে সবে,—
'মেবার সূর্য্য' একাকী যুঝিল দিল্লীশ্বর সনে ;
রাজ্য হারায়ে হলো বনবাসী, তবু না ক্ষান্ত রণে।
শত্রু সাথে সখ্য না করি' দুঃখের নাহি শেষ,
কোথা সেই বীর ? কোথা সে শৌর্য্য ? কোথা প্রতাপের দেশ ?

শতধা খণ্ড ছিন্ন ভারত বাঁধি একতার-পাশে,
অখণ্ড এক রাজ্য গড়ার স্বপ্ন মানসে ভাসে।
মারাঠা বীরের অন্তর মাঝে অগ্নি-মন্ত্র লিখা,
বক্ষে অমিত শক্তি সাহস, চক্ষে বজ্রশিখা।
শৈলশিখরে গৈরিক ধ্বজা উড়াল ছত্রপতি,
বীর শিবাজীর সেই ভারতের এ কি আজ দুর্গতি !

বণিকের বেশে রাজ্য-লোলুপ বিদেশীরা যবে আসি'
ভারতের যত স্বাধীন রাষ্ট্র একে একে ফেলে গ্রাসি'—
মারাঠা মোগল হয়ে হতবল হয় পরপদলেহী,
হেন কালে বীর-বালা কয়—"মেরি ঝাঁসি দেওঙ্গে নেহি !"
সমরাঙ্গনে কোথা সে দৃপ্ত রণরঙ্গিণী বেশ ?
হায়, কোথা সেই বীরপ্রসবিনী লক্ষ্মীবাইয়ের দেশ !

পরাধীনতার দুঃসহ ক্লেশে ভরা যার অন্তর,—
উল্কার মত ছুটিল সে বীর দেশ ও দেশান্তর।
ক্ষাত্রবীর্য্যে ঘুচাল জাতির ভীরুতার অপবাদ,
শৃঙ্খলপরা ভারতবাসীরে দিল মুক্তির স্বাদ।
হেরি সে দৃশ্য চমকি বিশ্ব চাহিল নির্নিমেষ !
লক্ষ্যহারা ও ভণ্ডামি-ভরা এ কি নেতাজীর দেশ ?

———

বাস্তবুড়ী

শ্রীসুধা দেবজা

[একটি পুরানো বড় কোঠাবাড়ীর দরদালান—পাঁচীল-ঘেরা মস্ত আমবাগান, অনেক আম ধরেছে। বাঁদর ও কাকের ভয়ে গাছগুলো জাল দিয়ে ঢাকা। দালানের খানিকটা পাঁচীলের বাইরে রাস্তা থেকে ছাখা যাচ্ছে। বাইরে একদল ছেলে—পাঁচীল ডিঙিয়ে ডাল ধরে আমগাছে উঠবার মতলব।]

ছেলেরা—আয়, আয়, এদিক দিয়ে আয়। খুব চুপি চুপি—টের না পায়—

মন্তু—এইরে! জাল দিয়ে এমন করে সারা গাছ ঢাকা দিয়েছে আম পাবার যো নেই।

ভাণ্ডু—এই! যে আগে পাবি আমাকে দিবি। বেজায় ক্ষিদে পেয়েছে ভাই! সকাল থেকে কিছু খাইনি—

মানকু—আচ্ছা রে আচ্ছা, তুই চেঁচাস্‌নে, শুনতে পাবে। এই দিকে সরে আয়, একটা পেয়েছি। (সে পাঁচীলে চড়ে একটা ডাল টেনে নামিয়ে আমটা পেড়ে ভাণ্ডুর হাতে দিতে যাবে অমনি এক থুথ্‌ড়ে বুড়ী একটা ঝাঁটা হাতে নিয়ে তেড়ে বেরিয়ে এলো।)

বুড়ী—তবে র‍্যা মুখপোড়ারা!—আবার এয়োচো? আয় না, আয়! এক একটাকে ধরবো আর জ্যান্ত চিবিয়ে খাবো—এই এমনি করে (চিবানোর ভঙ্গী করে দাঁতে দাঁত ঘষে ছাখালে)।

মানকু—(হঠাৎ বুড়ীর তাড়ায় চমকে উঠল, হাতের আমটা মাটিতে পড়ে গ্যালো, সে লাফিয়ে রাস্তায় পড়লো, তারপর চেঁচিয়ে বললে) তাও যদি দাঁত থাকতো—

বুড়ী—(দ্বিগুণ রেগে প্রায় লাফাতে লাফাতে পাঁচীলের সামনে এসে হাত-মুখ নেড়ে) নেই তো কি হয়েছে রে—এই পাকা আমের মত গুলে রক্ত বের করে খাবো—আয় না, আয়—(তেমনি ভঙ্গী)

মানকু—(দু'পা পিছিয়ে চোখ বড় করে) ওরে বাবা—

নুলো নীলু—(ওর একটা হাত নেই—রাস্তা থেকেই চেঁচিয়ে বলছে—)

ও বাস্তুদিদি বাস্তুদিদি—একটুখানি হাসো—
আর খুক্ খুক্ খুক্—খুক্ খুক্ খুক্ কাশো—
অদন্ত ওই হাসি—তামাক পোড়া কাশি—
মোরা বড্ড ভালবাসি।

মন্তু—(সঙ্গে সঙ্গে)—তারো চেয়ে ভালো তোমার গাছের মিঠে আম,
না যদি দাও যমের খাতায় পাঠাই তোমার নাম।

বুড়ী—বটে বটে বটে রে মুরুক্ষু! হতচ্ছাড়া উহুন্‌মুখোর দল! যমের খাতায় তোদিগের নাম পাঠাতে পারিনে আমি? অ্যা?—(ঝাঁটা নিয়ে তাড়া—ছেলেরা দুদ্দাড় করে সবাই ছুটে দূরে সরে এলো, শুধু ভাণ্ডু পারলে না—)

মস্ত মানকু নীলুরা—মা মনসা ফোঁস্—নিয়ো নাকো দোষ—

আর দিয়ো না গাল—আসবো আবার কাল—

মিটিয়ে মনের ঝাল।

(বলতে বলতে তখনকার মত সব পালালে, ছোট্ট ভাণ্ডু ধরা পড়ে গ্যালো।)

বুড়ী—(ভাণ্ডুকে ছুটো হাত ধরে টানতে টানতে এনে গাছের সঙ্গে বেঁধে রাখলে) দাঁড়া! আজ তোকে সহজে ছাড়ছি না—তোর বাপ এসে আমার সামনে তোকে নাকে খত্ দিইয়ে বলিয়ে নেবে—আর আসবিনি, তবে ছাড়বো! জানিস্ আমার নাম বাসু বামনী।

ভাণ্ডু—(কাঁদো-কাঁদো হয়ে) বাবা তো সেই রাতে আসবে—সারাদিন তাঁর কাজ। আমাকে একটা আম আগে দাও না, বড্ড যে ক্ষিদে পেয়েছে। আমার তো মা নেই, সময় মত খাওয়া হয় না।

বুড়ী—মা নেই তো আমার কি রে! এঃ! বড় আমার ঠাকুর এয়েচেন, তাকে বসে খাওয়াতে হবে! (বুড়ী ঘর থেকে এক ঝুড়ি আম আর বঁটি নিয়ে এসে দালানে বসে বঁটি পেতে আম ছাড়াতে লাগলো, প্লেটে যত্ন করে আম সাজিয়ে ডাকলে) অ ভুটুকে আয় রে! খাবি আয় মানিক!

(নাদুস্ ভুঁড়ি গোলগাল বেঁটে মোটা ভুটুকো হেলেদুলে ঘর থেকে বেরিয়ে এলো।)

ভুটুকো—ও ঠাকমা, আর খেতে পাচ্ছিনে। সকালে নাড়ু মুড়ি ক্ষীর অতগুলো খেয়েছি, আবার দুপুরে মাছ তরকারী মাংস দৈ মিষ্টি দিয়ে ভাত খেলুম, আবার এই তো পায়েস খেয়ে এলুম। পেটে আর জায়গা নেই—

বুড়ী—আহা বাছারে! মরে যাই মরে যাই! সেধে দিলে খায় না, আর ওই হাড় হাভাতে-গুলো তাড়িয়ে দিলে যায় না—কেবল খাই খাই! খাও যাদু, খাও! আম তো খাওনি, এই ক'টা খাও। না খাও তো আমার মাথার দিব্যি! (ভুটুকো বসে পড়ল খেতে)

ভুটুকো—(খানিক খেয়ে পেটে হাত বুলিয়ে) আর পারিনে ঠাকমা—

ভাণ্ডু—আমাকে একটা দাও না ঠাকমা, আমি যে ক্ষিদেয় মরে যাচ্ছি!

বুড়ী—যাঃ যাঃ, তোকে দিচ্ছে কে? মরে যাচ্ছিস্ তো আমার কি! একদিন এক কুচি দিলে রক্ষে আছে? মেরেও তাড়ান যাবে না!

ভাণ্ডু—তবে ওকে দিচ্ছ কেন? ওর যে ক্ষিদে নেই!

বুড়ী—(গালে হাত দিয়ে) আ মা মা! ওকে দেব না! আরে, ও যে আমার নাতী—আমার নিজের নাতী আমার নিজের আম খাবে না? খাবে! একশো বার খাবে! ক্ষিদে না থাকলেও খাবে! তোকে দেব কেন রে মুখপোড়া?

ভুটুকো—দাও না ঠাক্‌মা দুখানা ওকে, আমি যে আর পারিনে খেতে।

বুড়ী—খুব পারবি, খুব পারবি। আয় কোমরের বেল্‌টুটা একটু ঢিলে করে দি।

ভুটুকো—বেল্‌টে কি আর একটা ছেঁদাও বাকী রেখেছি ঠাক্‌মা? পায়েস খাবার আগেই একবারে সব শেষের গর্তটাতে কাঁটা ঢুকিয়ে নিয়েছিলুম, না হলে কি পেটে পায়েস ঢুকতো?

বুড়ী—আহা হা! মুখপোড়ারা এমন বেল্‌টু বানিয়েছে যে খেয়ে দেয়ে পেটটা বাড়াবার জায়গা রাখেনি। দে খুলে ফেলে, অমন বেল্‌টু আর পরিসনে। নে এই কলমের আম দুটো খা দেখি,—আঁচল দিয়ে আড়াল করে দি, হতভাগা ভেণ্ডো আবার নজর দিচ্ছে।

ভাণ্ডু—(অবাক হয়ে ভুটুকোর খাওয়া দেখছিল) না ঠাক্‌মা, নজর দিচ্ছিনে; ওর খাওয়া দেখে আমার বমি আসছে, আর ক্ষিদেও নেই। আমার মা যখন বেঁচেছিলেন, অত পেট ভরে কখনো খেতে দিতেন না, ওতে অসুখ করে।

বুড়ী—(রেগে উঠে ভাণ্ডুর মুখের কাছে হাত নেড়ে) অসুখ করে তো তোর কিরে হতভাগা! আমার নাতী—আমার ভুটুকু আরও দশটা খাবে—বিশটা খাবে—পঞ্চাশটা খাবে—একশোটা খাবে—হাজারটা খাবে—লক্ষটা খাবে (বলছে আর ঝুড়ি থেকে আম বার করে স্তূপাকার করছে; তাই দেখে

ভুট্‌কোর চোখ ক্রমশঃ গোল হয়ে উঠছে। ভয়ে ভাণ্ডুরও তাই। হঠাৎ ভুট্‌কো 'ওয়াক' করে বমি করে ফেললে—আর ভুট্‌কোর 'ওয়াক' করার ঝুঁকিতে আমের ঝুড়ি উল্টে বুড়ী চাপা পড়ে হাত-পা ছুঁড়তে লাগলো, আর চ্যাচাতে লাগলো।)

বুড়ী—ওরে আমার ভুট্‌কু রে! কি হ'ল রে! ওরে ও ভেণ্ডো, আমাদের বাঁচা বাবা!

ভাণ্ডু—(ব্যস্ত হয়ে) আমার হাত যে বাঁধা ঠাকুমা, ওরে মানুকু টঙ্কুদা মস্তুদা কে আছিস্, শীগগির এদিকে ছুটে আয়!

(এর মধ্যে চুপি চুপি এসে গাছের ওপর লুকিয়েছিল দু'একজন। তারা আর বাকী সবাই পাঁচীল টপ কে লাফিয়ে পড়লো)

সবাই—(ছুটে এসে) কি—কি? কি হ'ল রে?

(একজন ভাণ্ডুর হাতের বাঁধন আগে খুলে দিলে, একজন ভুট্‌কোকে ধরলে)

ভাণ্ডু—ও ভুট্‌কো, যতটা পারিস বমি করে ফ্যাল, না হলে মরবি।

টঙ্কু—(বুড়ীকে টেনে তুলে) যাও ঠাকুমা, ভোট্‌কাকে ঘরে নিয়ে শুইয়ে হাওয়া করগে। এখন এই আমের ঝুড়ি ভোট্‌কার হয়ে আমরা শেষ করি। কি আর করবে, তোমার যেমন কপাল! তোমারই আম—তোমারই ভুট্‌কু; কাকে চাও বলো?

বুড়ী—(ডাক ছেড়ে) ওরে আমার নাতীরে, ওরে আমার আমরে। এ ডাকাত বলে কিরে? ওরে আমি কোথায় যাইরে (বুড়ী একবার ভুট্‌কোকে কোলের কাছে টানে, একবার আমের ঝুড়ি টানে। ছেলেরা ততক্ষণে টুপটাপ আম তুলে যে যার থলেতে ভরছে)

বুড়ী—ওরে ও ভুট্‌কো, এ যে সব নিয়ে নিলেরে—ডাকাতরা যে সব লুটে পুটে নিলে, এ আমি কি করে সইব! ওরে তুই দুটো খেয়ে নে তাড়াতাড়ি—(যেই খাবার কথা বলা ভুট্‌কো আবার 'ওয়াক')

মস্তু—ঠাকুমা, নাতীই ধরো! না হলে আম তো গ্যালোই, নাতীও যে যায় (ব'লে ভোট্‌কাকে তাড়াতাড়ি বুড়ীর কোলে শুইয়ে দিয়ে আম নিয়ে সবাই লাফে লাফে একেবারে পাঁচীলের বাইরে)—

সবাই— ও বুড়ী, তোর সাম্‌লা নাতী—
নাতীই দেবে স্বর্গে বাতি!

আপনি মরিস্ আমের চাপে
খেয়ে নাতীর পেট যে ফাঁপে—
পরের ছেলে কাঁদেয় মরে,
দিলিনে তার দু'হাত ভ'রে।

অনেক কষ্টে নিলাম কেড়ে,
গাল দিও না আবার তেড়ে।
আজ পেয়েছি তোমার আম,
যমকে পাঠাই টেলিগ্রাম।

(বুড়ী যেই যমের নাম শোনা—নাতী টাতী ফেলে কোমর ধরে ঝ্যাঁটা নিয়ে তেড়ে এলো)

বুড়ী—তবে র‍্যা—

ছেলেরা—ওরে বাবারে! আবার এলোরে! (হুড়মুড় করে দে ছুট)

আবহাওয়া ও আমাদের মন

শ্রীঅশোককুমার মিত্র

বাইরে যখন বৃষ্টি পড়ে ঝুপ্ ঝুপ্ ঝুপ্, তখন যে কোন ছেলে যত দস্যিই হোক্ না কেন, গল্প সে শুনবেই একেবারে চুপটি করে। আবার শরতের সুরুতে, আকাশ যখন গাঢ় নীল হয়ে অনেক উঁচুতে উঠে গেছে মনে হয়, তখন আনন্দময়ীর আগমনে সারা বাংলাদেশের ছেলেমেয়েরা আনন্দে ঝলমল্ করতে থাকে। আবার দেখো, গরমে গলদঘর্ম্ম হয়ে মাষ্টার মশাইয়ের মেজাজ কি তিরিক্ষিই না হয়ে থাকে! অকারণেই হয়তো তিনি কোন ছাত্রকে বেধড় পিটিয়ে দিলেন! এসব দেখে মনে হয়, আবহাওয়ার বৈচিত্র্য অদ্ভুত রকমের পরিবর্ত্তন আনে মানুষের মনে। এইজন্যই বিভিন্ন ঋতুকে নিয়ে কবিদের ছন্দ গাঁথার ইয়ত্তা নেই। আবহাওয়ার প্রভাবে এইসব কবিতাই হ'ল মানুষের মনের অনুভূতির স্বতঃস্ফূর্ত্ত অভিব্যক্তি। প্রায় পাঁচশ' পাউণ্ড ওজনের বাতাস রয়েছে সাধারণ একটা ঘরে। নিঃশ্বাসের জন্য রোজ যে বায়ুর প্রয়োজন আমাদের, তার ওজন আমাদের দৈনন্দিন খাদ্যের ওজনের চেয়ে বেশী! শুনতে খট্কা লাগলেও কথাটা সত্যি। এইজন্যই, যে বায়ুর জন্য আমরা বেঁচে আছি, তার ওপরই আবার নির্ভর করছে আমাদের ভাল থাকা আর না-থাকা। আবহাওয়ার তারতম্যে তাই আমাদের শরীর করে কখন ম্যাজম্যাজ, কখন মনে আনে স্ফূর্ত্তি, আবার কখন মেজাজ হয়ে ওঠে তিরিক্ষি। বায়ু কখন গরম, কখন ঠাণ্ডা; কখন শুক্‌নো, কখন ভিজে; কখন তার গতি বেশী, কখন তা আবার শান্ত। বায়ুর এই বৈচিত্র্যের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের শরীরেও পরিবর্ত্তন আনতে হয়। বেশীর ভাগ সময়েই এই পরিবর্ত্তন চলেছে আমাদের অলক্ষ্যে, বিনা পরিশ্রমে। কিন্তু এই পরিবর্ত্তনের চাহিদা যখন খুব বেশী, তখনই হয় গণ্ডগোল। আমাদের দেহ কিংবা মন তখন বেঁকে বসে। আবহাওয়ার খেয়ালখুশীর সঙ্গে সমান তালে পা ফেলে না তারা। ফলে আমরা অসুস্থতা (হয় দেহে, নয় মনে) অনুভব করি। এই অসুস্থতার আবার রকম-ফের আছে। মাথা ধরা থেকে আরম্ভ করে বুক ধড়ফড় করা সবই এর অন্তর্ভুক্ত।

মনের ওপর আবহাওয়া যে কি রকম প্রভাব বিস্তার করে, তা বলে শেষ করা যায় না। অকারণে মনটা দমে থাকে, খুঁৎখুঁৎ করে, তার জন্য দায়ী বেশীর ভাগ সময়ই যে আবহাওয়া, তা আমরা ভেবে দেখি না।

অনেকদিন এমন হয়, যাতে হাত দেওয়া যায়, সবেতেই যেন বাগড়া পড়ে, ভুল হয়ে যায়। ভেঙেচুরে তচ্‌নচ্ হতে থাকে সব-কিছু। একশ' বিপদ যেন একসঙ্গে এসে নাজেহাল করে তোলে

তোমায়। বায়ুচাপ কম থাকলে এবং আরও ক্রমশঃ কমতে থাকলেই যে এ ধরনের অকর্ম্মের ঢেঁকি হয়ে বদনাম কেনো তোমরা, তার নজির আছে অনেক। এই সময় আশেপাশের বায়ুর তাপ, আর্দ্রতা, গতি সব কিছুই বদলাতে থাকে। মনের ওপর অভাবনীয় প্রভাব বিস্তার করে তখন এই পরিবর্ত্তনশীল বায়ু। অনিদ্রা, অস্থিরতা, দুর্ঘটনা, এমন কি আত্মহত্যাও নাকি এই সময় বেড়ে যায়। এই সময় মানুষের মন থাকে দমে, মেজাজ হয়ে ওঠে তিরিক্ষি। ছোট ছেলেমেয়েদের দৌরাত্ম্যি বাড়ে, বড়দের স্নায়বিক দুর্ব্বলতা আসে। খোঁজ নিয়ে দেখা গেছে, এই সময়ই বাসে-ট্রামে-ট্রেনে ভুল করে জিনিস ফেলা থাকে বেশী। জেলের কয়েদীরা আইন অমান্য করে এই সময়ই বেশী। এক কথায় বায়ুচাপ কমতে থাকলে যত রকমের নষ্টামি আসে আমাদের সমাজ-জীবনে।

সঠিক করে কেউ বলতে পারেন না, বায়ুচাপের তারতম্য আমাদের শরীরে ঠিক কি পরিবর্ত্তন আনে। তবে এটুকু জোর দিয়ে বলা চলে যে, বায়ুর চাপ কমলে বাড়লে আমাদের দেহের টিসুগুলোর মধ্যে যে জল আছে, তার পরিবর্ত্তন হয়। বায়ুচাপ কমতে থাকলে, এই টিসুগুলোর মধ্যে জলপরিমাণ বাড়ে। তাতে টিসুগুলো ফুলে ওঠে। এইজন্যই বায়ুচাপ কমবার সময় বেতো রোগীর গাঁটগুলোয় যন্ত্রণা বাড়ে। বায়ুচাপ কমতে থাকলে ঝড়জল আসন্ন। ঝড়জলের পূর্ব্বাভাস তাই অনেক বেতো রোগী নিজের শরীর বুঝেই দিতে পারেন। স্বাভাবিক সুস্থ মানুষ তার টিসুগুলোর মধ্যে জলপরিমাণ বাড়ার জন্য শরীরের কোন পরিবর্ত্তন হয়তো বুঝতেই পারবে না, কিন্তু তার অন্য বিশেষ ধরনের কোন অনুভূতি আসা অস্বাভাবিক নয়। দেহের টিসুগুলো যখন জল বেশী নিতে থাকে, তখন মগজের টিসুগুলো নিশ্চয়ই চুপ করে থাকবে না। আর মগজের কোন-কিছু সামান্য পরিবর্ত্তনই আমাদের হাবভাবে ফুটে উঠবেই।

পরিষ্কার আবহাওয়ার দিনে, বায়ুচাপ যখন বাড়ছে, তখন নাকি আমরা পরস্পরের খুঁৎ কাটি কম। নিজেকে এবং অপরকেও ভাল লাগে তখন। দোষ-ত্রুটি ভুলে গিয়ে তখন ভাল গুণগুলোই নজরে পড়ে যেন বেশী। কারও সঙ্গে ঝগড়াঝাটি করলে, মিটমাট করার উৎকৃষ্ট সময় নাকি এই সময়ই। বায়ুচাপ যখন কমছে, তখন কিছুর মিটমাট করাতে যাওয়া মূর্খামি। মিটমাট না হয়ে বরং আরও পুরানো কাসুন্দি ঘেঁটে বেরুবে। ঝড় জল এল বলে, এমনি সময় কখনও নিজের কাজ গোছানোর জন্য অপরের কাছে সুপারিশ করতে যেও না। ব্যারোমিটারে বায়ুচাপ তখন নামছে, তোমাকে হাঁকিয়ে দেওয়ার সম্ভাবনাই বেশী। এই সব দিনে বক্তৃতা দিতে যাওয়াও আর এক বিড়ম্বনা। শ্রোতাদের কারও মাথায় বিশেষ কিছু ঢুকবে না। বক্তা যা বলতে চাইছেন, কেউ তেমন দরদ দিয়ে বুঝবে না। তর্ক করে বুঝাতে যাওয়া বাতুলতা। রসিকতা করলে "উল্টা বুঝিলি রাম" হয়ে যাবে।

গায়ক আর বাজিয়েদের জিজ্ঞাসা করে দেখো, তারা চায় উপযুক্ত শ্রোতা আর অনুকূল আবহাওয়া।

এই তো গেল দৈনন্দিন আবহাওয়ার প্রভাবের কথা। এর পর আছে সাপ্তাহিক, মাসিক, বাৎসরিক আবহাওয়ার খেয়াল অনুযায়ী মানুষ কি ভাবে প্রভাবান্বিত হয়ে থাকে। তার মানে, জলহাওয়ার দরুণ বিভিন্ন দেশে মানুষের সাজসজ্জা, আহার-বিহার, আচার-ব্যবহার সব-কিছুরই কেমন রকম-ফের হয়, লক্ষ্য করে দেখেছো বোধ হয়। জাতীয় জীবনে অন্যতম প্রভাব হ'ল এই আবহাওয়া। অন্য প্রভাবও যে আছে তা অস্বীকার করবার উপায় নেই। কিন্তু আবহাওয়ার প্রভাবও কম নয়। বৈজ্ঞানিকেরা প্রণিধান করে দেখেছেন যে, মরুভূমির মানুষেরা "ঈশ্বর এক" এইটাই মনে প্রাণে বিশ্বাস করে থাকেন। এর কারণ ওই আবহাওয়া। সেখানে বৈচিত্র্যহীন মরুভূমির দৃশ্যে কোন পরিবর্ত্তন না লক্ষ্য করেই এই বিশ্বাস তাদের বদ্ধমূল হয় যে, এক ঈশ্বরই এই জগৎ সৃষ্টি করেছেন।

খুব গরমে শারীরিক ক্লান্তি তো আসেই, মানসিক অবসাদেও মুহ্যমান হই আমরা। অনেক সময় নৈতিক মনও ভেঙ্গে পড়ে। তার মানে সংযমের ওপর শাসন আমাদের থাকে না। গরমে ঘেমে-নেয়ে মেজাজ ঠিক রাখতে না পেরে অতি তুচ্ছ কারণেই তাই অনেকে বাসের ড্রাইভার বা কণ্ডাক্টরের সঙ্গে কথা কাটাকাটি, এমন কি গালাগালিও করে থাকেন। একটু ঠাণ্ডা হলেই পরে অনুতাপ হয়, লজ্জা আসে মনে। খবর নিয়ে দেখা গেছে, গরমে মানুষের রক্ত সত্যই অনেক সময় যেন টগবগ করে ফুটে ওঠে। খুনের সংখ্যা এবং অন্যান্য অপরাধের সংখ্যা গরমকালে তাই সব দেশেই বেড়ে যায়। এ নিয়ে গবেষণা হয়ে গেছে অনেক। তাপের তারতম্যে মানুষের অপরাধ কি রকম বাড়ে কমে, এ নিয়ে এক বৈজ্ঞানিক একখানা বই পর্য্যন্ত লিখে ফেলেছেন। তাঁর মতে প্রত্যেক দেশে বছরের পর বছর, তাপ বাড়াকমার সঙ্গে সঙ্গে অপরাধ সংখ্যাও বাড়ছে কমছে সমান তালে। 'রাজনৈতিক অপরাধ' সম্বন্ধে গবেষণা করে আর এক বৈজ্ঞানিক বলেছেন, বড় বড় গণ্ডগোল, উচ্ছৃঙ্খলতা, রাজনৈতিক বিপ্লব ও বিদ্রোহাচরণ সবই প্রায় গরমকালেই হয়ে গেছে। কলকাতার পাশবিক উচ্ছৃঙ্খলতা ও উন্মত্ততা ১৬ই আগষ্ট হয়েছিল—তখন কলকাতায় গরম কমেনি মোটেই।

মানুষের মনের ওপর আরও একটা আবহাওয়ার উপাদান মারাত্মকভাবে প্রভাব বিস্তার করে। সেটা হ'ল—বাতাসের গতি প্রচণ্ড হয়ে ঝড় দেখা দিলে মানুষ চিরকাল তাকে ভয়ের এবং বিস্ময়ের চোখে দেখে এসেছে। এই সব ঝড়ের নামকরণও হয়েছে নানা দেশে বিভিন্ন প্রকারে। স্পেনদেশে সোলানো (Solano) নামে ঝড়ের এমন প্রভাব যে, সে দেশে একটা প্রবাদই চালু হয়ে গেছে—"Ask no favour during the solano" অর্থাৎ সোলানো ঝড়ের সময় কোন অনুগ্রহ চেয়ো না। আরজেনটিনা দেশে Zonda নামে এক ধরনের ঝড়ের সময় নাকি অনেক সাময়িক উন্মাদনা দেখা যায়। মাল্টায় বিখ্যাত Sirocco ঝড় প্রাণনাশ বেশী না করলেও, মানুষের মেজাজের ওপর নাকি আশ্চর্য্য অদ্ভুত প্রভাব বিস্তার করে। এই সাংঘাতিক গরম বাতাসে-ঝড় যখন উত্তর আফ্রিকা থেকে ভূমধ্যসাগর পাড়ি দেয়, তখন সহরশুদ্ধ লোকের মাথা যায় বিগড়ে। এ ব্যাপার আইনও মেনে নিয়েছে। তাই

সেখানের হাকিমেরা Sirocco হাওয়া বইবার সময় আইনভঙ্গকারীদের তেমন শক্ত সাজা দেন না! এর পর রোগের কথা। আবহাওয়ার রকমফেরে রোগের তালিকাও হবে বিভিন্ন। প্রত্যেক দেশের আবহাওয়ার একটা বৈশিষ্ট্য আছে। দার্জিলিংএ ঠাণ্ডাই সারা বছর, গরম পড়ে না বললেই হয়। আবার গ্রীষ্মমণ্ডলে আফ্রিকার অনেক অঞ্চলে সারা বছরে শীত বলে কিছু নেই। কোথাও বর্ষাকালে বৃষ্টি পড়ে যেন আকাশ ফুটো হয়ে, আবার কোথাও বছরে ছিটেফোঁটা বৃষ্টি পড়লেই হৈ-চৈ পড়ে যায়—মরুভূমিতে দু'-এক ফোটা বৃষ্টি পড়াই অভাবনীয় আশ্চর্য্য ব্যাপার! এই সব আবহাওয়ার প্রভাবে এক দেশে যে রোগ মড়কের সৃষ্টি করছে, অন্য দেশে সে রোগে ভুগেছে এমন কোন মানুষকেই বোধ হয় পাওয়া যাবে না।

অজানা রূপকথা

শ্রীরবিদাস সাহা রায়

কবেকার কথা কেউ তা জানে না। সন তারিখের সৃষ্টি হয়নি তখনো।

চাঁদ দেখে চলত তখন দিনের গণনা, আর সূর্য্য দেখে চলত সময়ের হিসাব।

কাজেই কেউ মনে করে রাখেনি, কোন পণ্ডিত পুঁথিতে লিখে যাননি, কোন ভাস্করও তা খুদে রাখেনি পাথরের গায়ে।

এমনি করে দিন গেছে, মাস গেছে, বছর গেছে, যুগ-যুগান্তর পার হয়ে গেছে। তারপর মানুষ গেছে সব ভুলে।

সেই কাহিনী আজ তোমাদের কাছে বলছি।

তোমরা সব চুপ করে বসো। কেউ গোলমাল করো না। তা'হলে আমারও হয়তো সব গোলমাল হয়ে যাবে।

কিন্তু তোমাদের ভেতর বাবুল তো ভয়ানক দুষ্টু। সে খামকাই বলে উঠল—এ গল্প তুমি জানলে কার কাছ থেকে?

আমার এখন বেকুব হবার পালা। তবু বললাম—গল্প আগে শেষ হোক, তারপর বলব সে কথা।

ঠাকুমার কাছ থেকে নিশ্চয়ই?—জিজ্ঞেস করল অনেকে।

বললাম—না। তখন আমাদের ঠাকুরমার ঠাকুরমা—এমন কি তার ঠাকুরমারও জন্ম হয়নি। সেই সময়কার কাহিনী এটা।

(১)

এক দেশে ছিলেন এক রাজা। আর ছিলেন এক মন্ত্রী। তোমরা বুঝি ভাবছো—হবুচন্দ্র রাজা আর গবুচন্দ্র মন্ত্রী? না, তখনো হবুচন্দ্র রাজা আর গবুচন্দ্র মন্ত্রীর জন্ম হয়নি।

রাজা ছিলেন হবুরাম আর মন্ত্রী ছিলেন গবুরাম।

হবুরাম রাজা হলে কি হয়, বুদ্ধিতে একেবারে বোকারাম। মন্ত্রীর পরামর্শ ছাড়া এক পা চলতে পারেন না।

রাজা হওয়ার পরই সিংহাসনে বসে হবুরাম গবুরামকে জিজ্ঞেস করলেন—এবার মন্ত্রী আমাকে কি করতে হবে?

গবুরাম জবাব দিলেন—এবার সৈন্যদল গঠন করতে হবে।

সৈন্যদল কেন? সৈন্য দিয়ে কি হবে?—অবাক হয়ে রাজা জিজ্ঞেস করলেন।

মন্ত্রী বললেন—বাঃ, সৈন্য লাগবে না? সৈন্য না হলে রাজ্য রক্ষা করবে কে?

তাও তো বটে!—রাজা মাথা চুলকাতে থাকেন।

রাজভাণ্ডারে টাকার অভাব নেই। কাজেই সৈন্যেরও অভাব হ'ল না। সেনাপতি, কোটাল, দ্বাররক্ষী সব নিযুক্ত হ'ল। দরজায় দরজায় বসল পাহারা।

সৈন্যও অনেক। এখানে সেখানে লাঠি হাতে ঘুরে বেড়ায়। রাজপ্রাসাদে একটি ইঁদুর বেড়াল ঢোকবারও যো নেই।

সৈন্যদের সর্দ্দার হ'ল নিধিরাম।

ইয়া লম্বা চেহারা—প্রায় দেড়খানা লোকের সমান উঁচু। ইয়া লম্বা গোঁফ—তার উপর পাখী বসলেও হয়তো সে টের পাবে না।

সে মস্ত বড় এক লাঠি নিয়ে ঘুরে বেড়ায় সৈন্যদের তদারক করতে। কেউ পাহারা দিতে দিতে ঘুমিয়ে পড়লে লাঠির খোঁচা দিয়ে তাকে সচেতন করে দেয়। কেউ বাঁকা হয়ে দাঁড়ালে পিঠে কসিয়ে দেয় এক লাঠি। বলে—দাঁড়া সোজা হয়ে!

তিরিক্ষি মেজাজ—ভারিক্কি চলাফেরা।

নিধিরাম সর্দ্দার সে!

কিন্তু সৈনিকরা কেউ তাকে ভাল চোখে দেখে না। সামনে পড়লে সম্মান দেখায়—পেছনে গালমন্দ দেয়। বলে—বেটা যেন আমাদের মানুষই মনে করে না—কায়দা পেলে একদিন দেখাব মজা।

একদিন সত্যি মজা দেখাল তারা।

অনেক রাত হয়ে গেছে। খবরদারী করতে করতে নিধিরাম খুব ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। খাটিয়ার এক কোণে বসে একটু জিরিয়ে নিচ্ছে।

একে খাটুনি, তার উপর খাওয়াটা আজ একটু বেশী হয়ে গেছে। কাজেই নিধিরামের নাক-ডাকা সুরু হ'ল।

একজন সৈনিক এগিয়ে গেল তার কাছে। দেখল সত্যি ঘুমুচ্ছে কিনা। তারপর একটা ধারাল কাঁচি দিয়ে নিধিরামের লম্বা গোঁফ দুটো ঘ্যাচ-ঘ্যাচ করে কেটে ফেলল।

পরদিন ভোরে হৈ-চৈ পড়ে গেল। নিধিরাম রাতে কিছুই টের পায়নি। ভোরে ঘুম থেকে উঠে যে-ই গোঁপে তা দিতে গেল—

হ্যাঁ, ভাল কথা। ঘুম থেকে উঠে সব-কিছু করার আগে গোঁফে তা দেওয়া নিধিরামের রোজকার অভ্যাস।

কাজেই যে-ই গোঁফে তা দিতে গেল, অমনি হাত দুটো ফাঁকা ফাঁকা ঠেকল। সর্ব্বনাশ! আজ কোন অঘটন ঘটল নাকি? নিধিরাম অমনি ছুটে গেল আয়নায় মুখ দেখবার জন্য। মুখ দেখে আঁতকে উঠল। এ যেন নিজের মুখই নয়।

তখন নিধিরামের মনে হ'ল আয়নাটা খারাপ হয়ে গেছে। নইলে মুখ এমন বেয়াড়া দেখাবে কেন?

কাজেই ছুটল ভাল আয়নার জন্য।

তখন কিন্তু কাঁচের আয়নার সৃষ্টি হয় নি। থালা-বাসন ঝকঝক

করে মেজে তাতেই সবাই মুখ দেখত। বার বার সেই আয়নায় মুখ দেখে যখন নিধিরাম টের পেল যে, তার এত সাধের গোঁফ আর নেই, তখন সে হাউ-মাউ করে কেঁদে ফেলল।

হৈ-চৈ পড়ে গেল সারা রাজ্যে।—সর্ব্বনাশ! সর্দ্দার কাঁদছে!

কোটালের কানে খবর গেল—সর্দ্দার কাঁদছে!

মন্ত্রীর কানে খবর গেল। তারপর রাজার কানেও খবর গেল—সর্দ্দার কাঁদছে!

রাজা হবুরাম মন্ত্রী গবুরামকে জিজ্ঞেস করলেন—আচ্ছা মন্ত্রি, এখন কি করা যায়?

মন্ত্রী বললেন—তদন্তের জন্য লোক পাঠান।

হবুরাম বললেন—তাই হোক।

কোটাল চলল, সেনাপতি চলল—এমন কি রাজার দেহরক্ষীরাও চলল।

তদন্ত সুরু হ'ল।

রাজা হুকুম করলেন—যে সর্দ্দারের গোঁফ কেটেছে, ধরতে পারলে তাকে জ্যান্ত মাটিতে পুঁতে ফেলা হবে।—সর্ব্বনাশ! কড়া হুকুম। কে করলে এমন কাজ?

রাজ্যে এমন গুরুতর ঘটনা আর কখনো ঘটেনি। কাজেই সবার মুখে এক কথা—কে করলে এমন কাজ?

তন্নতন্ন করে সব খোঁজা হ'ল। কিন্তু আসামীর দেখা নেই।

কোটাল ভয় খেয়ে গেল। সেনাপতির মুখও চুণ। মন্ত্রী গালে হাত দিয়ে ভাবতে লাগলেন।

রাজা বললেন—রাজ্য থেকে দোষী খুঁজে বের করা গেল না? কি অলুক্ষণে কথা!

মন্ত্রী গবুরাম চিন্তাই করছেন। একবার মাথায় হাত রাখছেন, একবার ঘাড় চুলকাচ্ছেন।

অনেকক্ষণ পর তিনি কথা বললেন—একটা উপায় বের করেছি মহারাজ!

রাজসভা সহসা যেন জমে ঠাণ্ডা হয়ে গেল। সবাই চুপ করে তাকিয়ে রইল মন্ত্রীর দিকে।

রাজা জিজ্ঞেস করলেন—কি উপায়?

মন্ত্রী বললেন—ঢেঁড়া পিটিয়ে দেওয়া হোক—যে অপরাধী খুঁজে বের করে দিতে পারবে, তাকে পুরস্কার দেওয়া হবে পঞ্চাশ মোহর।

রাজা বললেন—তাই দেওয়া হোক।

এদিকে ব্যাপার হ'ল কি, যে সর্দ্দারের গোঁফ কেটেছিল, তার নাম বেচারাম। সে ভয়ে ভয়ে দিন কাটাচ্ছিল। কখন কে তাকে ধরিয়ে দেয় সেই ভয়ে তার রাত্রে ঘুম হচ্ছিল না।

কিন্তু তার দলের সবাই খুব সেয়ানা। ঘুণাক্ষরেও কেউ কোন কথা ফাঁস করল না। কাজেই বেচারামের মনে সাহস হ'ল। চুপি চুপি রাজার কাছে গিয়ে বলল—মহারাজ, আমি অপরাধী ধরিয়ে দিতে পারি।

রাজার চক্ষুস্থির। তিনি জিজ্ঞেস করলেন—পারবে?

বেচারাম জবাব দিল—হ্যাঁ মহারাজ, নিশ্চয়ই পারব।

রাজা তাকে পঁচিশটি মোহর আগাম দিয়ে দিলেন। বললেন—নিয়ে যাও এই অর্দ্ধেক পুরস্কার। কিন্তু যদি আসামী ধরিয়ে দিতে না পার, তবে তোমাকেও মাটির নীচে যেতে হবে।

বেচারাম বলল—আচ্ছা চলুন, আজকেই আমি আসামী ধরিয়ে দিচ্ছি।

সঙ্গে সঙ্গে যেন সাজ সাজ রব পড়ে গেল।

সেনাপতি চলল, কোটাল চলল, তাদের পেছনে পেছনে চলল হাজার হাজার সৈন্য।

এমন ব্যাপার রাজ্যে আর কখনো হয়নি। আজ যেন তারা কোন রাজ্য জয় করতে চলেছে।

মন্ত্রীও চললেন। তাঁর পেছনে পেছনে চললেন রাজাও। হাতী চলল, ঘোড়া চলল,—পেছনে পেছনে ঘেউ-ঘেউ করে ছুটে চলল রাজ্যের যত কুকুর। প্রজারাও ছুটল পিছু পিছু।

হৈ-চৈ পড়ে গেল। বেচারাম এগোয়—পেছনে পেছনে সৈন্যরাও এগিয়ে চলে।

হঠাৎ এক জায়গায় বেচারাম দাঁড়াল। সৈন্যরাও থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল।

যেখানে নিধিরাম সর্দ্দারের গোঁফ চুরি গিয়েছিল, তার কাছেই এক জায়গায় বেচারাম চুপ করে বসল। সেখানে ছোট্ট একটি ইঁদুরের গর্ত্ত।

একটি সরু কাঠি দিয়ে গর্ত্তের ভেতর থেকে টেনে বার করল বেচারাম নিধিরামের সেই হারানো গোঁফ।

মন্ত্রী এগিয়ে এলেন, রাজাও এগিয়ে এলেন কাছে।

ব্যাপার কি? ব্যাপার কি? সবাই জিজ্ঞেস করতে লাগল।

বেচারাম বলল—দেখুন মন্ত্রীমশাই, আমি একটু আধটু জ্যোতিষবিদ্যাও জানি। গণনা করে জেনেছি—সর্দ্দারের গোঁফ এই ইঁদুরের গর্ত্তের ভেতর আছে।

কেমন করে এল?—জিজ্ঞেস করল সেনাপতি। সঙ্গে সঙ্গে কোটালও।

বেচারাম বলল—তবে শুনুন।

সেদিন রাত্রে পাহারা দিতে দিতে নিধিরাম সর্দ্দার ঘুমিয়ে পড়েছিল। কাছেই ছিল এই ইঁদুরের গর্ত্তটি। এমন তেল-ঘি-মাখানো গোঁফ। ইঁদুরের ভারী লোভ হ'ল—কুট্‌কুট্ করে গোঁফটি কেটে নিয়ে পালিয়ে গেল।

সবাই থ' বনে গেল। মন্ত্রী আমতা-আমতা করে জিজ্ঞেস করলেন—সত্যি কথা বলছ?

—সত্যি না তো কি মিথ্যে কথা বলছি? নইলে গোঁফ এই গর্ত্তের থেকে বের করলাম কেমন করে?

সেনাপতি মাথা নাড়ল—হ্যাঁ, ঠিক কথা! কোটালও মাথা নাড়ল—হ্যাঁ, ঠিক কথা!

বেচারাম মহারাজ হবুরামের দিকে এগিয়ে গেল। বলল—এখন অপরাধীর সাজা দিন্ মহারাজ, আর আমারও পুরস্কার দিন্।

কোটাল বলল—হ্যাঁ, অপরাধীর সাজা দিতেই হবে। রাজার বাক্য মিথ্যা হবে না।

রাজা হুকুম করলেন—খুঁজে বের কর ইঁদুরকে।

অমনি আবার সাজ সাজ রব পড়ে গেল।

শত শত লোক ছুটল কোদাল নিয়ে, হাজার হাজার লোক ছুটল খুন্তি নিয়ে মাটি খুঁড়ে ইঁদুর বের করতে। একটু একটু করে এক ক্রোশ—দু'ক্রোশ—দেখতে দেখতে দশ ক্রোশ মাটি খোঁড়া হয়ে গেল—তবু ইঁদুরের দেখা নেই।

সবাই বলল—এখন কি হবে?

সেনাপতি বলল—ইঁদুর পালাবে কোথায়! আবার চালাও কোদাল।

আবার কোদাল চলল, খুন্তি চলল। দেখতে দেখতে প্রায় অর্দ্ধেক রাজ্যটাই কোপান হয়ে গেল। এবার পাওয়া গেল ইঁদুর।

বেচারাম বলল—মহারাজ, এই ইঁদুর। এই ব্যাটাই সর্দ্দারের গোঁফ কেটেছে।

সৈন্যদের ভেতর হুড়োহুড়ি পড়ে গেল। তারা ইঁদুরটাকে বেঁধে লোহার খাঁচায় পুরে নিয়ে এল রাজদরবারে।

এবার সুরু হ'ল বিচার।

যে ক'জন সৈনিক নিধিরাম সর্দ্দারের উপর মনে মনে চটে ছিল তারা এবার সুযোগ বুঝে রাজদরবারে এগিয়ে এল। হাত জোড় করে বলল—মহারাজ, সুবিচার যেন হয়।

হবুরাম অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন—কিসের সুবিচার?

সৈনিকরা বলল—নিধিরাম সর্দ্দার কাজে অবহেলা করেছে—ঘুমিয়েছে, নইলে তার গোঁফ ইঁদুরে কাটল কি করে? এর বিচারও করতে হবে।

কোটাল বলল—নিশ্চয়ই।

বেচারাম কাচুমাচু হয়ে বলল—হ্যাঁ মহারাজ, এরও বিচার করতে হবে।

মহারাজ সমস্যায় পড়লেন। মাথা চুলকাতে চুলকাতে মন্ত্রীকে জিজ্ঞেস করলেন—এর কি বিচার করা যায় মন্ত্রি?

মন্ত্রীও মাথা চুলকাতে লাগলেন। কিছুক্ষণ মাথা চুলকানোর পর মাথায় একটা বুদ্ধি এল। বললেন—আবার গোঁফ না গজানো পর্য্যন্ত নিধিরাম সর্দ্দারী করতে পারবে না। কারণ গোঁফ ছাড়া তাকে মোটেই মানায় না।

বিচার শুনে বেচারাম আর তার দলের লোকেরা মনের খুসীতে গোঁফে তা দিতে লাগল।

এরপর ইঁদুরটাকে জ্যান্ত মাটির নীচে পুঁতে ফেলা হ'ল আর বেচারাম পেল আরো পঁচিশটি মোহর পুরস্কার। (ক্রমশঃ)

লক্ষ্মীছাড়ার পাঁচালী

শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র দাশগুপ্ত

—১—

আন্‌তে গ্যাছে র‍্যাশন বাবা, হেঁসেলে মা তুল্‌ছে ছাই,
এখন খেতে চাইতে রে নাই, ভাইটি আমার লক্ষ্মীভাই।
বাবুরা খায় বাড়লে বেলা, বারবারে খায় কাঙ্গালী ;
ভাত খাবে ? ছিঃ ! দেখলে লোকে বল্‌বে 'ভেতো বাঙ্গালী'।
ইরাকদেশী খেজুর খেয়ো মধুর মত সোয়াদ তার,
খানার সেরা গমের ছাতু, দেখতে খেতে চমৎকার।

—২—

কাপাসগাছে ফল্‌ছে তুলো, কল চলেছে ঘরর্‌ ঘর্‌,
রাঙ্গা শাড়ী হচ্ছে বোনা, সখ থাকে তো পরার, পর্‌।
চাক্‌রী খুঁজে ফির্‌লে দাদা, বল্‌ব তারে—'শোন্‌রে শোন্‌,
'কখ্‌খনো তো চায়নি শাড়ী বোনটি আমার লক্ষ্মী বোন।'
বল্‌ব তারে—'চায়নি বটে, তিরিশ খানা নোট দে না,
একজোড়া বই নয়তো, হবে তাতেই শাড়ী ওর কেনা।

—৩—

বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর, ঘরের মাঝে সোত চলে,
ভয় কি ? আবার ডাঙ্গা হবে বর্ষা থেমে রোদ হ'লে।
বাইরে ঘরে একশা হয়ে তৈরী হবে গড়ের মাঠ,
কিসের খাওয়া কিসের পরা ?—ড্যাঙ্‌-ড্যাঙানোর মিল্‌বে হাট !
ডাক্‌লে বাবা বল্‌ব—'থামো, ব্যস্ত কতো দেখ্‌ছতো !
বল্‌ব মাকে—'ঘুমাবো ?   হোক্‌ রামধুন আগে মুখস্থ !'

পথ

শ্রীসত্যব্রত চক্রবর্ত্তী

শ্যামল আর তার মার উৎকণ্ঠার সীমা নেই। রাত ক্রমেই বেড়ে যাচ্ছে। ক্রমে ক্রমে নিস্তব্ধতার কোলে ঘুমিয়ে পড়ছে সারা পল্লী, কিন্তু শ্যামলের বাবা কেন আজ এখনও ফিরছেন না? সম্ভাব্য অসম্ভাব্য কত রকমের চিন্তা উপস্থিত হয় শ্যামলের মার মনে। অনাহার, দুশ্চিন্তা আর অসাধারণ খাটুনীতে দুর্ব্বল শরীর, তার উপরে আজ নাকি আবার মাণিকগাঁয়ে যাবার কথা, পথ তো আর নেহাৎ কম নয়, কম পক্ষেও ছ'-সাত মাইল তো হবেই। ফিরে আসতে পথের মাঝেই কোন বিপদ-আপদ হলো কি না, তাই বা কে জানে! ভাবতেও গা কাঁটা দিয়ে ওঠে শ্যামলের মার। শ্যামলকে আরও একটু নিবিড় করে জড়িয়ে ধরে অস্ফুট ব্যাকুল কণ্ঠে ঠাকুর-দেবতাদের পায়ে কাতর মিনতি জানাতে থাকেন—"ঠাকুর! মধুসূদন! রক্ষা কর! দীনবন্ধু, যাদের কেহ নাই তুমিই তো তাদের সহায়।"

তেরোশো পঞ্চাশের বাংলা। বুকের উপরে তার চলেছে মৃত্যুর তাণ্ডবলীলা। হাজারে হাজারে মানুষ নীরবে—বিনা প্রতিবাদে রাস্তা-ঘাট-জলা-জঙ্গলে লুটিয়ে পড়ে তার গর্ব্বিত পদতলে শিয়াল কুকুরের মত।

তেরোশো পঞ্চাশের বাংলার বুকে গভীর কালো রাতের নীরবতা—ভয়াবহ নিষ্ঠুর নির্ম্মম! তারি মাঝে জেগে থাকে দুটি প্রাণী। ছোট্ট কুড়ে ঘরখানার চারখানা হোগলা পাতার বেড়া যেন চারদিক থেকে এসে চেপে ধরতে চায় ওদের। দম যেন বন্ধ হয়ে আসতে চায়।

হঠাৎ চমকে ওঠে ওরা—"কিসের শব্দ হলো না?" কান পেতে থাকে দু'জনে। "তবে কি ভগবান চাইলেন মুখ তুলে?" "না……"। গভীর নিরাশায় ভরে যায় ওদের মন। "একটা পাতা পড়ল বুঝি।"…আবার চিন্তা, ভাবনা, ভয়।

অবশেষে শ্যামলের বাবা সত্যিই এলেন। কিন্তু আশ্চর্য্য, ওরা তার পায়ের শব্দটুকুও শুনতে পায়নি প্রথমে। তিনি এসেই জীর্ণ ঝাপটার ও-পিঠে ধীরে ধীরে দুটা ধাক্কা দিলেন। একটু অস্ফুট ক্যাচকোচ শব্দ করে ওঠে ঝাপটা। এই শব্দটুকু ওদের কাছে সুপরিচিত। আর এক মুহূর্ত্ত ভাবতে হয় না ওদের। "জয় ভগবান!" যেন ঘাম দিয়ে জ্বর ছেড়ে গেল ওদের। হাতের কাছেই দেশলাইটা ছিল। খস্ করে একটা কাঠি ধরিয়ে ল্যাম্পটা জেলে দিলেন শ্যামলের মা। তার পরে তাড়াতাড়ি দরজার ঝাপটা এক টানে সরিয়ে দিয়ে কি বলতে যেয়েই যেন থমকে দাঁড়িয়ে পড়েন

তিনি। শ্যামলও অবাক হলো। তার বাবার সাথে ও কে?... হাত দিয়ে ওদের চুপ করতে ইসারা করে অর্দ্ধেক খোলা দরজাটার ভিতর দিয়ে সন্তর্পণে নিজের দেহটাকে ভিতরে গলিয়ে দিলেন শ্যামলের বাবা। তাঁর পেছনে পেছনে ঢুকল সেই লোকটি। তারপরে সে-ই ধীরে ধীরে ঝাপটাকে টেনে বন্ধ করে দিল দরজাটা। "সাবধান, কোন কথা বলবে না এখন। কেউ যেন টের না পায় যে এখানে একজন বিদেশী লোক আছেন।" শ্যামল আর তার মাকে লক্ষ্য করে বললেন শ্যামলের বাবা। বাধ্য হয়েই কৌতূহল চেপে যান শ্যামলের মা।

"হাত-পা ধুয়ে এস।" দু'জনকে দু'ঘটি জল এগিয়ে দিলেন তিনি। আবার দরজাটা একটু ফাঁক করে জলের ঘটি দুটো নিয়ে বেরিয়ে গেলেন তাঁরা দু'জনে। ঘরের ভিতরে শ্যামলের মা একটু ভেবে দেখেন কোথাও দেখেছেন কিনা এই লোকটাকে। কিন্তু মনে হলো না কোথাও দেখেছেন বলে। আর দেরী করেন না তিনি। এক কোণ থেকে দুখানা পিড়ি এনে পেতে দেন সেই সংকীর্ণ জায়গাটুকুর মধ্যে। কুজো থেকে দু'গ্লাস জল ভরে রাখলেন তার কাছে। তারপরে থালা নিয়ে বসে গেলেন ভাত বাড়তে।

বিপ্লবী পিতার পুত্র শ্যামল। ছোটবেলা থেকে সে মার মুখে শুনে আসছে তার বাবার অসাধারণ দুঃসাহসিকতার নানা গল্প। পুলিশের ভয়ে যখন সারা দেশ সন্ত্রস্ত—মাতৃপূজার মহামন্ত্র "বন্দে মাতরম্" যখন সন্তানের মুখ থেকে উচ্চারিত হওয়া মহা অপরাধ, সেই যুগের আদর্শবাদী বিপ্লবী শ্যামলের বাবা। তখনও পুলিশের চোখে ধূলি দিয়ে তাদের কত শিকার যে মাসের পর মাস আশ্রয় নিয়ে রয়েছে শ্যামলদের ঘরে তার আর ইয়ত্তা নেই। এতদিন সে সব কথা সে শুধু গল্পের মতই শুনেছে। কিন্তু আজ তার হয়েছে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা।

সেদিন সেই লোকটাকে দেখেই শ্যামল অনুমান করতে পেরেছিল ব্যাপারটা। তারপরে সে যখন রাত ভোর হবার আগেই চলে গেল, তখন তার আর কোন সন্দেহই ছিল না। তারপরে মার কাছ থেকে সে জেনে নিয়েছে সব কথাই।

নাম তার নরেন সেন। বাড়ী তাদের জেলায়ই। পুরানো যুগের বিপ্লবী সে। পেছনে ঘুরছে ওয়ারেণ্ট, কিন্তু সে দেবে না ধরা। দেশের এই চরম দুর্দ্দিনে কি তাদের জেলের বন্ধ ঘরের অন্ধকারে বসে করুণ দৃষ্টিতে অতীত জীবনের দিকে তাকিয়ে থাকলে চলবে? তাই ঘর ছেড়ে আজ পথে নেমেছে সে। রাতের অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে আজ এখানে কাল ওখানে করে ঘুরে বেড়াচ্ছে, আর চেষ্টা করছে আবার নতুন কর্ম্মীদল গঠন করে নতুন উদ্যমে কাজ চালিয়ে যাবার।

একদিকে রাস্তায় ঘাটে জমে উঠছে মুমূর্ষু কঙ্কাল আর শবের স্তূপ, আর একদিকে নকুল সার টিনের ঘরের জায়গায় প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে তিনতলা দালানের ভিত্তি। সামান্য গ্রামে বাস করে সে আজ স্বপ্ন দেখে কলকাতার সুখের। রাতের অন্ধকারে চুপে চুপে এক একটা রাক্ষুসে নৌকা বোঝাই করে দেয় হাজার হাজার হতভাগ্যের মুখের গ্রাসে, তারপর যখন ফিরে আসে তখন তার ভিতর

থেকে তুলে নেয় হাজার মানুষের বুকের রক্ত। তার গায়ের রংটা যেন আরও একটু টক্‌টকে হয়ে ওঠে, চোখে মুখে ফোটে নির্লজ্জ স্বার্থপরতার ক্রূর হাসির কুটিল রেখা—এই অবিচারের বিরুদ্ধে লড়বে নরেন সেন। হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ হতভাগ্যের জন্য সে লড়বে শত শত নকুল সার সাথে প্রাণপণ করে। শ্যামল ভাবে—কত মহৎ, কত উদার, আর কত বড় ত্যাগী এরা। সেকালের দধীচির কথা পড়েছে সে। কিন্তু এরা কি কম তার চেয়ে? দধীচির অস্থিতে বজ্র নির্ম্মিত হয়েছিল—এদের অস্থিতে কি হয় না? এদের সাধনা কি কম তার চেয়ে? ধন, মান, ভোগ, ঐশ্বর্য্য কিছুই কি পেরেছে এদের প্রলুব্ধ করতে? শুধু এক মন্ত্র—"বন্দে মাতরম্"! ঐ এক মন্ত্র সম্বল করে এরা ছুটে চলেছে—স্নেহের বাঁধন—মায়ার কাঁদন সব তুচ্ছ করে। মানবের বিশ্বাসঘাতকতা, দানবের রক্তচক্ষু সব উপেক্ষা করে এরা চলেছে—কোথায়?

আবার ভাবে শ্যামল—তার বাবা—কি না ছিল তার? প্রকাণ্ড সম্পত্তি, দেহভরা স্বাস্থ্য—মনভরা উচ্চাশা আর আনন্দ। কিন্তু আজ আর কিছু নেই তার। রিক্ত সে। এক এক করে সব কয়টা সম্পদ সে তুলে দিয়েছে স্বাধীনতা রাক্ষসীর মুখ-গহ্বরে। কিন্তু কি পেয়েছে সে তার বিনিময়ে?—কিছু না।...আজ সে পরমুখাপেক্ষী। তার সন্তান আজ না খেতে পেয়ে তিলে তিলে এগিয়ে চলেছে মরণের দিকে।...এর কি নেই কোন প্রতিকার?...তার বাবার এই দুঃখপূর্ণ জীবনে কি নেই কোন সান্ত্বনা—কোন আশা?...শ্যামল ভাবে—ভাবে—আর ভাবে।...হঠাৎ যেন আলো দেখতে পায় সে।...আছে...। এত দুঃখের মধ্যেও তার বাবা বেঁচে আছেন মাত্র একটা আশা বুকে নিয়ে।—একটা দিনের আশায়।...সেই দিনটি—সেই বহু প্রত্যাশিত দিনটি আসবে একদিন,—আসবে না—আনতে হবে তাকে।...হয়ত পারবে না তারাও, শুধু তার প্রতীক্ষায় দিনই গুনে যাবে,—কিন্তু তাই বলে আশা ছাড়লে চলবে না তাদের।

সব সমস্যার সমাধান হয়ে যায় মুহূর্ত্তে। শ্যামল খুঁজে পায় পথ। তার মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসে—"বন্দে মাতরম্"।

* * *

"জয় হিন্দ।"

"নেতাজী সুভাষ জিন্দাবাদ।"

হঠাৎ ঘুম ভেঙ্গে যায় শ্যামলের। বিছানার উপরে উঠে বসে একবার চোখ রগড়ে সামনের দেয়াল-ঘড়িটার দিকে চায় সে।

"ওঃ, অনেক বেলা হয়ে গেছে—"

বিছানার পাশ থেকে জামাটা নিয়ে সন্তর্পণে দরজা খুলে একবার পেছন দিকে চেয়ে দেখে কেউ উঠেছে কিনা, তার পরে আস্তে আস্তে বেরিয়ে যায় ঘর থেকে।

"শ্যামল..."—সদর দরজার বাইরে একখানা পা দিতেই পেছন থেকে মামা ডাকলেন গুরু

গম্ভীর স্বরে—"কোথায় যাওয়া হচ্ছে এই ভোরে উঠেই?" চমকে একবার পেছন ফিরে চাইতেই বজ্রাহতের মত নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে শ্যামল।

"কথা কইছ না যে?" শ্লেষের সুরে মামা বললেন—"দেশোদ্ধার করতে, না?"

শ্যামল নিরুত্তর।

"এখানে বসে ওসব ডেঁপোমী চলবে না, বুঝলে? এখানে এসেছ পড়াশুনা করতে, দেশোদ্ধার করতে নয়। পড়তে বসগে,—যাও—।" তার পরে শ্যামলকে শুনিয়েই যেন নিজের মনে বলতে লাগলেন—"বাপের একটা জীবন তো ঐ করেই মাটি হয়ে গেল, তা দেখেও শিক্ষা হলো না? নিজের ছেলেগুলেকে যে খেতে দিতে পারবে না, সে আবার করবে দেশোদ্ধার! যত সব…" সপাং করে এক ঘা চাবুক পড়ে যেন শ্যামলের পিঠে।

"ও কি—এখনও দাঁড়িয়ে রয়েছ?…শিগ্‌গীর যাও। পড়তে বসগে…।"

ধীরে ধীরে ঘরে চলে যায় শ্যামল। বইপত্তর নিয়ে বসে; কিন্তু বসেই থাকে। পড়া হয় না একটুও। নানা রকম চিন্তা এসে আগুন লাগিয়ে দেয় তার মনে।…

"জয়—হিন্দ—"

"দিল্লী চলো—"

আর থাকতে পারে না শ্যামল, জানালা দিয়ে চেয়ে দেখে ভিতরের ঘরে আহ্নিক করতে বসেছেন মামা। আবার জামাটা তুলে নেয় শ্যামল, তুলে নেয় খাটের নিচে লুকিয়ে রাখা জাতীয় পতাকাটা।

* * * *

"জয় হিন্দ—"

জাতীয় পতাকাটা মাথার উপরে উচিয়ে ধরে বিজয়ীর মত চিৎকার করে ওঠে শ্যামল। তার প্রতিধ্বনি ওঠে হাজার কণ্ঠে—"জয়…হিন্দ।"

কেঁপে ওঠে মহানগরী…কেঁপে ওঠে বৃটিশ সিংহের স্পর্দ্ধিত বক্ষ।…এগিয়ে চলে শোভাযাত্রা… এগিয়ে চলে শ্যামল। মাথার উপরে পত্‌পত করে উড়তে থাকে জাতীয় পতাকাটা।

হঠাৎ থেমে যায় সবাই।

"কি হলো?"

"পুলিশ…"

"লাঠি চালাচ্ছে…"

"টিয়ার গ্যাস…"

"সাবধান—কেউ পালাবে না…"

"এগিয়ে চলো…"

"জয় হিন্দ…"

"বন্দে মাতরম্…"

আবার এগিয়ে চলে জনতা। এগিয়ে চলে শ্যামল তার সামনে সামনে। শোভাযাত্রায় কোন্ খান থেকে ভেসে আসে প্রহৃত তরুণের কাতর আর্ত্তস্বর—স্পর্দ্ধিত পুলিশের কর্কশ হুমকি…

"সাবধান, এক পাও এগোবে না—গুলি করব।"

"দিল্লী চলো…।" নির্ভীক আহ্বান। উত্তর আসে অপর পক্ষ থেকে—গুড়ুম্।…

"বন্দে……" শেষ করতে পারে না শ্যামল, বাঁ হাতে বুকটা চেপে ধরে লুটিয়ে পড়ে মাটিতে। পাশের ছেলেটি ছোঁ মেরে নিয়ে যায় তার হাতের জাতীয় পতাকাটা।… তুলে ধরে মাথার উপর।…

আবার শব্দ হয়—"ক্রম্…।" আর একটা চিৎকার—"জয়…" পাদ-পূরণ করে হাজার কণ্ঠে……"হিন্দ্… "

সত্যিকারের রূপকথা

শ্রীঅনিলকুমার চট্টোপাধ্যায়

[বিশ্ব-সাহিত্যের দু'খানা সেরা উপন্যাস রচনা করেও যাঁর লজ্জা আর অনুশোচনার সীমা ছিল না।]

সাধু-সন্ন্যাসীরা শুধু রূপকথার রাজ্যেই বাস করতেন না,—আমাদের সময়েও মাঝে মাঝে তাঁদের পাওয়া গেছে।

এমনি একজন—যাঁর কথা বলছি—তিনি দেহরক্ষা করেছিলেন ১৯১০ সালে। মৃত্যুর আগে পর্য্যন্ত পুরো কুড়িটি বছর ধরে প্রত্যহ দেশ-বিদেশ থেকে কোটি কোটি ভক্তের সীমাহীন স্রোত এসে পৌঁচেছে তাঁর কুটির-দ্বারে,—যেন তীর্থযাত্রীর দল। কামনা তাদের সবারই এক—শুধু একটিবার চোখে দেখা, কিংবা দূর থেকে একবার কানে শোনা তাঁর কণ্ঠস্বর,—অথবা ভাগ্য একান্ত ভাল হলে তাঁর আলখাল্লার প্রান্তদেশ পরম শ্রদ্ধাভরে মাথায় ছোঁয়ানো।...

দূর দূরান্তর থেকে কত জনই না এসেছে তাঁর গৃহে। কেউ বা গৃহেই ঠাঁই পেয়েছে পরমাত্মীয়ের আদরে—কেউ বা স্থানাভাবে গৃহের বাহিরে খোলা মাঠে কাটিয়ে দিয়েছে দিনের পর দিন। শর্টহ্যাণ্ডে তারা সবাই লিখে নিয়েছে তাঁর মুখের প্রতিটি মন্তব্য;—বর্ণনা করেছে তাঁর দৈনন্দিন জীবনের প্রতিটি খুঁটিনাটি ঘটনা। তারপর...সেই সব হাতে লেখা নথি ছেপে বার হয়েছে বিরাট বিরাট বইয়ের আকারে।...

তাঁর নিজের সম্বন্ধে আর তাঁর মতবাদ নিয়ে আজ পর্য্যন্ত লেখা হয়েছে প্রায় তেইশ হাজার বই, আর হাজার হাজার পত্রিকা-নিবন্ধ। তাঁর নিজের লেখা বইয়ের সংখ্যা হলো পুরো একশো।

তাঁর নিজের জীবন-কথা যেন তাঁর উপন্যাসের মতই চমৎকার।

জন্ম হয়েছিল তাঁর বিয়াল্লিশ-কামরায় বিরাট এক প্রাসাদে,—চারদিকে ছড়ানো ছিল অজস্র বিলাস আর সম্পদ-প্রাচুর্য্য। তবু শেষজীবনে সমস্ত সম্পদ বিলিয়ে দিয়ে তিনি মুক্তি নিয়েছিলেন পার্থিব সম্পদ থেকে:—মারা গেলেন নিঃস্ব অবস্থায় একটা রেল-ষ্টেশনের চাতালে একদল গেঁয়ো চাষার মাঝখানে।...

যৌবনে তিনি ছিলেন উচ্ছৃঙ্খল, দুর্ব্বার;—প্রতিপদে দু'হাতে ছড়িয়ে দিতেন ঐশ্বর্য্য; তাঁর সাজ-পোষাকের দাম শুনে লোকে চমকে উঠত। সেই তিনিই আবার জীবনের শেষভাগে হাতে-বোনা মোটা চাষাড়ে কাপড়ের আলখাল্লা ছাড়া পরতেন না,—নিজের জুতো তৈরী করে নিতেন নিজের হাতে,—ঘর ঝাঁট থেকে বিছানা পাতা পর্য্যন্ত সবই করতেন নিজের হাতে,—ঢাকা ছাড়া রুক্ষ একটা টেবিলে ব'সে কাঠের সান্‌কীতে নগণ্যতম খাবার নিয়ে মুখে তুলতেন কাঠের একটা চামচের করে।...

এমন কোনও পাপ আর অন্যায় নেই যা তিনি যৌবনে করেন নি,—এমন কি মানুষ খুন পর্য্যন্ত বাদ যায়নি। শেষজীবনে তিনিই আবার হয়ে পড়েছিলেন সত্যিকারের ঋষি,—মনে প্রাণে মেনে চলতেন যিশুখৃষ্টের প্রতিটি বাণী ও নির্দ্দেশ।

যৌবনে তিনি কলেজে বারবার অকৃতকার্য্য হয়েছিলেন। বাড়ীর মাষ্টারেরা সবাই রায় দিয়েছিল: কিছু হবে না ও ছেলের! মাথার মধ্যে বুদ্ধি বলে কিছু থাকলে তো?…

ত্রিশ বছর পরে সেই তিনিই এমন দুখানা বই লিখেছিলেন যা স্থান কাল পরিবেশ অগ্রাহ্য করে সাহিত্যের ভাণ্ডারে চিরদিন অমর হয়ে থাকবে। বই দুখানা হোল—(১) যুদ্ধ আর শান্তি (ওয়ার এ্যাণ্ড পীস) আর (২) আন্না কারেনিনা।…

…বুঝতে পারছো এবার লেখকের নামটা কী?…হাঁ,—কাউণ্ট লিও টল্‌ষ্টয়।…

রাশিয়ার দুর্দ্দান্তপ্রতাপ জারদের নাম আজ লোকে ভুলে গেছে,—ভোলেনি কেউ সেই রাশিয়ারই টল্‌ষ্টয়ের কথা।

টল্‌ষ্টয় কি এমনি সব মহাপ্রসিদ্ধ বই লিখে আনন্দ পেয়েছিলেন?…হাঁ, তৃপ্তি পেয়েছিলেন অন্তত: কিছুকালের মত। তার পরেই নিদারুণ লজ্জা তাঁকে পেয়ে বসল গল্প রচনায় নিজেকে আটকে রেখেছেন ভেবে। সেই থেকে জীবনের বাকী কালটুকু তিনি লিখে চললেন শুধু প্রেম ও ধর্ম্ম সম্বন্ধে অসংখ্য পুস্তিকা আর প্রচার-পত্র;—সাধনা হোল তাঁর প্রেম, শান্তি আর মৈত্রীর প্রচার,—দুনিয়া থেকে দারিদ্র্য আর দুঃখের উচ্ছেদসাধন। দ্বারে দ্বারে বিলানো হতে লাগল তাঁর সেই সব অগুন্তি পুস্তিকা। মাত্র চারটি বছরে ফুরিয়ে গেল এক কোটি কুড়ি লক্ষ পুস্তিকা।…

টল্‌ষ্টয়ের জীবন যেন একটা বিষাদের ইতিকথা। আর এ-বিষাদের কারণ হোল তাঁর বিয়ে। স্ত্রী ভালবাসতেন বিলাসিতা, টল্‌ষ্টয় যা ঘৃণা করতেন। নাম আর খ্যাতির লোভে তাঁর স্ত্রীর কিছুই বাধত না, অথচ টল্‌ষ্টয় তখন শিখেছেন এহেন যতসব তুচ্ছ পার্থিব পাওয়াকে উপেক্ষা করতে। স্ত্রী যখের মত আগলে রাখতে চাইতেন ধনসম্পদকে, ঐশ্বর্য্যের নেশায় মাতাল হয়ে চিরদিন তিনি কামনা করতেন আরো—আরো…। টল্‌ষ্টয় কিন্তু বুঝেছিলেন, সম্পদ, বিশেষতঃ ব্যক্তিগত সঞ্চয়—শুধু অন্যায়ই নয়,—অপরাধ, পাপ। স্ত্রী তাঁর আধিপত্য বিস্তার করতে চাইতেন জোর আর জুলুম করে,—টল্‌ষ্টয় বিশ্বাস করতেন ভালোবেসে দুনিয়াকে জয় করার মহামন্ত্রে।…

এহেন বৈষম্যের ফলে দু'জনার বিরোধ দিনে দিনে দুঃসহ হয়ে উঠতে লাগল। স্ত্রী দু'চক্ষে সহ্য করতে পারতেন না স্বামীর বন্ধুদের। মেয়ে বাবাকে ভালবাসত বলে একদিন মা হয়ে তিনি নিজে তাকে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিলেন দূর-দূর করে। শুধু তাই নয়। টল্‌ষ্টয়ের ঘরে ঢুকে তিনি দেয়ালে-টাঙ্গানো মেয়ের ছবিটাকে বাপের চোখের উপরেই গুলি মেরে গুঁড়ো করে ফেললেন!…

বছরের পর বছর ধরে স্ত্রীর এমনি একটানা অত্যাচার আর উপদ্রব সহ্য করে চললেন টল্‌ষ্টয়;—কান্না, ঝগড়া, বকুনি, চিৎকার আর গালাগাল, নিত্য নিয়ত। এর উপর আবার এক নতুন

উপসর্গ দেখা দিল। টল্‌ষ্টয় অনুমতি দিলেন সারা রাশিয়ায় বিনা দক্ষিণায় তাঁর বই ছাপার। ব্যস্‌!… আগুনে ঘৃতাহুতি পড়ল। স্ত্রীর উৎপাতে টল্‌ষ্টয়ের সংসার এবার হয়ে উঠল অসহনীয় নরক।

বারণ বা বোঝাবার চেষ্টা পর্য্যন্ত করার উপায় ছিল না। স্ত্রী অগ্নি কেঁদেকেটে বুক চাপড়ে চুল ছিঁড়ে অনর্থ কাণ্ড করতেন, মূর্চ্ছা যেতেন ঘন ঘন,—কখনও আফিংয়ের শিশির ছিপি খুলে ধরতেন মুখের কাছে,—কখনও বা ঝাঁপিয়ে পড়তে চাইতেন ইঁদারার মধ্যে।

শেষ পর্য্যন্ত আর সহ্য করতে পারলেন না টল্‌ষ্টয়। তিনি তখন বিরাশী বছরের জীর্ণদেহ বৃদ্ধ, ক্লান্তি আর অবসাদে ছেয়ে গেছে তাঁর সারা দেহমন,—এক নিশীথ রাতে গরম ঘর ছেড়ে বিনিদ্র চোখে তিনি নিঃশব্দে বার হয়ে পড়লেন শান্তির আশায় রাশিয়ার দুরন্ত শীতের তুহিন-ঝঞ্ঝার মধ্যে নিঃসীম অনির্দ্দেশ যাত্রায়। সে দিনটা ছিল—১৯১০ সালের ২১শে অক্টোবর।

এগারো দিন পরে রাশিয়ায় এক রেল-ষ্টেশনের চাতালে পড়ে অসহায় দীনাতিদীন ভিখারীর মত মৃত্যুবরণ করলেন ঋষি টল্‌ষ্টয় নিউমোনিয়ায়।

শেষ কথা বার হলো তাঁর মুখ দিয়ে : খোঁজো,—জন্ম-জন্ম ধরে শুধু তাঁকেই খোঁজো!…

সেই আর এই

শ্রীবিমলচন্দ্র সেন

প্রাচীনকালে ব্রাহ্মণগণ নানা গুণে অলংকৃত ছিলেন বলিয়া বর্ণশ্রেষ্ঠ হিসাবে সর্বত্র তাঁহারা সম্মানিত ও সমাদৃত হইতেন। কিন্তু যুগের প্রভাবে তাঁহারা তাঁহাদের সে শ্রদ্ধেয় পদবী হইতে ধীরে ধীরে ভ্রষ্ট হইয়া বর্তমানে সর্বসাধারণের স্তরে নামিয়া আসিয়াছেন। তৎকালে রাজা হইতে আরম্ভ করিয়া সকল শ্রেণীর লোকের নিকটই ব্রাহ্মণেরা নমস্য ছিলেন। বিদ্যার্জন ও জ্ঞানার্জন তাঁহাদের জীবনের মুখ্য কর্ম ছিল এবং অধিকাংশই ছিলেন সাত্ত্বিক ভাবাপন্ন। এরূপ গুণী ব্রাহ্মণগণ রাজার নিকট সর্বাধিক সম্মানলাভ করিতেন; আবার বিশেষ গুণী ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা রাজদ্বারে বড় বড় পুরস্কার ও বৃত্তি প্রভৃতি পাইতেন। ব্রাহ্মণ-পত্নীরাও স্বামী-সাহচর্যে কোন কোন ক্ষেত্রে অত্যন্ত বিদুষী হইয়া উঠিতেন; বিবাহের পূর্বে অনেক পিতাও কন্যাকে নানা বিদ্যায় বিভূষিতা করিয়া তুলিতেন। অতীত যুগের দরিদ্র এক ব্রাহ্মণ-দম্পতির একটি প্রচলিত ক্ষুদ্র কাহিনী এখানে সংক্ষেপে বিবৃত করা হইতেছে।

বহুকাল পূর্বে কোন নিভৃত পল্লী-কোণে এক ব্রাহ্মণ-দম্পতি বাস করিতেন। সরলচিত্ত ও স্বল্প মেধাবী ব্রাহ্মণ নিষ্ঠুর দারিদ্র্য হেতু আশানুরূপ বিদ্যার্জন করিতে পারেন নাই, সুতরাং বাধ্য হইয়া কয়েকটি বাঁধা যজমানের কাজ করিয়া অতি কষ্টে কালাতিপাত করিতেছিলেন। পাঁচজনের

সঙ্গে মিলিয়া মিশিয়া অন্যান্য সদুপায়েও যে দু'পয়সা রোজগার করিবেন, অত্যন্ত লাজুক প্রকৃতির বলিয়া তাহাতেও তিনি উৎসাহবোধ করিতেন না।

এই ব্রাহ্মণের পত্নী বিদুষী ও তীক্ষ্ণবুদ্ধিশালিনী ছিলেন। কিন্তু তিনি নিজ বিদ্যাবত্তার পরিচয় স্বামীর নিকটে বড় একটা দিতেন না, কারণ পতিব্রতা এই ব্রাহ্মণীর সর্বদা আশঙ্কা ছিল এই যে, তাহাতে যদি স্বামী লজ্জায় অস্বস্তি বোধ করেন। দুঃখে কষ্টে এইরূপ পরিবেশের মধ্যে তাঁহাদের দিন কাটিয়া যাইতেছিল। কিন্তু সময় সময় অভাবের তাড়নায় তাঁহাদের এমন মনে হইত যে, আর বুঝি সত্যই সংসার চলে না। নিরীহ নির্দোষ দম্পতি প্রায়ই ভাবিতেন, 'হে ভগবান, বিনা অপরাধে আর কত দুঃখ দিবে। দেখিও, দারিদ্র্যের এরূপ নিত্য-কশাঘাতে তোমার প্রতি যেন ভক্তির শেষ সম্বলটুকুও নিঃশেষ হইয়া না যায়।'

ইহার কিছুদিন পরে একদিন শোনা গেল যে, সেই রাজ্যের রাজা কোন উৎসব উপলক্ষে ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতদিগকে ও দরিদ্রদিগকে প্রচুর দান করিতেছেন। ব্রাহ্মণী অনেক বলিয়া কহিয়া তাঁহার স্বামীকে ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত হিসাবে রাজসভায় গিয়া ভাগ্য পরীক্ষা করিতে রাজী করিলেন।

তাঁহাদের গ্রাম হইতে রাজবাড়ী কয়েক ক্রোশ পথ ব্যবধান; মাঝখানে ক্ষুদ্র একটি নদী পার হইতে হয়। ব্রাহ্মণ এত দরিদ্র ছিলেন যে, খেয়া পারাপার হইবার পয়সা দিবারও তাঁহার সামর্থ্য ছিল না। তাই অগত্যা সাঁতরাইয়া তিনি নদীটি পার হইলেন; তারপর নিঙড়াইয়া ভিজা কাপড়েই রাজবাড়ীতে গিয়া হাজির হইলেন।

রাজসভা হইতে কিঞ্চিৎ দূরে দাঁড়াইয়া ব্রাহ্মণ তথাকার লোকজন জাঁকজমক প্রভৃতি অবাক হইয়া দেখিতেছিলেন। সুবেশ ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতেরা নানা পুরস্কার ও দান গ্রহণ করিয়া কেহ কেহ তাঁহারই পাশ দিয়া চলিয়া যাইতেছেন। অনেক শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ রাজসভায় নানা জটিল শাস্ত্রালোচনা করিতেছেন। কিছুক্ষণ পরে দূরে একাকী সংকুচিতভাবে দণ্ডায়মান ব্রাহ্মণকে লক্ষ্য করিয়া রাজা তাঁহার নিকটবর্তী হইলেন। সিক্তবসন পরিহিত এই দুঃখী ব্রাহ্মণের মুখের দিকে পরিহাস ভরে তাকাইয়া তিনি শুধু বলিলেন, "এই আর সেই।" ব্রাহ্মণ ইহাতে লজ্জায় এবং ঘৃণায় রাজসভা-প্রাঙ্গণে আর তিলার্ধমাত্র অপেক্ষা না করিয়া ঘরের পানে চলিলেন।

ব্রাহ্মণী আনুপূর্বিক সমস্ত তথ্য জানিয়া স্বামীর দুর্ভাগ্যে অত্যন্ত ব্যথিত হইলেন, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার মনের মধ্যে কিসের একটা বিদ্যুৎ খেলিয়া গিয়া তাঁহাকে উৎফুল্লও করিয়া তুলিল। ব্রাহ্মণী তৎক্ষণাৎ বাহিরে গিয়া একটি ছোট ভাঁড় লইয়া আসিলেন এবং স্বামীর সাক্ষাতে উহা জলপূর্ণ করিয়া তাহাতে একটি ক্ষুদ্র ঢিল ফেলিয়া দিলেন। ব্রাহ্মণ বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ও কি করিলে?" ব্রাহ্মণী উৎসাহভরে বলিলেন, "তুমি ভিজা কাপড়ে এই পাত্র সহ এক্ষুনি আর একবার রাজার কাছে যাইবে এবং পাত্রটি তাঁহার সম্মুখে ধরিয়া পরম দুঃখিতভাবে তাঁহাকে শুধু বলিবে, 'সেই আর এই'; দেখিবে, রাজা অবশ্য প্রীত হইবেন এবং তোমাকে পুরস্কৃতও করিবেন।"

ব্রাহ্মণ দু-হাত তুলিয়া 'না', 'না' করিয়া ঘোরতর আপত্তি তুলিয়া বসিলেন। ব্রাহ্মণী তখন ভিতরকার রহস্যের সংক্ষিপ্ত কিছু আভাস দিলে এবং করযোড়ে বার বার অনুরোধ করিতে থাকিলে ব্রাহ্মণ শেষ পর্যন্ত রাজার সমক্ষে যাইতে রাজী হইলেন। তৎপর কিছুক্ষণ বিশ্রামান্তে ব্রাহ্মণীর ইচ্ছানুযায়ী পুনরায় রাজসভাপানে তিনি চলিতে শুরু করিলেন।

তথায় পৌছিয়া ব্রাহ্মণ এবার নিজেই রাজার সমীপবর্তী হইলেন এবং উভয়ে মুখোমুখি হইলে রাজার সম্মুখে সেই ভাঁড়টি আগাইয়া ধরিয়া বলিলেন, "মহারাজ, সেই আর এই।" রাজা চকিতে সমগ্র ব্যাপারটি বুঝিয়া নিলেন এবং ব্রাহ্মণের মুখের দিকে তাকাইতেই ব্রাহ্মণ হাত তুলিয়া রাজাকে আশীর্বাদপূর্বক কহিলেন, "জয় হোক্ মহারাজ, আপনার মঙ্গল হোক্, আপনার রাজ্যের শ্রীবৃদ্ধি হোক্। মনে রাখিবেন কালপ্রবাহে কি ক্ষত্রিয়, কি ব্রাহ্মণ, সবাই আজ এই অবস্থায় উপনীত হইয়াছে—ইহাতে কাহাকেও নিন্দামন্দের ভাগী করিয়া তাচ্ছিল্য করা উচিত্‌ নয়।"

এইবার রাজা ব্রাহ্মণের পদধূলি গ্রহণ করিলেন এবং ঘটনাটা খোলাখুলিভাবে প্রকাশ করিয়া বলিলেন, "ঠাকুর, প্রাচীনকালে অগস্ত্য মুনি সমুদ্র শোষণ করিয়াছিলেন। আপনি তাঁহারই বংশধর, অথচ ক্ষুদ্র একটি নদী পার হইতে না পারিয়া সেই সামান্য জলটুকুর নিকট নতি স্বীকার করিলেন এবং ইহা যেন আপনাকে সিক্ত করিয়া দিয়া অপমানিত করিয়া ছাড়িল। আর সেই সিক্ত বসনেই রাজসভার একান্তে দাঁড়াইয়া কিছু দানের প্রত্যাশায় আপনি সসংকোচে উন্মুখ হইয়াছিলেন; কিন্তু ব্রহ্মতেজে ও বিদ্যাবত্তায় রাজাকে একটুমাত্র আকর্ষণ করিতে পারেন নাই। ব্রাহ্মণের এই পতিতাবস্থা দেখিয়া অত্যন্ত ক্ষোভের সঙ্গেই আমি বলিয়াছিলাম 'সেই আর এই'।

"আপনি আমার সেই সদম্ভ সন্দেহের অতিশয় তাৎপর্যপূর্ণ উত্তর দিয়া এবার আমাকে লজ্জিত ও মুগ্ধ করিলেন—অর্থাৎ আপনি কৌশলে স্পষ্টতঃই বুঝাইয়া দিলেন যে, ব্রাহ্মণের যদি চরম অধঃপতন হইয়া থাকে, ক্ষত্রিয়েরও কিছু কম হয় নাই। সমুদ্রে শিলা ভাসাইয়া ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠ শ্রীরামচন্দ্র একাকী বীরত্বের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া জগতে অদ্ভুত কীর্তি রাখিয়া গিয়াছেন; আর আমি তাঁহারই বংশধর, অথচ আজ একটি ছোট ভাণ্ডের জলে একটি ক্ষুদ্র নুড়ি ভাসাইবার ক্ষমতা পর্যন্ত আমার নাই। সুতরাং আমার পূর্বোক্তির যোগ্য প্রত্যুত্তর দিয়া আপনিও সেই কথাটির পুনরাবৃত্তি করিলেন, 'সেই আর এই'। ধন্য আপনার উপস্থিত-বুদ্ধি। ধন্য আপনার প্রচ্ছন্ন জ্ঞান।"

ব্রাহ্মণ হাত তুলিয়া রাজাকে পুনরায় আশীর্বাদ করিয়া বলিলেন, "আপনার বিনয়ে আমি অত্যন্ত প্রীত হইয়াছি; আপনার জয় হোক, মহারাজ! আপনার মঙ্গল হোক।"

অতঃপর এই ব্রাহ্মণ-দম্পতি রাজার অনুগ্রহে প্রচুর বিদায় এবং বৃত্তি প্রভৃতি লাভ করিলেন; তাঁহাদের সকল দুঃখ ঘুচিয়া গেল।

খরা জ্যৈষ্ঠের দিনে

শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য

খরা জ্যৈষ্ঠের রোদ্দুরে মাটি
ফেটে হোলো চৌচির।
মজা নদী-তীরে ওঠে কেঁদে গাঁ-টি,
সুখ নেই বৌ-ঝির।
বঞ্চিত বুকে পুঞ্জিত ভয়,
চাতক পাখীরা করে হাহাকার:
বীজ বুননের হোলো যে সময়,
চাষী হাঁটে আর চায় মাঠে তার
ভাঙা পরাণের ভাঙা দাওয়াটি
কবরের মত রয়।

সংসারে কারা দিতে চায় ফাঁকি
মরুমরীচিকা মাখা!
হয়ে গেছে কবে কাল্‌বৈশাখী
ভেঙে গেছে তরুশাখা!
তৃষ্ণা-কাতর মৃত্তিকা পানে
আসেনাকো ধেয়ে মেঘবলাকারা,
মৃত্যু-বীজাণু জীবনেরে টানে
আত্মা আজিকে আত্মীয় হারা।
আশ্রয় হারা ঘুরে মরে পাখী
কোন মতে বেঁচে থাকা।

মেঘেরা তো এসে বাঁধে নাকো বাসা
আকাশে নাচে না বাদলের নটী।
আজ জ্যৈষ্ঠের দুপুরে দুরাশা,
তালপুকুরেতে ডুবিল না ঘটি।
আম-কাঁটালের এলো মরশুম,
ফলের বাগানে মানুষের ভিড়।
পাখীর চোখেও নাহি মোটে ঘুম,
ফাঁকা হয়ে গেছে পাতা ঢাকা নীড়।
বাজে বটছায়ে রাখালের বাঁশী;
তার সুরে কেন পরাণ উদাসী!

আকাশে যেন গো জ্বলিছে আগুন,
নিয়ে দারুন-শিখা!
কে জানে কবে গো আসিবে ফাগুন
নব যৌবন টীকা!
চিত্ত চিতার ছাই মাখা শত
চলে কঙ্কাল মেঠো পথ বেয়ে;
কূপমণ্ডুক মরে আছে কত
কালো হয়ে গেল কত সোনা মেয়ে!
হৃদয়-গর্ভে বেদনা দারুণ
কোথায় অন্তরিকা!

শিশুসাথীর দপ্তর

অন্ধের গল্প—শ্রীসুশান্ত ঘোষ। তোমার গল্পটি কিন্তু গল্প হয়নি ভাই! একটি অন্ধ মানুষের বর্ণনা করেছ মাত্র। গল্পের মধ্যে ঘটনা আনতে হবে, আর তাকে সুন্দর করে সাজিয়ে লিখতে হবে।

কার্ত্তিক পূজো—শ্রীমঞ্জু দে। দুর্গা পূজো, সরস্বতী পূজো নিয়ে অনেক কবিতা লেখা হয়েছে, কিন্তু কার্ত্তিক পূজো নিয়ে কেউ কবিতা লিখেছে বলে জানা নেই। সেদিক থেকে তোমার কবিতার বিষয় নির্বাচনের তারিফ না করে পারছি না; তবে কবিতার ছন্দ একটুও ঠিক হয়নি। লিখে যাও, উন্নতি হবেই।

অসীম মনের গান—শ্রীদেবীপ্রসাদ সামন্ত। কবিতার কথাগুলোর মাঝে তুমি কি বোঝাতে চেয়েছ? যে কোন রচনা লিখতে গেলে আগে মনটাকে তৈরী করে নিতে হয়। তারপর রচনার বিষয়টিকে সেই শান্ত মনের ওপর ফেলে গড়ে তুলতে হয়। তোমার কবিতার কথাগুলো মনের মাঝে ঠিকমত দানা বাঁধেনি, তাই কবিতাটির ভাব পরিষ্কার ফুটে ওঠেনি।

স্বপ্ন না সত্য—শ্রীমন্দিরা বসু। তোমার রূপকথাটি তেমন জমে ওঠেনি। তবে গল্প বলার মধ্যে তোমার তেমন আড়ষ্টভাব দেখলাম না, অবশ্য এটি আশার লক্ষণ। নানা ধরনের বিষয়বস্তু নিয়ে লিখে যাও। একদিন দেখবে খুব সুন্দর গল্প তৈরী হয়ে গিয়েছে।

খোকার প্রশ্ন—শ্রীমায়া রায়। 'শত'-এর সংগে 'এত', 'পড়ে'-এর সংগে 'ফিরে', এসব মিল একেবারেই হয়নি। অবশ্য তোমার ছোট মনে যে কথা জেগেছে তাকে প্রশংসা না করে পারছি না। মিলের দিকে লক্ষ্য রেখে অনুশীলন করতে থাক।

হরিনাথ—'কল্লোল'—গ্রাঃ নং ১২৯৯২। গল্প তোমার একেবারেই জমেনি ভাই! হরিনাথের মৃত্যুর যে কারণ তুমি দেখিয়েছ, তা মোটেই ঠিক হয়নি। গল্পকে জমিয়ে তুলতে হবে, নইলে গল্প কারুর মনে ধরবে না। অনেক লেখ, চেষ্টার ফল একদিন নিশ্চয় পাবে।

নাস্তিক—শ্রীবিশ্বনাথ বিশ্বাস। সাধু আর চলিত ভাষার গোলমাল না সামলালে লেখার গোড়ায় গলদ থেকে যাবে ভাই! ওদিকে কড়া নজর রেখ। তোমার লেখায় বেশ একটা তাজা মনের পরিচয় পাওয়া গেছে। মানুষের নাস্তিক হবার যে কারণ তুমি দেখিয়েছ তা খুবই সত্য। তুমি যে তোমার ছোট একটি মন দিয়ে এ সব অনুভব করেছ, সেজন্যে খুব খুশী হয়েছি।

হাতের কাজ—শ্রীপূর্ণচন্দ্র পুইতণ্ডী। তুমি যে লেখা নিয়ে উপস্থিত হয়েছ, ওটা ঠিক আমার দপ্তরে ত পড়ে না ভাই! হাতের কাজ খুব ভাল জিনিস; আর তোমাকে প্রশংসা করছি এজন্যে যে তুমি শিশুসাথীর ছোট ভাইবোনদের তা শেখাতে চাও। তোমার কাজে তুমি সফলতা লাভ কর, এই কামনা করি।

পঁচিশে বৈশাখ—শ্রীহরেন্দ্রচন্দ্র দে। কথা ও কবিতায় পঁচিশে বৈশাখের এই নৈবেদ্যটি সত্যই খুব সরস হয়ে উঠেছে। তবে শিশুবোধ্য নয় বলে দপ্তরে তুলে দেওয়া সম্ভব হ'ল না। —মধুকর

পত্র

শ্রীপৃথ্বীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (১১৭৩৭)

বহুদিন বাদে বন্ধু, তোমার পেয়েছি পত্রখানি,
এতদিন পরে চীনের প্রাচীর ভাঙ্গিয়াছ অভিমানী ?
অভিমানভরা পত্রে তোমার জানিয়াছি সব ব্যথা,
লিখিয়াছ তুমি বাংলাদেশের দুঃখ-শোকের কথা।
বংগের নয়, সারা জগতের দুঃখের নাই শেষ,
তা'রি মাঝে সেরা অমৃত-পথের যাত্রী বংগদেশ।
এ ব্যথা-বেদনা আগামী দিনের সৃষ্টি-সুখের ব্যথা,
যুগ-যুগান্তে আর্য্য-ঋষিরা গেয়েছে যাহার গাথা।

আমরা মানুষ ভুলিয়া গিয়াছি সৃষ্টির সে বা'রতা,
আত্মাশক্তি আদি জননীরে ভুলায়েছে অন্ধতা।
তাই তো বন্ধু, অনাথের মতো মানুষ শিশুর দল,
আঁধারে মরিছে মাথা কুটে কুটে, হইতেছে দুর্ব্বল।
মানব খুঁজিছে পরশ-মণিরে জগৎ-সিন্ধু তীরে,
কত শত মণি ঝলসি উঠেছে আঁধার-রাত্রি-নীড়ে।
কঠিন হস্তে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া বিধাতার মহাদান,
ছুটিয়া চলেছে করিতে বারেক সে মণির সন্ধান।

পরিবর্ত্তন

শ্রীহারাধন মুখোপাধ্যায়

"মণ্টু, বাবা, যেও না, যেও না, কথা শুনে যাও..............."

"না, আমি আর থাকব না, আর আসব না এবাড়ীতে"—এই বলে মণ্টু বাইরে চলে গেল। মণ্টুর আজকে খুব রাগ হয়েছে। আর রাগ হবারই ত কথা। পূজার মাত্র আর কয়েকদিন বাকি। বিণ্টু, হারান এদের সকলের পূজার জামা-কাপড় কেনা হয়ে গেছে। তাই মণ্টু আজ মাকে জামা কিনে দেবার জন্য বলেছিল। তাতে কিনা মা তাকে কত কি বললেন, বললেন—বাবা, আমরা গরীব। আমরা জামা-কাপড় কেনবার পয়সা কোথায় পাব ? একে দুবেলা পেট চলে না, তার উপর............বলে দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। কিন্তু মণ্টু বুঝে না, কেন তারা গরীব। বিণ্টু, হারান এরা সকলেই নূতন জামা-কাপড় পরে আনন্দ করবে। কেন সে একটু আনন্দ করতে পারবে না ? না, এ হতেই পারে না। মাই তাকে জামা-কাপড় দিতে চায় না। তাই আজ মণ্টুর মার উপর রাগ হয়েছে, কাঁদতে কাঁদতে একটা সাঁকোর উপর এসে বসল মণ্টু। মা তাকে কোন দিনই ভালবাসে না। এতদিন মণ্টু কোন রকমে সব দুঃখ সহ্য করেছিল, কিন্তু আজ আর সে দুঃখ গোপন করতে পারল না। তাই ঝরণার মত তার মনের পুরাতন দুঃখের বোঝা চোখ দিয়ে বইতে লাগল। কিছুতেই আর কান্না থামে না।

কিছুক্ষণ পরে মণ্টুর দুঃখ কিছুটা লাঘব হ'ল। কিন্তু কিছুই তার ভাল লাগছে না। আগে মণ্টু কতদিন এই সাঁকোয় এসে বসে থাকত। সাঁকোর দুই ধারের লাল কাঁকর মেশানো মেঠো পথ, পাখীর মিতালী সুর, সাঁকোর নিচের জল-কল্লোল—এ সব মিলে তাকে যেন এক

স্বপ্নের দেশে নিয়ে যেত। আজ আর কিছুই ভাল লাগছে না। তাই সাঁকো ছেড়ে সামনের দিকে চলতে লাগল সে। কিছু দূরে, কেষ্ট ময়রার দোকান। তার পাশে মিণ্টু হারান নণ্ট—এদের বাড়ী। ডান দিকে বুড়ো শিবতলা যাবার পথ। মণ্টু বাঁ পাশের রাস্তার দিকে ফিরল। সামনেই নণ্টুদের বাড়ী। নণ্টু বাইরেই বসেছিল। মণ্টুকে দেখে নণ্ট বলল—"কিরে মণ্টু, এমন অসময়ে যে?" মণ্টু কিছু বলল না। নণ্টু বলল—"মণ্টু, হারানের মার খুব অসুখ, তাদের বাড়ী যাবি?" মণ্টু রাজী হ'ল। হারানের বাড়ীতে গিয়ে তারা দেখল, হারান খুব কাঁদছে, আর বলছে—মা, কথা বল, কথা বল, আমি আর কোন দিন তোমার অবাধ্য হ'ব না। কিন্তু কোনই উত্তর পাওয়া গেল না। বাড়ীর অন্যান্য লোকের মনে বিষাদের ছায়া নেমে এসেছে, তারা কেউ হারানকে আগলাতে পারছে না। কেবলই হারান মায়ের বুকের উপর কেঁদে পড়ছে। মণ্টুর কিন্তু মনে মনে খুব আনন্দ হয়েছে। মণ্টু ভাবছে—এবার হারানের আর ঘুড়ি লাটাইয়ের জন্য মাকে তাগাদা দিতে হবে না। স্কুলে না যাবার জন্য বকুনি খেতে হবে না। আজ যদি তার মা মরে যায়, তা'হলে সে নতুন জামা পরতে পারবে। নণ্টু, হারান এদের সংগে আনন্দ করতে পারবে।

নণ্টু এই করুণ দৃশ্য আর দেখতে পারল না। সে মণ্টুকে নিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে পড়ল। মণ্টু তার মনের কথাগুলো নণ্টুর কাছে ভেঙে বলে ফেললে। নণ্টু কিন্তু কোন কথার উত্তর দিল না, কেবল একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। নণ্ট কিছুদূরে একটা পরিষ্কার জমির উপর বসে পড়ল। তারপর মণ্টুকে বলল—"মণ্টু, তুই ত জানিস না মা-হারা ছেলেদের কি কষ্ট! আমিও আগে মাকে কত বকতাম, কত রাগ করতাম। এখন তার জন্য দুঃখ হয়। এখন ভাবি, কেন মাকে দুঃখ দিলাম। মার অবাধ্য হয়েছিলাম বলেই ত মা রাগ করে চলে গেলেন। তুই বুঝবি না মণ্টু, তোর যে এখনও মা আছেন। পরে বুঝবি মা-হারা সন্তানের কি কষ্ট!" বলতে বলতে নণ্টুর দু'চোখ দিয়ে জল উপচে পড়তে লাগল। কিছুতেই সে এই জলধারাকে চেপে রাখতে পারল না।

মণ্টুর মধ্যে এল এক পরিবর্তন। সে নিজের ভুল বুঝতে পারল। মণ্টুর চোখ ছলছল করতে লাগল। তার মনে হতে লাগল, সত্যি ত মা তাকে খুব ভালবাসে। যখন তার একবার জ্বর হয়েছিল, তখন মাই-ত সারারাত্রি তার কাছে বসেছিল। সে তার দোষ বুঝতে পেরেছে, মার কাছে ক্ষমা চাইতে হবে। নণ্টুকে বলল—"আমি দোষ করেছি, এখন আমার ভুল বুঝতে পেরেছি।"...বলতে বলতে মণ্টু দৌড়ে বাড়ীর দিকে চলল।

যখন মণ্টু বাড়ীতে পৌঁছাল তখন সন্ধ্যা। ঘরটা একেবারে অন্ধকার। তার মনে ভয় হতে লাগল। চারদিকে অন্ধকার যেন জমাট বেঁধে আছে। মণ্টু ডাকল—"মা, তুমি কোথায়?" দূর হতে একটা করুণ স্বর ভেসে এল—"এই যে বাবা, কাছে এস।" মণ্ট দৌড়ে মার কাছে ছুটে গেল, দেখলে মা কাঁথা মোড়া দিয়ে শুয়ে আছেন, জ্বরে গা পুড়ে যাচ্ছে। মণ্টুর হারানের মার কথা, নণ্টুর কথা মনে পড়ল। তার মনে হ'ল তার মাও বুঝি আজ অভিমানে তাকে ছেড়ে চলে যাচ্ছে। মণ্টু মার পা

হুখানি জড়িয়ে ধরে বলল—"মা, তুমি চলে যেও না, তুমি আমাকে ছেড়ে চলে যেও না। আমি আর কোন দিন অবাধ্য হ'ব না। আমাকে ক্ষমা কর মা, ক্ষমা কর···" এই বলে খুব কাঁদতে লাগল।

মার মন আনন্দে ভরে উঠল। তাঁর দু' চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগল। ছেলেকে কোলে নিয়ে বললেন—"না বাবা, আমি তোমাকে ছেড়ে যাব না। ভগবান তোমার মঙ্গল করুন।"

শিশুসাথীর বৈঠক

আমার পথের সাথী ভাইবোনেরা,—তোমরা আমার অভিনন্দন গ্রহণ কর, আমি ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি আগামী দিনগুলি যেন তোমাদের সামনে নতুন স্বপ্ন, নতুন উদ্দীপনা, নতুন শক্তির ও নিত্য নতুন জ্ঞানের আলো নিয়ে দেখা দেয়।

এবারে তোমাদের কয়েকটি মাত্র চিঠির জবাব দিচ্ছি, পর পর দেখে নাও।

প্রঃ—১। রতিভূষণ চক্রবর্ত্তী (কলিকাতা ৭৯৩৩), ২। ভোলানাথ চট্টোপাধ্যায় (ধোপাপাড়া ৯২১২), ৩। অনিল চট্টোপাধ্যায় (নাসিরপুর ১৯৫২), ৪। সমীর চক্রবর্ত্তী (লক্ষ্ণৌ ৫৪৪২), ৫। দেবব্রত গুপ্ত (কলিকাতা), ৬। ব্রজগোপাল রায় (আগরতলা ৯৬০০)।

উঃ—(১) তোমার চিঠির বক্তব্যে বুঝতে পারলাম, নিশ্চয়ই কোষ্ঠ-কাঠিন্যের দোষ তোমার আছে—যার জন্য ভোরের দিকে মাথা ধরে ও অবসাদ অনুভব কর। এর কারণ কি জান? পূর্ব্ব দিনের মলগুলি অন্ত্রের মধ্যে জমায়েত হয়ে পচে থাকে, তার থেকে পেটের ভেতর বিষাক্ত গ্যাসের সৃষ্টি হয়। তাতে যে খাদ্য পাকস্থলী থেকে অন্ত্রের মধ্যে গিয়ে শরীরের পুষ্টি সাধনের সহায়তা করে, খাদ্যের সেই ক্ষমতা তখন আর থাকে না। ফলে পেটে বিষাক্ত গ্যাস ও মলের মাত্রা বর্দ্ধিত হয়ে দেহের আনাচে-কানাচে রক্তের সঙ্গে ঐ গ্যাস ছড়িয়ে বেড়ায়; তাতে রক্তের তৎপরতা শক্তি হ্রাস পায়, আর মস্তিষ্কে রক্ত চলাচলের ব্যাঘাত ঘটে বলেই প্রাতঃকালে সাধারণতঃ মাথা ধরে এবং দেহে অবসাদ প্রকাশ পায়। কাজেই জোলাপ নিয়ে পেটটি পরিষ্কার করে লঘু খাদ্য অল্প অল্প করে খাবে যাতে দাস্ত পরিষ্কার থাকে এবং ক্ষুধা অনুভব কর। আর একবারে বেশী পরিমাণ খাদ্য খাবে না। সাধারণতঃ রাত্রির দিকে একটু কম করে খাবে, জল পান করবে বেশী। (২) তোমার পেটের পরিধি বেশী বলে লিখে জানিয়েছ, মাপ না পেলে বেশী কি, স্বাভাবিক বলা বড় মুশকিল। আগামী বারে তোমার দৈহিক মাপ ইত্যাদি লিখে জানিও। (৩) শীতকালে কখনও ব্যায়ামের প্রথমে খালি গা হয়ে ব্যায়াম করতে নেই, এমন কি গ্রীষ্মকালেও নয়। এতে হঠাৎ ঠাণ্ডা গরম লেগে যাবার ভয় থাকে। একটু ব্যায়াম করে যখন গা গরম হয়ে উঠবে, তখন গেঞ্জী জামা খুলতে পার। ব্যায়ামের পূর্ব্বে যদি পায়খানা পরিষ্কার

না হয় তো আধ গ্লাস গরম জল নুন ও পাতিনেবুর রস মিশিয়ে খেয়ে নেবে। তাতে পায়খানা পরিষ্কার হতে সাহায্য করবে এবং শরীরের অবসাদ ভাবটাও কেটে যাবে। (৪) অল্প বয়সে কখনও ডাম্বেল বারবেল নিয়ে ব্যায়াম করাটা আমাদের দেশে উচিত নয়। কারণ ঐ বয়সে হাড় মজবুত হয় না। তাই ১২ বৎসরের আগ পর্য্যন্ত খেলাচ্ছলে ব্যায়াম করাটাই বিধেয়। (৫) তুমি যে সব ব্যায়ামগুলি করে যাচ্ছ বর্ত্তমানে সেইগুলিই করে যাও, তবে কিছু যন্ত্র সাহায্যে ব্যায়াম করতে পারলে আরও ভাল হয়। শিশুসাথী অফিস থেকে আমার প্রকাশিত যন্ত্র সাহায্যে ব্যায়ামের চার্টটি সংগ্রহ কর। (৬) তুমি কিছুদিন রাত্রে দুধ সাগু এবং ফল খাও, তবে তোমার লিভারের কাজ খুব ভাল হবে এবং লিভারজনিত অন্যান্য রোগের উপশম হবে। কেমন থাক লিখে জানাবে। খুব ভোরে ঘুম থেকে উঠে বেড়াতে যাবে। প্রাতঃকালের রোদ গায়ে লাগাবে আর এখন খুব হাল্‌কা ধরনের ব্যায়াম অল্প মাত্রায় করা যাবে। আজকে এখানেই তোমাদের চিঠির জবাব শেষ করছি। তোমরা আমার শুভেচ্ছা গ্রহণ কর। জয় হিন্দ্‌। —তোমাদের মনতোষদা

গত মাসের ধাঁধার উত্তর

১। কাশী ২। ওঝা, বিশী অথবা যোশী ৩। ৩, ৯, ২, ১৮ ৪। ক

উত্তরদাতাদিগের নাম

যাহাদের ৪টি উত্তর ঠিক হইয়াছে—কুমারী শ্রীলা গুপ্তা, জামসেদপুর; অসীমাংশুকুমার ঘোষ, ১১৪১১নং গ্রাহক; পবিত্রকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, কলিকাতা—৩১; রণজিৎকুমার দত্তরায়, শিলং; দীপক সেনগুপ্ত, ১৩১৫৪নং গ্রাহক; অভিজিৎ সেনগুপ্ত, দমদম্‌; শচীকুমার ঘোষ, নাগপুর; স্বদেশকুমার মাইতি, ১১৩৪৮নং গ্রাহক; মৃণাল, ছায়া, ছবি, ছন্দা ও মৃন্ময় বরাট, গোরক্ষপুর; হিমাংশুকুমার মণ্ডল, মুকুন্দপুর; চিত্তরঞ্জন বিশ্বাস, কসবা কুমারপাড়া; চন্দ্রশেখর ঘোষ, কাটোয়া; রমা সরকার ৫৯৩৪নং গ্রাহিকা; বিনয়কৃষ্ণ ঘোষ ১২৭৮৬নং গ্রাহক; শুভেন্দুবিকাশ ৭৫৪৪নং গ্রাহক; ভবেশ দাস, ফতেপুর; অঞ্জু ও বুলু, ঢাকুরিয়া; জ্যোতিপ্রসাদ ও দীপা লাহিড়ী, বহরমপুর; সন্তোষলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, ১২৫৩৩নং গ্রাহক; বিশ্বনাথ দে ও দীপক সেনগুপ্ত, কাটিহার; আনন্দ চাটার্জি, মজঃফরপুর; সুনিপুণ দাশগুপ্ত, নিউ দিল্লী; মিহির চক্রবর্ত্তী, ৭১৩৯নং গ্রাহক; বীণা দেবী, কলিকাতা; নৃপেন্দ্রনাথ দে, তেজপুর; দেবপ্রসাদ রায়, ঝাড়গ্রাম; গীতা, গায়ত্রী, ডলি, ও সমীর, রাঁচি; আরতি মুখোপাধ্যায়, ১২৬৭৯নং গ্রাহিকা; পুলকরঞ্জন সেনরায়, ৯৩৯২নং গ্রাহক; বিমলাবালা ভট্টাচার্য্য, বেনারস সিটি; নীলমণি, লালু ও সুধা, গিরিডি; ভূপতিনগর প্রগতি সংঘের সভ্যবৃন্দ; কেতকী মৈত্র, পাটনা; গোপালচন্দ্র চাটার্জ্জি, ১৩০৮০নং গ্রাহক; অনন্তকুমার ও প্রশান্তকুমার ভট্টাচার্য্য, মুর্শিদাবাদ; তারাশঙ্কর ও শান্তিলতা বন্দ্যোপাধ্যায়, কলিকাতা—৬ শেখ আমিনুর রহমান, খাজুরদহ

—হুগলী; মিহিরকুমার সাহা, তালপুকুর; উৎপল সিংহ, বহরমপুর; গোপাল দাস, ৯৪৫০নং গ্রাহক; মঞ্জুশ্রী ভট্টাচার্য্য, ১২১০৫নং গ্রাহিকা; মন্দিরা ও সোমনাথ ব্যানার্জ্জি নয়া দিল্লী; কুমারী কল্পনা চৌধুরী, ৯৫৭০নং গ্রাহিকা; গৌতম ঘোষ, ১১৩০৯নং গ্রাহক; দেবব্রত, বাসুদেব, মহাদেব ও পার্থ সেন, বালিগঞ্জ; সুধারাণী রায়, ৮৬৪১নং গ্রাহিকা; নিমাইচাঁদ বন্দ্যোপাধ্যায়, লাহেরিয়া-সরাই; রুবি ঘোষ, এলাহাবাদ; গৌরী সান্যাল, ঘুঘুডাঙ্গা; স্বপনকান্তি রায়, ১৩০৮৮নং গ্রাহক; শ্রীরামপুর মহলানবিশ ছাত্র সংসদ; কল্যাণকুমার মুখার্জ্জি, কলিকাতা—২৬; অরুণাংশু চক্রবর্ত্তী, ৯৭৬৭নং গ্রাহক; শঙ্করনাথ চট্টোপাধ্যায়, নাগপুর; রবীন্দ্র রায় দস্তিদার, গৌহাটী; অসিত বিশী, কলিকাতা—২৬; সুপ্রিয়া ও দীপক সেন, ১৩১০৩নং গ্রাহক; মঞ্জুশ্রী চক্রবর্ত্তী, ধানবাদ; শিপ্রা ও সুজাতা গুহ রায়, ৮৭১৪নং গ্রাহক; মুকুল সেন, দিঘাঘাট; অরূপরতন বসু, ১০৮৭৬নং গ্রাহক; ভুদেব, রামকৃষ্ণ ও সবিতা, ৮৪৭১নং গ্রাহক; নিরঞ্জন দাস, ১১৬২৬নং গ্রাহক; প্রশান্তকুমার রুদ্র, ১০৬৫৪নং গ্রাহক; পূরবী ঘোষ, ১০৮৯৭নং গ্রাহিকা; স্বপনকুমার মুখোপাধ্যায়, বরাহনগর; পুরবী মুখোপাধ্যায়, নয়া দিল্লী; বন্দনা দে, কলিকাতা; আশীষকুমার মোতায়েদ, ৮৯৫৬নং গ্রাহক; কমলা, নীলা, রাধারাণী ও রাণী, ঘর গোহাল —হুগলী; বাণী, অশোক, অজয়, বহ্নি ও বিপ্লব দাশ, ১২৭৫১নং গ্রাহক; সমীরকুমার গঙ্গোপাধ্যায়, কর্ণাল—পাঞ্জাব; তুহিন, স্বাহাপতি, বন্দনা ও বুলা, উত্তরপাড়া; অলকা ব্যানার্জ্জি ১৩০৯৪নং গ্রাহিকা; রঞ্জন সেনগুপ্ত, কলিকাতা—২৬; বাণু, গৌরী, খোকা, বাচ্চু, শ্যামনগর; অঞ্জলী ও উৎপলা, ১৩০১১নং গ্রাহিকা; হীরেন্দ্র স্মৃতি-পাঠাগারের সভ্যবৃন্দ; রঞ্জিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, ভাগলপুর; দীপালী, অঞ্জলী, শঙ্কর, কানু ও অনিতা বসু, বাউলিয়া; অমরনাথ দত্ত, মুর্শিদাবাদ; দেবব্রত, বাণী, রাণী ও শিবু, সাজাহানপুর; শ্রুতি ও দূর্ব্বা গুপ্ত, ৫১৪৮নং গ্রাহিকা; দিলীপকুমার চন্দ, বারুইপুর; কুমারী মুকুলিকা বন্দ্যোপাধ্যায় রাঁচি; সিদ্ধার্থ ও প্রবীর ঘোষ, কলিকাতা; নির্ম্মলকুমার দত্ত, ৭০৩০নং গ্রাহক; রতিভূষণ চক্রবর্ত্তী, ৭৯৩৩নং গ্রাহক; প্রভাতকুমার পাল, ১২২৮১নং গ্রাহক; সুখরঞ্জন ভট্টাচার্য্য, চন্দননগর; বিধান ও স্নেহময়, ২১১৪ নং গ্রাহক; কুমারী কল্যাণী সরকার, উত্তরপাড়া; অসীম, নান্টু, সন্টু ও টুলটুল, লক্ষ্ণৌ; মঞ্জুশ্রী দত্ত, ১২০৪৯নং গ্রাহিকা; গীতা ও গায়ত্রী ঘোষ, বেলেঘাটা; অশোককুমার রায়, মজঃফরপুর; রণজিৎ রায়, কসবা; কুমারী ঝর্ণা পাল, মানভূম; লতিকারাণী পোদ্দার, ৬১২৩নং গ্রাহিকা; কালাচাঁদ, রণজিৎ, কেশবদাস, মঞ্জু, প্রতিমা ও পুতুল মুখোপাধ্যায়, বালীগঞ্জ; ভবানীপ্রসাদ দত্ত, শিবপুর—হাওড়া; চম্পা সরকার, ১১৯১৯নং গ্রাহিকা; অরূপ, অমিয়, মৃণাল, রাণী, মঞ্জু, শিবানী, ইন্দু, বীণা, প্রতিমা, স্বরাজ, পঙ্কজ, পরিমল, পিযুষ, অমিতাভ, টালিগঞ্জ; সমীরণ চৌধুরী, ১২৩২৪নং গ্রাহক; অনিরুদ্ধ ভট্টাচার্য্য, ৪২৬১নং গ্রাহক; শাশ্বতী চক্রবর্ত্তী কলিকাতা—৯; মায়া সেন গুপ্তা ও উমা মুখার্জ্জি ১২৬০৬নং গ্রাহক; বারীন্দ্রনাথ মাইতি, ৮০০৪ নং গ্রাহক; কুমারী টকীজ রাণী ভুঞা, ধনেশ্বর; সুরঞ্জন দাসগুপ্ত, বেনারস; আশিস বসু, হাওড়া; প্রশান্ত, মঞ্জু, সঞ্জু, ভুড়ু, রমা ও মুন্টি শাস্ত্রী; শ্যামাপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য, বিষ্ণুপুর; কুমারী গৌরী

মুস্তাফী, ১১২৭৮নং গ্রাহিকা; কুমারী মীরা গাঙ্গুলী, তালপুকুর—ব্যারাকপুর; শৈবালকান্তি বিশ্বাস, বহরমপুর; ডাবলুসুকুমার সিংহ, হাওড়া; দুর্গাপদ ঘোষ, ধানবাদ; দেবব্রত, অমর, অজিত, বিদু ও মণি, ১১৩৩৯নং গ্রাহক; কল্যাণ মজুমদার, ৯৯৬৯নং গ্রাহক; জয়ন্ত রায়, ১২১০২নং গ্রাহক; মীরা ঘোষ, দিল্লী; হীরেন্দ্র, হেমেন্দ্র, মায়ারাণী, মুক্তি, শ্যামল, তৃপ্তি, রেণুকা, যূথিকা, অমল, মিলন, বাবলু, ঝরণা ইত্যাদি, কলিকাতা; পবিত্র ও প্রণয় সরকার, কালিগাঁও—মালদহ; অশোককুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, ৯৫৪২নং গ্রাহক; প্রদীপ সেন, গোরক্ষপুর; বিভূতি মজুমদার, সুলতানপুর; ভূনাথ ও মাস্তা, সুভাষ পাঠাগার, শান্তিপুর; কুমারী সাধনা বসু, ৭৯৫৯নং গ্রাহক; মীরা সেনগুপ্তা, ১২১০৭নং গ্রাহিকা; অজিতকুমার কুণ্ডু, ১০৭৯১নং গ্রাহক, অঞ্জলী গোস্বামী, শান্তিপুর; খগেন দাস, লালগোলা; মায়ারাণী বন্দ্যোপাধ্যায় লক্ষ্ণৌ; সনৎকুমার পাল, টাটানগর; সেবারাণী ঘোষ, কলিকাতা—৩; মঞ্জুশ্রী চক্রবর্ত্তী, ধানবাদ; রথীন, বাবুয়া, রাজেন্দ্রনাথ ও দুর্গাদাস সেন, ১২২২২নং গ্রাহক; শেফালী ও পার্থসারথি ঘোষ, কলিকাতা—৬; নারায়ণচন্দ্র, ভীমেশ্বরী; মহুলিয়া এম. ই. স্কুলের ছাত্রবৃন্দ; জয়ন্ত গুহ, দিল্লী; দীপালী সরকার, নয়া দিল্লী; অন্তু, দেবু, কেলো ও বিশু, ৮৭৫২নং গ্রাহক; শরদিন্দু সিংহ রায়, ১০১২৯নং গ্রাহক; প্রদীপ মজুমদার, কলিকাতা; প্রীতি গাঙ্গুলী, ৯৪৩৬নং গ্রাহক; সুমিত্রা ও প্রদীপ মিত্র, ১২৯৩০নং গ্রাহক; বুলবুল, ৪৩৮৬ নং গ্রাহক বীথি দাস, আসানসোল; দোদুল গাঙ্গুলী, ১১৫৮৩নং গ্রাহক; দীপকরঞ্জন মাইতি, খড়্গপুর; চাঁচল বয়েজ এসোসিয়েশন সান্ ক্লাব; দীপু, কৃষ্ণা, মণি ও নাণ্টু—বালিগঞ্জ; তমোহরকৃষ্ণ রায় দস্তিদার, কলিকাতা—২৯; বিশ্বজিৎ, মতিলাল, ১৩১৮৪; কুমারী অপর্ণা ও কৃষ্ণগোপাল মল্লিক ১৮৭১১নং গ্রাহক।

যাহাদের ৩টি উত্তর ঠিক হইয়াছে—হাসিরাণি দাস, জলপাইগুড়ি; কুমারী মুকুল চক্রবর্ত্তী ২০৫৭নং গ্রাহিকা; দীপক রায় চৌধুরী, ১২০০৭নং গ্রাহক, রবীন্দ্রনাথ দে, ১৩০৭১নং গ্রাহক; প্রেমেন্দ্র মিত্র, বোলপুর; পিণ্ট ও ঝণ্টু, ১২১১৫নং গ্রাহক; মীনাক্ষী মিত্র, বাঙ্গালোর; শুভ্রা ভট্টাচার্য্য ১২৬৩৫নং গ্রাহক; মুক্তিকাম পণ্ডা, দেভোগ; দেবেন্দ্রনাথ পাণ্ডে, রাজমহল; দীপঙ্কর মুখোপাধ্যায়, কৃষ্ণনগর; অশোককুমার রায়, চট্টগ্রাম; মুকুল বিশ্বাস, ১০৮৭১নং গ্রাহক; আরতি রায় চৌধুরী, বোলপুর; চম্পা সরকার, ভাগলপুর; প্রশান্তকুমার বক্সী ৭৮৮৯নং গ্রাহক; অচলা চক্রবর্ত্তী, হরিণঘাটা ফার্ম; পঙ্কজকুমার মুখোপাধ্যায়, কলিকাতা—২৪; অমরেন্দ্রনাথ রায়, সোনারপুর; রূপ-সনাতন, অমি, ভাস্কর ইত্যাদি ১২০৫২নং গ্রাহক; চন্দনা মজুমদার ও বাবুল, ১০২২৮নং গ্রাহক; প্রভাংশু খাসনবিশ, কলিকাতা—১০; দেবব্রত মুখোপাধ্যায়, রাঁচি; মৃণালকান্তি সামন্ত, ১৩১৫২নং গ্রাহক; কল্যাণ স্বরাজ ও জয়শ্রী ঘোষ, ১২২১১নং গ্রাহক; গোপেন্দ্রমোহন সিংহ, ৯১২৯নং গ্রাহক; সুশান্তকুমার হালদার, আনন্দনগর; দিপু ও হারু বন্দ্যোপাধ্যায় তেজপুর; তাপসকুমার কল্যাণকুমার ও সুনীলকুমার বাগচী, কানপুর; শিবশঙ্কর মণ্ডল, ১৩১১৬নং গ্রাহক; অশোকা দাশগুপ্তা, ১০১২৭নং গ্রাহিকা; জয়ন্তী ঘোষ, হাজারিবাগ; বরুণ সরকার, কলিকাতা—২০; সুদীপা কর ও সুশান্তকুমার রায়

চৌধুরী, হবিগঞ্জ; ভূপালচন্দ্র দাস, ১২৬৯৩নং গ্রাহক, রতনমালা ও ছবি, ২১৭৩নং গ্রাহক; মতিভূষণ চক্রবর্ত্তী, ৭৯৩৩নং গ্রাহক; সুকান্তকুমার গোল, ঝাউডাঙ্গা; শান্তা বসু, কলিকাতা—৬; মুকুল ঘোষ, আসানসোল; দেবদাস ভট্টাচার্য্য, ১২৪৪০নং গ্রাহক; তপননারায়ণ চৌধুরী ৯৫৯৬নং গ্রাহক; বিজয়কিরণ পাল, কলিকাতা; দিপু, বাচ্চু, পুটু ও রুমা, গোরক্ষপুর; আশীষ ও অমিতাভ দত্ত, নয়া দিল্লী; পঞ্চানন ভট্টাচার্য্য, দেভোগ; অমল মুখোপাধ্যায়, রামপুরহাট, ব্রততী রায় ১২৭৪৪নং গ্রাহক; রঞ্জনকুমার নাথ, ডিব্রুগড়; জগদীন্দ্রনাথ সেন, ২৫৯ পি গ্রাহক; কুমারী মঞ্জু দাসগুপ্তা, ১০৫৪৯নং গ্রাহিকা; দোলন গুপ্ত, মতিহারী; তুষারকান্তি মুখোপাধ্যায়, কাঁচরাপাড়া, রণজিৎকুমার সরকার, গাইবান্ধা; আনন্দময় মুখোপাধ্যায়, ১৩০৮৭নং গ্রাহক, সনৎজিৎ ও সুজিত গুহ, কলিকাতা; হরেন্দ্রচন্দ্র দে, ৬৬৯১নং গ্রাহক; এ. এম. এল. রহমান খান, রমনা—ঢাকা; কুমারী অরুণা ঘোষ, ১২৫৬১নং গ্রাহিকা; মন্দিরা সান্যাল, বহরমপুর; হিমাংশু সিংহ রায়, ১০৭৬১নং গ্রাহক; সৌমেন মজুমদার, ৯৭৮১নং গ্রাহক; বিষ্ণু ও দাসু, বালী—হাওড়া; প্রশান্তকুমার বসু, ১৩১০১নং গ্রাহক।

পুস্তক-আলোচনা

ভলিবলের নিয়মাবলী—শ্রীস্বরাজ দাশগুপ্ত প্রণীত। দাশগুপ্ত ব্রাদার্স এণ্ড কোং কর্তৃক ১৩৯বি কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা ৪ হইতে প্রকাশিত। মূল্য ॥০। এই গ্রন্থকারের লেখা বিভিন্ন খেলাধূলার নিয়মাবলী সম্বলিত কয়েকখানা পুস্তকই বিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জন করিয়াছে। আলোচ্য পুস্তকখানিও ভলিবল খেলোয়াড়গণের নানা জ্ঞাতব্য তথ্যে পূর্ণ এবং সুখপাঠ্য।

সুনীল স্মৃতি-প্রতিযোগিতার ফল

এই প্রতিযোগিতায় সর্বাধিক সঠিক উত্তর দিয়ে **প্রথম পুরস্কার** লাভ করবার যোগ্য হয়েছেন—**শ্রীমান্ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি** (গ্রাঃ ৯৬৬২) তত্ত্বাবধায়ক—শ্রীযুত টি. পি. মুখার্জি, এম. এ. বি. এল. সাবজজ, পোঃ লাহেরিয়া সরাই, জিঃ দ্বারভাঙ্গা।

দ্বিতীয় পুরস্কারের যোগ্যতা অর্জন করেছেন—**শ্রীমতী ব্রততা ঘোষ** (গ্রাঃ ৫৩৮২) ১৪এ, নীলমণি মিত্র ষ্ট্রিট, কলিকাতা—৬

দ্রষ্টব্য—অরুণাভ স্মৃতি-প্রতিযোগিতার ফল আগামী মাসে প্রকাশিত হবে।

সম্পাদক—**শ্রীআশুতোষ ধর**

৫নং বঙ্কিম চাটার্জ্জি ষ্ট্রীট, কলিকাতা, শ্রীনারসিংহ প্রেস হইতে

শ্রীপরেশনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

[প্রথম প্রকাশ—১৩২৯ সাল, ইং ১৯২২]

৩১শ বর্ষ } আষাঢ়, ১৩৫৯ { ৩য় সংখ্যা

বর্ষায়

শ্রীবেণু গঙ্গোপাধ্যায়

কোকিল নীরব, ভেক জেগেছে,
শোন না ওই শব্দ !
মেঘের ডাকে দিন-দুপুরে
দামাল ছেলেও জব্দ।
বনের ধারে ঢল নেমেছে—
ছুটছে নদী হর্ষে ;
বাঁধন-হারা বৃষ্টিধারা
শালের বনে বর্ষে।
বটের তলে হাট বসে না,
বাট ডুবেছে পঙ্কে ;
জল টলমল করছে দীঘি
কলমী লতা অঙ্কে।

ভিজে ভিজে নীড় বুনিছে
বাবুই তালী কুঞ্জে ;
কদম-কেয়ার টাটকা মধু
মধুপ সুখে ভুঞ্জে।
গাছভরা জাম দোদুল দুলে
লাগছে ভাল চক্ষে ;
মরা লতাও মুঞ্জরিছে
বনস্পতির বক্ষে।
মেঘের ভেলায় যায় ভেসে যায়
কোন্ দুখিনী কন্যা ?
তার নয়নের জলে কি গো
ধরায় নামে বন্যা ?

ডাকাতের বিচার

শ্রীদুর্গামোহন মুখোপাধ্যায়

তোমরা নিশ্চয়ই শুনেছ, কি রকম করে দস্যু রত্নাকর শেষে হলেন মহর্ষি বাল্মীকি। রামায়ণের কাহিনী যখন তোমরা পড় অথবা শোন, তখন কি তোমাদের মনে একথা একবারও জাগে যে, এই অমর মহাকাব্য রচনা করে যিনি সারা ভারতের পরম শ্রদ্ধার পাত্র হয়ে আছেন যুগ যুগ ধরে, তিনি এক সময়ে ডাকাতি করতেন এবং নিঃসংকোচে নিঃসংশয়ে লাঠি মেরে নিরীহ মানুষের মাথা ফাটিয়ে দিয়ে তার সর্বস্ব লুঠে নিতেন? রত্নাকর বাল্মীকি হয়েছিলেন বটে, কিন্তু তার পর থেকে হাজার হাজার বছরই তো চলে গেল, আর কোনও ডাকাত যে মহর্ষি হয়ে জগতে অমর হয়েছেন তা শোনা যায় নি।

মহর্ষি না হোক, ডাকাতি ছেড়ে দিয়ে অত্যন্ত সংলোক হয়েছে, সংসার ছেড়ে চলে গেছে সন্ন্যাসী হয়ে,—এর দৃষ্টান্ত একেবারে বিরল নয়। এমন কি, ইংরেজ যুগেও, বিশেষ করে বিগত উনবিংশ শতকেই আমাদের বাংলাদেশে এমন কয়েকজন ডাকাত ছিল যারা মোটেই সাধারণ ডাকাতের মতো ছিল না। তারা ডাকাতি করে নিজেরা কখনও ধনী হয়নি, নিজেরা কোনও দিন ভাল বাড়ি-ঘরে বাস করেনি, সকল স্ত্রীলোককেই মা বলে ডাকত, শুধু ধনীর বাড়িতেই ডাকাতি করত সেই বাড়ির স্ত্রীলোকদের সম্মান সম্পূর্ণ অক্ষুণ্ণ রেখে; ধনীর টাকা লুঠ করে এনে তারা দান করত গরীবদের। যে কোন গাঁয়েরই দরিদ্র অসহায় লোককে তারা যথাসাধ্য রক্ষা করত সবলের অত্যাচার ও উৎপীড়ন থেকে। তাদের দেহ ছিল লোহার মতো শক্ত, সাহস ছিল দুর্বার, মনও ছিল দরাজ। কথা দিয়ে তারা কথা রাখত প্রাণ গেলেও। বীরত্বের মর্যাদা রাখতে জানত তারা।

বিগত উনবিংশ শতকের এই রকম কয়েকটি বাঙালী ডাকাত-সর্দারের কাহিনী তোমরা আগে শোন, তার পর চিন্তা করে দেখ তাদের মধ্যেও সত্যিকারের মনুষ্যত্ব কিছু ছিল কিনা।

ফাল্গুন মাস।

হরিদাসপুরের জমিদার একখানা চিঠি পেয়ে একেবারে থ বনে গেছেন।

তাঁর নায়েব রয়েছেন পাশে। জমিদারকে হঠাৎ নিশ্চল ও নিস্তব্ধ হতে দেখে তিনিও অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠেন; কিন্তু সহসা কিছু জিজ্ঞেস করতে পারেন না ভয়ে। খানিক পরে জমিদার চিঠিখানা ফেলে দেন নায়েবের সামনে। চিঠিতে মোটা মোটা কাঁচা অক্ষরে লেখা আছে মাত্র এই কয়েকটি কথা—

"আগামী ত্রয়োদশীর রাত্রিতে আপনার বাড়ীতে অতিথি হইব।

বিশ্বনাথ।"

এই বিশ্বনাথই তখন বাংলাদেশের সর্বত্র পরিচিত ছিল 'বিশে ডাকাত' নামে। যশোর জেলায় তখন এমন লোক ছিল না, যে তার নামে কেঁপে উঠত না।

সেই বিশে ডাকাতই চিঠি দিয়ে জমিদারকে জানিয়ে দিয়েছে ত্রয়োদশীর রাত্তিরে ডাকাতি করতে আসবে তার দল নিয়ে। তার দলে যে সব ডাকাত, তারা যেন ইস্পাতের গড়া এক একটা মূর্তি। লাঠিখেলায় তাদের সমকক্ষ কেউ বাংলাদেশে নেই। এত দ্রুত আর এমন জোরে লাঠি ঘোরায় যে বন্দুকের গুলি অবধি ফেরে। ডাকাত তো নয়, একেবারে সাক্ষাৎ যম!

আগে খবর না দিয়ে চোরের মতো অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে অতর্কিতে বাড়িতে ঢুকে টাকাকড়ি লুঠে নিয়ে যাওয়া তো নিতান্ত কাপুরুষের কাজ। চোরকে তারা এই জন্যই ঘৃণা করত।

জমিদার আর তার নায়েব পড়েন বিষম দুশ্চিন্তায় বিশে ডাকাতের চিঠি পেয়ে। বিশে তো যে-সে ডাকাত নয়, তার কথা নড়বে না কিছুতেই।

ইনি খুব বড় জমিদার না হলেও খুব ছোট জমিদারও নন। নিজের গাঁ ও পাশের সকল গাঁয়েই এঁর প্রতিপত্তি ছিল খুব বেশি। দোল-দুর্গোৎসব ইত্যাদি বারো মাসে তেরো পার্বণ তাঁর বাড়িতে লেগেই আছে। সকল ক্রিয়াকর্মই তাঁর বাড়িতে হয় খুব ধুমধামের সংগে। দুর্গোৎসবের সময়ে তিন দিন তিন রাত্তির গাঁয়ের কোন বাড়িতে হাঁড়ি চড়ত না। গাঁয়ের সকল লোকেরই পুজোর দিনগুলো কেটে যেত এই জমিদার-বাড়িতে খাওয়া-দাওয়ায়, আমোদ-প্রমোদে। গাঁয়ে তখন লোকও ছিল অনেক। তখনও পল্লীমাকে সকল রকমে রিক্ত করে জমিদাররা আর গাঁয়ের বিশিষ্ট লোকেরা গিয়ে শহরগুলোকে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে তোলেনি। পল্লীর শোভা, পল্লীর সম্পদ আর পল্লীর মানুষই ছিল বাংলাদেশের সত্যিকার পরিচয়।

গাঁয়ে বহু লোক থাকলেও ডাকাতের হাত থেকে অব্যাহতি পাওয়ার জন্য গাঁয়ের লোকদের অথবা শহরে পুলিসকে খবর দেওয়া ধনী লোকেদের পক্ষে খুব সুবিবেচনার কাজ ছিল না। কারণ ডাকাতের দলের লোকেরা এর সন্ধান নিত। পুলিসের লোক এসে দু'-একদিন থেকে তখনকার মতো ডাকাতি বন্ধ করতে পারত বটে, কিংবা গাঁয়ের লোক দল বেঁধে দু'-চার দিন পাহারা দিয়ে সাহসের পরিচয় নিশ্চয়ই দিতে পারত, কিন্তু অনির্দিষ্ট কাল ধরে তো আর এ ব্যবস্থা চলে না। যখন পুলিস রইল না, গাঁয়ের লোকেরাও সতর্ক থাকল না, তখন অতর্কিতে আক্রমণ করলে রক্ষা করবে কে? এই জন্যই বিশে ডাকাত আগে চিঠি দিয়ে জমিদারকে খবর দিয়েছে। নির্দিষ্ট দিনে ডাকাতির চেষ্টা ব্যর্থ হলে আর তো খবর দিয়ে ডাকাতি করতে আসবে না; তা ছাড়া, এই ব্যর্থতার অতি নির্মম প্রতিশোধ নেবে। এই ভেবেই জমিদার ও তাঁর কর্মচারীটি বিশে ডাকাতের চিঠির কথা কাউকেই জানালেন না।

বাড়ির লোকদের এ কথা বলাই যায় না; কারণ এই খবর পেলে বাড়ির ভেতর যে ভয়ানক কাণ্ড ঘটবে, তার কাছে সত্যিকার ডাকাতির ভয়াবহতাও হার মানতে পারে। জমিদার

চেপে গেলেন বটে, কিন্তু বিষম দুশ্চিন্তার অগ্নিশিখা তাঁর বুকের ভেতরটা পুড়িয়ে ছাই করে দিতে লাগল।

আহার-নিদ্রা ঘুচে যায় জমিদারের। গৃহ-দেবতার মন্দিরে ঢুকে তিনি কেঁদে কেঁদে বলেন—“ঠাকুর, রক্ষে কর এবার! এই বিপদে যদি রক্ষে না কর তবে বুঝব তোমার বিচার নেই।”

ঠাকুর চুপ করে থাকেন, তাঁর বিচার আছে কিনা তা তিনিই জানেন।

দিন কেটে যায়। নির্দিষ্ট দিন আসে জমিদারের বুক কাঁপিয়ে। তাঁর অত্যন্ত বিশ্বাসী যুবক ভৃত্য শিবচরণ এ কয়েক দিনে ব্যাপারটা খুব স্পষ্ট বুঝতে পেরেছে।

সন্ধ্যা হয়-হয়। শিবচরণ এসে দাঁড়ায় ভয়ে আধমরা জমিদারের সামনে। লম্বা ও খুব বলিষ্ঠ তার দেহটা, বুকটা খুব চওড়া, গায়ের রং কালো, চোখ দুটো খুব বড়, এক মাথা কালো কুচকুচে ঝাকরা চুল।

প্রণাম করে সে বলে, “কর্তা, একটা কথা বলি, অপরাধ নেবেন না। আমি লাঠি খেলা জানি, খুব পাকা লোকের কাছেই আমার শিক্ষা, আজকাল তেমন অভ্যেস নেই, তবু মনে হয় লড়তে পারি।”

“তুই কি বলতে চাস্ যে বিশে ডাকাতের দলের সংগে তুই একলা লড়বি? তাকে বাধা দেওয়ার ফলে তুই তো মরবিই, আমাদেরও কারুর রক্ষে থাকবে না। খবরদার! এমন কাজ করিস্ নে।”

“আজ্ঞে, তা মনে হয় না। বিশে ডাকাত কাপুরুষ নয়, পথের মাঝখানে তাকে বাধা দিতে পারলে আর সত্যি লড়তে পারলে সে খুশিই হবে। আপনি আমায় হুকুম দিন্, আশীর্বাদ করুন, আমি তাকে পথেই বাধা দেব। আমার দেহে এক বিন্দু রক্ত থাকতেও এ বাড়িতে তাকে ঢুকতে দেব না। বাধা আমি দেবই।”

এই বলেই প্রণাম করে আস্তে আস্তে চলে আসে শিবচরণ।

সন্ধ্যা পার হয়ে গেছে। ত্রয়োদশীর চাঁদ হাসিমুখে তাকায় পূবের আকাশ থেকে। শিবচরণ নিজের ঘরে ঢুকে তার বাঁশের লাঠি নিয়ে বেরিয়ে আসে। তার পর ঠাকুর দালানের সামনে এসে মাটিতে আস্তে আস্তে মাথা ঠেকিয়ে বার হয়ে যায়। এদিকে হতবুদ্ধি জমিদার কাঠ হয়ে বসে থাকেন।

জমিদার-বাড়ির সদর থেকে কাঁচা রাস্তা চলে গেছে একটা বিস্তীর্ণ মাঠের বুকের ওপর দিয়ে। প্রায় মাইল খানেক দূরে একটা প্রকাণ্ড বটগাছ মাঠের মাঝখানে দাঁড়িয়ে ডালপালা ছড়িয়ে দিয়েছে চারদিকে, মনে হয় রোদ্দুরের সময় সেটা যেন একটা ছায়া-শীতল তাঁবু। তলাটায় খুব পাতলা অন্ধকার। শিবচরণ গিয়ে সেখানে দাঁড়ায়।

চাঁদও আকাশ-পথে এগিয়ে চলে আরো ওপরে। দূরে ঘন গাছে ঘেরা গাঁ থেকে যে শিয়াল-গুলো বেরিয়ে আসছে, তাও স্পষ্ট দেখা যায়।

রাত প্রায় দুপুর।

দূর থেকেই দেখা যায় সাতজন লোক আসছে হন্‌-হন্‌ করে। শিবচরণ বুঝতে পারে, এরাই বিশে ডাকাতের দল। ঐ যে সামনের লোকটার একমাথা চুল দেখা যাচ্ছে। ঐ লোকটিই বিশে।

দেখতে দেখতে এগিয়ে আসে তারা। শিবচরণও গিয়ে দাঁড়ায় পথের মাঝখানে।

তাকে দেখেই বিশে ডাকাত এমন একটা হাঁক ছাড়লে, মনে হ'ল বুঝি বা আকাশ থেকে হঠাৎ একটা বাজ পড়ল।

শিবচরণও হেঁকে বললে, "সেলাম সর্দার।"

"কে তুই ?"

"আমি যেই হই সর্দার, আগে আমার সংগে লড়াই না করে জমিদার-বাড়িতে ঢুকতে পারবে না।"

"জমিদারের হয়ে তুই এসেছিস্ আমার সংগে লড়াই করতে।" বলেই হো-হো করে হেসে ওঠে বিশে ডাকাত।

"আমি বেঁচে থাকতে তোমাকে পথ ছেড়ে দেব না।"

"বহুৎ আচ্ছা। তোর সাহস আছে বটে। আমার সংগে লড়তে হবে না, আমার এই সাগরেদ ছ'জনের সংগে তোকে লড়তে হবে। ধর্ লাঠি। কথা দিলাম তুই জিততে পারলে খুশি হয়ে ফিরে যাব।"

শিবচরণ বাগিয়ে লাঠি ধরে।

বিশে ডাকাত তার সাগরেদদের বলে, "ছ'জন এক সংগে লাঠি ধরলে ও পারবে কেন? অন্যায় করে ওকে হারাব কেন? তোমাদের একজন লাঠি ধর।"

শুরু হয় লড়াই। বিশে নিজেই বিচারক হয়ে দেখে। এত দ্রুত আর এত জোরে লাঠিতে লাঠিতে খটাখট লেগে যায় যেন বাঁশের লাঠি থেকে ফুলকি ছটকে বেরুচ্ছে।

হঠাৎ লড়াই বন্ধ করে দেয় বিশে ডাকাত, শিবচরণের পিঠ চাপড়ে বলে, "সাবাস্ ভাই, তুমিই জিতেছ।"

প্রথম সাগরেদ বসে পড়ে হাঁপাতে থাকে।

দ্বিতীয় সাগরেদের সংগে লড়াই চলে। বিশের বিচারে এবারেও জয় হয় শিবচরণের।

এমনি করে একে একে ছ'জনের সংগে লড়াইয়েই জয় লাভ করে শিবচরণ।

বিশে ডাকাতে বলে, "সাবাস্ ভাই! আমার সংগে আর তোমাকে লড়তে হবে না। তুমি হয়রান্ হয়ে পড়েছ। এখন তোমাকে হারিয়ে আমি জিততে চাই না। আমার সাগরেদদের হার হওয়াতেই আমি হার স্বীকার করছি।"

শিবচরণ বলে, "আমিই যদি জিতে থাকি সর্দার, তা হলে তোমাকে তো ফিরে যেতে হয়।"

"নিশ্চয়ই। খুশি হয়েই ফিরে যাচ্ছি।"

বড় যদি হতে চাও

শ্রীদীপেন্দ্র মুখোপাধ্যায়

বড় কে? প্রচুর টাকা আছে যার, না মন বড় যার, সে? শোন মহাপুরুষের বাণী: "টাকার বড়মানুষ কখনই মনের বড়মানুষ নয়। টাকা দেখে আমি তোমাকে সমাদর করব না, জন দেখে তোমার আদর করব না, সিংহাসন দেখে তোমার সম্মান করব না, বাহুবলের জন্য তোমার সম্ভ্রম করব না, কেবল মন দেখেই পূজা করব।" মানুষের সবচেয়ে বড় সম্পদ হ'ল মনের সৌন্দর্য, সেটি স্বাভাবিক সৌজন্য ও বিনয়। যত বড় জ্ঞানী ও বুদ্ধিমান হও না কেন—ব্যবহারে যদি ভদ্রতা রক্ষা করতে না পার, বিদ্যাবুদ্ধি হবে পণ্ড। একটা কথা আছে, "বড় যদি হতে চাও ছোট হও তবে।" যাঁরা বড় হয়েছেন তাঁরাই উপলব্ধি করেছেন এ পরম সত্য: "যদি মানুষ হবার অভিলাষ থাকে, তবে মনকে বিমল কর ও সরল হও। নিজে ছোট হলেই বড় হবে; নিজেকে বড় জানলে কখনও বড় হতে পরবে না।"

শিষ্টাচার করতে মানুষের কোনই কষ্ট নেই, অথচ এর সাহায্যে মানুষকে যথেষ্ট খুশি করা যায়। লেখাপড়া সকলের হয় না, কিন্তু চেষ্টা করলে সকলেই ভদ্র হতে পারে। আমাদের ব্যবহার যেমন, আমরাও তার ফলে তেমনি হয় বিরক্তি নয় সান্ত্বনা পাই; হয় উন্নত নয় ত নীচ হই; হয় বর্বর নয় ত মার্জিত ও ভদ্র হই। পরের ওপর যে ব্যবহার করি তা নিজেদের ওপরও অদম্য প্রভাব বিস্তার করে। গ্রীক পণ্ডিত অ্যারিস্টটল উঁচু মনের সংজ্ঞা নির্ণয় করেছিলেন এইভাবে: "ভালো মন্দ সকল

অবস্থাতেই তিনি সংযমের সংগে চলবেন। নিজেকে খুব উঁচু বলে ভাববেন না, হীন তুচ্ছ বলেও নয়। সার্থকতার আনন্দে তিনি আত্মহারা হবেন না, বিফলতার শোকে মুহ্যমান হবেন না। নিজের কথা বা পরের কথা তিনি বলে বেড়াবেন না। নিজেকে প্রশংসা করা বা পরকে দোষ দেওয়া কোনটারই পক্ষপাতী হবেন না তিনি।"

• অনেকে অহংকার প্রকাশ করে বলে, তাদের মতামতটাই ঠিক—অন্যেরটা ভুল। এদের বিশ্বাস, এরা যা বলে যা করে তাই শুধু ঠিক। অপরের কথা বা কাজ—ভুলে ভরা। অপরকে তারা মানতে নারাজ। নিজের মতকে জোর করে তারা অপরকে গ্রহণ করাবার চেষ্টা করে। গলার জোরে সুবিধে না হলে গায়ের জোরে দেখে। এ রকম মনোভাবে কিন্তু মনের জীবনী-লক্ষণ প্রকাশ পায় না। অপরের মতকে সহ্য করতে শেখো, অপরের মতের সংগে না মিললে অসহিষ্ণু হয়ে কলহ-তর্ক করার মধ্যে অসৌজন্য ও অভদ্রতা প্রকাশ পাবে। সত্য প্রচার করতে হলে চাই সহিষ্ণুতা, শান্ত-ধীর মেজাজ এবং মতপ্রকাশে ও মতবিচারে সৌজন্য ও শিষ্টাচার! তা হলে লাভ হবে এই, সত্য-প্রচারে সমর্থ হবে এবং চেঁচিয়ে গলাবাজি করে শত্রু-সৃষ্টি করবে না।

ইতিহাস-প্রসিদ্ধ অনেক ব্যক্তিই তাঁদের অতুলনীয় ব্যবহার দ্বারা স্মরণীয় হয়ে আছেন। নিজের সুবিধার জন্য অপরকে কখন সামান্যতম পীড়াও দিতেন না গান্ধিজী। দাসপ্রথার উচ্ছেদকল্পে যিনি জীবন উৎসর্গ করেছিলেন সেই গ্যারিসনকে যখন উন্মত্ত জনতা পথের মাঝ দিয়ে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে গিয়েছিল, তখন তাদের প্রতি যে বিনয় তিনি দেখিয়েছিলেন তার তুলনা হয় না। অদ্ভুত ছিল তাঁর মনের শান্তি! ভদ্রতায় তিনি যীশু-খ্রীষ্টেরই পদাংক অনুসরণ করেছিলেন, যিনি দারুণ মৃত্যু-যন্ত্রণায় কাতর হয়েও বলেছিলেন, "পিতা, এদের ক্ষমা কর, এরা জানে না কি করছে!"

বিনয়ী লোকদের সর্বত্রই অবারিত দ্বার। সকলেই তাঁদের আদর করে, সকলেই তাঁদের চায়। তাঁরা হলেন শত্রুজিৎ—মধুর ব্যবহারে শত্রুকে করেন বন্ধু। ডিউক মার্লবরোর মধুর ব্যবহারের প্রভাব সারা ইউরোপে ব্যাপ্ত হয়েছিল। তাঁর স্নিগ্ধ হাসি আর মনোহর বাণী শত্রুর দারুণ ঘৃণাকে ধূলিসাৎ করে শত্রুকে বন্ধুতে পরিণত করত। ওয়েণ্ডেল্ ফিলিপ্স ছিলেন বিখ্যাত বক্তা। লোকে তাঁর উদ্দেশ্যকে মনে মনে না মানলেও মুগ্ধ হয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা তাঁর বক্তৃতা শুনত। তাঁর বলবার ধরনে কেমন একটা সম্মোহনী শক্তি ছিল যা শ্রোতাদের মনোযোগ আকর্ষণ করত।

মানুষের দেহের অসংগতি আর অপূর্ণতা পূর্ণ করে তার শিষ্ট ব্যবহার। মানুষকে আনন্দ দিতে পারা যায় দেহের সৌন্দর্যে নয়—মনোমোহন ব্যবহারের দ্বারা। অতি নিরীহ সাদাসিধা গোছের অতি কদাকার লোকও অতুল্য ব্যবহারে লোককে মুগ্ধ করে।

• "জীবন ক্ষণস্থায়ী হলেও তার মধ্যে ভদ্রতা প্রকাশের যথেষ্ট সুযোগ আছে"—বলেছেন আমেরিকার মনীষী এমারসন। লোকে চাকর-বাকর ও পরিবারস্থ লোকদের সংগে কিরূপ ব্যবহার করে, তার থেকেই পরিচয় পাওয়া যায় তার ভদ্রতার। রথচাইল্ড, লরেন্স, ব্রাক্স প্রভৃতি কোটিপতি-

গণ তাঁদের চাকর-বাকরদের সংগে মধুর ব্যবহার করতেন। হেনরী ফোর্ড একদিন তাঁর এক বন্ধুর সংগে বেড়াতে বেরিয়েছেন। পথে তাঁর কারখানার এক মজুরের সংগে দেখা। সে টুপি তুলে অভিবাদন করলে। ফোর্ড টুপি তুলে প্রতিনমস্কার করলেন। বন্ধুটি বিস্ময় প্রকাশ করে বললেন, সামান্য একজন মজুরকে তিনি নমস্কার করলেন কেন? উত্তরে হেনরী ফোর্ড বলেছিলেন, "আমি চাই না আমার কারখানার মজুর ভদ্রতায় আমায় ছাড়িয়ে যাক্।"

মানুষকে খুশি করতে হলে নিজেও খুশি হওয়া দরকার। বিনয়ী হওয়া মানে নিজের ওপর এবং অন্যের ওপর সন্তুষ্ট থাকা। স্বহস্তে কোরান নকল করে বিক্রয়লব্ধ অর্থ দ্বারা দিনাতিপাত করতেন সম্রাট্ নাসিরুদ্দিন। একবার তাঁর কোন এক লেখায় ভুল বের করেছিলেন তাঁর এক বন্ধু। তিনি তৎক্ষণাৎ সেটি সংশোধন করে নেন। পরে বন্ধুটি চলে গেলে সেটি পূর্বের মতই করে দেন। তাতে বিস্মিত হয়ে একজন কারণ জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেছিলেন, "ওইটিই ঠিক। কিন্তু বন্ধুটি মনে ব্যথা পাবেন বলে তাঁর কথামত কথা কটি লিখেছিলাম।"

সুন্দর প্রাণকে অসুন্দর করে তোলে রূঢ় ব্যবহার। একটুখানি কথা কইবার দোষে ভালোও পুরো ভালো হতে পারে না। মুখের দুটো মিষ্টি কথায় বা একটু মধুর ব্যবহারে সকলেই শতগুণে বাড়িয়ে তুলতে পারে তাদের প্রভাব ও সার্থকতা।

উরাশিমা

শ্রীবীরেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

সে অনেক কাল আগে। সমুদ্রের ধারে—যেখানে সবুজ ঢেউগুলো ফেনার মুকুট নিয়ে আছড়ে পড়ত মাটির বুকে—সেখানে একটি ছেলে থাকত, নাম তার উরাশিমা। সকাল থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত সে একটি ছোট্ট নৌকো চড়ে সমুদ্রের মাঝে ঘুরে বেড়াত; সমুদ্র তার খুব ভালো লাগত, তাই সে ঢেউএর মাথায় মাথায় নৌকো নিয়ে নেচে বেড়াত, আর মাছ ধরত।

একদিন জালটা টেনে তুলতে গিয়ে ভারী ঠেকল, তারপরে টানাটানিতে উঠে এল—মাছ নয়—মস্ত বড় একটা কচ্ছপ। উরাশিমা বললে, "মাছ না জোটে, তাও সই; কিন্তু এই মহাপ্রভুকে খামকা এক হাজার বছরের পরমায়ু থেকে বঞ্চিত করব না।" এই রকম বিবেচনা করে কচ্ছপটিকে সে আবার ছেড়ে দিলে। আর—এ কি!—জলের ঝাপ্টা মিলিয়ে যেতে না যেতেই ঢেউ থেকে উঠে এল অপরূপ এক কন্যা! উরাশিমা অবাক হয়ে চেয়ে আছে দেখে সে বললে, "আমি

সমুদ্র-দেবতার মেয়ে। তোমাকে দেখে যতটা ভালো মনে হয়, সত্যি তুমি ততটা ভালো কিনা পরীক্ষা করে দেখবার জন্য বাবা আমাকে পাঠিয়েছিলেন। তাই আমি কচ্ছপ সেজে এসে দেখলাম, মাছ না পেলেও তুমি কি কর। আমি খুব খুশি হয়েছি। তুমি আমার সঙ্গে চলো জলের নিচে আমাদের ড্রাগন-প্রাসাদে। বাবা খুব খুশি হবেন।"

উরাশিমার তো খুব আনন্দ হ'ল এই ভেবে যে সমুদ্রের দেশটা একবার দেখে আসা যাবে। জলের নিচে আবছা-আলোর দেশে এসে উরাশিমা অবাক হয়ে চারদিক দেখতে লাগল। কোরাল ডালের ফাঁকে ফাঁকে মাছগুলো সব লুকোচুরি খেলে বেড়াচ্ছে, নানা রকম রঙের নানা রকম ঢঙের সব মাছ যেন মণিমুক্তার রং-বেরঙের আলো লেগে ঘুমপরীদের দেশের মতো স্বপ্ন এনে দিচ্ছে। গাছ-পালা-পাতা সব কিছুর কী অদ্ভুত রং—কী সুন্দর গড়ন! উপরে ঢেউএর অত তো গর্জন, উরাশিমা ভেবেছিল নিচে না জানি কী ভীষণ শব্দই হবে,—কিন্তু শুধু একটা মৃদু ঝরণার ঘুমপাড়ানি গানের মতো শব্দ ভেসে আসছে। ড্রাগন-প্রাসাদটি সমুদ্রপুরীর নানা রকম মণি-মুক্তা, হীরে-চুনী-পান্না দিয়ে তৈরি, তার থেকে সব সময়ে এমন অপূর্ব জ্যোতি ঠিকরে বেরুচ্ছে যে, মনে হচ্ছে রকমারি আলো দিয়ে বাড়ীটিকে সাজিয়ে রাখা হয়েছে।

উরাশিমা সেখানে গিয়ে পৃথিবীর রোগ-শোক-দুঃখ সব ভুলে গেল। সেই স্বপ্নের দেশে মহা আনন্দে দিন কাটতে লাগল তার। এমনি করে কেটে গেল দীর্ঘ চার বছর। শেষে একদিন এক কচ্ছপের সঙ্গে দেখা হয়ে যাওয়াতে তার মন কেমন করে উঠল, সমুদ্রপারের কথা মনে পড়ে গেল,—ইচ্ছে হ'ল একবার মা-বাবার সঙ্গে দেখা করে আসে।

রাজকন্যা তার মুখ দেখেই ব্যাপারটা বুঝলে, বললে, "তোমার বাড়ী যেতে ইচ্ছে করছে দেখছি। কিন্তু আমাদের তোমাকে ছেড়ে দিতে ইচ্ছে করছে না একটুও। তোমাকে আবার ফিরে আসতে হবে এখানে।" এই বলে তার হাতে একটা বাক্স দিয়ে বললে, "এই বাক্সটা সঙ্গে রেখো। এটা হাতে নিয়ে এখানে চলে আসবার ইচ্ছে করলেই আসতে পারবে। কিন্তু সাবধান! খুলো না, বাক্সটা খুললেই সব পণ্ড হয়ে যাবে; আর কিছুই করবার উপায় থাকবে না।"

প্রবালের সেই সুন্দর বাক্সটি হাতে নিয়ে পারে যাবার ইচ্ছে করা মাত্র সে তো গিয়ে উঠল সমুদ্রের ধারে বড়ো পাইন গাছটার পাশে—যেখানে ছিল তাদের ছোট বাড়ীখানা। কিন্তু কাছে এসে উরাশিমা দেখলে সে বাড়ীও নেই, সে গাছও নেই। তার বদলে নতুন ধরনের অদ্ভুত সব বাড়ী চারদিকে। অভিনব পোষাক পরে অচেনা সব লোক ঘুরে বেড়াচ্ছে। এক বুড়োকে ডেকে সে শুধালে, "উরাশিমার বাড়ীটা বলতে পারো কোথায়?"

চোখ কপালে তুলে বুড়ো বললে, "উরাশিমা! সে কি? তবে একটা প্রবাদ গল্পের মতো শুনেছি বটে ঠাকুমার কাছে যে চারশো বছর আগে ঐ নামের একটি ছেলে সমুদ্র থেকে আর ফেরেনি। কেউ বা বলে সে নাকি ডুবে গেছে, কেউ বলে ঢেউ-পরীরা নাকি তাকে কোথায়

নিয়ে গেছে। তা তুমি কি সেই উরাশিমার কথা বলছো—যে রাতদিন সমুদ্রেই ঘুরে বেড়াতে ভালোবাসত ?"

চারশো বছর ? এঁ্যা ! সে কি কথা ! সে তো মোটে বছর চারেক হ'ল ড্রাগন-প্রাসাদে বেড়াতে গিয়েছিল ! তা হলে এ কি সত্যি—তার বাবা-মা, ভাই-বোন, কেউ নেই ? সমস্ত গ্রাম ঘুরে সে বুঝলে সত্যি ; পরীর দেশের সময়ের সঙ্গে এখানকার সময়ের কোনো মিল নেই। ভাবলে, রাজকন্যার কাছেই ফিরে যাবে। কিন্তু ফিরে যাবার রাস্তাটা কেমন যেন গুলিয়ে গেল। বাক্সটার কথা মনে পড়তে ভাবলে, তাই তো এটার মধ্যে ফিরে যাবার উপায় আছে। এই ভেবে অন্য মনে সে ফস্ করে তার ডালাটা খুলে ফেললে। আর অমনি তার মধ্য থেকে হুস্-হুস্ করে বেরোতে লাগল সাদা চাপ চাপ ধোঁয়া। অবাক হয়ে সে সেদিকে তাকিয়ে রইল, তার মনে হ'ল যেন সেই ধোঁয়ার মধ্যে ভেসে ভেসে রাজকন্যার মুখ মিলিয়ে যাচ্ছে ক্রমে সমুদ্রের জলের উপরে। দু'হাত বাড়িয়ে সে তাকে ডাকতে গেল।

আর তক্ষুনি মনে হ'ল তার দেহের শক্তি যেন কমে যাচ্ছে, বুড়ো হয়ে যাচ্ছে সে। দেখতে দেখতে তার চুল-দাড়ি সব পেকে গেল, হাত-পা কাঁপতে লাগল। তার পরে সে যেন আস্তে আস্তে মিলিয়ে যেতে লাগল হাওয়ায়,—মিলিয়ে গেল অতীতের দেশে—যে অতীতকে সে ঠেকিয়ে রেখেছিল চারশো বছর।

ক্রমে যখন চাঁদ উঠল পাইন গাছের মাথায়, তখন সেখানে পড়ে রইল শুধু সেই প্রবালের বাক্সটা। আর ঢেউ তাকে ঢেউএর দেশে নিয়ে যাবে বলে এসে আছড়ে আছড়ে পড়তে লাগল—যেমন আছড়ে পড়ত চারশো বছর আগে।

জাপানী রূপকথা

আষাঢ়-সাঁঝে

শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য

নদীর বুকে বাজছে ভেরী ;
আকাশ-গাঙে তুফান হেরি।
আষাঢ়-সাঁঝে বাদল নাচে,
মেঘমুলুকে মাদল বাজে।
আগল খুলে পাগল ডাকে
বাহির করে' ছাগলটাকে।
গোহালে এসে মুখটি তুলি
দাঁড়িয়ে আছে গোধনগুলি।

দস্যি ছেলে বায়না ধরে
পড়্‌তে আর যায় না ঘরে।
বেড়ায় ঘুরে তন্দ্রাপরী ;
ওড়্‌নাতে তার সোনার জরি।
মৌমাছিরা গুন্‌গুনিয়ে
কত না গান যায় শুনিয়ে!
ভিজ্‌ছে পথে বাবুই পাখী,
সন্ধ্যেবেলা কে যায় ডাকি!

জোনাক জ্বলে আকাশতলে,
পেখম তুলে ময়ূর চলে।
ব্যাঙের ডাকে খোকন কাঁদে,
কয় না কথা মায়ের সাথে।
বৃষ্টি পড়ে মিষ্টি সুরে
নীলাকাশের অশ্রুঝুরে।
ঢেউ-তোলা ঐ নদীর ধারে,
কদম-কেয়া খুঁজছে কারে!

মেঘের জালে জড়িয়ে বুঝি
তারারা পথ পায় না খুঁজি'।
ভিজে হাওয়ায় কাঁপছে বীথি,
ঝিঁঝির গানে ঝিমায় স্মৃতি।
কোথায় যেন ভাঙ্‌ছে নদী
ফিরিয়ে নিতে আপন গতি!
কোথায় যেন ঝড়ের রাতি
খুঁজ্‌ছে তার খেলার সাথী!

হৃদয় মোর হারিয়ে ফেলে
বসে আছি প্রদীপ জেলে।
এমন ক্ষণে তোমার সনে
গাইবো মাগো ভাব্‌ছি মনে ;
সুদূর পারে স্বপন তুমি,
সেথায় কেন রইলে তুমি!

কাঠখোট্টা ভুট্টাখোর

শ্রীমৃত্যুঞ্জয় বরাট সেনগুপ্ত

মণ্টু, খ্যাদা, হরিশ, হাবুল—এদের না চেনে কে? ফুটবল, হকি, ক্রিকেট থেকে কপাটী খেলায় এদের কৃতিত্ব আর কেরামতি এ গ্রাম ছাড়িয়ে বাঙলাদেশের দু'চার জেলায় ছড়িয়ে পড়েছে। সোনা-রূপোর কাপ্ আর পুরস্কারের জিনিসে প্রত্যেকেরই পড়বার টেবিল বোঝাই হয়ে রয়েছে। নানা রকম মেডেল পরে যখন ওরা আবার নতুন খেলায় বিজয়ী হয়ে পুরস্কার নিয়ে সভাপতিকে অভিবাদন করে, তখন বিজলী বাতির আলোয় কিংবা অস্তগামী চিক্‌মিকে সূর্য্যকিরণে তাদের গায়ের মেডেলগুলো মাছের আঁশের মতোই চিক্‌মিক্ করতে থাকে।

ওরা সবাই ব্যবসায়ী বড়লোকের ছেলে। কালোবাজারের কল্যাণে ওদের ঘরে পয়সার অভাব নেই। বাড়ীতেও প্রত্যেকেরই দু'তিনটে করে মাষ্টার আছে পড়াবার জন্যে। তবে ছেলেদের মতো মাষ্টারদেরও বেশী মাথা ঘামাতে হয় না, নিত্য তাদের বাড়ীতে হাজিরা দিতে যাওয়ার যা পরিশ্রম। মাসের মধ্যে সাড়ে উনত্রিশ দিন তারা বাইরে বাইরে 'ম্যাচ' খেলে সুনাম পায়, তাতে দেশের ও স্কুলেরও সুনাম হয়। কাজেই পড়ার পরীক্ষার আর প্রয়োজন হয় না, 'প্রমোশন' তো তাদের হাতধরা। কিন্তু এবার বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষার ফলাফল কি হবে বলা যায় না। পুরো আড়াইটি মাস ছুটি। মা-সরস্বতীর সঙ্গে এখন কোন সম্বন্ধ নেই। খেলাধূলো, গান-গল্প নিয়ে পাড়ার আড্ডাঘরটি তারা রীতিমত জম্‌জমাট করে তুলেছে।

আজ বিকেলবেলায় আসছেন বিলাত-ফেরত এবং 'অল ইণ্ডিয়া স্পোর্টস্ চ্যাম্পিয়ান্' শ্রীযুক্ত হারী তরফদার। ক্লাবে আজ ওদেশের খেলার বিশেষত্ব সম্বন্ধে তাঁর একটা নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা হবে, তা ছাড়া তিনি এই ক্লাবের সভ্যদের অনেকগুলো মেডেল দিতে প্রতিশ্রুত রয়েছেন।

শ্রীযুক্ত তরফদার শুধু একজন খেলোয়াড়ই নন, তিনি বিদ্বান, সরকারী শিক্ষা-বিভাগের স্কুল পরিদর্শক এবং সর্ব্ব সমাজে তাঁর নাম ও প্রতিপত্তি আছে।

এহেন লোকের আগমন সম্ভাবনায় 'বয়েজ ক্লাবের' সভ্যেরা রীতিমত ব্যস্ত ও উৎফুল্ল হয়ে উঠেছে। ক্লাবঘর ও তার সংলগ্ন প্রাঙ্গণটিকে যথাসম্ভব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে, ফুলের টব, পাতাবাহারের সারি, লাল-নীল কাগজের নিশান আর মালা ও রঙীন বাতিতে বেশ পরিপাটী করে সাজানো হয়েছে। চা আর চপের সঙ্গে আইস্‌ক্রীম আর বরফ-লেমনেডের বন্দোবস্তও হয়েছে প্রচুর রকমের। তা ছাড়া গরম নিমকি সিঙাড়া তো মধু ময়রার সঙ্গে আগে থেকেই বন্দোবস্ত করা হয়েছে।

তরুণ সভ্যেরা দুপুর থেকেই টেবিল চেয়ার আর দোর-জান্‌লার পর্দা সাজাতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। কিশোর সভ্যেরা এক এক দিকে জড়ো হয়ে 'ক্যারম্', 'ব্যাগাটেল', 'পিঙপঙ্' আর জোড়া কত তাস নিয়ে দারুণ হল্লায় মেতে উঠেছে।

মণ্টু, খ্যাদা, হরিশ, হাবুল মুরুব্বিয়ানার ভঙ্গীতে চারদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছে। ক্লাবের সব সভ্যেরা সপ্রশংসদৃষ্টিতে তাদের দিকে চেয়ে চেয়ে দেখছে।

ক্যারমের কুইনটাকে রিবাউণ্ড করে গর্ত্তের মধ্যে ফেলে দিয়েই ন্যাপ্লা বলে উঠল—"আজকের সভায় দেখিস্ মিষ্টার তরফদার মণ্টুদার সুখ্যাতিতে পঞ্চমুখ হয়ে উঠবেন। সোনার মেডেলখানা মণ্টুদা ছাড়া আর কাউকে পেতে হচ্ছে না।"

ওপাশ থেকে 'পিঙপঙের গেম্ ফিনিশ' করে নরহরি বলে উঠল—"মণ্টুদার চেয়ে 'হাপব্যাকে' খ্যাদা নন্দী এবার 'অল ইণ্ডিয়ায়' নাম কিনেছে—"

তার কথা শেষ করতে না দিয়ে ছুঁচোমুখো পঞ্চু, তার পা নাচিয়ে চক্ষু নেড়ে বলে উঠল—"তা যা বলিস্, আমাদের হরিশ হালদারের চেয়ে 'হকি খেলায়' এ তল্লাটে ওস্তাদ আর আছে কে?"

তর্ক বেশ জমে উঠছিল, কিন্তু সহসা চারমূর্ত্তি অর্থাৎ মণ্টু, খ্যাদা হরিশ, হাবুল বুক চিতিয়ে বেড়াতে বেড়াতে সে ঘরে ঢুকে, 'ব্যাগাটেলের' খেলোয়াড়দের কাছে এসে বলে উঠল—"আ মলো যা! এই মেয়েলী খেলা নিয়ে তোরা এমন গম্ভীর হয়ে বসে আছিস্ যেন ছিষ্টির ভাঙ্গাগড়াটা ভগবান তোদের হাতে দিয়েই নিশ্চিন্ত আছেন। যা—যা সব, রোদ পড়েছে, মাঠে গিয়ে ততক্ষণ কপাটী খেলগে যা। মিষ্টার তরফদার এসে দেখতে পেলে খুশী হবেন।"

এদের চারজনকে এত কাছে পেয়ে আহ্লাদে গদগদ হয়ে পঞ্চু আর নরহরি একসঙ্গে বলে উঠল—"সোনার মেডেলখানা আজকে মিষ্টার তরফদার যে কাকে দেবেন—"

মণ্টু তাচ্ছিল্যের হাসি হেসে বলে উঠল—"আরে ছোঃ! অমন মেডেল আমি—"

তার কথা শেষ হতে না দিয়ে খ্যাদা নন্দী বাঁকা চোখে একটা ছেলের দিকে তাকিয়ে ব্যঙ্গের সুরে বলে উঠল—"মিষ্টার তরফদারের সোনার মেডেলখানা এবার বোধ হয় 'কাঠখোট্টা ভুট্টাখোরের' গলায় ঝুলে ঝক্‌ঝকানিতে ঝলসে উঠবে।"

মণ্টু, হরিশ আর হাবুল একসঙ্গে হো-হো করে হেসে উঠল।

যাকে উদ্দেশ করে তাদের এই বাক্যবাণ, সে কিন্তু তাদের এই রঙ্গ-ব্যঙ্গের মর্ম্মটা ঠিক বুঝতে পারল কিনা তা' বোঝা গেল না। ছেলেদের মাঝখানে বসে সে তখন একমনে 'ব্যাগাটেলের' খেলা দেখছিল। তালি-দেওয়া আধময়লা হাফপেণ্টের ওপর খাকীরঙের একটা পুরানো কোট, পায়ে মামুলী চপ্পল, মাথায় চুলগুলো কদমছাঁট, গায়ের রঙটা রোদে পোড়া পাহাড়ীদের মতো,—চেহারায় যেন বাঙালীর কোন কোমলতাই নেই, আঁটসাঁট পেশী বার করা যেন একটি বজ্র বাঁটুল।

বাঙালীর ছেলে হলেও ও-বেচারা থাকে বাংলার বাইরে ছাপ্রা জেলায়। ওর বাবা সেখানকার সামান্য স্কুল মাষ্টার। ছেলেবেলা থেকেই সে সেখানকার আবহাওয়ায় বড় হয়েছে। হিন্দী কথাবার্ত্তা আর হিন্দুস্থানী ছেলেমেয়েদের সংসর্গে থেকে থেকে তার বাংলা কথায় কেমন যেন আড়ষ্টভাব এসে গিয়েছে। প্রায়ই ছুটিছাটায় সে তার বাবার সঙ্গে দেশে আসে, কিন্তু

এখানকার সমবয়সী সবার সঙ্গে সে ভালো করে মিশতে পারে না। কথাবার্তায় ও আচার-ব্যবহারে তার এমন গোটা কতক ভুল হয়ে যায় যে, এখানকার সবাই তাকে 'কাঠখোট্টা ভুট্টাখোর' বলে বিদ্রূপ করে। সবাই তাকে ঐ নামে সহজে চিনে নেয়।

সে-ও এবার পাটনা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষা দিয়ে একটানা লম্বা ছুটিতে তাদের দেশের বাড়ীতে এসেছে। মণ্টু, খ্যাঁদা, হরিশ, হাবুল তার সমবয়সী আর সমপাঠী হলেও, ও-বেচারা 'ছাতুখোর' আখ্যা পেয়ে ওদের সঙ্গে ঠিক খাপ খাইয়ে উঠতে পারে না।

খেলাধূলোয় তার কৃতিত্ব তেমন না থাকলেও কুস্তির প্যাঁচে আর গায়ের জোরে মণ্টু, খ্যাঁদা, হরিশ, হাবুল তাকে মনে মনে বেশ সমীহ করেই চলে, কিন্তু মুখে বলে—"আরে ওটা একটা মেড়োর দেশের কাঠখোট্টা ভুট্টাখোর—"

মিষ্টার তরফদার আসবেন শুনে তার মনটাও আনন্দে নেচে উঠেছে। তরফদারকে ও চেনে। তাঁর হাত থেকে সে তার স্কুল থেকে গত বছরেও পুরস্কার গ্রহণ করেছে। তবে তরফদারের পক্ষে তাকে মনে না রাখাই স্বাভাবিক। কেননা তার মতো কত শত ছেলে নিয়ে তাঁর কারবার।

মিষ্টার তরফদারের হাত থেকে সে গতবার পুরস্কার নিয়েছে—একথা সে এখানকার কারুকে কোনদিনও বলেনি। বললেই বা সেকথা বিশ্বাস করত কে? তা ছাড়া সেগুলো তো আর খেলার পুরস্কার নয়। ও-বেচারা সভার নির্দ্দিষ্ট সময়ের ঢের আগে থেকেই ক্লাবে এসে একা একা এদলে সেদলে খানিক ঘুরে ফিরে শেষটায় 'ব্যাগাটেলের' মতো এক বিচিত্র খেলা দেখতে লেগে গেল।

খ্যাঁদা নন্দীর ব্যঙ্গোক্তি সে শুনেছিল, কিন্তু তাতে সে কান দেয়নি। মণ্টু, খ্যাঁদা, হরিশ, হাবুল আর তাদের সঙ্গে অনেকেই তাকে নিয়ে যে রঙ্গ-ব্যঙ্গ করে আনন্দ পাচ্ছে, তা সে বুঝতে পারছিল, কিন্তু ইচ্ছে করেই তা গায়ে মাখছিল না।

অনেকক্ষণ পরে, প্রায় সন্ধ্যে হয়ে আসে আসে, এমন সময় বাইরে একখানা প্রকাণ্ড 'রোলস্ রয়েস্' ভোঁক্ ভোঁক্ আওয়াজ করে ঘাঁস্ করে থেমে গেল। পাড়ার মাতব্বররা আর ছেলেরা সব ছুটে গেল—"ঐতো এসে গেছেন"—বলে মিষ্টার তরফদারকে 'রিসিভ' করতে।

সভার কাজ আরম্ভ হয়ে গেল। মিষ্টার তরফদার নানা আলোচনার পর খেলাধূলা সম্বন্ধে নাতিদীর্ঘ এক বক্তৃতা দিলেন। মণ্টু, খ্যাঁদা, হরিশ, হাবুল মিষ্টার তরফদারকে মিষ্টি কথায় আপ্যায়িত করতে লাগল। সভায় চা চপ্ সিঙাড়া নিমকির সঙ্গে আইসক্রীম পরিবেশন চলতে লাগল, এমন সময় কোণের একখানা বেঞ্চিতে একটি ছেলের দিকে দৃষ্টি পড়তেই মিষ্টার তরফদার বলে উঠলেন—"ও ছেলেটি কে বল তো? যেন চিনি চিনি মনে হচ্ছে। ডাকো তো ওকে এদিকে—"

এবার সেই ছেলেটি উঠে দাঁড়িয়ে হাত জোড় করে তাঁকে নম্র নতি জানিয়ে তাঁর কাছে এসে দাঁড়াল। মিষ্টার তরফদার তাকে ভালো করে একবার দেখে নিয়ে বললেন—"তুমি বোধ হয় মিষ্টার সেনের ছেলে, তোমার নাম অমলেন্দু—না?"

ঘাড়টি নীচু করে সে বললে—"জী, হাঁ…"

তার মেড়ো ধরনের উত্তর দেওয়ায়, সভায় মৃদু হাসির একটা গুঞ্জন উঠল। তাতে খেয়াল না করে মিষ্টার তরফদার উঠে দাঁড়িয়ে তার পিঠে ডান হাতখানি রেখে সস্নেহকণ্ঠে বললেন—"আমি জানি, তুমি এখন দেশের বাড়ীতে আছ, তবে আশা করতে পারিনি যে, তোমাকে এখানে দেখতে পাব।" বলেই কোটের পকেট থেকে একখানি সেইদিনের পত্রিকা বার করে তার দিকে এগিয়ে ধরে বললেন—

"সবার আগে বোধ হয় আমিই তোমাকে এ সুসংবাদটুকু দেবার সৌভাগ্য লাভ করছি অমলেন্দু! এই দেখ, পাটনা য়ুনিভার্সিটীর প্রবেশিকা পরীক্ষায় এবার চারটি বিষয়ে তুমি প্রথম স্থান অধিকার করেছ। তোমার ফটো ছাপা হয়েছে শুধু সেই জন্যেই নয়। এবার হরিহরছত্রের মেলায় তোমার পরিচালিত 'কর্ম্মি-সংঘের' তৎপরতা, আর পাঞ্জাব রিফুজী ক্যাম্পে অতি সুকৌশলে অগ্নি নির্ব্বাপণ আর শোন নদীর বানে ভেসে যাওয়া তিনটি নিমজ্জমান বালককে উদ্ধার করার জন্যে সরকার বাহাদুর তোমার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে সহস্র ধন্যবাদ জানিয়েছেন। বাংলার বাইরে থেকে 'ভেতো বাঙালী' হয়ে তুমি সত্যিই বাঙালীদের মুখ উজ্জ্বল করেছ।"

সভার সবাই তখন ঝুঁকে পড়েছে মিষ্টার তরফদারের হাতে খবরের কাগজের ফটোখানির দিকে। সত্যিই তো! এই তো ঐ অমলেন্দু সেন। আমাদের 'কাঠখোট্টা ভুট্টাখোর'!

মিষ্টার তরফদার তাঁর বুকপকেট থেকে, লাল রেশমী ফিতে বাঁধা সোনার মেডেলখানি বার করে 'কাঠখোট্টা ভুট্টাখোরের' গলায় ঝুলিয়ে দিতে দিতে বললেন—"খেলাধুলো করে, বয়েসকালে নাম করা যায় সত্যি; আমরা বাঙালী, তা থেকে কোন দিনই পিছিয়ে যাব না জানি, কিন্তু সত্যিকার সৎসাহস, আর শত অভাব-অভিযোগের মধ্যে অধ্যবসায়ী হয়ে বিদ্যামন্দিরে শ্রেষ্ঠত্ব বরণ করার সঙ্গে মানবকল্যাণে আত্মনিয়োগ করাকে আমি সত্যকার গৌরব মনে করি। আশীর্ব্বাদ করি তুমি ভবিষ্যতে সর্ব্বমানবের বরেণ্য হয়ে সারা বাঙলার মুখ উজ্জ্বল করবে।"

যুক্ত করে নতজানু হয়ে অমলেন্দু যখন ভক্তিভরে মিষ্টার তরফদারকে নতি জানিয়ে ঘাড় তুলে সবার দিকে তাকালে, তার প্রফুল্ল মুখখানিতে উজ্জ্বল চোখ দুটি খুসীর আনন্দে চক্-চক্ করছে।

মণ্টু, খ্যাঁদা, হরিশ, হাবুল লজ্জায় যেন মাটিতে মিশিয়ে যেতে চাইছিল। খ্যাঁদা নন্দীর সঙ্গে সবাই তাকিয়ে দেখলে—সত্যিই সোনার মেডেলখানি 'কাঠখোট্টা ভুট্টাখোরের' গলায় ঝুলে আলোর ঝক্‌ঝকানিতে ঝল্‌মল্ করছে।

দুটি ভাই

শ্রীক্ষেত্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

দুটি ভাই যেন একটি বোঁটায় দুটি ফুল। দাদা বলিতে ছোট ভাই সারা। ভাই-এর নামে দাদা পাগল। এমনটি আর দেখা যায় না। দেখিলে চোখ জুড়াইয়া যায়।

ছোট ভাই একদিন আসিয়া দাদাকে বলিল, "বাবার এ কেমন ধারা বিবেচনা দাদা?"

অবাক হইয়া দাদা শুধাইল, "কিসের বিবেচনা ভাই?"

ছোট ভাই বলিল, "শোননি? বাবা তাঁর যাবতীয় বিষয়-আশয় আমাদের দু'জনের নামে সমান-সমান ভাগে লিখে-প'ড়ে রেখেছেন; তা' ছাড়া চুঁচুড়ার সবচেয়ে বড় আর ভাল বাড়ীখানা আমাকে বেশীর ভাগ দিয়েছেন। এটা কি ঠিক হয়েছে দাদা?"

হাসি-মুখে দাদা জবাব দিল, "কেন, ঠিক হয়নি কেন ভাই?"

ছোট ভাই বলিল, "না, কিছুতেই ঠিক নয়। বড় ছেলেরই সব পাওয়া উচিত; রাজার ছেলেরা তাই পায়। বাবা রাজা নয় ব'লেই আমি তবু আধা-আধি পেলাম। এর ওপরেও আবার বেশী! এ ভয়ানক অবিচার আর এক-চোখোমি।"

বড় ভাই-এর খেয়াল হইল। ছোট ভাইটির গলা জড়াইয়া বলিল, "হ্যাঁ ভাই, খুবই অবিচার। বাবার উচিত ছিল আমাকে কিছুই না দিয়ে কেবল তোমাকেই দেওয়া। আমি তোমার চেয়ে সাত বছরের বড়। এই সাত বছর বাবার ভালবাসা একলাই পেয়েছি, তুমি তা' পাওনি। এর পরেও আমাকে কিছু দেওয়ার মানেই তোমার উপর অবিচার করা। নয় কি?"

দু'জন দু'জনকে জড়াইয়া ধরিল।...এই ভাই দুইটি কাহার ছেলে? ভূদেবচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের বড় ছেলে গোবিন্দদেব এবং ছোট ছেলে মুকুন্দদেব। মুকুন্দদেবের মেয়ের নাম অনুরূপা দেবী।

পিচকারী ফুল

শ্রীননীগোপাল চক্রবর্তী

'পিচকারী' নামটা অবশ্য আমার নিজের দেওয়া। আসলে এ ফুলটির নাম কি, আমি তা জানিই না। এখানকার অনেককে জিজ্ঞাসা করেছি, কিন্তু কেউ এই ফুলের আসল নাম কি বলতে পারেন নি।

গাছটি কৃষ্ণনগরের মিশনারী স্কুলের কম্পাউণ্ডের কাছে আছে। কোন্ কালে কে এই গাছটি লাগিয়েছিল তাও কেউ বলতে পারছেন না।

ছেলেরা কিন্তু এর খোঁজ পেয়ে গিয়েছে।

শক্ত এবং মসৃণ আবরণ বিশিষ্ট ফুলকুঁড়িগুলি পেড়ে নিয়ে ছেলেরা তাদের পকেটে লুকিয়ে রাখে। তারপর কোনও বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে ঠাট্টা-তামাসা করতে হলে—একটি কুঁড়ি বের করে দেয় তাতে টিপি; অমনি কুঁড়িটির মুখ থেকে খুব সরু পিচকারীতে যে ভাবে জল ছিটকে যায়, সেই ভাবে জল ছিটকে বন্ধুর গায়ে মাথায় লাগে, আর সে চমকে ওঠে!

জলটা টলটলে পরিষ্কার, কোনও গন্ধ নেই তাতে এবং ওটা জামা-কাপড়ে লাগলে কোনরূপ দাগও হয় না। খুব মজার ব্যাপার নয় কি?

এই গাছটি দেখতে অনেকটা আমড়া গাছের মত। ফুল হয় থোকা থোকা। কুঁড়িগুলিকে বাঁকা ফল বলে হঠাৎ মনে হয়। কতকটা 'বাঘনখের' মত এর গড়ন। কুঁড়ির আবরণটা ছিঁড়ে ফেললে এর ভিতর দেখা যাবে, জলের মধ্যে ঘুমিয়ে রয়েছে লাল রংয়ের ফুল-শিশু। কুঁড়ির মধ্যে জল পেয়ে এই ফুল বড় হয় এবং যথাকালে আবরণ ভেদ করে বেরিয়ে আসে টকটকে লাল রং নিয়ে। —জলপরী যেন বেরিয়ে আসে লাল রংয়ের ওড়না গায়ে দিয়ে হাসি হাসি মুখ নিয়ে।

ফুল-শিশুকে রক্ষা করতে কত কুঁড়িরই না কত রকম কারসাজি করতে হয়!

প্রকৃতির বৈচিত্র্যের মধ্যে এই ফুল-কুঁড়িও একটি। কেউ যদি এই ফুল গাছটির সম্বন্ধে আরও বিবরণ দিতে পারেন, তা হলে ভবিষ্যতে সেটা জনসাধারণের উপকারে আসতে পারে।

শ্রীরবিদাস সাহা রায়

(২)

হ্যাঁ, ভাল কথা। বেচারাম আরো কিছু পেল। সে তো ছিল সৈনিক; এবার তাকে করা হ'ল সরফ্‌রাজ। কম কথা নয়! মন্ত্রীকে সে বুদ্ধি দেবে, রাজাকে বুদ্ধি দেবে। এমন কি ইচ্ছে করলে দু'একটা লোকের মুণ্ডুও কেটে ফেলবার হুকুম দিতে পারে সে।

বেচারাম এবার আনন্দে তিড়িং-তিড়িং নাচতে সুরু করে দিল।

এদিকে নিধিরাম বেচারার অবস্থা কাহিল। সে গোঁফের শোকে দশদিন দশরাত্তির ঘুমুল না, খেল না, এমন কি জলগ্রহণও করল না। তারপর রাজার লোকেরা বলে কয়ে তাকে ভাত খাওয়াল। পাড়াপড়শীরা এসে তাকে ঘুম পাড়াল।

আবার সর্দ্দারী পাওয়ার আশায় নিধিরাম গোঁফে তেল মাখতে সুরু করল। গোঁফটা তাড়াতাড়ি লম্বা করবার জন্য গেল বদ্যির কাছে ওষুধ আনতে।

বুড়ো জবুথবু বদ্যি। বয়েস পাঁচকুড়ি কি দশকুড়ি তা বোঝা মুস্কিল।

তবু বুড়োর অসাধারণ ক্ষমতা—রোগীদের দূর থেকে দেখেই রোগ চিনতে পারে।

তার দোরগোড়ায় গিয়ে দাঁড়াতেই নিধিরামকে সে পাগল বলে ঠাউরে নিল। তাই চেঁচিয়ে বলতে সুরু করল—ভৃঙ্গরাজের রস, গোরচনা আর মধু ……

তারপর নিধিরামকে শুইয়ে দিল মাটির উপর। নাড়ী পরীক্ষা করল, পেট পরীক্ষা করল, চোখের পাতা উলটিয়ে দেখল, তারপর আর কোন রোগের হদিস না পেয়ে বলল—ঐ ওষুধটাই খাবে রোজ তিন বেলা করে।

নিধিরাম ভ্যাবাচ্যাকার মত বলে উঠল—ওতেই আমার গোঁফ তাড়াতাড়ি বড় হবে?

—গোঁফ?…বুড়ো বদ্যির চোখ কপাল ছেড়ে মাথায় উঠবার যোগাড় হ'ল।

—হ্যাঁ গোঁফ।…নিধিরাম বলল—আমার গোঁফ আগের মত ভাল হবে তো?

বুড়ো বদ্যি এবার সত্যি ভাবিত হয়ে পড়ল—গোঁফেরও আবার অসুখ হয় নাকি?

—আজ্ঞে গোঁফের অসুখ হয় নি। গোঁফটা ইঁদুরে কেটেছে, আমার বড় সাধের গোঁফ—সেটাকে আবার তৈরী করতে চাই।

বুড়ো বদ্যি ভুরু কুচকে বলল—ইঁদুরে খেয়েছে? ছুঁচো ইঁদুর? সর্ব্বনাশ! ছুঁচোর মুখ ভারী অপয়া। ছুঁচোতে খেলে তো আর সেটা বড় হবে না। গোঁফটা সবটুকু চেঁচে ফেলে দিলে যদি আবার গজায়।

নিধিরাম ভয় খেয়ে গেল—সর্ব্বনাশ, যেটুকু আছে সেটুকুও ফেলে দিতে হবে?

—হ্যাঁ, ভাল চাও তো সবটুকু ফেলে দাও, নইলে একবার ছুঁত লেগে গেলে আর রক্ষা নেই।

নিধিরাম সবটুকু গোঁফ ফেলে দিয়ে দুঃখিতমনে বাড়ী ফিরে এল। গোঁফের ওষুধ আনতে গিয়ে যে তার বাকি গোঁফটুকু হারাতে হবে তা সে স্বপ্নেও ভাবতে পারে নি।

যা হোক্, সে দিন গুণতে লাগল কবে আবার গোঁফ গজাবে—কবে সেই সর্দ্দারীটা আবার ফিরে পাবে।—সারাদিন গোঁফের কথা ভাবে—সারারাত গোঁফের স্বপ্ন দেখে।

(৩)

হবুরাম রাজা সিংহাসনে বসে আছেন। গবুরাম মন্ত্রী বসে আছেন পাশে। সেনাপতি বসেছে একটু দূরে। প্রহরীরা দাঁড়িয়ে আছে।

হবুরাম জিজ্ঞেস করলেন—মন্ত্রী, এবার কি করতে হবে?

গবুরাম জবাব দিলেন—এবার অস্ত্রশস্ত্র তৈরী করতে হবে।

—অস্ত্রশস্ত্র কেন?

—রাজ্য রক্ষা করতে হবে তো?

—কেন, রক্ষা তো হচ্ছেই।

—যদি অন্য কোন রাজা আমাদের রাজ্য আক্রমণ করে?

—সর্ব্বনাশ, আরো রাজা কেউ আছে নাকি?

—হয় তো থাকতে পারে। এত বড় সসাগরা পৃথিবীর সব খবর কি আমরা জানি?

—কেন, কেউ কি বলতে পারে না?

সবাই মহা ভাবনায় পড়ে গেল।

সেনাপতি এবার মুখ খুলল; বলল—মহারাজ, ডাকুন বেচারামকে। সে তো গুণতে পারে, গুণে বলুক আর কোন্ রাজা আছে পৃথিবীতে।

রাজা বললেন—হ্যাঁ ঠিক বলেছ সেনাপতি, তুমি ভাল কথা মনে করেছ। এজন্য দিলাম তোমাকে দশটি মোহর পুরস্কার।

এবার ডাক পড়ল বেচারামের। জরুরী ডাক। বেচারাম হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এল।

রাজা বললেন—গুণে বল তো আমার মত আর কে রাজা আছে পৃথিবীতে।

বেচারামের মুখ শুকিয়ে গেল। সে যে কিছুই জানে না। ফাঁকি দিয়ে চলে এসেছে এতকাল।

কিন্তু বেচারাম ভারী চালাক। মনের ভাব গোপন করে বলল—মহারাজ, আমি গুণে দিতে পারি, কিন্তু কিছুদিন সময় দিতে হবে।

রাজা জিজ্ঞেস করলেন—কতদিন সময়?

বেচারাম বলল—আজ্ঞে, তিনমাস।

রাজা চোখ কপালে তুলে বললেন—বা-ব্বা, এতদিন সময়!

বেচারাম বলল—হ্যাঁ মহারাজ, বড় কঠিন গণনা কিনা।

—আর কিছু কম সময়ে হয় না? এদিকে যে মন ছটফট করছে।

—কিছু পুরস্কার আগাম দিলে চেষ্টা করে দেখতে পারি।

—কত চাও? দশটি মোহর?

—আজ্ঞে না, পঁচিশটি।

—আচ্ছা, পঁচিশটি মোহরই দিচ্ছি। সময় লাগবে ক'দিন?

—একমাস।

শেষে একমাস সময়ই মঞ্জুর হ'ল। রাজা বললেন—দেরী করলে মুণ্ডু কাটা যাবে।

বেচারাম রাজী হয়ে চলে গেল। মনে মনে ভাবল—যাহোক, তবু একমাস সময় পাওয়া গেল। একমাস তো সে নাক ডাকিয়ে ঘুমুতে পারবে—তারপর কপালে যা থাকে তা-ই ঘটবে।

এরপর করল কি, বেচারাম খায় দায় আর ঘুমায়—আর রাজার কাছে কি বলবে তাই মনে মনে ফন্দি আঁটে।

একদিন, ত্থ'দিন, তিনদিন।—একমাস কেটে গেল।

ত্বরু-ত্বরু বুকে বেচারাম গিয়ে হাজির হ'ল রাজসভায়।

রাজা বললেন—গণনা শেষ হয়েছে?

বেচারাম বলল—হ্যাঁ মহারাজ, হয়েছে। এদিকে ভিতরে ভিতরে বুক শুকিয়ে উঠল।

মহারাজ একটু নড়ে চড়ে বসলেন, মন্ত্রী গোঁফজোড়া পাকিয়ে ঠিক হয়ে বসলেন।

বেচারাম খড়িমাটি দিয়ে মেঝের উপর হিজিবিজি দাগ কাটতে লাগল। তারপর বলল—মহারাজ, এ দেশের ঠিক উত্তরেও নয়, ঠিক দক্ষিণেও নয়—তার মাঝামাঝি আছে এক রাজ্য।

—কোন্ দিকে? পশ্চিমে?

—না, ঠিক পশ্চিমেও নয়, পুবেও নয়, তারও মাঝামাঝি।

—কত দূরে?

—এখান থেকে বারো হাজার বারো শো বাহান্ন ক্রোশ হতে পারে কিংবা তেরো হাজার তেরো শো তিপ্পান্ন ক্রোশও হতে পারে। সেখানে এক রাজা আছে।

—সর্ব্বনাশ! আমার মতো রাজা?…বললেন রাজা হবুরাম।

—হ্যাঁ, আপনার চেয়েও যোয়ান রাজা।···মহাপণ্ডিতের মত বেচারাম জবাব দিল।

—কি তার নাম?

এবার বেচারাম সত্যি মুস্কিলে পড়ে। ভালো একটা নাম হঠাৎ মনে আসে না।

কিছুক্ষণ ভেবে চিন্তে বেচারাম বলল—নামটা এখনো গণনায় পাওয়া যায় নি। তবে শীগ্‌গীরই পাওয়া যাবে।

—কেমন করে?

—সেই রাজা বারো হাজার বারো শো বারো জন সৈন্য নিয়ে আপনার দেশ দখল করতে আসবে।

—তাই নাকি?···সভার সকলে প্রায় চেঁচিয়ে উঠল।

—হ্যাঁ।······বেচারাম বলল—যখন সেই রাজা পাঁচ শো ক্রোশের মধ্যে এসে পড়বে তখন আমার গণনায় তার নাম পাওয়া যাবে।

ভয়ে হবুরামের মুখ শুকিয়ে গেল। মন্ত্রীকে জিজ্ঞেস করলেন—মন্ত্রী, তা হলে এবার কি উপায় হবে?

মন্ত্রী বললেন—অস্ত্র তৈরী করতে হবে।

—তবে তাই হোক্। খুব তাড়াতাড়ি ব্যবস্থা কর।

রাজার হুকুম। দলে দলে কামার এল।

মন্ত্রী বললেন—অস্ত্র তৈরী করতে হবে।

কামাররা তো অবাক্। অস্ত্র বলতে তারা বোঝে দা আর লোহার ডাণ্ডা।

কাজেই তারা ভাবনায় পড়ল।

তবে হ্যাঁ, তীর-ধনুকের প্রচলন হয়েছে তখন। এবার ডাণ্ডা লাগিয়ে বড় বড় তীরের মত তৈরী করতে লাগল। যেন তা ধনুকে না লাগিয়েই ছোড়া যায়, লোককে খোঁচা মেরে ঘায়েল করা যায়।

সেই থেকে তৈরী হ'ল বর্শা বা সড়কি। আর বড় বড় রামদা-ও তৈরী হ'ল।

হবুরাম এবার নিশ্চিন্ত হলেন। (ক্রমশঃ)

কুহু

শ্রীউষাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়

নব বসন্তে শিশির অন্তে কে তুমি ধরেছ তান?
চক্ষু মেলিয়া মধুর প্রভাতে শুনিনু তোমার গান।
ওগো শুনেছি তোমার গান,
মোর ভরিয়া উঠিছে প্রাণ,
আমার পরাণে তুমি যে আজিকে ভক্তের ভগবান।

বসন্ত মাঝে কুণ্ঠিত লাজে কে তুমি ডাকিলে আজি
বায়ু হিল্লোলে আন্দোলি তুলি বিদল পুষ্পরাজি?
শুনিয়া তোমার কাকলী
জড়তা কেটেছে সকলি;
বদ্ধ ঘরেতে রুদ্ধ পরাণ উঠেছে বারেক আকুলি।

নূতন প্রভাতে সমীরণ সাথে তোমার কাকলীখানি
নির্ম্মল করি অন্তর মম ভরালো পাথেয় আনি,
করিনি তোমারে হেলা,
তোমার সুরের খেলা
ঝংকার তুলি মনেতে আমার ফিরেছে সারাটি বেলা।

নীলাম্বরের অঙ্গনে আজি অঞ্জন-রেখা টানি
উধাও ছুটিছে চঞ্চল পাখা বন্ধন নাহি জানি,
মোর আকুল মনের কারা
হলো বাধা বন্ধন হারা;
খুলে দিয়ে দ্বার তোমার সুরেতে হয়েছি পাগলপারা।

তোমার সে বাণী অশরীরী জ্ঞান নির্ম্মল নির্জ্জর
কোথা হতে এসে কোথায় মিলায় পাই না তো নির্ঝর,
আমার মনের মায়া
ধরেছে তোমার ছায়া,
দেখা না-দেখার ভিত্তির পরে অপরূপ তব কায়া।

মূকের মিনতি

শ্রীঅমিতাকুমারী বসু

ভগবানের বিচিত্র লীলা বুঝা ভার। ভগবান আমাদের সৃষ্টি করেছেন, চোখ দিয়েছেন, দেখতে পাই। লোকে বলে,—আহা খরগোসের চোখগুলি কি সুন্দর লাল, যেন পদ্মরাগ মণি! ভগবান কান দিয়েছেন, শুনতে পাই; নাক দিয়েছেন, গন্ধ শুঁকতে পারি, জিভ দিয়েছেন, স্বাদ বুঝতে পারি। কিন্তু তবু কথা বলবার ক্ষমতা কেন দেননি আজও বুঝতে পারি না। কথা বলা ত দূরের কথা, হাঁস-মুরগীর মত যদি "কোক্কর-কো", "প্যাক প্যাক" আওয়াজও করতে পারতাম, তবে ত আমার এত সাধের সাথীটি আজ এই দুষ্ট শয়তান কুকুরের হাতে প্রাণ হারাত না। তোমাদের মতই আমার প্রাণ আছে, সুখদুঃখের অনুভূতি আমাদিগকেও বিচলিত করে। কিন্তু হায়! আমরা নির্ব্বাক প্রাণী, তাই আমাদের মনের ব্যথা তোমরা হয়ত কেউ বুঝতে পার না, বুঝতে চাও না। আজ তোমরা হয়ত কেউ বুঝতে পারবে না, আমার অন্তরটা আমার সাথীর ব্যথায় কি রকম টন্-টন্ করছে, সমস্ত প্রাণ কি রকম হাহাকার করছে!

কানপুরে চামড়ার কারখানার বড় সাহেব ছিলেন এক ইউরোপীয়ান, তাঁর মেমসাহেবের কাছেই আমরা প্রথম ছিলাম। মেমসাহেব সন্তানহীনা ছিলেন, তিনি আমাদের বড় ভালবাসতেন। আমার মা বাবা, মাসী মেসো, দিদি আর আমি—আমাদের ছয় প্রাণীকে নিয়ে ছিল মেমসাহেবের সংসার। মেমসাহেবের বাংলাটি ছিল বড় সুন্দর, চারদিকে বিলাতী মেন্দী গাছের দেয়াল, সমান আকারে ছাঁটা, আর বাগানের ভিতর কত রংবেরংএর ফুলের বাহার। সেই বাগানের একদিকে আমাদের জন্য জালি দেওয়া সুন্দর একখানা ঘর ছিল, আমরা তাতে থাকতাম। মা পা দিয়ে মাটি খুঁড়ে খুঁড়ে একটা বড় সুড়ঙ্গ তৈরী করেছিলেন, আর তার ভিতর প্রায় অধিকাংশ সময় আমাকে নিয়ে বসে থাকতেন, কারণ দিদি আর আমি ছাড়া আমার সব ভাইবোনেরা অকালে মারা গিয়েছিল। মেমসাহেব আমাকে বড় ভালবাসতেন। আমি তখন খুব ছোট, আমাকে হাতের তালুতে বসিয়ে রাখতেন, আর পরম স্নেহে আমার গায়ে হাত বুলাতেন।

ঠিক পাঁচটার সময় সাহেব কারখানা থেকে ফিরতেন। মোটর আসা মাত্র চাপরাশি ছুটে এসে দরজা খুলে দিত, মেমসাহেব এসে হেসে দাঁড়াতেন। বাগানে ছোট টিপয় পেতে তার উপর খানসামা ধবধবে টেবিলক্লথ বিছিয়ে, দুপাশে দুখানা চেয়ার রাখত, আর চায়ের সব সরঞ্জাম ও বিস্কুট কেক ইত্যাদি এনে হাজির করত। সাহেব-মেম চা খেতে বসতেন। মেমসাহেব ছুটে গিয়ে মার পাশ থেকে আমাকে তুলে আনতেন, টেবিলের উপর আমাকে বসাতেন, নয়ত একটা সুন্দর মখমলের বাক্স খুলে তাতে আমাকে শুইয়ে দিতেন, আর গল্প করতে করতে চা খেতেন। মাঝে মাঝে আমাকে কেকের কণা ভেঙে খেতে দিতেন। মেমসাহেবের

আমার উপর সন্তানের মত মায়া দেখে সাহেব হাসতেন। বড় আরামেই আমাদের দিন কাটছিল। কিন্তু একদিন শুনলাম, মেমসাহেব বিলেত চলে যাচ্ছেন। মেমসাহেব মুখখানা ম্লান করে সব প্যাকিং করছিলেন। ফুরসৎ বড় নেই, তবু এত কাজের মধ্যেও আমাকে মাঝে মাঝে হাতে নিয়ে আদর করে যেতেন। দেখলাম, মা মাসীর মুখ বড় গম্ভীর। বোধ হয় তারা চিন্তায় অস্থির যে, এত সাধের সংসার ফেলে তাদেরও চলে যেতে হবে। দিদিটা অতশত বুঝত না, সে আমার চেয়ে পাঁচ-ছয় মাসের বড়, সে শুধু তিড়িং-তিড়িং করে এদিক ওদিক ছুটে পালাত।

বিদায়ের দিন এল, সাহেবের আফিসে মুখার্জ্জী বলে এক ভদ্রলোক বড় কাজ করতেন। তাঁর ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের মেমসাহেব বেশ ভালবাসতেন। যাবার সময় মেমসাহেব আমাদের তাদের হাতে সঁপে দিলেন। মেমসাহেব যখন আমার গায়ে হাত বুলিয়ে মুখার্জ্জীর সাত বছরের মেয়ে লিলির হাতে তুলে দিলেন, তখনই প্রথম ব্যথায় আমার মন আকুল হয়ে উঠল। মুখার্জ্জী পরিবারও বদলী হয়ে এলাহাবাদে চলে এলেন। বায়রানার ওদিকে তাদের বাড়ী ছিল। সুন্দর ছোট্ট একখানা বাড়ী, তাতে একফালি বাগিচাও আছে। সেখানেই মুখার্জ্জী-গিন্নী আমাদের থাকবার ব্যবস্থা করে দিলেন। কিন্তু মেমসাহেবকে ছেড়ে প্রথম প্রথম দু'চারদিন আমার কিছুতেই ভাল লাগত না; আমি চুপ করে নতুন জায়গায় এসে বসে থাকতাম। মা আমাকে জিভ দিয়ে চেটে চেটে আমার গায়ে মাথা ঘসে আমাকে নানা রকম আদরের ছলে সান্ত্বনা দিতে লাগলেন। ধীরে ধীরে নতুন বাড়ীটা সয়ে গেল। এক এক সময় মেমসাহেবের স্নেহ-যত্নের কথা মনে হয়ে বড় কষ্ট হ'ত; কিন্তু বেশী মনে হ'ত না, কারণ নতুন বাড়ীতে এসে আমার মাসীর চারটে ছানা হ'ল। সাদা ধবধবে ছোট ক্ষুদেগুলিকে দেখতে আমার বড় ভাল লাগত। আমি যদিও তাদের চেয়ে হয় ত মাস ছয়েকের বড়, কিন্তু চালচলন আচার-ব্যবহারে নিজকে বেশ প্রবীণ মনে করতাম। ছোট্ট বাগানের এক কোণাতেই মাসী গর্ত্ত খুঁড়ে খুঁড়ে বাচ্চাদের লুকিয়ে রাখত।

কোন কোন হিংস্র লোকে বলে থাকে, আমাদের মাংস নাকি বড় সুস্বাদু, নরম তুলতুলে। খাওয়া-খাওয়ির কথা শুনলে আমার প্রাণ কিন্তু ভয়ে আঁত্‌কে উঠে। আমরা থাকি জঙ্গলে জঙ্গলে, বড় বড় গাছের গুঁড়ি খুঁড়ে, মাটির নীচে গর্ত্ত বানিয়ে নিজেদের নিরাপদে রাখি। হিংস্র জন্তু খেতে এলে তীরবেগে বহুদূর অবধি পালিয়ে সুড়ঙ্গে গিয়ে আত্মরক্ষা করি। আমরা ত কারু অনিষ্ট করি না। তবু মানুষ এত নিষ্ঠুর! হঠাৎ আমাদের উপর টর্চ্চ ফেলে চোখে ধাঁধাঁ লাগিয়ে দেয়। আমরা যখন হতভম্ব হয়ে কি করব ভাবতে সুরু করি, তখন সুট করে বন্দুকের গুলি আমাদের বুকে বিঁধিয়ে আমাদের চিরজন্মের মত শেষ করে দেয়! আবার এক ফ্যাসন হয়েছে—ডাক্তারী শাস্ত্রের বহু কাটাচেরা, বহু অভিজ্ঞতা সঞ্চয় আমাদের উপর দিয়েই হয়। তোমরা ছোকরা ডাক্তাররা যখন আমাদের নাকে ক্লোরফর্ম শুঁকিয়ে আমাদের অসাড় করে দাও, তারপর ছুরি দিয়ে আমাদের শরীর ছিন্ন-ভিন্ন করে আমাদের স্নায়ুর স্পন্দন পর্য্যবেক্ষণ কর, আর সাফল্যের আনন্দে, নতুন

আবিষ্কারের আনন্দে তোমাদের চোখ ঝলমল করে উঠে, তখন ক্ষণেকের জন্যও কি ভাব, আমাদের সুকোমল দেহের মধ্যে ততোধিক সুকুমার প্রাণ সুখদুঃখের আঘাতে কি রকম বিচলিত হয়!

কোন কোন মানুষ বেশ ভাল, তারা আমাদের এনে যত্ন করে পুষে রাখে। তেম্নি এক ভাল মানুষ আমাদের জঙ্গল থেকে এনে পুষে রেখেছে। আমরা কয় পুরুষ ধরে জঙ্গল ছেড়ে লোকালয়ে বাস করছি বলতে পারি না। যা'হোক বায়রানাতে দিনগুলি কাটছে মন্দ না। সেই মেমসাহেবের বাগানের মত বিস্তীর্ণ জায়গা কোথায় পাব? এখানে একটু একটু বন্দী দশার মত মনে হয় বৈ কি!

একদিন মুখার্জ্জীর ছোট ছেলেটি বাড়ীর সাম্নে একটা বড় পার্কে খেলা দিতে নিয়ে গেল। আহা কি সুন্দর পার্কটা! কত খোলা জায়গা! আমি মনের আনন্দে তড়াক্ করে লাফিয়ে পড়ে এদিকে ওদিকে ছুটাছুটি করতে লাগলাম। ছোট ছেলেটি বছর পাঁচ-ছয়েকের, সে কিছুতেই আমাকে ধরতে পারছে না; যেই আমাকে ধরতে যায়, অম্নি আমি অপরদিকে পালিয়ে যাই। বহুদিন পর ছুটাছুটির আনন্দে আমি মশগুল হয়ে পড়লাম। ছোট ছেলেটি অবশেষে প্রায় কাঁদবার উপক্রম করল। এম্নি সময় বেশ বড়সড় লম্বা ছিপছিপে একটি ছেলে এসে ফটক খুলে পার্কে ঢুকল। অম্নি মুখার্জ্জীর ছোট ছেলেটি অকূলে কূল পেল; চেঁচিয়ে বললে, "ও আশীষদা! আমার খরগোসটা পালিয়ে যাচ্ছে, আমি ধরতে পারছি না।" সেই বড় ছেলেটি ধমকে বললে, "খোকা, তুই বড় দুষ্টু, মাসীমাকে না বলে কেন তুই খরগোস-ছানাটাকে নিয়ে এসেছিস? যদি এখন একে কুকুরে নিয়ে যেত কি করতিস?" এই বলে ছেলেটি বড় বড় পা ফেলে এসে খপ করে আমাকে ধরে ফেললে, তারপর কোলে নিয়ে গায়ে হাত বুলিয়ে আদর করতে লাগল। সে আমাকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখতে দেখতে বললে, "বাঃ! এর চোখ দুটি কি সুন্দর, কান দুটি কেমন পাতলা আর লম্বা!" তার প্রশংসা-বাক্য যেন আমার ভালই লাগল। সে আমাকে কোলে নিয়ে এসে ডাকতে লাগল, "ও মাসীমা, তোমার খরগোস নিয়ে যাও, আজ কুকুরের মুখ থেকে এটা বেঁচেছে। রণুটা একে পার্কে নিয়ে হয়রান।" এই বলে ছেলেটি চলে গেল। এর পর থেকে রোজই ছেলেটি হাতে একগাদা বই নিয়ে আসে, আর আমাকে আদর করে চলে যায়। এদের মুখে কথাবার্ত্তা শুনে জানলাম, ছেলেটি পাশের বাড়ীতে থাকে, ইউনিভারসিটিতে পড়ে, অতি মেধাবী ছাত্র। শিগ্‌গিরই নাকি সে গরমের ছুটিতে মা-বাবার সঙ্গে দেখা করতে যাবে।

একদিন আশীষ এসে বললে, "ও মাসীমা, আমি ত দু-একদিনের ভিতরই ইন্দোর যাচ্ছি বাবা-মার কাছে, এই খরগোস-ছানাটি যদি দাও, তবে মার জন্যে নিয়ে যাই।" মুখার্জ্জী-গিন্নী লোক ভাল, বললেন, "বেশ ত আমার ঘরে ত এককাঁড়ি খরগোস, একটা কেন দুটা নিয়ে যাও, জোড়া হলে ভাল থাকবে।" এই বলে আমাকে ও মাসীর ছানাদের থেকে একটাকে তুলে দিয়ে দিলেন। সেদিনই রাত দশটার মেইলে আশীষ তার বুড়ো পিসীমাকে নিয়ে ইন্দোর রওয়ানা হ'ল। আমাদের

দু'জনকে একটা ঝুড়ির ভিতর অতি সাবধানে ভরে নিল। মুখার্জ্জী-গিন্নীর স্বভাব বড় কোমল ছিল, আমাদের ভালবাসতেন। একটা ঠোঙ্গায় করে ছোলা ভেজা ও পালংশাক দিয়ে দিলেন পথে খেতে। ক্যানেডিয়ান এঞ্জিনটা যেই গায়ের জোরে ভোঁ আওয়াজ করে ট্রেনটাকে টানতে সুরু করল, অম্নি মনে হ'ল যেন আমার কান দুটিতে তালা ধরে গেছে। গাড়ীর বিষম ঝাঁকুনিতে দু'জনে ঝুড়ির ভিতর গড়াগড়ি খেতে লাগলাম। মাসীর মেয়েটা আমার চেয়ে বয়সে ছোট, ভয়ে কাতর হয়ে পড়ল। আমি মূক প্রাণী, তার গায়ে মাথা ঘসে ঘসে বুঝাতে চাইলাম, 'শান্ত হও, কোন ভয় নেই।'
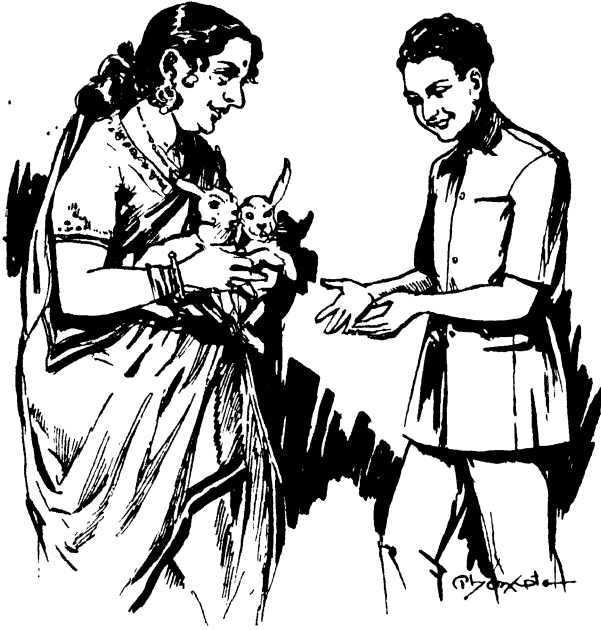
আশীষ মাঝে মাঝে উঠে ঝুড়ির ঢাকনা খুলে দেখছিল আমরা ঠিক আছি কিনা। ভোর হলে সে উঠে হাতমুখ ধুয়ে নিল। একটা বড় ষ্টেসনে এসে গাড়ী থামল। বয়কে ডেকে চায়ের অর্ডার দিল। খানসামা ট্রেতে করে চা ও টোষ্ট নিয়ে এল। আশীষ আমাদের দু'জনকে ঝুড়ির ভিতর থেকে অতি যত্নে বের করে গদির উপর রাখল। তারপর নিজেও খেতে লাগল, আমাদেরও ছোট টুকরো করে টোষ্ট দিতে লাগল। প্রথমে আমি নাক দিয়ে গন্ধ শুঁকে নিলাম। তারপর যখন দেখলাম গন্ধটা ভালই, তখন দু'জনে একটু একটু করে মাখন-মাখানো টোষ্ট খেলাম। বেশ লাগল খেতে। বুড়ী পিসীমা আমাদের দু'জনকে কোলে নিয়ে আদর করতে লাগলেন।

দিনের আলোয় রেলের যাত্রীরা আমাদের দেখে বেশ অবাক হ'ল। কেউ কেউ এসে, "দেখি বাবুজী" বলে আমাদের কোলে নিতে লাগল। একটি অল্পবয়সী বউ—বোধ হয় মাড়োয়ারীই হবে, গা-ভরা গয়না, মাথায় একগলা ঘোমটা—বাঁ হাতে ঘোমটা তুলে আমার দিকে মাঝে মাঝে অবাক হয়ে চেয়ে দেখছিল। সারা সকাল গাড়ীতে কত রকমের যাত্রী উঠানামা করতে লাগল। তাদের কত রকমের ভাষা, কত রকমের পোষাক, কত রকমের চেহারা। একবার আশীষ আমাদের রেলের কামরার মেঝেতে নামিয়ে দিল। ভাবলাম, একটু এধার ওধার করি। ও বাবা! রেলের দোলার সঙ্গে এক ডিগবাজী খেয়ে উঠলাম! মাথা ঘুরতে লাগল, সমস্ত শরীর থর-থর কাঁপতে

লাগল। তাই দেখে সে তাড়াতাড়ি আমাদের কোলে তুলে নিল। ছেলে কিন্তু বড় ভাল, বুদ্ধিমান আর শান্ত, তাকে আমার বড় ভাল লাগে।

বেলা দুটায় এসে গাড়ী ইন্দোরে পৌঁছল, ট্রেন নাকি লেট হয়েছিল। ষ্টেসনে তিনটি ছোট ছেলে দাঁড়িয়েছিল, তারা নাকি আশীষের ভাই। আশীষ আর পিসীমাকে দেখে তারা কলরব করে উঠল। আশীষ কিন্তু সবাইকে অবাক করে দেবার জন্য আমাদের কথা কাউকে বললে না। যত্ন করে ঝুড়িটা টাঙ্গায় বসিয়ে দিল। বাংলার সাম্নে গাড়ী এসে থামল। মা বাইরেই দাঁড়িয়েছিলেন। আশীষ প্রণাম করে ঝুড়িটার থেকে আমাদের দু'জনকে বের করে বললে, "মা, তোমার জন্য এনেছি।"

আমাদের দেখে মা কি খুশী! আমাদের দু'জনকে হলঘরেই থাকবার ব্যবস্থা করে দিলেন। চার-পাঁচ দিন গেল আমাদের মাথা ঘোরা থামতে। তারপর সবার আদরে আদরেই আমাদের দিন কাটতে লাগল। আশীষের ভাই অমিয় খুব উৎসাহে ভেতর-বাড়ীতে একটা বড় ঘরে আমাদের থাকবার কায়েমী বন্দোবস্ত করে দিল। ঘরে ডবল দরজা জানালা, একটা কাঠের ও অন্যটা জালির। দু'মাসে আমরা বেশ বড় হয়ে গেলাম। সকালে ছেলেমেয়েরা উঠে আমাদের বাগানে ছেড়ে দিয়ে বসে থাকত। ভাইবোন বসে গল্পগুজব করত, আমাদের বেশ লাগত দেখে। আমরা দু'জনে লাফিয়ে লাফিয়ে বেড়িয়ে কচি কচি দূর্ব্বাঘাস আর ফুলের পাতা খেতাম। বিকেলে আবার ভেতরকার উঠানে ছাড়া পেতাম। সাতবছরের ছোট ছেলে অরু আমাদের তাড়া করে এমাথা থেকে ওমাথা দৌড়াত, আর খিল-খিল করে হেসে ভেঙ্গে পড়ত। অরু আর লাল্লু দুই ভাইতে ঝগড়া লাগত। এ বলত, "ওটা আমার খরগোস।" ও বলত, "এটা আমার খরগোস।" মুখের ঝগড়াটা অনেক সময় হাতাহাতিতে পরিণত হ'ত, মা এসে থামাতেন। শুধু মেয়েটি বড় শান্ত। ভায়েদের এক বোন, আদুরে হলেও মনটা বড় কোমল। ঠিক সময়ে রোজ আমাদের খাওয়া দেওয়া, আদর করা, ঘরে শিকল তুলে আমাদের নিরাপদে রাখা, এসব কাজ সে নিজের হাতে তুলে নিয়েছিল। সে চাকরকে দিয়ে আমাদের জন্য ঝুড়ি ঝুড়ি মাটি আনিয়ে কোণাতে রাখতে লাগল। পাথরের ঘরে একরাশ লাল মাটি পেয়ে আমাদের কি আনন্দ! আমরা দু'জনে মিলে চমৎকার সুড়ঙ্গ-ঘর তৈরী করতে আরম্ভ করলাম।

গরমের পর বর্ষা এসেছে, দু-চারটা বৃষ্টির ফোঁটা পড়তে না পড়তেই চারদিকে সবুজ ঘাস গজাতে আরম্ভ হয়েছে। আমার কি আনন্দ! আমি এদিকে ছুটি, ওদিকে ছুটি। দেখে মা আমার নাম দিলেন দুষ্টু, আর ওটার নাম দিলেন মিষ্টি। দু'জন যমজ ভাইবোনের মত ছিলাম, চিনতে পারা যেত না, তাই মা আমায় গলায় নীল রিবণ, আর মিষ্টির গলায় লাল রিবণ বেঁধে দিলেন। বেচারী মিষ্টি বড় শান্ত ছিল, আমি বাইরে পালিয়ে যেতে চাইলেও সে পালাত না, চুপচাপ এদিক সেদিক ঘুরত। মা বলতেন, এই দুষ্টুটা এত অশান্ত, একদিন কুকুরের পেটে যাবে। বাস্তবিকই সারাদিন মাঠে কতকগুলি কুকুর ঘুরত, তাদের দেখলেই আত্মা শুকিয়ে যেত। তবু সবুজ খোলা মাঠের মায়া আমি

ছাড়তে পারতাম না, কে যেন আমাকে টেনে নিয়ে যায়। একদিন বড় দুর্দ্দিন এল। দুপুরে আমাদের খাবার খাইয়ে দরজা বন্ধ করে চলে গেল। দরজা-জানালা জালি দিয়ে ঘেরা বলে এটা স্বর্গের মত নিরাপদ ছিল, কুকুরগুলি কিছু করতে পারত না।

কলকাতা থেকে এদের ভাই একটি বড় ছেলে এসেছে, নাম তার অভিজিৎ। সে আমাকে একদিন কোলে তুলে নিল। অভিজিৎ ডাক্তার শুনে, আমি ভয়ে ঘাবড়ে গেলাম, কোন্ সময় বা আমার শরীরে চাকু বিঁধিয়ে দেয়। কিন্তু না, দেখলাম ছেলেটি নিষ্ঠুর নয়। শ্যামবর্ণ, লম্বা ছিপছিপে, চেহারা আধুনিক যুবকের মত, কোঁকড়া কোঁকড়া বড় চুল, কোমল মুখখানা দেখে ডাক্তার-ভীতি চলে গেল। সে আমাকে কোলে নিয়ে সমস্ত শরীর ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখতে লাগল। কানগুলি দেখে বললে, "বাঃ কি সুন্দর কান, সরু লম্বা, গাছের পাতার মতো, আর শিরাগুলি কি সুন্দর চারদিকে ছড়িয়ে আছে, সূর্য্যের আলোতে এপিঠ ওপিঠ পরিষ্কার দেখা যায়!" বলে আমাকে আদর করতে লাগল। সে রোজই দুপুরে আমাদের দু'জনকে উঠিয়ে নিয়ে তার বিছানায় শুইয়ে রাখত। অদৃষ্টের ফের! সেদিন সে আমাদের নিতে এল না। আমরা দু'জনে আরাম করে শুয়েছিলাম, এমন সময় ওদের ঝিটা বাসন মেজে চলে যাবার সময় আমাদের দরজাটা খুলে রেখে চলে গেছে। খানিক বাদেই যমদূতের মত একটা বড় লাল কুকুর লাফিয়ে ঘরে ঢুকল। ভয়ে আমরা এদিক ওদিক পালাতে লাগলাম। আমি ত চট করে লাফিয়ে একটা টুকরীর নীচে লুকিয়ে পড়লাম। আর কি বলব! আহা, মিষ্টিটাকে মুখে করে দুষ্টু শয়তান কুকুরটা পালিয়ে গেল।
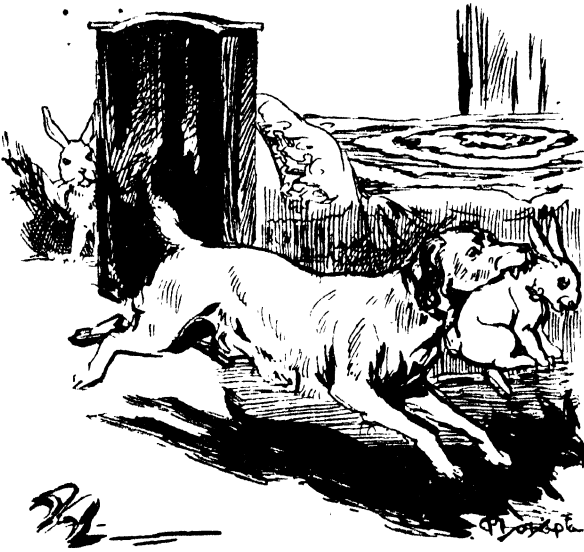
হায় হায়! আমি কি করি! ভগবান! আমাকে কেন একটা আওয়াজ করবার ক্ষমতা দাওনি? মিষ্টিটাকে আমার চোখের সামে নিয়ে গেল! আমি একটা আর্ত্তনাদ পর্য্যন্ত করতে পারলাম না! কাউকে সাহায্যের জন্য ডাকতে পারলাম না। এ আপশোষ আমার জীবনে যাবে না।

খানিক পর রাস্তা থেকে একটা মেয়েলোক চীৎকার করে বললে, "খরগোসকে কুকুর নিয়ে যাচ্ছে!" সবাই হৈ-চৈ করে তাড়া করলে। কুকুরটা মুখ থেকে মিষ্টিকে ছেড়ে পালাল। ঝি মিষ্টিকে তুলে নিয়ে এল। প্রাণখানা ধুকধুক করছিল। মাথায় একটু জল দিতে দিতেই ধীরে ধীরে শেষ হয়ে

গেল। মার চোখ দিয়ে টপ-টপ করে জল ঝরতে লাগল, ছেলেরা চোখ মুছতে লাগল। কিন্তু যে চলে গেল, সে আর ফিরে এল না। ভাইবোন সবাই মিলে বাগানের এক কোণায় মিষ্টিকে মাটি দিলে, তার উপর ফুল ছিটিয়ে দিলে, তার পর চোখ মুছতে মুছতে ঘরে ফিরে এল।

মিষ্টি নেই একথা ভাবতে পারি না। আজ দু মাস দু'জনে সাথী ছিলাম। একসঙ্গে খাওয়া-দাওয়া, খেলা; আজ সে নেই! সারাটা রাত আমি পাগলের মত এধার থেকে ওধার সারা ঘরে তাকে খুঁজতে লাগলাম। মনে হ'ল, খুঁজলেই তাকে পাওয়া যাবে। একটুও খাবার মুখে দিতে পারলাম না। সকালে অনুভা লাল্লু অরু আমাকে বড় ঘরে ছেড়ে দিল। আমি বৃথা আশায় সব ঘরে ঘরে, কোণায় কোণায় খুঁজতে লাগলাম, বাগানে এক লাফে গেলাম, মিষ্টি নেই!

আমার সমস্ত অন্তর বেদনায় খান-খান হয়ে যাচ্ছে, আমার প্রকাশ করবার ক্ষমতা নেই। হে ভগবান্, আমি মূক প্রাণী, তোমার কাছে কাতর ভিক্ষা জানাই, আমাদের ভাষা দাও, ভাষা দাও। মনের ভাব শব্দে ব্যক্ত করবার একটুখানি ক্ষমতা দাও। আমাদের রূপ কম কর, ওই দুধের মত সাদা ধবধবে রং খানিকটা কালো করে দাও। স্বচ্ছ বড় লাল চোখের শোভা কমিয়ে দাও, লম্বা পাতলা কান যা আমাদের সৌন্দর্য্য বাড়িয়ে তুলেছে, তা ছোট করে দাও; সব হাসিমুখে সইব, আমাদের রূপের পরিবর্ত্তে শুধু সুখ-দুঃখ ব্যক্ত করবার অধিকার দাও—প্রভু, এই মিনতি করি।

গো-জাতি

শ্রীঅরুণচন্দ্র সরকার

মফঃস্বলে দেখা যায়, সপ্তাহের কোন এক নির্দ্দিষ্ট দিনে পথের ধুলো উড়িয়ে দলে দলে গরু নিয়ে ব্যাপারীর দল চলেছে কলকাতার দিকে। দলের ছোট-বড় প্রত্যেক গরুর গায়ে একটা করে গোল 'সিল' দেওয়া, আর গলায় ছোট করে দড়ি পরান। সেই দলে গাই, বলদ, বাছুর এবং মহিষ সব রকমই আছে। ব্যাপারীদের জিজ্ঞাসা করলে জানা যায়, তারা এই সব গরু কিনে এনেছে। গ্রামে গ্রামে গৃহস্থবাড়ী ঘুরে ঘুরে এই সমস্ত গরু তারা সংগ্রহ করে। এদের অধিকাংশকেই অবশ্য কসাইয়ের দড়িতে ঝোলান অবস্থায় দেখা যায়, তা কমবেশী সকলেরই জানা আছে।

গরুর এই প্রকার অবস্থা হবে জেনেও গৃহস্থেরা ব্যাপারীর কাছে গরু বেচে। এমন কি, ব্যাপারী কোন্ দিন আসছে, সেই দিনের আশায় অনেকে বসে থাকে গরু বেচবে বলে। অর্থের প্রয়োজনে

যে অনেকে এই রকম করে, সে বিষয় কোন সন্দেহ নেই। অবশ্য এতে গরুর কিছু যায় আসে না। তবে মানুষ বুদ্ধিজীবী, তাদের উপকার ভুলতে পারে না। তাই তাদের স্মরণ করে—বাৎসরিক কোন অনুষ্ঠান করে, নয় কতগুলো 'কথার' মারফত। যেমন—কোন লোকের বুদ্ধির স্বল্পতা দেখা গেলে; তাকে অমনি বলা হ'ল 'গোমূর্খ'। আষ্টেপৃষ্ঠে কাউকে মারলে তাকে 'গোঠেঙ্গান' বলে আখ্যা দেওয়া হ'ল। খেলায় হেরে গেলে অমনি 'গো-হারান হারিয়েছে' বলে খ্যাপান হ'ল।

তবে এমন একদিন ছিল যখন গরুদের এই সমস্ত ব্যঙ্গোক্তি আর বিদ্রূপ সহ্য করতে হ'ত না। মনে হয় গরুরা যদি জানত, তাদের কি দিন ছিল—আর আজ কি হয়েছে, তবে তারা বিরাট সহিংস আন্দোলন না করে মানবকুলকে রেহাই দিত না। কিন্তু ভাগ্যিস্ সেদিনের কোন সম্ভাবনা নেই! নইলে কবে গরুরা ল্যাজ খাড়া করে, বাঁকান শিংএর গুঁতোয় মানুষের উপর প্রতিশোধ নিতে লেগে যেত, তা কল্পনারও বাইরে।

গো-কুলের সুদিনের কথা জানতে গিয়ে, দেখা যায়—আগেকার দিনে গো-হিংসা গুরুতর অন্যায় ছিল, এবং ঐরূপ অন্যায়কারীকে দণ্ডভোগ করতে হ'ত। মহাভারতের যুগে আমরা দেখতে পাই, গরু নিয়ে মস্তবড় যুদ্ধই বেঁধে গেল। বিরাট রাজার বাড়ীতে অর্জ্জুনের সাথে দুর্য্যোধন-পক্ষীয় বীরগণের যুদ্ধ হওয়ার মূলে ছিল গো-হরণ। তা ছাড়া আরো আছে। যেমন—মহর্ষি বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্রের মধ্যে যে বিবাদ হয়—তার মূলে ছিল বশিষ্ঠের হোমধেনু 'নন্দিনী'। সেই গাভী ছিল কামদুঘা। তার নিকট ঋষি যা চাইতেন, তাই পেতেন; যখনই দুইতেন, তখনই প্রয়োজন মত দুধ পেতেন। সে যুগে গো-দানই ছিল শ্রেষ্ঠ দান। অতিথিকে সম্মান দেখাবার একমাত্র প্রধান উপায় ছিল, তাঁকে গো-দান করা। তাই বলা হয়—গরুর গন্ধ সুরভি, গরু সর্ব্বভূতের আশ্রয়স্থল এবং পরম স্বস্তির হেতু। এতেই সেকালের ভারতীয়েরা ক্ষান্ত হননি। গো-জাতির উন্নতির জন্য এক ব্রত প্রচলিত ছিল—যার নাম 'গো-পুষ্টি'। যে এই ব্রত পালন করত, সে গোময়-জলে স্নান করত। শুক্‌ন গরুর চামড়ায় পশ্চিম দিকে মুখ করে বসে, মাটিতে ঘি ঢেলে তা নিঃশব্দে পান করতে হ'ত।

এখনকার মত তখনকার দিনে গৃহস্থের বাড়ীতে সকাল-সন্ধ্যে গরুর চৌদ্দপুরুষ উদ্ধার হ'ত না, বা লাঠির ঘায়ে তার শাসানি চলত না। সে যুগে ছিল এর ঠিক উলটো, অর্থাৎ গো-সেবায় ত্রুটি হলে গৃহকর্ত্তার সমূহ ক্ষতি হ'ত। এইরকম প্রবাদ ছিল যে, গরুর 'লেজ ও পিঠ' স্পর্শে সমস্ত পাপ ক্ষয় হয়। তাছাড়া গোময় আর গোমূত্র যে আজও হিন্দুর কাছে পরম পবিত্র, তা বলাই বাহুল্য। এই গোময় আর গোমূত্রের পবিত্রতা সম্বন্ধে একটা ইতিবৃত্ত আছে। একদিন লক্ষ্মীদেবী সেজেগুজে গো-জাতির কাছে গিয়ে হাজির হতেই গরুরা বললে, 'কি চাই?' তিনি বললেন, 'দেখ, সব দেবতাই আমার বরে সম্পদশালী। তোমরাও আমার কাছে কৃপাপ্রার্থী হবে তাই আশা করি।' সঙ্গে সঙ্গে গরুরা জবাব দিলে, 'আমাদের কৃপার তোমায় কোন প্রয়োজন নেই! আমরা ভালই আছি।' তখন লক্ষ্মীদেবী লজ্জিত হলেন এবং মনে মনে চিন্তা করে দেখলেন, এতে তাঁকে

জগতে হেয় হতে হবে। শেষে বললেন, 'তোমাদের উপেক্ষায় আমার কলঙ্ক রটবে, তোমরা আমার ওপর সদয় হও। আমি তোমাদের কুৎসিত অঙ্গেই থাকব।'

গো-জাতির মধ্যে শ্রেষ্ঠ ছিল কপিলা গাই। মহাভারতের যুগে দেবতা অপেক্ষা গরুর স্থান ছিল উচ্চে। এর কি কারণ তা জানতে চাওয়ায়, ব্রহ্মা তার উত্তরে ইন্দ্রকে বললেন, 'এর একমাত্র কারণ হ'ল, গো-জাতিই যজ্ঞের প্রধান অঙ্গ। সে কারণ তার স্থান সর্ব্বাগ্রে।'

বর্ত্তমানে গো-পালন সম্বন্ধে আমরা যদি এই সমস্ত রীতিনীতিকে মেনে চলি, তা হলে ভারতের ধ্বংসোন্মুখ গো-জাতিকে রক্ষা করবার একটা সদুপায় হতে পারে।

পথের সন্ধান

শ্রীসুধা দেবজা

কেষ্টধনকে সকলেই খুব ভালবাসে। তাকে পেলেই সবাই ধরে—'একটা গান গাইতে হবে কেষ্ট।' কেষ্ট একটু এদিক্ ওদিক্ ক'রে রাজী হয়ে যায়। তার বিশ্বাস সে বেশ ভালো গাইতে পারে—অন্ততঃ সবাই তাকে সেই বিশ্বাস করিয়েছে; কিন্তু যেই সে গাইতে আরম্ভ করে, অমনি সকলের চাপাহাসি শুরু হয়। এ কি রকম? তারা বলে, কেষ্টর গান শুনে তাদের এমন আহ্লাদ হয় যে, তারা আর হাসি চেপে রাখতে পারে না। কেষ্ট খুশি হয়। এক এক সময়ে কিন্তু তার সন্দেহ হয়, ওরা ওকে ঠাট্টা করে কিনা; কিন্তু ওদের পিঠ-চাপড়ানিতে আবার ভুলে যায়।

আজ পাড়ায় এক বাড়ীতে জামাই এসেছে। সবাই ধরলে, জামাইবাবুকে কেষ্টর গান শোনাতে হবে। জামাইবাবু নিজে এসেছেন—যেখানে কেষ্ট রঙ্ তুলি দিয়ে মাটির পুতুলের নাক চোখ মুখ আঁকছিল। সবাই বারবার বলছে—'জানেন, জামাইবাবু, কেষ্ট আমাদের চমৎকার গায়, ওর গান না শুনলে আপনার এ শহরে আসাই মিথ্যে—এমন কি, শ্বশুরবাড়ী হলেও।' কেষ্ট রাজী না হয়ে কি করে? রইল প'ড়ে তুলির কাজ, সে গান শোনাতে গেল। কেষ্টর জন্য তো ফরাশ বিছানো হবে না, সে তা জানে; রকের ওপরেই সবাই জমায়েৎ হ'ল। সকলেই কেষ্টর পানে তাকিয়ে আছে, কেষ্ট বেশ সপ্রতিভ ভাবেই গান ধরলে। সব গানই কেষ্ট গায়—একবার যে গান সে শোনে তাই সে তার নিজস্ব সুরে গাইতে চায়। কেষ্ট শুরু করলে—'আ-আ-আ আমি দু-দু দুরন্ত বৃ-বৃ-বৃ বৈশাখী ঝ-ঝ ঝড়, তু-তু-তু তুমি যে বৃ-বৃ-বৃ বহ্নি শি-শি শিখা'—গানের লাইন আর শেষ হতে চায় না। নানা ভঙ্গীতে চাপাহাসির কসরৎ চারদিকে শুরু হয়ে গিয়েছে। কেবল জামাই-বাবুর মুখে হাসি নেই, তিনি কেষ্টর মুখের পানে তাকিয়ে গানের ছত্রটা শেষ করার জন্য তার আপ্রাণ চেষ্টা দেখছিলেন। তারপর হঠাৎ ঘরের ভিতর গিয়ে বসলেন। তামাশা কিছুক্ষণ পর মিটে গেল—

তিনি কেষ্টকে ডাকলেন। সে এলে বললেন—'কেষ্ট, তুমি আর কখনো কারু কথায় গান গাইতে চেষ্টা কোরো না—ওরা তোমাকে ঠাট্টা করে।'

'ক্যা-ক্যানো ?'

'তুমি তোত্‌লা—তাই তুমি গাইতে গেলে তোমার চেহারা খুব খারাপ দেখায়—তাই নিয়ে ওদের ফুর্তি।' কেষ্ট হাঁ করে তাকিয়ে রইল। জামাইবাবু বললেন—'কাল এসো।' কেষ্ট খুশি হয়ে বললে, 'গান গাইতে ?' জামাইবাবু হেসে বললেন, 'না, ছবি দেখতে।'

পরদিন কেষ্ট ঠিক সময়ে এসে হাজির। জামাইবাবু তখন রঙ্‌ তুলি দিয়ে ছবি আঁকছিলেন। টেবিল থেকে একখানা ছবি তুলে নিয়ে দেখিয়ে বললেন, 'এই তোমার ছবি।' শ্রীহীন চেহারার একটি ছেলের গান গাইবার প্রাণান্তকর চেষ্টায় গলার ও কপালের শিরাগুলো ফুলে উঠেছে—ঠেলে বেরিয়ে আসতে চাইছে দুটো চোখ—অতি কুৎসিত! নীচে লেখা 'ব্যর্থ চেষ্টা'।

কি জঘন্য—এত বিশ্রী দেখতে হয়ে যায় সে ? কষ্ট তার হয়, কথাগুলো সহজে বেরিয়ে আসতে চায় না ব'লে; কিন্তু সে কষ্টের রূপ এত বিশ্রী হয়ে ধরা পড়ে সকলের চোখে ? আর সেই কুৎসিত ভঙ্গী দেখবার জন্য—দেখে মজা উপভোগ করবার জন্য সবাই তার গান শুনতে চায় ? তাতেই ওদের এত আমোদ! রাগে কেষ্টর কান্না আসতে চাইল—অবাধ্য জিভ্‌ দিয়ে একটা কথাও উচ্চারণ সে করতে পারলে না। রাগে দুঃখে কেষ্টর দু'চোখ বেয়ে ধারা নামল। জামাইবাবু বললেন, 'এর চাইতেও একটা খারাপ ছবি আছে'—ব'লে আর একটা ছবি তার হাতে দিলেন; তাতে কেষ্টর গানের শ্রোতারা সব সমবেত—মাঝখানে একটা রুগ্ন কুকুর-ছানার মুখের সাম্‌নে এক টুক্‌রো মাংস ঝোলানো—তাতে একখানা ধারাল ছুরি বেঁধানো। ছানাটি ছুটে এসে তাতে কামড় বসাতে যেয়ে যেন চোয়াল কেটে গিয়েছে—দু'কস বেয়ে রক্ত গড়াচ্ছে। ছুরিশুদ্ধ মাংস ওর মুখের একেবারে নিকটে, গলায় শেকল খাটো করে বাঁধা—লোভ, রাগ, দুঃখ, যন্ত্রণায় রুগ্ন ছানাটির অবস্থা মর্মান্তিক—তাকে ঘিরে কেষ্টর গানের অতি-পরিচিত শ্রোতাদের নৃশংস আমোদের কি উৎকট ভঙ্গী! কারু দুটো ঠোঁট কাম্‌ড়ে উচ্ছ্বসিত হাসি চাপ্‌বার চেষ্টায় দু'চোখ ফেটে বেরিয়ে আসছে—কেউ দু'হাতে পেট চেপে ধ'রে কান পর্যন্ত সব ক'টা দাঁতের পাটি মাড়িশুদ্ধ বার ক'রে হাসছে—কেউ প্রকাণ্ড হাঁ ক'রে তামাশাটাকে যেন গিলতে চাচ্ছে। তাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বিকৃত নির্মম উপহাসের ভঙ্গী যেন কেষ্টর তোতলামির চেয়েও সহস্রগুণে কদর্য মনে হ'ল। নীচে লেখা 'বীভৎস কৌতুক'।

জামাইবাবু বললেন, 'তোত্‌লা মানুষ গান গাইতে পারে না।'

কেষ্ট সবেগে মাথা নেড়ে বল্‌লে—'ন-না আ-আ, আমি ছ-ছবি আঁ-আঁকব।'

'সেইটেই তো তোমার কাজ। আমি দেখেছি তোমার পুতুলের চেহারা আঁকা।'

'ছ-ছবিতে ও-ওদের নিয়ে এ-এ-এম্নি ক্‌ ক'রে তা-তা-তামাশা ক্‌-ক্‌ করব,' কেষ্ট বললে।

জামাইবাবু হেসে বললেন—'বেশ'—তারপর ওর পিঠে হাত রেখে বললেন—'চল আমার সঙ্গে।'

ছয় মাস পর—

সেবারে ওই শহরের চিত্র-প্রদর্শনীতে প্রথম পুরস্কার পেল জামাইবাবুর 'বীভৎস কৌতুক', দ্বিতীয় পুরস্কার কেষ্টর। নতুন আঁকতে শিখে সে কিন্তু প্রথমেই কারুকে তামাশা করে নি—এঁকেছে গাঁয়ের এবড়ো-খেবড়ো মাঠের ওপর ঝড়ের রাতে পথ-হারানো পথিক দূরে জঙ্গলের ভেতর এঁদো ডোবায় আলেয়ার আলো দেখে আশ্রয়ের জন্ম সেদিকে ছুটে যাচ্ছিল, —গাঁয়ের চৌকীদার সেই ঝড়-বৃষ্টির মধ্যে তাকে ধ'রে আশ্রয়ের পথ দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। হাতে তার আলো—সেই আলো পড়েছে গাঁয়ের সরু পথের ওপর,—পড়েছে বিভ্রান্ত পথিকের মুখের ওপর—আর দেখা যাচ্ছে চৌকীদারের শান্ত মুখ—কর্তব্য সাধনে দৃঢ়তা, সৌহার্দের স্নিগ্ধতায় সে মুখ উজ্জ্বল—আর সে মুখখানি জামাইবাবুর! ছবি দেখে জামাইবাবু চম্‌কে উঠেছিলেন প্রথমে, শুধিয়েছিলেন—'এ কি কেষ্ট ?'

কেষ্ট উত্তর না দিয়ে নীচে লিখে দিলে—'পথের সন্ধান'।

সত্য ও মিথ্যা

শ্রীহিমাংশুভূষণ সেনগুপ্ত

সত্য কভু দেয় না ধরা, মিথ্যা ধরা পড়ে।
সত্য রহে চিরস্থায়ী, মিথ্যা শীঘ্র মরে॥
সত্যের জয় চিরকাল জেনে রাখ সবে।
মিথ্যা কয়ে হয় জয়ী বল কে বা কবে॥
সত্যে যাহা করবে লাভ, রবে চিরকাল।
মিথ্যা কয়ে হলে জয়ী না ফেরে কপাল॥

পথে পথে

শ্রীসন্তোষকুমার দে

দেরাদুন—হরিদ্বার হতে ৪৮ মাইল দূরে দেরাদুন। এখানে ই. আই. আর. লাইন শেষ হয়েছে। পথ গেছে গভীর অরণ্য ভেদ করে। হরিদ্বার সহর ছাড়বার পরেই ট্রেন পর পর, দুটো সুড়ঙ্গ (Tunnel) পার হয়। তারপর ক্রমশঃ বসতি শেষ হয়ে জঙ্গল সুরু হয়। মাঝে মাঝে ছোট দু-তিনটি ষ্টেশন আছে, সেখানে কাঠের আমদানি বেশী। এ জঙ্গলের কাঠ বিখ্যাত, সারা ভারতে সরবরাহ হয়। তা ছাড়া হিমালয় উপত্যকার বনে কত বনজ সম্পদ আছে। ভারত সরকারের বনবিভাগের দপ্তর, বনবিভাগের বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাগার ও অনুশীলন বিভাগ (Forest Research Institute) এবং ভারতীয় জরীপের (Survey of India) দপ্তর, সামরিক বিভাগীয় দপ্তরও আছে এখানে। বিশেষ করে বনবিভাগের কাজে সত্যই দেরাদুন বিখ্যাত।

বিদেশীদের যাতায়াতে এ সহরের কোন কোন অঞ্চলে আভিজাত্যের ছাপ পড়েছে, বিলাতী ধরনের বিপণীর সংখ্যাও কম নয়। একটা রাস্তার নাম পর্য্যন্ত ভাইসরয় রোড্।

মুসৌরী—দেরাদুন হতে মুসৌরী যাওয়ার বাস বা ট্যাক্সি পাওয়া যায়। নিয়মিত যাত্রী ও মালবাহী বাস সার্ভিস আছে। মাত্র বাইশ মাইল পথ, কিন্তু তারই জন্যে অনেকগুলি বাস কোম্পানীর গাড়ী চলে। তাতেই বোঝা যায়, যাত্রীর সংখ্যা অল্প নয়।

মুসৌরী যাওয়ার পথ

দেরাদুন হতে চার-পাঁচ মাইল সমতল পথ এসে বাম দিকে বাঁক ঘুরে পাহাড়ী পথ সুরু হয়। শিলং কিংবা দার্জিলিংএর পথের মতোই পাহাড়ের গা কেটে পথ করা, সাপের মত এঁকেবেঁকে পেচ খেয়ে, কোথাও একই পাহাড়ে চার-পাঁচবার পাক দিয়ে চলে গেছে। সারা পথটাই সযত্নে পিচ ঢালা, রোদে চিক্-চিক্ করে। দূর থেকে একখণ্ড ফিতার মতো দেখায়।

উঠবার পথে প্রায়ই ডাইনে পাহাড় আর বামে ঢালু উপত্যকা পড়ে। পেরুতে হয় নদী, নদীর উপর পুল, সে নদীতে এখন গ্রীষ্মকালে জল নেই। যতদূর চোখ যায় সবুজের সমারোহ,

উপত্যকায় অরণ্য, দীর্ঘ দেওদার-শ্রেণী, কত নাম-না-জানা গাছ। কোথাও বা লোকালয়, কয়েক ঘর বসতি। নিকটে ঢালু উপত্যকায় ধাপে ধাপে চাষের জমি, কোনটায় ফসল ফলেছে, কোনটায় চাষ করা হয়েছে, কোন জমিতে মজুরেরা কাজ করছে। পাহাড়ী লোকেরা খুব শক্ত সমর্থ আর পরিশ্রমী, তাই ওই কঠিন গিরিগাত্রেও তারা প্রয়োজনের কোদালী চালিয়ে ফসল ফলাতে পারে।

আর বহুদূর জুড়ে ঢেউয়ের পর ঢেউ পাহাড়ের সারি। তার কোনটার মাথা নীচু, কোনটার মাথা উঁচু, কোনটার মাথা হারিয়ে গেছে নিঃসীম আলোর সমুদ্রে। খানিকটা দূর স্পষ্ট দেখা যায়, তারপর আর তত স্পষ্ট নয়, যেন কুয়াসা, যেন ধোঁয়া-ধোঁয়া।

এই হিমালয়। অনন্তকাল ধরে মানুষের কাছে এর মহিমা ব্যক্ত হয়েছে। রূপ দিয়েছে শিল্পী, ভাষা দিয়েছে কবি, নিজের নিজের অনুভূতির কথা বলেছেন সাধকেরা। আমার মত যারা অর্বাচীন পথিক মাত্র, তাদের কাছেও এর আবেদন কম নয়।

মুসৌরীর সামান্য পথ দেড় ঘণ্টায় ফুরিয়ে গেল। নামবার মুখে এক ঘণ্টাই যথেষ্ট। বাসের মধ্যে যথারীতি দুজন যাত্রী বমন রোধ করতে পারলেন না। স্থানীয় মিউনিসিপ্যালিটির টোল্ ট্যাক্স মাথা পিছু দেড় টাকা করে দিতে হ'ল। বাস কিনক্রেগ (Kincraig) ষ্ট্যাণ্ডএ এসে থামল। কেবল রয়াল মেল নিয়ে যে বাস আসে সেটাই উপরে ডাকঘর পর্য্যন্ত যায়। ট্যাক্সি বা ঘরের গাড়ীও অবশ্য উপরে যায়। কিনক্রেগ সমুদ্রপৃষ্ঠ হতে ৬০০০ ফুট উপরে।
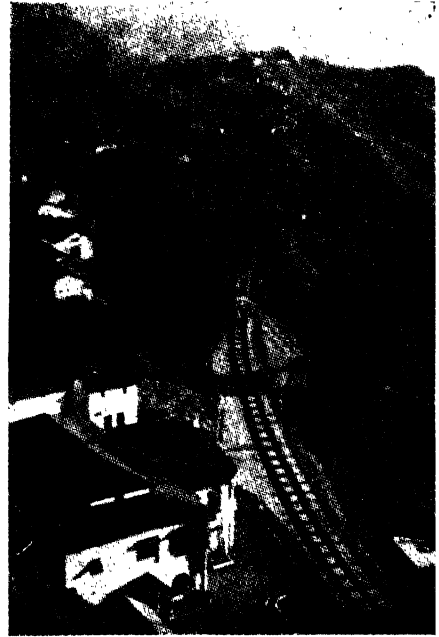
মুসৌরী—সহরের পথে রেলিংএর ছায়া

কিনক্রেগ হতে ৬৮০ ফুট উঁচুতে এক মাইলটাক দূরে মুসৌরী সহর। রিক্সা পাওয়া যায়, চারজনে চালায়, সুমুখে দুজন টানতে থাকে, পিছনে দুজন ঠেলতে থাকে। তা ছাড়া ডাণ্ডি (চার বেহারার দোলা) পাওয়া যায়। ডাণ্ডির কারখানা দেখেছি হৃষীকেশে। বদ্রীনাথ যাত্রায় বড়লোকেরা ডাণ্ডি চড়ে যেয়ে থাকেন।

সহরে ঢুকবার মুখেই পড়ে লাইব্রেরী (Mussoorie Library); এটি ইউরোপীয় প্রতিষ্ঠান। বাংলা বা অন্য ভারতীয় ভাষার বই তাঁরা নাকি রাখেন না—বললেন ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী। লাইব্রেরী বাড়ীর সুমুখে খানিকটা সমতল জমি, একটা কংক্রিটের গোলঘর, চিঠি ফেলবার ডাকবাক্স,

পুলিশ ষ্ট্যাণ্ড, শিল্পমণ্ডিত আলোকস্তম্ভ। নিকটেই হোটেল ও দোকানপাট। অঞ্চলটির নাম লাইব্রেরী বাজার। আরো ডাইনে এগিয়ে পথ নেমে গেছে, উঠে গেছে, পাশ ঘেসে গেছে বনানী-ব্যাপ্ত উপত্যকার। তারপর কুল্‌রি বাজার (Kulri Bazar)—বিলাতী ধরনে সাজানো বিপণীশ্রেণী। আরো এগিয়ে ল্যাণ্ডোর এবং ক্লক টাওয়ার। ম্যুনিসিপালিটির দপ্তরটি একটি পাহাড়ের টিলায়। ঘুরে ঘুরে দেখলাম সব। অনেকগুলি ছবিঘর, হোটেল-রেস্তোরা-কাফে, বিলাসনগরী মুসৌরী।

মুসৌরী সহর সমুদ্রপৃষ্ঠ হতে ৬৬৮০ ফুট উঁচু। দেরাদুনেও বেশ গরম পেয়েছি, কিন্তু এখানে দ্বিপ্রহরের রৌদ্রেও ঘুরতে কষ্ট হয় না। মেয়ে-পুরুষ ঘুরছে অবাধে। সেজেগুজে বেরিয়েছে সবাই। শীত নেই, আবার গরমও নেই—চমৎকার আবহাওয়াটি। কয়েকদিন আগে বৃষ্টি হয়ে গেছে, আজ আকাশটি নীলকান্তমণির মত দ্যুতিময়। পথের পাশে কংক্রিটের রেলিং, তার ছায়া পড়ে গোটা ম্যলের রাস্তাই কেমন বিচিত্র দেখায়। লোভে লোভে ছবি নিলাম।

কাম্পটি জলপ্রপাত

পথের পাশেই বসবার আসন—কংক্রিটের বেঞ্চ পাতা। সুমুখেই বিরাট ঢালু উপত্যকা (gorge), দক্ষিণে ভিনসেণ্ট পাহাড় (Vincent Hill), দূরে দিক্‌চক্রবাল ঘিরে হিমালয় পর্বতমালা। দূরে নিকটে পাহাড়ে পাহাড়ে দেওদার-শ্রেণী, বিরাট পাহাড়ের পটভূমিতে উঁচু দেওদার-শীর্ষটিও যেন ধ্যানস্তিমিত মনে হয়।

মুসৌরী হতে সাত মাইল দূরে কাম্পটি জলপ্রপাত (Kempty Falls) একটি দর্শনীয় বস্তু। অনেক উঁচু হতে জল গর্জন করে ঝাঁপিয়ে পড়ছে —দিন রাত। ওর তলায় বসে যদি দিবানিশি খেলা করা যেত—ভাবতেও ভাল লাগে!

মুসৌরী সহরের সাধারণ দৃশ্য যে কোন জায়গায় দাঁড়ালে অনেকখানি চোখে পড়ে। এখানে এই বেঞ্চে বসে ডাইনে বামে উঁচুতে নীচুতে দূরে নিকটে কত বাড়ী দেখা যাচ্ছে। বাড়ীঘরের ফাঁকগুলি পূরণ করেছে অজস্র গাছ, তারা কেউ গুল্ম, কেউ বনস্পতি, কিন্তু সবগুলিতেই হিমালয়ের ছাপ-মারা। কেউ দীর্ঘ, কেউ হ্রস্ব। যে সবুজ সে গভীর সবুজ, সে যে বিরাটের অংশ তা তার পত্রে পত্রে প্রকাশ করেছে। আর নীচের দিকে ঘুরে ঘুরে পথ নেমে গেছে দেরাদুনের দিকে। নেমে যাচ্ছে লরী বাস ট্যাক্সি। দূর থেকে মনে হয় যেন খেলনা মোটরে দম দিয়ে কেউ ছেড়ে দিয়েছে,

চলতে চলতে এখুনি বুঝি ঠোক্কর খেয়ে থেমে পড়বে। পড়ে না কিন্তু, অপূর্ব কৃতিত্বের সাথে ঘুরে ঘুরে এঁকেবেঁকে তারা নেমে যায়। পথের দু-তিনটা ধাপ চোখে পড়ে, তারপর মিশে যায় বনানীর মধ্যে।

এক সময় বেঞ্চ ছেড়ে আবার পথে নামলাম। কিনলাম খোবানি, আলুচা, আলুবখরা, পিচ, চেরি প্রভৃতি ফল। খেতে খেতে আবার পথ পরিক্রমা আরম্ভ করলাম। পথে পড়ল গান্ হিল (Gun Hill) যাওয়ার রাস্তা। এই পাহাড়ের চূড়াটা মুসৌরী সহর হতে অনেকখানি উঁচু, সমুদ্রপৃষ্ঠ হতে ৭০২৯ ফুট। পথটা সর্বত্র সুগম হয়নি এখনো। কষ্ট করে উঠলাম চূড়ায়। ওখানেই সহরের জলের কল, পাহাড়ের মাথায় কংক্রিটের ট্যাঙ্ক, একটা একটু ছোট, একটা বেশ বড়। ছোট রোপ-ওয়ে (Ropeway) আছে—নীচে হতে ভারী মালপত্র এখানে তুলে আনে। ট্যাঙ্কের পাশে আরাম করে বসলাম। এখান হতে অনেক দূর দেখা যাচ্ছে—বহু দূরের পাহাড় দেখা যায়, দেখা যায় তুষার-মৌলি হিমালয়ের অবিনশ্বর রূপ। তাতে বদ্রীনাথ ও নন্দা দেবীর আভাস পাওয়া যায়। শীতকালে কোন কোন বৎসর মুসৌরীতেও খুব বরফ পড়ে। অল্প দিনের মধ্যে ১৯৪৪ খৃষ্টাব্দে শীতকালে বিষম বরফ পড়েছিল। এমন শীত এখানে অনেক দিন পড়েনি।

মুসৌরী সহরের সাধারণ দৃশ্য

ধূলিময়লাহীন শাণিত উজ্জ্বল দিন। দুপুরের রোদটাও যথেষ্ট গরম নয়, বরং ভালোই লাগে। আকাশে ভেসে যাচ্ছে পেজা তুলোর মতো হালকা সাদা মেঘ। আমার সম্মুখে পশ্চাতে দক্ষিণে বামে যতদূর দৃষ্টি যায়—সৌন্দর্যের অবধি নেই। এ দিনটির স্মৃতি ভুলবার নয়।

মুসৌরী এসে একটা পুরাতন কাহিনী মনে পড়েছিল। পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু তাঁর আত্মজীবনীতে এই ঘটনাটি লিখেছেন। এই মুসৌরী সহর হতে তিনি একবার রাজরোষে বিতাড়িত হয়েছিলেন। কি করে তিনি কিষাণ আন্দোলন তথা ভারতের গণ-আন্দোলনের সহিত জড়িত হয়ে পড়েন, তার ইতিহাস বিবৃত করতে যেয়ে পণ্ডিত জওহরলাল লিখেছেন: ১৯২০ খৃষ্টাব্দে মে মাসের প্রথমে তাঁর মা ও স্ত্রী অসুস্থ হয়ে পড়ায় তাঁদের নিয়ে মুসৌরী আসেন। ওই সময় ব্রিটিশ সরকারের সাথে সন্ধিচুক্তি চালাবার জন্য আফগানের কয়েকজন বিশিষ্ট লোক মুসৌরীতে জওহরলাল সপরিবারে যে হোটেলে উঠেছিলেন সেই স্যাভয় হোটেলেই উঠেছিলেন। মাসাধিককাল

গত হওয়ার পর একদিন স্থানীয় পুলিশ সুপারিন্‌টেণ্ডেণ্ট জওহরলালের সাথে সাক্ষাৎ করে এই মর্মে এক স্বীকৃতি আদায় করতে চাইলেন যে, জওহরলাল আফগান প্রতিনিধিদের সাথে কোন সম্পর্ক রাখবেন না। ইতিপূর্বে আফগান প্রতিনিধিদের বিষয়ে জওহরলাল কিছু জানতেন না, তবু অন্যায় ভাবে কোন জবরদস্তিতে ঘাবড়াবার পাত্র জওহরলাল নন। তিনি স্বীকৃতি দিতে সম্মত হলেন না, ফলে তাঁকে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে দেরাদুন জেলা ছেড়ে যাওয়ার হুকুম হ'ল। মুসৌরী সহর দেরাদুন জেলার অন্তর্গত। জওহরলাল সত্বর মুসৌরী ত্যাগ করতে বাধ্য হলেন।

জওহরলালের স্বনামধন্য পিতা পণ্ডিত মতিলাল যুক্তপ্রদেশের তৎকালীন গভর্ণর স্যার হারকোর্ট বাটলারকে এক রকম বাধ্য করেন এই অন্যায় আদেশ প্রত্যাহার করতে। মুসৌরী হতে বিতাড়িত হয়ে এলাহাবাদ থাকবার সময়েই জওহরলাল কিষাণ আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করবার আহ্বান পান। সেই মুসৌরী—পৃথিবীর কত দূর দূর দেশের লোক এখানে আসে, ভারতের সকল জাতির তো-আনাগোনা লেগেই আছে। নাই বা হ'ল দার্জিলিং বা শিলংএর মতো বড়, শিলংএর মতো অমন চমৎকার ফুলের বেসাতিও নাই বা থাকল তার। তবুও সে হিমালয়ের অন্যতম আদরের দুলালী, লালন করছে হিমালয় তার গহন রহস্য ভরা বুকের উপর বসিয়ে। বহু মানুষের পদধূলি-পূত এই শৈলাবাসকে আমার অন্তরের নতি জানিয়ে নামবার মুখে পা বাড়ালাম।

জীয়ন পুতুল

শ্রীমণীন্দ্র দত্ত

কুড়ি মিনিট পরে।

পুতুলকুমার চলেছে আজগুবির মাঠের পথে। দুরু-দুরু কাঁপছে বুক। মনে মনে ভাবছে আকাশ-কুসুম: যদি চার মোহরের বদলে পাই চার হাজার……যদি চার হাজারের বদলে পাই আট হাজার……যদি আট হাজারের বদলে পাই ষোল হাজার……

ভাবতে ভাবতে পুতুলকুমার হাজির হ'ল আজগুবির মাঠে। কিন্তু কোথায় গাছ? একটি পাতাও সেখানে গজায় নি। তা হলে?

মাথার উপরে হেসে উঠল একটি কাকাতুয়া।

পুতুলকুমার শুধাল: তুমি হাসছ কেন কাকাতুয়া?

—হাসছি তোমার বোকামি দেখে।

—কিসের বোকামি?

—আরে বাবা, মোহরের কখনো গাছ হয়?

—ওরা যে বলল হয়।

—ওরা বলল, আর তুমি তাই বিশ্বাস করলে ?

—তা হলে ?

কাকাতুয়া হেসে উঠল আবার: আর তা হলে!. শোন তা হলে আসল ব্যাপার; ওরা দুজনেই ঠগ, সকলকে ঠকিয়ে বেড়ায়। তুমি এখান থেকে চলে যাবার পরেই তারা দুজন এসে মোহর চারটি নিয়ে পগার পার হয়েছে। বুঝেছ ?

পুতুলকুমার ডুকরে কেঁদে উঠল: হায় হায়রে! আমার চারটি মোহরই গেল! এখন বাবা এলে তাঁকে আমি কি দেব ?

এমন সময় সেখানে উড়ে এল একটি বড় পায়রা। শুধাল: তুমি এখানে কি করছ বাপু ?

—দেখছ না, আমি কাঁদছি।

—তুমি পুতুলকুমার নামে কাউকে চেন কি ?

—আমিই তো পুতুলকুমার।

—তুমি কি গোপীখুড়োকে চেন ?

—চিনি মানে ? তিনি তো আমার বাবা। কেন বল তো ? তিনি কি তোমায় পাঠিয়েছেন ? তিনি কি বেঁচে আছেন ? দয়া করে বল, বাবা কি বেঁচে আছেন ?

পায়রা বলল: তিন দিন আগে আমি তাঁকে দেখেছি সাগরতীরে।

—কি করছিলেন তিনি ?

—সাগর পার হবার জন্য নৌকো তৈরী করছিলেন।

—কেন ?

—তিন মাস তোমাকে না দেখতে পেয়ে তাঁর ধারণা হয়েছে তুমি সাগরপারে কোন নতুন দেশে গিয়েছ।

—বল তো পায়রা ভাই, সাগরতীর এখান থেকে কতদূর ?

—তা ছ'শো মাইলেরও বেশী।

—ছ'শো মাইল! ওঃ, আমার যদি তোমার মত পাখা থাকত!

—তুমি যদি সাগরতীর যেতে চাও, আমি তোমাকে নিয়ে যেতে পারি।

—কেমন করে ?

—আমার পিঠে চড়িয়ে।

—তবে আর দেরী নয় পায়রা ভাই, এখনি চল।

পায়রার পিঠে চড়ে পুতুলকুমার দুই পা দু'দিকে ঝুলিয়ে দিল ঘোড়-সওয়ারের মত। তারপর বলে উঠল: জল্‌দি চল—জল্‌দি চল আমার নতুন পংখীরাজ!

পরদিন সকালে তারা পৌছল সাগরতীরে।

পুতুলকুমারকে নামিয়ে দিয়েই পায়রা অদৃশ্য হয়ে গেল।

সাগরতীর লোকে লোকারণ্য।

পুতুলকুমার একজনকে শুধাল: কি হয়েছে গো এখানে?

সে জবাব দিল: এক বুড়ো বাপ তার হারানো ছেলেকে খুঁজতে নৌকো ভাসিয়েছে সাগরজলে। কিন্তু আজ সাগরে যা ঢেউ, বুড়ো বুঝি ডুবেই মরে।

—কোথায় সে নৌকো?

—ওই ত্যাখো, আমার আঙুল সোজাসুজি।

ভাল করে চেয়ে দেখেই পুতুলকুমার চীৎকার করে কেঁদে উঠল: আমার বাবা—আমার বাবা—

ঢেউয়ের দোলায় নৌকোখানি দুলছে। এই দেখা যায়, এই দেখা যায় না।

একটা উঁচু পাথরের উপর দাঁড়িয়ে পুতুলকুমার ডাকতে লাগল: বাবা—বাবা—বাবা—

বহুদূর হতে বাঙলার-পাঁচ বুঝি চিনল ছেলেকে। মুখ নেড়ে কি বুঝি বলল। মাথার টুপি খুলে নাড়তে লাগল।

হঠাৎ সাদা দানবের মত ছুটে এল একটা বড় ঢেউ। বাঙলার পাঁচকে আর দেখা গেল না।

তীরের লোকজন হায় হায় করে উঠল!

এমন সময় তাদের কানে এল একটা তীব্র চীৎকার: বাবা—বাবাগো—

পিছন ফিরে সকলে দেখল, ছোট ছেলেটি ঝাঁপিয়ে পড়ল সেই ভীষণ সাগরজলে।

সবাই বলল: আহা বেচারি!

(ক্রমশঃ

শক্তির পূজারী

শ্রীবিজয়কৃষ্ণ সাহু

উত্তরমুখে ধা-ধা করে ছুটে চলেছে পালোয়ান রামলোচন নিয়োগী—হাতে খোলা তলোয়ার। পিছন পিছন ছুটছে অর্জ্জুন সর্দ্দার, হাতে একটা মোটা লাঠি।

গাঁয়ের যত লোক হৈ-হৈ করে রাস্তার ধারে ভেঙে পড়েছে—এখনই উত্তর মাঠে একটা রক্তগঙ্গা ছুটবে। রামলোচনের মূর্ত্তি দেখে ছোট বড় কারও সাহস হচ্ছে না তাকে থামায়।

জমিদার গোবিন্দ সিংএর কাছে এ খবরটা আগেই পৌঁছে গেছে। তিনি অতি বিচক্ষণ লোক। সঙ্গে সঙ্গেই একটা মতলব এঁটেছেন।

গ্রামের নাম দীঘলগাঁ—অতিরিক্ত লম্বা বলেই এই নাম। রামলোচন যতই ছুটে আসুক—গ্রামের দক্ষিণ ধার হ'তে উত্তর ধারে আসতে অনেকটা সময় লাগবে। ইতিমধ্যে জমিদারবাবু রামলোচনকে রোখবার সব ব্যবস্থা তৈরী করবেন।

উত্তর মাঠে রামলোচনের কতকগুলি জমি আছে। জমির আল কাটা নিয়ে পাশের গাঁয়ের লোকদের সঙ্গে অর্জ্জুনের তুমুল বিবাদ হয়েছে। তারা দাঙ্গা করার জন্য তৈরী হয়ে এসেছে। অর্জ্জুন এসে রামলোচনকে এই সংবাদ দিতেই রামলোচন মূর্ত্তিমান্ যমের মত ছুটে বেরিয়ে পড়ল।

জমিদারবাবুর কাছারীর সামনে রাস্তাটা একটু সরু হয়ে মোড় ঘুরেছে। পাশেই একটা বড় নালা। রাস্তা যেখানে মোড় ঘুরেছে, তার পাশেই একটা পুরানো আমগাছ। রামলোচন যেমন সেই আমগাছটা পেরুবে,—অমনি আমগাছের গুঁড়ির সঙ্গে বাঁধা লোহার শিকল দিয়ে তাকে গাছে জড়িয়ে ফেলা হোল!

কার্ত্তিক গণেশ দুই ভাই। যেমন চেহারা বিকট—তেমনি দেহে অসাধারণ শক্তি। দু'ভাই জমিদারের একান্ত বাধ্য। রামলোচনকে ঠেকাবার জন্য জমিদার রথটানা লোহার শিকল নিয়ে এদের দু'জনকে লাগিয়েছেন। একজন সেই প্রকাণ্ড শিকলটার একদিক গাছে জড়িয়ে ধরেছে, আর একজন রাস্তার অপর পাশে আর একটা খুঁট ধরে দাঁড়িয়ে আছে। যেমন রামলোচন মোড় ফিরেছে,—অমনি তড়িৎ গতিতে তারা একে বেড়ে ফেলেছে।

রামলোচনের হাতে খোলা তলোয়ার। দিগ্বিদিক্ জ্ঞানশূন্য হয়ে সে আমগাছটার উপর দু'হাত দিয়ে এক কোপ বসাল। ধারাল ছুরির মুখে কচু ডাঁটা যেমন কচ্ করে কাটে,—আমগাছের গুঁড়িটা তেমনি কেটে পড়ে গেল।

তৎক্ষণাৎ জমিদার সামনে এসে হাজির হলেন—সঙ্গে সঙ্গে বিস্তর লোক জমে গেল, কার্ত্তিক গণেশকে ইঙ্গিত করায় তারা শিকল খুলে নিল। জমিদার রামলোচনের হাত ধরে কাছারী ঘরে নিয়ে গেলেন। আকস্মিক উত্তেজনা কমে যাওয়ায় রামলোচনেরও একটু অনুশোচনা এসেছে। জমিদার না আটকালে এখনই কী সর্ব্বনাশ হোত।

জমিদারের বাড়ীতে এক সাধু এসেছিলেন। তিনি এগিয়ে এসে বললেন—'বাবা, মেঘনাদের উপাস্য দেবতা অগ্নি, সে অগ্নির অনুমতি নিয়ে কোন যুদ্ধে গেলে কেউ তাকে হারাতে পারত না। তোমার ঠাকুর মা জয়চণ্ডী। তুমি শক্তি দেখাতে যাচ্ছিলে,—সেই শক্তি-মার অনুমতি নিয়েছ? তুমি ব্রাহ্মণ, এত রাগ ভাল নয়।'

রামলোচনের মাথা হেঁট হয়ে গেল। সে আস্তে আস্তে বাড়ী ফিরে এল,—পুনরায় স্নান করে জয়চণ্ডীর মন্দিরে ঢুকল। রামলোচন জয়চণ্ডীকে খুব ভক্তি করত। তার বিশ্বাস ছিল—মা জয়চণ্ডীর নাম উচ্চারণ করে সে অসাধ্য সাধন করতে পারে।

রামলোচনের দেহে অমিত তেজ। মানুষের দেহে এত শক্তি কোথা হতে আসে, কেউ বুঝতে পারত না। জয়চণ্ডীর দালান করার জন্য কতকগুলি লোহার কড়ি এসেছিল। এক-একটার ওজন চার মণ। রামলোচন কোমর নুইয়ে দাঁড়াত—একে একে চারখানা কড়ি তার কোমরে তুলে দেওয়া হোত। সে অনায়াসে সেগুলিকে একধার থেকে সরিয়ে নিয়ে আর এক ধারে রেখে আসত।

রামলোচনের একটা মজার খেলা ছিল। সে মাটিতে শুয়ে পড়ত—আর চব্বিশ-পঁচিশজন লোক তাকে চারদিক হতে টিপে ধরত। রামলোচন মুহূর্ত্তমধ্যে সোজা হয়ে দাঁড়াত—আর লোকগুলি চারদিকে ছিটকে পড়ত।

শক্তি মানুষকে চুপ করে বসে থাকতে দেয় না। তাকে ছুটিয়ে নিয়ে যায় নতুন নতুন অভিযানে। ভগবানের কাছে বর চাইতে গিয়ে হিরণ্যাক্ষ চেয়েছিল—প্রতিদ্বন্দ্বী যোদ্ধা। রাজাদের দিগ্বিজয়ের কারণ একই। আশপাশে ডাকাতির খবর শুনলে রামলোচন নিজেই ছুটে যেত ডাকাত দমন করতে।

জমিদার গোবিন্দ সিং একদিন রামলোচনকে বললেন—'বর্দ্ধমান রাজসরকারে কথা হচ্ছিল, যে কর্জ্জনার ডাকাতদের সায়েস্তা করতে পারবে,—তাকে পুরস্কার দেওয়া হবে।'

প্রবাদবাক্য ছিল,—'যদি পেরুলি কর্জ্জনা,—নেয়ে ধুয়ে ঘর যা না'। এখানকার ডাকাতেরা খুব বিখ্যাত। পুলিস এদের সায়েস্তা করতে পারে নি। উপরন্তু এদের কবলে পড়ে কত দারোগা প্রাণ হারিয়েছে। তখনকার দিনে ইংরেজশাসন সবেমাত্র সুরু হয়েছে—দেশে শৃঙ্খলা আদৌ ছিল না।

কর্জ্জনার এই সংবাদ পেয়ে রামলোচন চঞ্চল হয়ে পড়ল। পরদিনই মা জয়চণ্ডীর পূজা সেরে অর্জ্জুনকে নিয়ে যাত্রা করল।

কর্জ্জনা একটা প্রকাণ্ড জলা মাঠ। মাঠের মাঝামাঝি একটা রাস্তা চলে গেছে। এই রাস্তাটাই ডাকাতদের শিকার ধরার ফাঁদ।

রামলোচন আর তার সঙ্গী দুপুরের সময় একটা লোকের কাছে একটু তেল চাইল। সে বলল—'বাড়ীতে তেল নাই,—সরষে ভাঙ্গাতে যাব।' রামলোচন মুঠো দুই সরষে একটা ভাঁড়ে চেয়ে নিল। তারপর হাতের মুঠোয় সরষেগুলি পিষে তেল বার করে সেই তেল মেখে দু'জনে

স্নান করল। গৃহস্থ তাকে জিজ্ঞাসা করল—'কোথায় যাবেন?' রামলোচন কর্জ্জনার অপর পারে একটা গ্রামের নাম করল।

গৃহস্থ বলল—'আজ আর এগুবেন না—মাঝ মাঠে সন্ধ্যে হয়ে যাবে।'

রামলোচন একটু হেসে চলে গেল। গৃহস্থ তার হাতের চাপে সরষে পেষা দেখে অবাক হয়ে গেছল—আর কিছু বলতে সাহস করল না।

কর্জ্জনার মাঝ মাঠে এসে পড়েছে তারা। অর্জ্জুন হাতে একটা থলে নিয়ে মাঝে মাঝে লুফছে। রাস্তার পাশেই একটা পুকুর। পুকুরের ঘাটের ধারেই একটা বটগাছ—তার তলায় জন পাঁচ ছয় লোক চাবিজাল নিয়ে বসে আছে।

রামলোচন আর তার ভৃত্যকে দেখে তারা জোরে হেসে উঠল। রামলোচন জিজ্ঞাসা করল—'হাসলে কেন?' তারা বলল—'আজকের দিনটা ভাল—একটা বড় কাতলা মাছ পেয়েছি।'

রামলোচন অর্জ্জুনকে বলল—'আয় এইখানে একটু জল খেয়ে নিই।' এই বলে তারা দু'জনে জলের ধারে গেল। ঠিক্ সেই সময় উঁচু পাড় হতে একজন চাবিজাল নিয়ে লাফ দিয়ে রামলোচনের উপরে পড়ল। রামলোচন সঙ্গে সঙ্গে 'জয় মা জয়চণ্ডী' বলে চাবিজালের মুখের রেখাটা বাঁ হাত দিয়ে উঁচু করে ধরে জালটা কাত করে দিল। জালের উপর ছিল ডাকাত—সে জলে পড়ে গেল। রামলোচন তাকে পা দিয়ে জলেই টিপে ধরল। তার সঙ্গীরা মুহূর্ত্তের মধ্যে লাঠি নিয়ে ছুটে এল। এই সময় অর্জ্জুন তার লাঠির হাতটা দেখাবার সুযোগ পেল। ডাকাতেরা সকলে মিলে তাকে কাবু করতে পারল না। এদিকে সেই ডাকাতটাকে জন্মের মত জল খাইয়ে রামলোচন অর্জ্জুনের পাশে এসে দাঁড়াল। ডাকাতদের কারও হাত ভেঙ্গে গেল—কারও মাথা কেটে গেল—তারা ছুটে পালাল।

রামলোচন আরও কিছু দুর এগুল। সন্ধ্যা হয় হয়। সেই সময় প্রায় পঞ্চাশ-ষাট জন লোক তাকে ঘেরাও করল। তাদের সকলের সঙ্গে যুঝতে যুঝতে রামলোচন এগিয়ে চলল—অর্জ্জুন তার পিছনে লড়তে লাগল। ক্রমে মাঝ মাঠের ভিতর তারা ডাকাতদের একটা বাড়ীতে পৌছাল। মাঠের মাঝখানে একটা চালা—দু'পাশ থেকে দুটো রাস্তা এসে তার পাশেই মিশেছে। অর্জ্জুন সেখানে তার উদরের ব্যবস্থা সেরে নিল। রামলোচন বারান্দায় একটা বাঁশের খুঁটিতে ঠেসান দিয়ে বসে পরম ভক্তিভরে নিজের ইষ্টদেবীর নাম গান করতে লাগল।

সেই তেপান্তর মাঠ থেকে—কোন দিকে কোন শব্দ লোকালয়ে পৌছায় না। কিন্তু সে রাত্রে সারারাত ধরে চার পাশের লোকেরা অসংখ্য মানুষের আর্ত্তনাদ শুনেছিল। মাঠের ঘটনা তারা সকলেই জানে। তারা ভাবছিল—বহু পথিক আজ অন্তিম পথের যাত্রী হোল!

পরদিন ভোর হতে না হতেই রামলোচন অর্জ্জুনকে নিয়ে ফিরে চলল। তার ফেরার পথে প্রথমেই যে গ্রামটা পড়ে, সেই গ্রামের সেই গৃহস্থ তার সরষে পেষার খবর পূর্ব্বদিনে সারা গ্রামে রটিয়ে দিয়েছে। সেখান হতে পরদিন সকালে বর্দ্ধমান রাজসরকারে খবরটা এসে গেছে। রাজাও

সেই পথিককে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে বলে পাঠিয়েছেন। সেই গৃহস্থ লোকটি উদ্‌গ্রীব হয়ে রামলোচনের আশায় বসে আছে। দুপুরের কিছু আগে রামলোচন সেখানে এসে পৌছুল। সেই গৃহস্থ রামলোচনকে দেখে অবাক্ হয়ে গেল। তার কাপড়-চোপড়ে রক্তের দাগ—সারা দেহ হতে তার একটা অপূর্ব্ব জ্যোতি বেরুচ্ছে। গৃহস্থ তাকে দেখতে পেয়েই গ্রামবাসীদের খবর দিল।

সকলে রামলোচনকে একরকম কাঁধে করেই রাজসরকারে নিয়ে গেল। মহারাজা রামলোচনের বীরত্বের কাহিনী শুনে পরম সুখী হলেন—একশত বিঘে ভাল নিষ্কর জমি তৎক্ষণাৎ তাঁকে লিখে দিলেন। রাণীমা স্বয়ং সোনার থালায় করে খাবার নিয়ে এসে বললেন—'বাবা, কাল হতে কিছু খাওয়া হয় নাই,—একটু জলযোগ কর।' রামলোচন কিন্তু জলবিন্দুও স্পর্শ করল না। সে বলল—'মায়ের পূজা না করে খেতে পারি না।' রাজা তৎক্ষণাৎ হাতীতে চাপিয়ে তাকে বাড়ী পাঠিয়ে দিলেন।

রাজার হাতী যখন হেলে দুলে গ্রামে ঢুকছে—গ্রামের ছোট বড় সকলে হাতী দেখতে ছুটে এল। রামলোচন তাড়াতাড়ি নেমে পড়ে হাতীকে বিদায় করে দিল।

সত্য ঘটনা বলিয়া কথিত।

আশুতোষ নমো নম

শ্রীনীলরতন দাশ

তমোগুণে ভরা পরাধীন দেশে তোমার অভ্যুদয়—
কেমনে হলো যে সম্ভব, তাই ভেবে লাগে বিস্ময়।
সত্যই তুমি 'বাংলার বাঘ', পুরুষ-প্রবর বীর,
তোমার দীপ্ত তেজস্বিতায় বাঙালী উচ্চশির।
বজ্রের মত কঠোর হলেও কোমল পুষ্পসম,—
তুমি নির্ভীক স্বজাতি-প্রেমিক, আশুতোষ নমো নম।

লক্ষ্মীর বর পুত্র যদিও, তবু মাতা বীণাপাণি
তব সাধনায় প্রীত হয়ে বুকে আদরে নিলেন টানি'।
প্রতিভাদীপ্ত তোমার দৃপ্ত মূর্ত্তি জ্যোতিষ্মান
স্বদেশী বিদেশী প্রতিপক্ষের কাঁপায়ে তুলিত প্রাণ।
সত্য-ন্যায়ের পূজারী তোমার চরিত্র অনুপম;
উদারপন্থী জ্ঞানী ব্রাহ্মণ আশুতোষ নমো নম।

তোমার সৃষ্ট নব নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়—
জ্ঞানসাধনা ও বিদ্যাপীঠের অপূর্ব্ব পরিচয়।
বিশ্ব ভাষা ও সাহিত্যের পাশে পাতিয়া সিংহাসন
করেছ বঙ্গভাষা-জননীর গৌরব বর্দ্ধন।
ছাত্রের গুরু, পিতা ও বন্ধু, হে সুধী দ্বিজোত্তম,
আচারে বিচারে প্রকৃত বাঙালী আশুতোষ নমো নম।

বঙ্কিমচন্দ্র

শ্রীবন্দনা সরকার

১২৪৫ সনের ১৩ই আষাঢ় বঙ্কিমচন্দ্র ২৪-পরগণা জেলায় কাঁঠালপাড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম যাদবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। বঙ্কিমচন্দ্রের জন্মতিথি বাঙালীর এবং সমগ্র ভারতবাসীর পবিত্র উৎসব-তিথি। সাহিত্য-পঞ্জীতে ঐ দিনটি স্মরণীয়। সেদিন বোধ হয় আকাশে পুষ্পবৃষ্টি হইয়াছিল, বঙ্গবাণীর বীণার তারে সুরঝংকার মৃদু গুঞ্জনে কম্পন তুলিয়াছিল।

ছাত্রজীবন—বঙ্কিমের পিতা মেদিনীপুরে ডেপুটি কালেক্টর ছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দে মেদিনীপুরে ইংরেজী স্কুলে ভর্তি হন। ইহার পর ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দ হইতে হুগলী কলেজের স্কুলবিভাগে অধ্যয়ন করিতে থাকেন। ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে বঙ্কিমচন্দ্র জুনিয়র পরীক্ষায় এবং ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে সিনিয়র পরীক্ষায় বৃত্তি পান—প্রথমোক্ত পরীক্ষায় মাসে ৮ টাকা ও দ্বিতীয় পরীক্ষায় মাসে ২০ টাকা।

১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে সর্বপ্রথম বাঙলাদেশে বি. এ. পরীক্ষা গৃহীত হয়। মোট ১০ জন ছাত্র পরীক্ষা দিয়াছিল; তাহার মধ্যে কেবল দুইজন দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হন—বঙ্কিমচন্দ্র প্রথম স্থান এবং যদুনাথ বসু দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন। বি. এ. পরীক্ষার পর তিনি প্রেসিডেন্সি কলেজে আইন পড়িতে লাগিলেন। ইহার কিছুদিন পরে তিনি যশোহরে ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টরের পদ লাভ করিয়া চাকরি করিতে যান। চাকরি করিতে করিতে তিনি ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে বি. এল. পরীক্ষা দিয়া প্রথম বিভাগে তৃতীয় স্থান অধিকার করেন।

কর্মজীবন—সরকারী কর্মচারী হিসাবে বঙ্কিমচন্দ্র বিশেষ সুনামের সঙ্গে কাজ করেন। সেই সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার সাহিত্য-সাধনাও চলিতে থাকে। বঙ্কিমের প্রতিভা বহুমুখী। সাহিত্যের ভাণ্ডার পূর্ণ করিতে যেখানে যাহা কিছু প্রয়োজন সেখানেই তিনি বিপুল বল ও আনন্দ লইয়া ধাবিত হইয়াছেন। বঙ্কিমচন্দ্র একবারে কবি, শিল্পী, সমালোচক, সাহিত্যিকে, ঔপন্যাসিক, প্রত্নতাত্ত্বিক, দার্শনিক ও ধর্মবেত্তা ছিলেন। তিনি ছিলেন সাহিত্যের সব্যসাচী, বাংলা ভাষার বিশ্বকর্মা।

বাংলা সাহিত্য ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া বঙ্কিমচন্দ্র যে সাহিত্য সৃষ্টি করিলেন, তাহার মধ্যে অমৃতের স্নিগ্ধ স্পর্শ, বিদ্রূপের তীব্র কশা, পুষ্পের কোমলতা ও বজ্রের জ্বালা নিবিড়ভাবে জড়াইয়া থাকিয়া আঘাতে, আবেদনে দেশের শিক্ষিত মনকে সচকিত করিয়া তুলিল। বিদেশী শাসকের প্রসাদ ভিক্ষা করিয়া জাতি হিসাবে আত্মসম্মান ও প্রতিষ্ঠা লাভ করা সম্ভবপর নয়; ইহার জন্য মৃত্যু পণ করিয়া স্বাধীনতা অর্জন করিতে হইবে; দেশ উদ্ধারের কাজে শুধু মৃত্যুপণই নয়, ভক্তি ও নিষ্ঠা অবিচলিত রাখিয়া কর্মে ব্রতী হইতে হইবে; দেশপ্রেম, মাতৃভক্তি ও ভগবদ্ভক্তির যুক্ত

ত্রিবেণীধারা শক্তিমান সন্তানদের অন্তরে প্রবাহিত করিতে হইবে—বঙ্কিমচন্দ্রই প্রথম এই আদর্শ তুলিয়া ধরেন বাঙালী তরুণদের সম্মুখে।

আমাদের রাজনৈতিক জীবনে বঙ্কিমচন্দ্র যে নবপ্রেরণার সূত্রপাত করেন, তাহা কোটি কোটি ভারতবাসীকে জাগাইয়াছে, স্বদেশসেবায় আত্মাহুতি দিতে অনুপ্রাণিত করিয়াছে। বঙ্কিমের রচিত জাতীয় সংগীত 'বন্দে মাতরম্‌' পরাধীন ভারতবাসীকে স্বাধীনতা অর্জনে উদ্দীপ্ত করিয়াছে। কত বীর এই মৃত্যুহরণ মহাসংগীত উচ্চারণ করিতে করিতে ফাঁসীর মঞ্চে জীবন দিয়াছে, অত্যাচারীর লাঠি ও গুলীর সম্মুখে নির্ভয়ে দাঁড়াইয়াছে।

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় বলিয়াছেন: 'বঙ্কিম ভারতের নবজাতীয়তার ঋষি; বাঙালীর কৃষ্টি ও প্রসারের অগ্রদূত। বাংলা সাহিত্যে ও সমাজ-জীবনে বঙ্কিম যে আলোকপাত করিয়াছিলেন তাহার জ্যোতি: আজও আমাদের পথ দেখাইতেছে।'

বঙ্কিমচন্দ্রকে রবীন্দ্রনাথ 'ভগীরথ' আখ্যা দিয়াছেন। সাহিত্যে বঙ্কিমের দান আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি বলিয়াছেন: 'আমাদের মধ্যে যাঁহারা সাহিত্যব্যবসায়ী তাঁহারা বঙ্কিমের কাছে যে কী চিরঋণে আবদ্ধ, তাহা যেন কোনো কালে বিস্মৃত না হন। একদিন আমাদের বঙ্গভাষা কেবল একতারা যন্ত্রের মতো এক তারে বাঁধা ছিল, কেবল সহজ সুরে ধর্মসংকীর্তন করিবার উপযোগী ছিল; বঙ্কিম স্বহস্তে তাহাতে এক একটি করিয়া তার চড়াইয়া আজ তাহাকে বীণাযন্ত্রে পরিণত করিয়া তুলিয়াছেন। পূর্বে যাহাতে কেবল স্থানীয় গ্রাম্য সুর বাজিত, আজ তাহা বিশ্বসভায় শুনাইবার উপযুক্ত ধ্রুপদ অঙ্গের কলাবতী রাগিণী আলাপ করিবার যোগ্য হইয়া উঠিয়াছে।'

বাঙালীর ভিতর হইতে যে কয়জন মহামানব ভারতবর্ষকে জ্ঞানে, ধর্মে, সাহিত্যে, রাজনীতিতে উন্নত করিয়াছেন, বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহাদের অন্যতম। নবযুগের প্রবর্তক তিনি। বাংলা সাহিত্য তাঁহার প্রতিভায় মহিমান্বিত হইয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়া কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ যে প্রশস্তি গাহিয়াছিলেন আমরাও তাহাই উচ্চারণ করিয়া বঙ্কিমের জয়ধ্বনি করি:

নবযুগ সাহিত্যের উৎস উঠি' মন্ত্রস্পর্শে তব
চির চলমান স্রোতে জাগাইছে প্রাণ অভিনব
এ বঙ্গের চিত্তক্ষেত্রে, চলিতেছে সম্মুখের টানে
নিত্য নব প্রত্যাশায় ফলবান ভবিষ্যৎ পানে।
তাই ধ্বনিতেছে আজি সে বাণীর তরঙ্গকল্লোলে,
বঙ্কিম, তোমার নাম, তব কীর্তি সেই স্রোতে দোলে।
বঙ্গভারতীর সাথে মিলায়ে তোমার আয়ু গণি,
তাই তব করি জয়ধ্বনি॥

ভাই-ভাই

শ্রীধীরেন্দ্রলাল ধর

নীরেন ও হীরেন দুই ভাই।

মিল খুব। বাজার করতে গেলে নীরেন আনাজের থলি হাতে নেয়, হীরেনের হাতে থাকে মাছের থলি। সখের দলে নীরেন রাজার ভূমিকায় নামলে, হীরেন রাণী না সাজলে অভিনয় জমে না। দুজনের মাঝে বয়সের তফাৎ মাত্র দু' বছরের। সম্ভ্রমের কোন বালাই নেই, তামাক খেয়ে গড়গড়ার নলটা হীরেনের দিকে এগিয়ে দিয়ে নীরেন বলে—নে খা!

নীরু বিয়ে করলো, পাত্রী পছন্দ করলো হীরু। আবার হীরুর বিয়ের সময় সে বললো—দাদা দেখেছে তো, তা হলেই হোল।

নীরুর বিছানার চাদরটা কেমন হবে তা দেখে কিনবে হীরু, আবার হীরুর ঘরের টেবিলটা কোন্ দিকে বসালে মানাবে তা ঠিক করে দেবে নীরু।

এমন মিল একালে বড় একটা দেখা যায় না।

কিন্তু শক্ত গাঁথুনিতেও একদিন ফাটল ধরে।

প্রথম ধাক্কাটা লাগলো আপিসের মাইনে নিয়ে। নীরু মাইনে পায় দেড়শো, হীরু বলে—উপরি-স্থপরি নিয়ে তিন-চার শো টাকা মাসে হয়।

একদিন নীরু আপিস থেকে এসে বললো—তুই এই সব বলে বেড়াস, নরেন শুনে সাহেবের কাছে বলেছে, সাহেব আজ ডেকে ধমকে দিলে, তোর জন্যে আজ চাকরিটাই যেতে বসেছিল আর কি! আমি কি পাই না পাই, সে কথা তোর পাড়ায় বলে বেড়ানোর দরকার কি বাপু!

ক'দিন পরে হোল দ্বিতীয় ধাক্কা। নীরুর ছেলেটিকে হীরু আপিস থেকে এসে পড়াতে বসে। একদিন রাগের মাথায় হীরু একটা চড় মেরে বসলো। রাত্রে খাবার সময় নীরু বললো—তুই ছেলেটাকে আজ এমন মেরেছিস যে পিঠে পাঁচ আঙুলের দাগ পড়ে গেছে।

হীরু বললো—তেমন ভাবে তো কিছু মারিনি। মোটেই পড়তে চায় না, তাই আস্তে একটা চড় মেরেছি।

নীরুর বৌ বললো—দরকার কি বাপু ছোট ছেলেকে মারধর করার? আপিসের খাটাখাটুনির পর তোমার মেজাজ ঠিক থাকে না, তখন সহজেই রাগ হয়। আমি ক'দিন ধরে তাই ওকে বলছি একটা মাষ্টার রাখার কথা।

দুদিন পরে নীরুর ছেলের জন্য নতুন মাষ্টার এলো।

তৃতীয় ধাক্কা এলো হীরুর স্ত্রীর অসুখের সময়। হীরু বৌদিকে বললো—আজ থেকে আধসের দুধ বেশী নিও।

বৌদি বললো—তোমার দাদাকে বল।

নীরু বললো, তা কি করে হয়, এতেই গয়লার পাওনা হচ্ছে মাসে ত্রিশ টাকা, এর উপর আর বাড়াবো না, যে ক'দিন দরকার হয় নগদ কিনে নে।

হীরু আর কিছু বলে না। বৌদি বলে—একশো টাকায় কি আর দুটি লোকের চলে আজকাল, তবু তো আমরা চালাচ্ছি, উপরি খরচটা তোমরা নিজেরাই কর না বাপু!

হীরু মাইনে পায় মাত্র একশো পঁচিশ টাকা। দাদার সংসারে সে থাকে, স্বামী-স্ত্রীর খরচের জন্য দাদার হাতে সে মাসে মাসে একশো টাকা দেয়। পঁচিশটি টাকা হাতখরচের জন্য হাতে না রাখলে তার চলে না।

সকালে নীরু বলে—সারা রাত তোর ঘরে লাইট জ্বলে?

—স্ত্রীর অসুখ।

—ছোট বৌমার অসুখ যদি একমাস চলে, তা হলে একমাস সারারাত আলো জ্বলবে?

—উপায় কি?

—তা হলে তুই একটা আলাদা সাবমিটার কর।

হীরু বলে—শুধু সাবমিটার কেন? খাওয়া পরা সব আলাদা করে নিলে কেমন হয়?

—সে ত অতি উত্তম। তোর বুঝে তুই খরচ করবি, কারুর বলার কিছু থাকবে না।

হীরেন সেই দিনই বাজার থেকে একটা উনুন কিনে এনে নিজেই রাঁধতে বসলো। আগুন ধরিয়ে ভাতে ভাত চাপিয়ে যখন সে কপালের ঘাম মুচছে, তখন নীরুর রান্নাঘর থেকে মাছ ভাজার গন্ধ আসছে। ঘরে এসে হীরু স্ত্রীকে বললো—আমাকে দেখিয়ে দেখিয়ে আজ ইলিশ মাছ ভাজা হচ্ছে। এই রবিবারেই মিস্ত্রী ডেকে বারান্দার মাঝে একটা দরজা বসিয়ে দোব, তা হলেই সব আলাদা হয়ে যাবে, কারুর সঙ্গে আর কোন লেক্‌চো থাকবে না।

ক'দিন পরে সত্যই হীরু বারান্দায় একটা একটা দরজা বসালো। দু'দিকে দুটি পথ, দু'ভাই দু'পথ দিয়ে চলাফেরা করে। দৈবাৎ কলতলায় সাত দিনে একবার দু'ভাই মুখোমুখি হয়, খুব প্রয়োজন না হলে কেউ কারু সঙ্গে কথা বলে না।

কবির পুরস্কার

শ্রীসুলতা কর

গম্‌গম্‌ করছে রাজসভা। রত্ন-সিংহাসনে বসে রয়েছেন বাংলার সম্রাট গণেশ। তাঁর চারদিক ঘিরে বসে রয়েছেন মন্ত্রী, অমাত্য, পরিষদেরা। সোনার দণ্ড হাতে ঘুরে বেড়াচ্ছে প্রহরীরা। ঐশ্বর্য্যে আর সৌন্দর্য্যে দেবরাজ ইন্দ্রের সভাকে হার মানিয়েছে সম্রাট্ গণেশের রাজসভা।

বেলা বেড়ে চলেছে। রাজকাজ শেষ হয়েছে। সভা ভাঙবার সময় হয়ে এসেছে। এমন সময় এগিয়ে এল এক প্রহরী। সম্রাটকে অভিবাদন করে বলল—"মহারাজ, এক গরীব ব্রাহ্মণ যুবক ফুলিয়া গ্রাম থেকে পায়ে হেঁটে এসেছেন। তাঁর নাম কৃত্তিবাস ওঝা। সাতটি কবিতা তিনি সঙ্গে করে এনেছেন। মহারাজকে নিজে পড়ে শোনাবেন এই তাঁর ইচ্ছা। মহারাজ যদি অনুমতি করেন ত তাঁকে নিয়ে আসি।"

সম্রাট গণেশ বললেন—"যাও, এখনই ব্রাহ্মণকে এখানে নিয়ে এস।"

প্রহরীর সঙ্গে এক সৌম্যদর্শন ব্রাহ্মণ যুবক রাজসভায় ঢুকলেন। অতি সাধারণ পোষাক পরে রয়েছেন, হাতে কয়েকখানি পুঁথি। সভার বিপুল ঐশ্বর্য্য দেখে সভয়ে চারদিকে তাকাচ্ছেন। গ্রাম্য কবির হাবভাব দেখে মন্ত্রী, অমাত্য, পরিষদেরা ব্যঙ্গের হাসি হেসে উঠলেন।

কিন্তু সম্রাট গণেশ গরীবকে অনাদর করেন না। কবিকে আসন গ্রহণ করতে বলে সম্রাট জিজ্ঞাসা করলেন—"ব্রাহ্মণ, আমার কাছে আপনার কি প্রার্থনা আছে?"

সবিনয়ে কবি কৃত্তিবাস বললেন—"মহামান্য সম্রাট, আমি আপনাকে নিজের লেখা কয়েকটি কবিতা পড়ে শোনাতে চাই। গুণগ্রাহী আপনি, কাব্যের দোষগুণ আলোচনা করে আমার কাব্য শ্রেষ্ঠ হবার যোগ্য কি না বলবেন, এই আমার প্রার্থনা।"

সম্রাট বললেন—"বেশ তাই হোক্। রাজকাজ শেষ হয়েছে। এই ত কাব্য শোনবার সময়। কবি, আরম্ভ করুন আপনার কাব্যপাঠ।"

কবি কৃত্তিবাস পুঁথি খুলে কবিতা পড়তে আরম্ভ করলেন। প্রথমে তাঁর গলার সুর সঙ্কোচে ক্ষীণ শোনাচ্ছিল। কিন্তু যতই কাব্যপাঠ এগোতে লাগল, যতই কবি কাব্যরসের মধ্যে ডুবে যেতে লাগলেন, ততই তিনি বাইরের প্রভাব ভুলে যেতে লাগলেন। একটির পর একটি কবিতা পড়ে চললেন কবি কৃত্তিবাস। বিস্ময়ে চমকে উঠল রাজসভা। এমন অপূর্ব্ব ভাবে ভরা—ছন্দে ভরা কবিতা কি কোন মানুষ কোন দিন লিখতে পারবে? যে সব মন্ত্রী, অমাত্য, পরিষদেরা এতক্ষণ পরিহাস করছিলেন, এখন তাঁরা কবিকে চেয়ে দেখতে লাগলেন।

কাব্যপাঠ শুনতে শুনতে ভাবের আবেগে সম্রাট গণেশের সমস্ত দেহ কাঁপতে লাগল, দরদর করে চোখের জল ঝরে পড়তে লাগল। মন্ত্রী, অমাত্য, পরিষদেরা মন্ত্রমুগ্ধের মত চেয়ে রইলেন।

কাব্যপাঠ শেষ হল। কবি কৃত্তিবাস অভিবাদন করে একপাশে সরে দাঁড়ালেন।

সিংহাসন থেকে নেমে এলেন সম্রাট গণেশ। কবির হাত ধরে সাদরে বললেন—"ধন্য, ধন্য মহাকবি! এ পৃথিবীতে তোমার তুল্য আর কেউ নাই। রাজা গণেশের রাজ্য ও মহিমা দুদিনে লোপ পাবে; কিন্তু কবি, তোমার কাব্য চিরকাল ধরে অক্ষয় হয়ে থাকবে। বল কবি, তোমায় কি পুরস্কার দেব? লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা কি তুমি চাও? কিংবা কোন বিস্তীর্ণ জায়গীর? তোমায় অদেয় কিছুই নেই আমার।"

গরীব ব্রাহ্মণ কৃত্তিবাস সগর্ব্বে মাথা উঁচু করে তুললেন, বললেন—"মহারাজ, অনুরোধ করি আমায় অসম্মান করবেন না। ধনের প্রত্যাশায় আপনার কাছে আসিনি। কবি আমি, আমার কাব্য মহারাজকে আনন্দ দিয়েছে, এই আমার শ্রেষ্ঠ পুরস্কার। মহারাজ শ্রেষ্ঠ কবি বলে আমায় অভিনন্দিত করলেন, এর বাড়া পুরস্কার আর কি হতে পারে!"

লজ্জায় মাথা নীচু হল সম্রাট গণেশের। নিজের গলা থেকে ফুলের মালা খুলে নিয়ে পরিয়ে দিলেন কবির গলায়। বললেন—"ধন্য, ধন্য মহাকবি! তুমি আমায় প্রকৃত শিক্ষা দিলে। আমি মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করছি যে—কবি কৃত্তিবাস দেশের শ্রেষ্ঠ কবি। কবি, আমার একটি বিশেষ অনুরোধ এই যে, তুমি বাংলা ভাষায় রামায়ণ রচনা কর। তোমার লেখা রামায়ণ বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে যুগ যুগ ধরে অক্ষয় হয়ে থাক।"

কবি কৃত্তিবাস হাসিমুখে বললেন—"তথাস্তু মহারাজ! আপনার আদেশ শিরোধার্য্য করলাম।"

ধন্য ধন্য রব উঠল সভায়। মন্ত্রী কেদার খাঁ দামী আসন থেকে নেমে এসে চন্দন মাখিয়ে দিলেন কবির সারা দেহে। "জয় কবি কৃত্তিবাসের জয়, জয় মহাকবি কৃত্তিবাসের জয়" ধ্বনিতে কেঁপে উঠল রাজসভা। হাসিমুখে কবি কৃত্তিবাস রাজসভা থেকে বিদায় নিয়ে নিজের ভাঙ্গা কুঁড়ে ঘরে ফিরে গিয়ে বাংলা ভাষায় রামায়ণ গান রচনা করতে বসলেন। আজকের দিনে বাংলার কবি রবীন্দ্রনাথ যেমন কবি-যশের পুরস্কার চেয়ে বলেছেন—

"ধন নয়, মান নয়, আপনার ভাবা
করেছিনু আশা।"

ঠিক তেমনই ভাবে পাঁচশো বছর আগে বাংলার কবি কৃত্তিবাস সম্রাট গণেশের রাজসভায় দাঁড়িয়ে কবি-যশের পুরস্কার চেয়ে বলেছিলেন—

—"কারো কিছু নাই লই করি পরিহার।
যথা যাই তথায় গৌরব মাত্র সার।"

কবি কৃত্তিবাসের মনের কামনা সার্থক হয়েছে। পাঁচশো বছর ধরে কৃত্তিবাসী রামায়ণ বাংলার আর বাঙ্গালীর অতিপ্রিয় হয়ে রয়েছে এবং যুগ যুগান্তর ধরে থাকবে।

শিশুসাথীর দপ্তর

টুকরো ছবি—অনিত ভট্টাচার্য। তোমার কবিতার হাত ভাল। গল্প কবিতা লেখার ঢংটি তুমি বেশ আয়ত্ত করে নিয়েছ দেখে খুশী হলুম।

আকাশে মেঘ ভাসছে মৃদু হাওয়ায়
ছোট্ট চায়ের দোকানটার ঐ দাওয়ায়
রঙ ওঠা এক বেঞ্চি পাতা আছে
এক পা তাহার উধাও কোথা
নেইক ধারে কাছে।

এলো ঋতুরাজ—শ্রীশক্তিপ্রসাদ পণ্ডা। তোমার ছন্দের জ্ঞান ভালই; তবে পর পর 'ভজন' 'কানন' 'বন' 'শিহরণ' এতগুলি 'ন' কারের মিল দিলে শুনতে খুব ভাল লাগে কি? ছোট কবিতায় পর পর একই ধরনের মিল যেন না বসে সেদিকে লক্ষ্য রেখ। কয়েক ছত্র তুলে দিলুম।

আম বনে ওঠে মুকুলের বাস, বিহগেরা নীড়ে গাহিছে ভজন
দোল দেয় প্রাণে দখিনা বাতাস। শিখীর কূজনে মুখর কানন।

এগারই জ্যৈষ্ঠ—রমেন্দ্রকুমার দে। নজরুল সম্বন্ধে তোমার লেখা প্রবন্ধটি সরস ও সুখপাঠ্য হয়েছে। নজরুলের বিদ্রোহী মনটি যেমন তোমার দৃষ্টিতে ধরা পড়েছে, তেমনি তাঁর শিশুচিত্তহারা মনটিও তোমার দৃষ্টি এড়িয়ে যেতে পারেনি। সেদিক থেকে তোমার প্রবন্ধটি পড়ে খুশী হলুম। তুমি প্রবন্ধের একস্থানে পূর্ব-পাকিস্তানের উল্লেখ করে তার সমালোচনা করেছ। এর ত কোন প্রয়োজন নেই। নিষ্ঠার সংগে কবি নজরুলকে স্মরণ করলেই তোমার উদ্দেশ্য পূর্ণ হতো।

আষাঢ়—শেখ আনিসুর রহমান। তোমার কবিতাটির ভেতর বর্ষাঝরা দিনের একটি স্নিগ্ধ ছবি পাওয়া যায়। রিম্ ঝিম্, রিম্ ঝিম্ করে অবিরল ধারায় সারাদিন বর্ষার জল ঝরে পড়ছে। চারদিক বেশ স্নিগ্ধ ও ঠাণ্ডা হয়ে উঠেছে। কৃষাণেরা মাঠে চলেছে, যেমন করে চিরকাল চলে বর্ষার ধারাপাতের সংগে সংগে। বেশ হয়েছে ছবিটি। তবে ভাই, তোমার লেখার সরলতা যত বেশী খুশী করেছে, চরণের গরমিল তত বেশী পীড়া দিয়েছে। 'ঝিম্' এর সংগে 'দিন' কিংবা 'টিরে' এর সংগে 'ঝরে' এসব মিল একেবারে অচল।

পরী রাণীর খেয়াল—শ্রীভূদেবচন্দ্র ঘোষ। ইংরেজি থেকে বাংলায় অনুবাদটি ভালই হয়েছে। ইংরেজিতে কবিতাটি যেমন সহজ সুন্দর, বাংলা অনুবাদেও সেই ধারাটি বজায় আছে দেখে খুশী হলুম।

পরী রাণী গিয়া আনিল কিনিয়া
বাজারে একটি মীন
স্ফটিক আধারে রাখিয়া তাহারে
শোভা হেরে সারাদিন।

গৃহপাশ দিয়া হেলিয়া দুলিয়া
ছোট নদী বহে যায়
আঁধার আসিলে তটিনী সলিলে
ছাড়িয়া দিল সে তায়।

সন্ধ্যা—শ্রীপ্রাণগোপাল দালাল। সন্ধ্যার একটি ছায়া কবিতাটির মাঝে পড়েছে। সেদিক থেকে কবিতাটি সুখপাঠ্য। তবে কবিতার অনেক জায়গায় কাঁচা অপটু হাতের ছাপ এখনও রয়েছে।

আমাদের শিপ্রা—প্রতিমা চক্রবর্তী। শিপ্রাকে হারিয়ে তুমি যতখানি ব্যথা পেয়েছ, আমিও ঠিক ততখানি ব্যথা পাচ্ছি তোমার লেখার ভেতর দিয়ে শিপ্রার কথা জানতে পেরে। তবে ভাই, তোমার রচনাটিতে সাহিত্য-সৃষ্টি হয়নি, কেবল ভালবাসার পাত্রীকে হারাণর কথাটা চিঠির আকারে জানিয়ে গিয়েছ।'

নেতাজী—বিশ্বনাথ গুপ্ত। কবিতার বিষয়বস্তুটি যে ভাবে সাজিয়েছ, তা ভালই হয়েছে। তবে কবিতা লিখায় এখনও ভাই তোমার হাত কাঁচা। মিলের দিকে লক্ষ্য রেখে লিখে যাও। চেষ্টা ও সাধনা থাকলে একদিন সিদ্ধিলাভ করবে। —মধুকর

কৃষকের প্রতি

শ্রীঅনন্তকুমার ভট্টাচার্য্য (১০০৬০)

বন্ধু, তোমার ধন্য জীবন,
তোমার জীবন শান্তিময়;
তোমার মুখের পানে চেয়ে
ভুল্‌ছে মানব মৃত্যুভয়।
কি বরষায়, কি আতপে
করছ কঠোর পরিশ্রম,
তাহার প্রমাণ দিচ্ছে সদা
শ্রেষ্ঠ ফসল ধান্য-গম।
যখন বায়ুর নিঃশ্বাসেতে
ধান উঠে ভাই দুলে দুলে,
তখন তোমার আনন্দেতে
বুক যে উঠে ফুলে ফুলে।

উত্তরে মেঘ ঘনিয়ে আসে,—
চতুর্দ্দিক হয় অন্ধকার,
চক্ষু তোমার ক্ষেতের পানে
উন্মোচিয়া কুটীর-দ্বার।
বন্ধু, তোমার দুঃখে আমি
জানাব মোর মনের দুখ;
সুখ যদি গো বন্ধু তোমার
তবে যে হয় আমার সুখ।
যাদের কাছে ঘৃণ্য তুমি
ক্ষম তাদের বারংবার;
বন্ধু, তুমিই শ্রেষ্ঠ মানব;
তোমায় আমার নমস্কার।
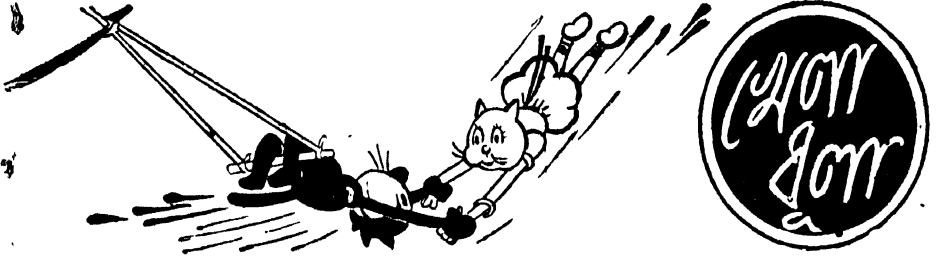
—অষ্টাবক্র—

বৈশাখ জ্যৈষ্ঠের সূর্য্যের প্রখর দীপ্তির মত বাংলার অতিপ্রিয় ফুটবল কলকাতার মাঠে সমারোহ এনে দিয়েছে। প্রত্যহ অপরাহ্লে দলে দলে দর্শক চলেছে এই প্রিয় খেলার অনুষ্ঠান দেখতে। লীগের খেলার প্রথম ধাপ পার হবার সময় এল। এই ধাপেই প্রতিটি দলের শক্তিমত্তার পরিচিতি মাঠের বুকে আঁকা হয়ে যায়। লীগ আরম্ভ হওয়ার বহু আগে থেকেই জোর তোড়জোড়ের কথা শোনা যায়। উত্তর থেকে দক্ষিণ আর পূব থেকে পশ্চিম সব দিক থেকেই পয়সাওয়ালা ক্লাবের কর্ত্তারা খেলোয়াড় যোগাড়ে ব্যস্ত থাকেন। পয়সাও যে না-ঢালেন তা নয়। তবে শেষ পর্য্যন্ত সেই ইষ্টবেঙ্গল আর মোহনবাগান, না হয় বড়জোর রাজস্থান।

ভবানীপুর ও বি-এন-আর প্রথমদিকে ভালভাবে সুরু করেও কয়েকটা খেলার পর যেন ঝিমিয়ে পড়েছে। এরিয়ান্স তার চিরাচরিত রীতি বজায় রেখে চলেছে—একদিন অপ্রত্যাশিত ভাল খেলা খেলে আবার আর একদিন অপ্রত্যাশিত খারাপ খেলা খেলে। নবাগত উয়াড়ী দল প্রথম খেলাতেই জ্বলে উঠে যেন দপ করে নিভে গেছে।

তবে চির প্রতিদ্বন্দ্বী ইষ্টবেঙ্গল আর মোহনবাগানের স্বাভাবিক রূপ যেন দেখা যায়। ইষ্টবেঙ্গল প্রথম থেকেই বিজয়ের সঙ্কল্প নিয়ে অগ্রসর হয়। এ পর্য্যন্ত আটটা খেলার মধ্যে মাত্র দুটাতে ড্র করে বাকী ছ'টাতেই তারা জিতেছে। এই দলটির ফরোয়ার্ডদের অমিত বিক্রমে আক্রমণ ধারা রচনা ও গোল করার দক্ষতা সত্যই প্রশংসনীয়। লীগ-চ্যাম্পিয়ান মোহনবাগান দলের খেলায় ঠিক এই জিনিষটারই অভাব। খেলা তাদের মন্দ না, বিশেষতঃ এই দলের রক্ষণভাগই এদের প্রাণ। কিন্তু মাঝ মাঠের নৈপুণ্য চরম সাফল্যের সার্থকতার রূপ দেবার কৃতিত্বের দাবী এই দলের ফরোয়ার্ডরা করতে পারেন না। তাই এ পর্য্যন্ত দশটি খেলার মধ্যে এ দলটি জিতেছে মাত্র পাঁচটিতে এবং ড্র করেছে বাকী চারটিতে, আর ইষ্টবেঙ্গলের সাথে খেলায় হেরে গিয়েছে। মহমেডান স্পোর্টিং আটটি খেলার মধ্যে দুটিতে জয়ী, তিনটিতে ড্র ও তিনটিতে পরাজিত হয়েছে। তবে তাদের কৃতিত্বের কথা এই যে, ইষ্টবেঙ্গল ও মোহনবাগান উভয় দলের মধ্যেই তারা ড্র করেছে।

নিম্নে ৮ই জুন পর্য্যন্ত খেলার তালিকা দেওয়া হল :—

	খেলা	জিত	ড্র	হার	গোল দিয়েছে	গোল খেয়েছে	পয়েণ্ট
ইষ্টবেঙ্গল	৮	৬	২	০	১২	০	১৪
মোহনবাগান	১০	৫	৪	১	১৬	৫	১৪
কালীঘাট	৯	৪	৪	১	৮	৪	১২
এরিয়ান্স	৯	৩	৪	২	৮	৪	১০
রাজস্থান	৯	৪	১	৪	১২	১২	৯
উয়াড়ী	১০	৩	৩	৪	৫	৮	৯
ভবানীপুর	৯	৩	৩	৩	৫	৯	৯
মহঃ স্পোর্টিং	৮	২	৩	৩	৪	৪	৭
স্পোর্টিং ইউনিয়ান	৮	১	৫	২	৫	৬	৭
বি-এন-আর	৭	৩	১	৩	১০	১৪	৭
জর্জ টেলিগ্রাফ	৯	০	৭	২	২	৬	৭
ই-আই-আর	৬	২	২	২	৮	৭	৬
পুলিস	৭	১	৩	৩	৫	৭	৫
ক্যালঃ গ্যারিসন	৯	০	২	৭	১	১৫	২

ভারতীয় অলিম্পিক ফুটবল দলের শিক্ষা—হেলসিঙ্কি অলিম্পিকে ভারত এবারও ফুটবলে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে। গত লণ্ডন অলিম্পিকে ভারতবর্ষ ফ্রান্সের নিকট পরাজিত হলেও তাদের খেলা দেখে দর্শকেরা উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছে। সেই ভরসাতে এবারও ফুটবল দল পাঠান হচ্ছে। গত ১৮ই এপ্রিল থেকে ৮ই মে পর্য্যন্ত কলকাতাতে নির্ব্বাচিত খেলোয়াড়রা ট্রেনিং নিয়েছে। নির্বাচিত কুড়িজন খেলোয়াড়ের মধ্যে এস-রায় অসুস্থতার জন্য এই অনুশীলনে যোগ দিতে পারেন নি। অধিনায়ক এস-মান্না, সত্তার, আর-গুহ-ঠাকুরতা, চন্দন সিং, আমেদ খাঁন, মেওয়ালাল, বেঙ্কটেশ, বি-এণ্টনী, জে-এণ্টনী, বি-বসু, পি-বি-সালে, এ-লতিফ, এস-সর্বাধিকারী, মইন, নূরমহম্মদ, আজিজ, কে-ভরদ্বাজ, ধনরাজ, যথুখম এই অনুশীলনে যোগ দিয়ে অলিম্পিকের জন্য বিশেষ শিক্ষাগ্রহণ করেছেন। অলিম্পিকের জন্য যে খেলোয়াড়রা হেলসিঙ্কিতে যাবেন, তাঁদের নামের তালিকা দেওয়া হল :—

গোল—ভরদ্বাজ, এণ্টনী। ব্যাক—মান্না, বি-বসু ও আজিজ। হাফব্যাক—লতিফ, এস-সর্বাধিকারী, চন্দন সিং, নূরমহম্মদ ও এস-রায়। ফরোয়ার্ড—বেঙ্কটেশ, আর-গুহ-ঠাকুরতা, মেওয়ালাল, আমেদ, সত্তার, সালে, জে-এণ্টনী, মইন।

আশা করি ভারতীয় দল এবার ফুটবলে ভারতের মুখরক্ষা করবে।

কলকাতায় রণপায়ের ফুটবল—সম্প্রতি কলকাতার খেলার মাঠে এক অভিনব ধরনের ফুটবল খেলা অনুষ্ঠিত হয়। নাগপুরের কল্লি স্কুলের আদিবাসী ছাত্ররা রণপায়ে চড়ে ফুটবল খেলে দর্শকদের আনন্দ পরিবেশন করে। খেলার আগে তারা রণপায়ের সাহায্যে দৌড়, ঝাঁপ, নৃত্যছন্দে

চলা প্রভৃতি নানা কসরৎ দেখায়। অবশ্য বড়দের তুলনায় ছোটদের আনন্দের খোরাকই এতে বেশী। কলকাতায় বহু স্থানে ছেলেমেয়েরা এদের দেখাদেখি রণপায়ে দৌড়-ঝাঁপের চেষ্টা করছে।

ইংলণ্ড সফরে ভারতীয় ক্রিকেট দল—গেল শীতকালে ইংলণ্ডের ক্রিকেট দল ভারতে সফর শেষ করে দেশে ফিরে গেছে। ভারতীয় ক্রিকেট দল ইংলণ্ডে গিয়ে বৃটিশ ক্রিকেট খেলোয়াড়দের সঙ্গে শক্তিপরীক্ষার জন্য এপ্রিলের শেষাশেষি ইংলণ্ড পর্য্যটনে গেছে। এবার ভারতীয় দলটি বেশীর ভাগ তরুণ খেলোয়াড় নিয়েই গঠন করা হয়েছে। সমস্ত মে মাসে তারা ইংলণ্ডের আটটি কাউন্টি ক্লাব ও বিখ্যাত এম-সি-সি দলের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করেছে। তার মধ্যে তারা একবার মাত্র পরাজিত হয়েছে শক্তিশালী সারে দলের কাছে, একটিমাত্র খেলায় জিতেছে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে এবং বাকী খেলাগুলি অমীমাংসিতভাবে শেষ হয়েছে। এই খেলাগুলি সবই তিন দিনব্যাপী ম্যাচ। ৫ই জুন থেকে ভারতীয় দলের ইংলণ্ডের সঙ্গে প্রথম টেষ্ট ম্যাচ খেলা সুরু হয়েছে। অধিনায়ক হাজারে টেষ্ট ম্যাচে টিম গঠন নিয়ে বিপন্ন হয়ে পড়েছেন। তার কারণ, যে ১৭ জন খেলোয়াড় নিয়ে তিনি ইংলণ্ডে গেছেন, তার মধ্যে চার-পাঁচজন আহত হয়ে পড়েছেন। ভারতীয় দলে আছেন—বিজয় হাজারে (অধিনায়ক), হেমু অধিকারী (সহ-অধিনায়ক), ফাদকার, উমরিগড়, গোলাম আমেদ, পি-সেন, এন-চৌধুরী, গোপীনাথ, পি-রায়, রামচাঁদ, সিন্ধে, মন্ত্রী, এইচ-এল-গায়কোয়াড়, ডি-কে-গায়কোয়াড়, সর্বাতে, দিভেচা ও মঞ্জারকার।

ভারতীয় দলের যাত্রা তেমন শুভ হয়নি। যাবার দিন থেকেই ঝড়বৃষ্টি তাদের অনুসরণ করে চলেছে। যাত্রার সময় দমদম বিমান ঘাঁটিতে ঝড়বৃষ্টি, খেলার সময় মাঠে বৃষ্টি—এই ভাবে ভারতীয় দল যেন নাস্তানাবুদ হচ্ছে। এর উপর উইকেট রক্ষক পি-সেন, চৌকস খেলোয়াড় ফাদকার, শ্রেষ্ঠ-স্পিনবোলার আমেদ, পেস-বোলার চৌধুরী, সহ-অধিনায়ক অধিকারী আহত হয়ে পড়েছেন। অধিকারী হয়ত টেষ্টে খেলতে পারবেন, কিন্তু বাকী চারজন টেষ্টে খেলতে পারবেন বলে মনে হয় না। দলের সেরা চৌকস খেলোয়াড় ও নির্ভরশীল বোলারগুলি আহত হয়ে পড়ায় প্রথম টেষ্টের টিম গঠনে হাজারে এত বিব্রত বোধ করছেন। তাই মানকড় যাতে ভারতের হয়ে টেষ্টম্যাচ খেলতে পারেন তার চেষ্টা চলছে।

এদিকে ইংলণ্ডও ভারতের বিরুদ্ধে টেষ্ট খেলার জন্য শক্তিশালী টিম গঠন করেছে। এ পর্য্যন্ত ইংলণ্ডে যা কোন দিন সম্ভব হয়নি পেশাদার খেলোয়াড় লেন হাটনকে অধিনায়ক নির্ব্বাচন করে ইংলণ্ড তা-ই করেছে। এ থেকেই বুঝা যায় ইংলণ্ড ভারতীয় দলের শক্তিকে উপেক্ষার চক্ষে দেখছে না। ইংলণ্ড দলে রয়েছেন হাটন (অধিনায়ক), কম্পটন, পিটার মে, সিমসন, ওয়াটকিন্স, জেঙ্কিংস্, বেডসর, লেকার, ট্রুম্যান, ইভান্স ও গ্রেভনী। ইংলণ্ডের ক্রীড়ামোদী-মহলের অভিমত যুদ্ধোত্তর কালে ইংলণ্ডে এরূপ শক্তিশালী টিম আর হয় নি।

নূতন ধাঁধা

১। পাঁচ অক্ষরে নামটি আমার সবাই আদর করে,
আমার ভিতর কত বীর লড়াই করি মরে।
জরা মৃত্যু নাইক আমার, অমর আমি ভবে,
তিন-পাঁচ বিহনে ভাই, দু'-তিন-পাঁচ হবে।
তিন-চার-পাঁচের ভিতর তোমরা সবাই রও।
বোকা যদি নাহি হও, নামটি আমার কও।

শ্রীঅমরেন্দ্র নাথ রায়

২। নিচের দুটি লাইনে আট জন ইতিহাস-প্রসিদ্ধ ব্যক্তির নাম লুকিয়ে আছে ; সেই লুকানো নামগুলি বাহির কর :—

আজ অজা মসার জীবন সাতার বক্র মানা,
হে মহা শিশো কনক দিবা বিত্যজানু হানা।

শ্রীনির্ম্মলকুমার গঙ্গোপাধ্যায় (কানু)

৩। বলত কি ?—

পেট খেতে বড় স্বাদ, পেট কাটলে পরমাদ ;
আকাশেতে উড়ে যায়, ধরা তারে বড় দায়।

শ্রীসরযূরাণী ধর

দ্রষ্টব্য—তিনটি ধাঁধার উত্তর ঠিক ঠিক হইলে এবং উত্তরগুলি উত্তরদাতার গ্রাহক নম্বর সমেত ১৫ই আষাঢ়ের ভিতর আমাদের হাতে পৌছিলে নাম ছাপা হইবে।

অরুণাভ স্মৃতি-প্রতিযোগিতার ফল

প্রথম পুরস্কার—শ্রীবিশ্বনাথ বিশ্বাস (১০৯৫১)
দ্বিতীয় পুরস্কার—শ্রীঅনিলকুমার গঙ্গোপাধ্যায় (১১৪৮৯)

সম্পাদক—শ্রীআশুতোষ ধর
৫নং বঙ্কিম চাটার্জ্জি ষ্ট্রীট, কলিকাতা, শ্রীনারসিংহ প্রেস হইতে
শ্রীপরেশনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

[প্রথম প্রকাশ—১৩২৯ সাল, ইং ১৯২২]

৩১শ বর্ষ } শ্রাবণ, ১৩৫৯ { ৪র্থ সংখ্যা

বর্ষাশ্রী

শ্রীচিত্তরঞ্জন চক্রবর্ত্তী

আকাশের ঘন মেঘে বরষার কালো রূপ,
জল পড়ে, পাতা নড়ে, ভিজে পাখী রহে চুপ।
মন্থর সমীরণ,
ওঠে নামে বেণুবন,
কদম-কেতকী ঐ পড়ে খ'সে ঝুপ্ ঝুপ্,
আলো-ছায়া খেলা কোথা তরুতলে অপরূপ!

আঁধারেতে ছায় দিক—ছায় বন-উপবন,
ছায়া খেলা সারাবেলা—মসী লেপা ত্রিভুবন।
শিখী নাচে, ভেকে গায়
ঝোপ-ঝাড় আঙিনায়,
দাদুরীর ঘন ডাকে চাতকীর ভিজে মন,
জলে জলে জলাশয়, মাঠ-ঘাট নিমগন।

মাঝিহীন খেয়াতরী দোলে ঢেউ-দোলনায়,
ছিপ্ ফেলে ছাতা মেলে ঐ কেবা ব'সে না'য়!
কৃষাণের ছেলে কৈ
করে পথে হৈ হৈ?
বদ্ধ ঘরের কোণে খেলা নাহি জমে হায়!
সাধ ক'রে খেলা নিতে জল-কাদা পানে চায়।

হেন দিনে মোর মনে শত স্মৃতি খায় দোল,
খেলা ছেড়ে বাতায়ন পাশে চাওয়া অবিরল।
কোথা ঘরে ঠাকু'মার
গল্পের ঝুলি বা'র,
রূপকথা রাজ-রাণী ছোটে কোথা চঞ্চল,
ক্ষণিকের মোহে মোর আজি চিত উতরোল।

ক্যাবলরামের ফ্যাঁসাদ

শ্রীঅনিলেন্দ্র চৌধুরী

আমাদের পাড়ার ক্যাবলরামকে যদি তোমরা না চেনো ত সে দোষ আমার নয়। কারণ তাকে যে সবাই চেনে। আর ঐটুকু হলে হবে কি, এই বয়সেই সে দিব্যি হোমড়া-চোমড়া হয়ে উঠেছে! বয়স?—তা তোমাদেরই বয়সী হবে, কি একটু আধটু ছোট-বড়, সে যাক গে!

কলকাতায় এবার 'এম. সি. সি' টিম ক্রিকেট খেলতে এসেছিল, ক্যাবলরামের আর নাইবার-খাবার সময় ছিল না। কত খবর তাকে জোগাড় করতে হয়, তার কি কিছু ঠিক আছে? কার কত প্যাকেট সিগারেট লাগে রোজ, কার সব ক'টা পকেটেই একটা করে রুমাল থাকে, কে সব সময়েই চকোলেট খাচ্ছে, আর কে দিনরাত খালি হাসে আর গান গায়! এমনিতর আরো সব কত রকম খবর সে ভোর থেকে ঠায় মাঠের ধারে ঘুরে ঘুরে জোগাড় ক'রে রাখে সকলকে একবার শুনিয়ে তাক লাগিয়ে দেবার জন্যে।

শুধু কি এই? বাইরেকার কোন্ ফুটবল টিম কবে কলকাতায় খেলতে এসেছিল, কোন্ প্লেয়ারের ডান পার চেয়ে বাঁ পা আরো ভালো চলে, গোলে সট্ করতে একটু দেরী করার জন্যে 'সেণ্টার ফরওয়ার্ডের' দোষে কোন্ খেলাটা একেবারে মাটি হয়ে গেছল, ক্যাবলরাম তার নাড়ীনক্ষত্র জানে। সভা শোভাযাত্রা হুজুগ মারামারি—যখন যেখানে যা কিছুই হোক, ক্যাবলরামকে পাওয়া যাবে ঠিক সকলের আগে। পণ্ডিত নেহরুর কি করা অন্যায় হয়েছে, আর কি করা উচিত ছিল, এ সে দাদাদের পিছনে থেকে তাদের আলোচনা শুনে মুখস্থ করে ফেলেছে। তাল পেলেই সে গলগল করে বলে গিয়ে সমবয়সীদের কাছে চাল মারতে ছাড়ে না।

সেই ক্যাবলরামই এবার বেজায় ফ্যাঁসাদে পড়েছে। সারা বছরটাই ত সে মাঠে মাঠে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরেছে, খেয়ালই ত ছিল না যে আবার পরীক্ষা আসবে। তাই যেদিন সে টিফিনের আগের ঘণ্টায় ক্লাসে বসে পরীক্ষার পরোয়ানা পেল, একেবারে হাত দিয়ে বসল মাথায়। উপায়? ভাবতে ভাবতে টিফিনটাই কোথা দিয়ে কেটে গেল হদিশ পেল না। পরীক্ষাটাকে কোন দিনও দু'চক্ষে দেখতে পারে না ক্যাবলরাম, এটা কেন যে আছে তার কোন মানেও খুঁজে পায় না সে।

বিকেলে বাড়ী আসতে তার মা মুখ দেখে 'কি হয়েছে' জিজ্ঞাসা করেও কোন উত্তর না পেয়ে অবাক হয়ে গেলেন, এবং আরও অবাক হলেন যখন দেখলেন একবারও বলবার আগেই সুবোধ বালকের মত ক্যাবলরাম পড়ার টেবিলে সন্ধ্যার আগেই এসে বসল!

পড়ার টেবিলে মাথায় হাত দিয়ে বসে আছে ক্যাবলরাম। সামনে থরে থরে সাজানো বইয়ের রাশ? মুখের অবস্থাটা কি রকম জানো?—খুব অসুখ করলে তেঁতো ওষুধ খেতে দুষ্টু ছেলেদের মুখের অবস্থাটা যে রকম হয়, ঠিক তেমনি। এই এতগুলো বই, কোনটা সে কোনও দিনও ছোঁয়নি পর্য্যন্ত। এখন কোন্‌টা যে আগে পড়ে, সেই চিন্তায়ই আকুল হয়ে উঠল সে। তা'ছাড়া ওর মনে একটা মজার ধারণা আছে যে, অঙ্ক ছেড়ে আগে ইংরেজী পড়লে অঙ্ক রাগ করবে, আবার বাংলা ছেড়ে আগে স্বাস্থ্য পড়লে বাংলা যাবে চটে। এখন কাকে সে খুসী করে, আর কাকে বা চটায়, এ ভেবে দিশাহীরা হয়ে উঠল। এখন উপায় কি? একটু একটু করে এদিকে রাতও বেড়ে উঠছে, বাইরেটা চারদিক অন্ধকার ভরা। সমস্ত বইগুলো একবার নামাচ্ছে, আবার তুলে রাখছে; কোনটারও পাতা খোলা হ'ল না এখন পর্য্যন্ত। এদিকে ঘুমও আসছে একটু একটু......

...হঠাৎ ভারী জুতোর খট্‌-খট্‌ আওয়াজে ক্যাবলরামের তন্দ্রা যেন ছুটে গেল। পিছু ফিরতেই দেখে প্যান্ট-কোট পরা, গলায় টাই আটা এক পুরোদস্তুর সাহেব একেবারে গট্‌-গট্‌ করে তার সামনে হাজির। এসেই সে ইংরেজীতে হট্‌মট্‌ করে যে কি বললে, ক্যাবলরাম তার বিন্দুবিসর্গও বুঝলে না। হক্‌চকিয়ে গিয়ে সে শুধু ফ্যালফ্যালিয়ে চেয়ে রইল। সাহেব চুরুট-মুখেই এবার বিকট চিৎকার করে উঠল, সে ভয়ে ভয়ে আস্তে আস্তে বললে, 'কিছু ত বুঝতে পারছি না সাহেব, বাংলায় বল।'

সাহেব এবার মহা খুসী হয়ে মুখ থেকে চুরুটটা নামিয়ে ভাঙা বাংলায় কেটে কেটে বল্লে, 'ইয়েস্‌, হামার চৌদ্দ পুরুষ থেকে হামি বাংলা দেশে আছে, বাংলা কোথা কিছু কিছু বলতে জানে।'

ক্যাবলরাম এবার একটু নিঃশ্বাস নিয়ে বলে, 'তাই তাড়াতাড়ি বল সাহেব, কি জন্যে এখানে এসেছ! দেখছ না, আমায় কত বই পড়তে হবে এখন?'

সাহেব উত্তর দেয়, 'হামি তো ঐ জন্যেই এখানে এসেছে। কত বোছোর ধরে হামারা টোমাদের রাজা ছিলুম; হামাদের ভাষা টোমাদের রাজভাষা ছিল, হামাদের বই আগে পোড়ে তোবে অন্য বই পোড়তে, আর আজ কিনা ভাবছে কোন্‌ বই আগে পড়বে?'

এতক্ষণে ক্যাবলরাম তাকে চিন্‌লে। ভাল ক'রে দেখলে তার বুকে একটা লেবেল-আঁটা 'New India Primer'—তারই ইংরেজী বইটার নাম। চেহারাটাও অবিকল মলাটের ছবির মত। একটু সাহস পেয়ে ক্যাবলরাম বলে, 'কিন্তু আজ ত আর আমাদের রাজভাষা ইংরেজী নয়।'

সাহেব এবার বুট ঠুকে চেঁচিয়ে-মেচিয়ে কেলেঙ্কারী বাঁধিয়ে তুলল,—'ও কথা হামি শুন্‌তে চায় না। হামরা না থাক্‌লে টোমরা কিছু শিখতে পারতে? হামাদের ভাষায় ফেল হোলে 'এক্‌জামিনেশনে' পাশই করতে পাবে না। সারা বছর টুমি হামায় একবারও ছোঁয়নি, হামি বড় চোটে আছে! হামায় যদি আগে না পড় ত দেখাবে মজা।'

সাহেবের বিকট চীৎকার আর দড়াদ্দম বুট-ঠোকার আওয়াজে একেবারে সিঁটিয়ে উঠল ক্যাবলরাম। ভয়ে ভয়ে সে হাত বাড়িয়ে ইংরেজী বইখানা সামনে টেনে নিলে; আর তাই দেখে সাহেবও খুসী হয়ে চুরুটটা মুখে লাগিয়ে তেমনিই গট্‌মট্‌ করে বেরিয়ে গেল।

ইংরেজী বইটা তখনও খোলা হয়নি ভাল করে, বসে বসে ভাবছে কি করা যায়। এমন সময় চটাং-পটাং চটীর আওয়াজে মুখ তুলে দেখে ধুতি-পাঞ্জাবী পরা দিব্যি চাদর কাঁধে এক পণ্ডিত মশাই! এসেই মুখ লাল করে বললেন, 'ঐ বিধর্ম্মীটা বলে গেল বলেই তুমি আগে ইংরেজী ধরলে ছোকরা? তোমাদের কি এতদিনেও জ্ঞান হ'ল না? এতদিন ইংরেজরা থাকতে যা করেছ করেছো, আজও

তাই করতে যাও তুমি কোন্ লজ্জায়? জানো', আজ বাংলাতেই বেশী ছেলেমেয়ে ফেল্ করে? এমনি করলে যে বাংলাভাষা একেবারে উঠে যাবে, সে খেয়াল নেই?—নাও, নাও আগে বাংলা ধর। ছি ছি ছি ছি—তোমরা কি?'

পণ্ডিত মশাইয়ের চটাং-পটাং চটীর শব্দ একটু একটু মিলিয়ে যেতেই ক্যাবলরাম আরো ফাঁপরে পড়ল। তার চোখের সামনে তখনও সাহেবের লাল চোখের কটমটানি ও দড়াদ্দম বুট ঠোকার আওয়াজ ভাসছে। পণ্ডিত মশাই যা বলে গেলেন তাও ত মিথ্যে নয়, কিন্তু সাহেব যা কাণ্ডটা করে গেল, তাকেও উড়িয়ে দেবার ভরসা কই?—কি জানি কখন কি করে বসবে—ওরা সব পারে! ক্যাবলরাম মহা মুস্কিলে পড়ে গেল! এই ঠাণ্ডার দিনেও কপালে ফোঁটা ফোঁটা ঘাম দেখা দিল। এর চেয়ে মোহনবাগান-ইষ্টবেঙ্গলের ফাইনাল খেলার টিকিট যোগাড় করা অনেক সোজা! ইংরেজী

বইটাও সরিয়ে রাখতে হাত উঠছে না, আবার বাংলাটাও পেড়ে বসল। কিন্তু আগে আরম্ভ করে কোন্‌টা ?—ফোঁটা ফোঁটা ঘাম এবার ঝর-ঝর করে ঝরতে লাগল, কিন্তু কোনই কিনারা হ'ল না।

হঠাৎ ঠুক্‌-ঠুক্‌ লাঠির আওয়াজ পেতেই সে কপালের ঘাম মুছে পেছন ফিরল। দ্যাখে, দড়ি-বাঁধা চশমা চোখে এক থুথ্‌ড়ে বুড়ো আস্তে আস্তে লাঠি ঠুকে ঠুকে এগিয়ে আসছে। তার গায়ে একটা নামাবলী জড়ানো, আর তাতে ১, ২, ৩, ৪ এমনি সব অঙ্কের অক্ষর লেখা। ক্যাবলরামকে ফিরতে দেখে বুড়ো বল্লে, 'মিথ্যে তুমি ভাবছ বাবা, ও ইংরিজীই বল আর বাংলাই বল কোনটাই কিছু না, আমিই সব। আমাকে তোমরা সবাই ভয় করে দূরে সরিয়ে রেখে দাও বলেই ত অঙ্কে সব ফেল কর। আমি বুড়ো হয়েছি বটে, কিন্তু ছেলেদের আমি খুব ভালবাসি। তোমরা ত আর তা বিশ্বাস করবে না! ভাব, বুড়োর ঝুলির মধ্যে না জানি কত ভয়ের ব্যাপার আছে! আমি বুড়ো হয়েছি, তাই বেশী চেঁচাতে পারিনে। তা না হ'লে সবাইকে চেঁচিয়ে বুঝিয়ে দিতুম, আমার এই ঝুলিতে কত মজার মজার খেলা আছে। যতই শিখবে ততই আনন্দ।'

ক্যাবলরাম এতক্ষণে একটু সাহস পেয়ে আস্তে আস্তে বলে, 'কিন্তু অঙ্কটা যে আমার কিছুতেই মাথায় ঢোকে না, সব যেন কেমন গোলমাল হয়ে যায়! আর, তা'ছাড়া ওটাকে সব্বাই বড় ভয় করে, তাই আমিও আর ওপাশে ঘেঁষি না।'

এবার অঙ্কবুড়ো বেজায় চটে হাতের লাঠিটা ঠক্‌-ঠক্‌ করে মেঝেয় ঠুকতে লাগল। প্রাণপণে গলার শির ফুলিয়ে রীতিমত হৈ-চৈ লাগিয়ে দিলে,—'ঐ করেই ত সব উচ্ছন্নে গেছ, সারা বছর ত শুধু ফুটবল ক্রিকেট করে কাটাবে, পড়াশুনার কথা ত আর মনে থাকবে না! পরীক্ষার সময় শুধু একবার নাড়াচাড়া করলে ছাই ঢুকবে মাথায়। রেখে দাও ওসব ইংরিজী-বাংলা, আগে অঙ্ক না শিখলে কিছুই হবে না। সবাই ভয় করে—অমনি তোমাকেও ভয় করতে হবে, না? নাও, নাও, ওসব রেখে আগে অঙ্ক নিয়ে বস দেখি, কেমন না বুঝতে পার দেখি!'

বুড়ো যেভাবে লাঠিটা ঠুক্‌তে লাগল, মেরেই দেয় বুঝি ক্যাবলরামের মাথায়। এর চেয়ে ফুটবল-মাঠে পুলিশের ব্যাটন্‌কে অনেক কম ভয় করে সে। কিন্তু আর উপায়ই বা কি? সারা বছর বই না ছুঁয়ে যে সে কি ভুল করেছে, এতদিনে তা হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছে। একদিকে সাহেবের লাল চোখের কট্‌মটানি, তারপর পণ্ডিত মশাইয়ের দাঁত খিঁচুনি, তার ওপর এই অঙ্কবুড়োর লাঠির ঠক্‌ঠকানি,—কোন্‌দিকে সে যায়? একে ফেলে যে ওকে রাখে, সে ভরসাই বা দেবে কে?—নাঃ, আর বুঝি তার পরিত্রাণ নেই! দর-দর করে ঘাম ঝরতে লাগল এই শীতের রাতেও।

হঠাৎ দুম্‌দাম্‌ ধপাংধস্‌ আওয়াজে ক্যাবলরাম চমকে চেয়ে যা' দেখলে, তাতে তার গায়ের রক্ত একেবারে হিম হয়ে গেল। ইয়া চেহারার এক পালোয়ান বেধড়ক দড়াদ্দম্‌ ঘুসি চালাতে চালাতে লাফাতে লাফাতে এগিয়ে আসছে। ওর একটা যদি কোনরকমে ছিট্‌কে এসে ওর নাকে লাগে,

ব্যস্ নাকের দফারফা! সে নাককে আর খুঁজে পাওয়াই যাবে না।—আরে, ও যে এগিয়েই আসে ক্রমশঃ! ভয়ে সিঁটিয়ে ক্যাবলরাম এক পাশে সরে গিয়ে বসে।

কাছে আসতেই কিন্তু সে ভয়ে ভয়ে চিনলে,—আরে, এযে তারই স্বাস্থ্য-বইয়ের মলাটের ছবিটা! উঃ কি দুর্দ্দান্ত পালোয়ান রে বাবা! মনে হচ্ছে পৃথিবীতে যেন সবাইকে ও থোড়াই কেয়ার করে!

ঘরে ঢুকেই বিকট তেজী গলায় পালোয়ান চীৎকার করে ওঠে, 'ওসব অঙ্ক-ফঙ্ক রেখে দাও হে ছোকরা, ওতে কি আর তোমার দেশ উদ্ধার হবে? আগে স্বাস্থ্য, স্বাস্থ্য! বুঝলে?—আগে শরীর ঠিক না রাখলে করবে কি?'

ভয়ে কুঁচকে ক্যাবলরাম ফিস্-ফিস্ স্বরে বলে, 'কিন্তু ইংরেজী, বাংলা, অঙ্ক, কোনটাই যে হয়নি এখনও, আগেই স্বাস্থ্য পড়ব?'

পালোয়ান এবার ঘুঁষি উঁচিয়ে বলে ওঠে, 'আলবৎ! সারা বছর ত মাঠে মাঠে ঘোরো, দেখতে পাও না, আগে শরীর ভাল না হলে কোন খেলাই হয় না? এই ত প্যাঁকাটির মত চেহারা, স্বাস্থ্য ঠিক না থাকলে অন্য বই সব পড়বে কি করে? আগে স্বাস্থ্য, বুঝলে হে ছোক্‌রা, ওসব অঙ্ক-ইংরিজী ফেলে আগে স্বাস্থ্য নিয়ে বোসো, নইলে এই লিক্‌লিকে সিংয়েদের জন্যে দেশটা ত ডুবতে বসেছেই, একেবারে তলিয়ে যাবে। নাও, নাও, লেগে পড়!' বলে পালোয়ান তার হাতটা ধরে বার দুয়েক এমন কড়া ঝাঁকুনি লাগালে যে, মনে হ'ল কব্জি ছিঁড়ে হাতটা একেবারে আলাদা হয়ে খসে গেল। অসহ্য যন্ত্রণায় সে বিকট চীৎকার করে উঠতেই মনে হ'ল কে যেন 'কি হয়েছে' 'কি হয়েছে' বলে ছুটে এল!

* * * *

চোখ খুলতেই দেখে, দিদি তার মাথাটা ধরে বলছে, 'কি হয়েছে, কি হয়েছে রে ক্যাবলা, অমন ষাঁড়ের মত গাঁক্-গাঁক কচ্ছিস কেন? ইস্, ঘামে যে বইগুলো একেবারে ভিজিয়ে দিয়েছিস, বেশ পড়া হচ্ছে ত? নে নে, আর পড়তে হবে না, উঠে আয়! বেশ পড়া হয়েছে, এখন খাবি চল!'

ক্যাবলরাম বার দুয়েক চোখ কচলে মিট্‌মিট্ করে চারদিকে চেয়ে ভাবলে 'নাঃ, তা'হলে ও স্বপ্নই দেখেছে। উঃ! কি সাংঘাতিক স্বপ্ন রে বাবা! এখনও তার চোখে ভাসছে সাহেবের লাল চোখের কট্‌মটানি, পণ্ডিত মশাইয়ের শাসানী আর অঙ্কবুড়োর লাঠির ঠক্‌ঠকানি, শেষটায় পালোয়ানের বেপরোয়া ঘুঁষি আর হাড় মড়মড়ানি! উঃ, যদি সত্যিই হ'ত!—নাঃ, আর ভাবতে পারে না ক্যাবলরাম, সমস্ত বইগুলো গুছিয়ে সে তুলে রেখে দেয়। আর মনে মনে পণ করে, না কাল থেকে আর ফাঁকি নয়। আগে সব বই পড়বে, তার পরে অন্য কাজ। নইলে, স্বপ্ন আর সত্যি হ'তে কতক্ষণ?

কলিকাতা বেতার কেন্দ্রের সৌজন্যে।

তিব্বতে দুঃসাহসী বাঙালী

শ্রীদ্বিজেন্দ্রলাল নাথ

অনেকের মধ্যে একটা ধারণা প্রচলিত আছে যে, বাঙালী চিরদিন ভীরু, কাপুরুষ; কঠোর পরিশ্রম ও দুঃসাহসিক কাজে বাঙালী চিরদিনই পশ্চাৎপদ। আজ এ যুগেরই একজন বাঙালীর জীবন-কাহিনী বর্ণনা করবো—যিনি শ্যামল বাঙলার বুকে জন্মগ্রহণ করেও জ্ঞান-সাধনার উদগ্র পিপাসায় হিমালয়ের দুর্গম পথ অতিক্রম ক'রে রহস্যাবৃত তুষারের দেশ তিব্বতে গিয়ে উপস্থিত হয়েছিলেন। এই দুঃসাহসী বাঙালীর নাম শরৎচন্দ্র দাস।

শরৎচন্দ্র চট্টগ্রামের একটি সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি যখন চট্টগ্রাম কলেজে ছাত্র হিসেবে পড়ছিলেন, তখন থেকেই ভূগোল ও সাহিত্য সম্বন্ধে গবেষণা ব্যাপারে ভবিষ্যৎ উন্নতির পরিচয় দেন। বাঙলা দেশের তৎকালীন শিক্ষা-বিভাগের ডিরেক্টার স্যর আলফ্রেড্ ক্রফ্ট্ এই তরুণ গবেষকের উল্লেখযোগ্য গবেষণার পরিকল্পনা দেখে মুগ্ধ হন এবং তাঁকে তাঁর ভবিষ্যৎ গবেষণা কার্য্যে যথাসম্ভব সাহায্য করবেন ব'লে ভরসা দেন। শরৎচন্দ্র স্যর ক্রফ্টের নিকট তিব্বতে গিয়ে গবেষণা কার্য্য পরিচালনা করবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। স্যর আলফ্রেড্ ক্রফ্ট্ তখন ভারত সরকারের নিকট দরবার করায় শরৎচন্দ্রের তিব্বত গমনের কল্পনা বাস্তবে রূপান্তরিত হয়।

১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে সিকিমের রাজার সহচররূপে উগ্যেন গ্যয়েট্সো (Ugyen-gyatso) নামক একজন লামা দার্জিলিং আসেন। তৎকালীন তিব্বতের রাজপরিবারের সঙ্গে তাঁর কিছু সম্পর্ক ছিল। তিনি পমিয়ঞ্চি নামক বিহারের লামা ও তিব্বতী শিক্ষক ছিলেন। দার্জিলিংএ আসার পর তিনি ভারত গভর্ণমেণ্টের সার্ভে বিভাগের কর্ণেল এইচ. সি. ভি. ট্যানারের তত্ত্বাবধানে সার্ভে শিক্ষা প্রাপ্ত হন। ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে তিনি তাঁহার বিহার থেকে কিছু উপহার নিয়ে সিগট্সির (Shigatse) অন্তর্গত তসিলুন্পো (Tashilunpo) নামক মঠে গমন করেন। তিনি তসি লামার প্রধান মন্ত্রী হ'তে শরৎচন্দ্রের জন্য তিব্বতে প্রবেশ করবার অনুমতিপত্র যোগাড় করেন।

উগ্যেন গ্যয়েট্সোর সঙ্গে শরৎচন্দ্র ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দের ৭ই জুলাই নির্ব্বিঘ্নে তসিলুন্পো-তে পৌছেন। এখানে শরৎচন্দ্র দীর্ঘ ছয়মাস কাল অবস্থান করেন। এ সময়ে তিনি অনেক তিব্বতী গ্রন্থ পাঠ করেন এবং কাঞ্চনজঙ্ঘার উত্তর ও উত্তরপূর্ব্ব দেশসমূহ ভ্রমণ করেন। এই ভ্রমণের ফলে তিনি অনেক তিব্বতী ও সংস্কৃত পুঁথি সংগ্রহ ক'রে আনতে সক্ষম হন।

১৮৮০ সনের প্রায় পুরো বৎসরটাই তিনি তিব্বতের ইতিহাস, ধর্ম্ম ও নৃতত্ত্ব সম্বন্ধে প্রবন্ধ লিখে অতিবাহিত করেন। এ প্রবন্ধগুলি বেঙ্গল এসিয়াটিক সোসাইটির পত্রিকায় এবং ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে তাঁরই প্রতিষ্ঠিত Buddhist Text Societyর পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

এর পরে সুরু হয় শরৎচন্দ্রের জীবনের বৈচিত্র্যময় অধ্যায়। ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে শরৎচন্দ্র একজন লামার ছদ্মবেশে দার্জিলিং ত্যাগ করেন। দার্জিলিংএর কয়েক মাইল উত্তরে খরস্রোতা বড় রঙ্গীত (Great Rangit) নামে একটি পাহাড়ী নদী। শরৎচন্দ্র তিনটি মাত্র শিথিল বংশদণ্ডের ওপর আপন দেহভার রেখে বহু কষ্টে এই খরস্রোতা নদীটি পার হয়েছিলেন। তারপরে তিনি কঙ্গ নামক হিমালয়ের একটি উঁচু শৃঙ্গের উত্তরে কঙ্গ (Kang) নামক গিরিবর্ত্ম অতিক্রম করেন। তসিলুন্‌পো যাবার পথে বাইশ দিনের দিন শরৎচন্দ্রকে যে ভীষণ কষ্টের সম্মুখীন হ'তে হয় তা বর্ণনাতীত। চারদিকে শুধু মৃত্যুর মতই বরফের রাজত্ব, কোথাও খাদ্য বা পানীয় নাই—এ অবস্থায় সমস্ত রাত্র যাপন করা যে কি কষ্টকর ব্যাপার তা আমাদের অনুমান করাও দুঃসাধ্য। পথের মধ্যে তুষারাবৃত ঢালু যায়গা দিয়ে তাঁকে হাত-পা ছেড়ে দিয়ে ছ্যাঁচড়া খেয়ে নীচের দিকে নামতে হয়েছিল। প্রায় এক মাসের উর্দ্ধকাল হাঁটার পরে ৯ই ডিসেম্বর তিনি তসিলুন্‌পো গিয়ে পৌঁছেন।

বিখ্যাত কাঞ্চনজঙ্ঘা অভিযানকারী Mr. F. S. Smytheএর মতে শরৎচন্দ্রের হিমালয় ভ্রমণ একটা দুঃসাহসিক অভিযানের নিদর্শন। তিনি লিখেছেন, "১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে বিখ্যাত 'পণ্ডিত' এস. সি. ডি, সিকিম হ'তে নেপালের পথে কঙ্গলা (Kangla) অতিক্রম করেন, (উচ্চতা ১৬,৩৭৩ ফুট); তারপরে কঙ্গবচেনের (Kangbachen) উপত্যকা পার হয়ে যান; তারপরে যঙ্‌সঙ্গলা (২০,০০০ ফুট), এবং ছোটেন নইমা লা (Choten Nyima La) নামক স্থান অতিক্রম ক'রে শেষ পর্য্যন্ত তিব্বতের তসিলুন্‌পো নামক স্থানে এসে উপস্থিত হন। সেই অঞ্চলের দুঃসাহসিক ভ্রমণের মধ্যে শরৎচন্দ্রের এই ভ্রমণ অন্যতম, এবং তুষারাবৃত গিরিসঙ্কট যঙ্‌সঙ্গলা (Jongsongla) অতিক্রম একটা বিরাট কৃতিত্বের নিদর্শন।"

শরৎচন্দ্র দ্বিতীয়বার যখন তসিলুন্‌পো পরিদর্শন করতে যান, তখন তিনি ব্রহ্মপুত্রের উত্তর-পশ্চিমে শক্য (Sakya) নামক বিখ্যাত বৌদ্ধমঠ দর্শন করেন। এই বৌদ্ধমঠটি রহস্যাবৃত তিব্বতের পশ্চিমতম প্রান্তের নিকট অবস্থিত। এই বৌদ্ধমঠে বহু প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃত গ্রন্থ রক্ষিত ছিল। সুদূর তিব্বতের এক প্রান্তে একটি বৌদ্ধমঠের ভেতর এ সমস্ত অমূল্য সংস্কৃত গ্রন্থ দেখে শরৎচন্দ্র বিস্মিত হন। এ সমস্ত গ্রন্থ বহুদিন পর্য্যন্ত তাদের জন্মভূমি ভারতবর্ষ হ'তে লুপ্ত হয়েছিল। শরৎচন্দ্র সেখান হ'তে আসবার সময় অনেক সংস্কৃত গ্রন্থ এই মঠ হ'তে নিয়ে আসেন।

এর পরে আরম্ভ হয় শরৎচন্দ্রের তিব্বত ভ্রমণের দ্বিতীয় অধ্যায়। দ্বিতীয়বার তিব্বত ভ্রমণ কালে শরৎচন্দ্র বিখ্যাত স্করপিয়ন হ্রদ (Scorpion Lake) ও যমদোট্‌সো নামক হ্রদের মাপ নেন। এই হ্রদের যথাযথ বিস্তৃতি সহ অবয়ব নির্ণয় শরৎচন্দ্রের একটা বিখ্যাত ভৌগলিক আবিষ্কার। এই হ্রদকে পল্‌তি হ্রদও (Lake Palti) বলা হয়। স্যর আলফ্রেড ক্রফ্‌টের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করবার জন্য তিনি এই হ্রদের নাম রাখেন Yamdo Croft. স্যর আলফ্রেড্‌ এই আবিষ্কারের গুরুত্ব উপলব্ধি করে হ্রদটিকে পুনরায় জরিপ করবার জন্য উগ্যেন গ্যয়েট্‌সোকে পাঠান। বলা

বাহুল্য, এ জরিপের ফলও শরৎচন্দ্রের অনুরূপই হলো। এতে শরৎচন্দ্রের কৃতিত্ব আরো বেশী ক'রে সপ্রমাণ হলো।

শরৎচন্দ্রকে ভারত গভর্ণমেণ্টের গুপ্তচর ব'লে সন্দেহ হওয়ায় লাশায় থাকতে তাঁকে সেই রহস্যময় নগরীর অনেক উল্লেখযোগ্য স্থান ঘুরে দেখতে দেওয়া হয়নি।

১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে ভারত গভর্ণমেণ্ট তিব্বতে একটি দৌত্য (mission) প্রেরণ করতে সিদ্ধান্ত করেন। এই দৌত্যের যথারীতি সনদ লাভের জন্য Hon. Colman Macaulay পেকিংয়ে প্রেরিত হন। শরৎচন্দ্রও এ সময়ে ছয়মাস কাল তাঁর সঙ্গে চীনে বাস করেন। এ সময়ের মধ্যে তিনি মেকলেকে তাঁর বিভিন্ন কাজে যে সাহায্য করেন তা খুবই উল্লেখযোগ্য। ফলে বাংলা দেশে ফিরবার পর সরকার তাঁকে রায় বাহাদুর ও সি. আই. ই উপাধিতে ভূষিত করেন। কিছুকাল পরে ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে The Royal Geographical Society তাঁর বিখ্যাত ভৌগোলিক আবিষ্কারের জন্য তাঁকে সম্মান করেন। দুঃসাহসী শরৎচন্দ্র তিব্বতের যে সমস্ত দুর্গম পার্ব্বত্য অঞ্চলে ভ্রমণ করেন, তাঁর পূর্ব্বে ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে নৈন সিং এবং ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে কিসেন সিং ছাড়া আর কেউ সে সমস্ত অঞ্চলে ভ্রমণ করেন নি।

তিব্বতে অবস্থান কালে শরৎচন্দ্র তিব্বতী ভাষায় বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। তাঁর এই ভাষাজ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায় তাঁর রচিত বিখ্যাত গ্রন্থ তিব্বতী-ইংরাজী অভিধানে (Tibetan-English Dictionary)। তিব্বতী ভাষা সম্বন্ধে এত বড় অভিধান আর বেশী দেখা যায় না। এই বিরাটায়তন গ্রন্থখানি শরৎচন্দ্রের গভীর পাণ্ডিত্য ও অসাধারণ ধৈর্য্যের পরিচায়ক। তিব্বতী ভাষায় যে সমস্ত পণ্ডিত গবেষণাকার্য্য পরিচালনা করেন, তাঁদের নিকট এ অভিধানখানির প্রয়োজন অপরিহার্য্য।

বিখ্যাত আমেরিকান পণ্ডিত উইলিয়ম উড্‌ভাইল রকহিল (William Woodville Rockhill) এ দেশীয় তিব্বত-অভিযানকারীদের একজন পক্ষপাতহীন সমালোচক। শরৎচন্দ্রের বিখ্যাত আবিষ্কারের মূল্য উপলব্ধি ক'রে তিনি লিখেছিলেন—'তিব্বত-অভিযানকারী ও আবিষ্কর্ত্তাদের মধ্যে যাঁরা প্রথম ও প্রধান, শরৎচন্দ্র তাঁদের মধ্যে অন্যতম। যোগ্যতার দিক দিয়ে তিনি বিখ্যাত পণ্ডিত চোমা ডি করোসের (Cosma de Koros) পার্শ্বে স্থান দাবী করতে পারেন; পণ্ডিত হিসেবে তিনি যাতে তাঁর উপযুক্ত স্থান পেতে পারেন সে চেষ্টা আমি করবো।'

শরৎচন্দ্র প্রথমবার যখন তিব্বতে যান, তখন তাঁর পত্নী তাঁর সঙ্গে গিয়েছিলেন। কিন্তু সেবারে শুধুমাত্র ভ্রমণ ছাড়া তিনি আর বিশেষ কোন কাজ করতে পারেন নি। সেবার তিনি ভূটান পর্য্যন্ত প্রবেশ করেছিলেন বটে, কিন্তু অনেক স্থানে নিগৃহীত হয়ে আবার তাকে লাসায় ফিরে আসতে হয়। লাসায় তার নোট-বইগুলো পুড়িয়ে দেওয়া হয়, তাঁর জরিপের যন্ত্রপাতিগুলো কোন মতে লুকিয়ে রাখতে সক্ষম হয়েছিলেন। তাকে লাসায় ঢুকবার অনুমতি দেয়া হয়েছিল বটে, কিন্তু দার্জিলিংএর

একজন কুলী তাঁকে চিনে ফেলায় একজন চীনা সৈন্যের বাড়ীতে গিয়ে তাকে কোন মতে প্রাণরক্ষা করতে হয়েছিল। এতেও কিন্তু শরৎচন্দ্রের দুর্ভাগ্যের শেষ হলো না। তিনি তিব্বত ত্যাগ করবার পরেই একথা কানাঘুষা হতে লাগলো যে, শরৎচন্দ্র বে-আইনি ভাবেই তিব্বতে প্রবেশ করেছিলেন এবং তিব্বত হ'তে বেরিয়ে গিয়েছিলেন। এ কথা জানতে পেরে—তিব্বতী গভর্ণমেণ্ট তখনই তাঁর সমস্ত সঙ্গীকে কারাগারে নিক্ষেপ করলেন। তাঁর জন্য পাশপোর্ট সংগ্রহকারী তসিলুনপোর প্রধান মন্ত্রী, তাঁর একজন আশ্রয়দাতা, এবং তসিলুনপোতে বসবাস করবার সময় শরৎচন্দ্রের শিক্ষক প্রধান লামা সেঙ্গচেন ডোরজেছেন (Sengchen Dargechen) এরা সকলেই শরৎচন্দ্রকে সাহায্য করবার অভিযোগে কারারুদ্ধ হলেন। লামা ডোরজেছেন শুধু যে তৎকালীন তিব্বতের ধর্ম্মগুরু তসিলামার শিক্ষক ছিলেন তা নয়, তিনি তিব্বতের সমস্ত বৌদ্ধধর্ম্মের স্তম্ভস্বরূপ ছিলেন। তিনি অগাধ পাণ্ডিত্যের অধিকারী এবং একজন ধর্ম্মপ্রাণ ব্যক্তি ছিলেন। কিন্তু তিব্বতী সরকার তাঁকেও রেহাই দিলো না। একজন বিদেশী দূতের কাছে জাতীয় গোপন তথ্য ফাঁস ক'রে দেবার জন্য তাঁকে অভিযুক্ত করা হলো। বিচারে দোষী সাব্যস্ত হলে তার জন্য যে শাস্তির ব্যবস্থা হলো তা অত্যন্ত মর্ম্মান্তিক। এই ধর্ম্মপ্রাণ পুরোহিতের দেহকে একটা বড় পাথরের সঙ্গে বেঁধে খরস্রোতা সেনপো (Sanpo) নামক নদীতে নামিয়ে দেয়া হলো। তারপর কতক্ষণ পরে তাঁকে উপরে টেনে তোলা হলে হত্যাকারীরা বিস্ময়ের সঙ্গে দেখলো যে, তাঁর দেহ হতে তাপ বা প্রাণ বেরিয়ে যায় নি। তারপর দ্বিতীয় বারেও তাকে এমনি ভাবে আবার জলে ডুবিয়ে দেয়া হলো; কিন্তু এবারেও তাঁর জীবন নাশ হলো না। হত্যাকারীরা তখন ভীষণ ভয় পেয়ে আর বেশীদূর অগ্রসর হতে সাহস করলো না। কিন্তু সেখানে সমবেত অসংখ্য লোককে বিস্ময়ে অবাক করে দিয়ে লামা শেষে নিজেই ব'লে উঠলেন—'আমার মৃত্যুর জন্য দুঃখ করে কোন লাভ নেই। আমার কাজ শেষ হয়েছে, এখন আমাকে যেতেই হবে। তোমরা তাড়াতাড়ি করে আমাকে জলের মধ্যে ডুবিয়ে দাও। আমি যখন ইহলোকে থাকবো না, তখনও যেন বৌদ্ধধর্ম্ম তিব্বতে অব্যাহত গতিতে উন্নতির পথে এগিয়ে যায়।' পরে লামার আশ্চর্য্যজনক মৃত্যু এই মর্ম্মান্তিক দৃশ্যের ওপর যবনিকাপাত করে।

Edmund Candler এর Unveiling of Lasha নামক গ্রন্থ পড়লে জানা যায়, ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে ডংষ্টের (Dongste) নিকটবর্ত্তী ফল্লা (Phalla) নামক ষ্টেটের একজন নায়েব শরৎচন্দ্রের প্রতি আতিথ্য প্রদর্শন করেছিলেন বলে তাঁর ওপরও অকথ্য নির্য্যাতন করা হয়।

এই অসমসাহসিক বাঙালী পণ্ডিত ও ভ্রমণকারী নানা বিচিত্র ঘটনার মধ্য দিয়ে এভাবে তাঁর তিব্বত ভ্রমণ শেষ করেন। আজ তাঁর দেহ পঞ্চভূতে বিলীন হ'য়ে গেছে বটে, কিন্তু প্রবল জ্ঞানান্বেষী ভ্রমণকারী হিসেবে তিনি যে আদর্শ রেখে গেছেন, তা প্রত্যেক দুঃসাহসী জ্ঞানপিপাসুর চিত্তে চিরন্তনভাবে শক্তি ও সাহসের সঞ্চার করবে।

শ্রীদুর্গামোহন মুখোপাধ্যায়

ডাকাতের দয়া

অন্ধকার রাত্তির।

বিশে ডাকাত দশ-এগারো জন সাগরেদ নিয়ে ফিরে আসছে ঝিকারগাছার মস্ত ধনী পোদ্দারের গদী লুট ক'রে।

অনেকগুলি গ্রাম পার হয়ে তাদের আসতে হবে নিজেদের আস্তানায়, কিন্তু গাঁয়ের ভেতরের পথ তারা ইচ্ছা ক'রেই ছেড়ে দিয়েছে, চলেছে গাঁয়ের বাইরে মাঠের মধ্য দিয়ে রণ-পায় ক'রে। এখনও চার ক্রোশ পথ চলতে হবে, তবে তারা হবে নিরাপদ।

তোমরা খুব সম্ভব রণ পা কথাটা শুনেছ, অনেকেই দেখনি এই বস্তুটি কি। খুব মোটা লাঠির মতো সরু খুব পাকা বাঁশের একটা খুব লম্বা টুক্‌রা মনে কর। এই বাঁশের টুক্‌রোটি দাঁড় করালে উঁচু হয় একতলারও বেশী। বাঁশটি বেশ চাঁছা-ছোলা, কিন্তু গোড়া থেকে দু' হাত কি তিন হাত ওপরের গাঁটটি রেখে দেওয়া হয়। দু' পায়ের জন্য একই মাপের এই রকম দুটি লাঠির ওপর পা রেখে ডগার দিক দু' হাতে শক্ত ক'রে ধ'রে ব্যালান্‌স্ রেখে একটা লোক দাঁড়ালে লোকটি অনেকখানি উঁচু হবে তো! এই অবস্থায় সে যদি চলে তা'হলে চলাটা কি রকম হবে? মাটিতে পা ফেলে চললে যতটা দূরে দূরে পা পড়বে, এই ভাবে চললে তার চেয়ে ঢের দূরে দূরে পা পড়বে। আমাদের পা যদি ডবল বা তিনগুণ বেশী লম্বা হয় তা'হলে আমরা যে সময়ে যতটা দূর গিয়ে থাকি তার ডবল বা তিনগুণ পথ সেই সময়ের মধ্যে অনায়াসেই যেতে পারি। বাঁশের গাঁটের ওপর দাঁড়াবার ফলে পা তো ঢের বেশী লম্বা হয়ে যায়। পা যতটা লম্বা হবে তত দূরে দূরে পা পড়বে। এই যে গাঁট-রাখা চলবার বাঁশ একেই বলে রণ-পা।

রণ-পা ডাকাতেরা ব্যবহার করত যখন বিশেষ প্রয়োজন হ'ত। হয়তো ডাকাতি করতে গেছে কুড়ি-পঁচিশ মাইল দূরে, এতটা পথ চ'লে আসতে হলে রাত্তিরে কুলোয় না, ভোর হয়ে যায়। অন্ধকার গাঢ় থাকতেই তো নিজেদের আস্তানায় ফিরে আসা চাই। খুব জোরে চললেও যে সময়ের মধ্যে পাঁচ মাইল পথ যেতে পারে, সেই সময়ের মধ্যেই খুব কম পক্ষেও দশ-বারো মাইল পথ যেতে পারে ঢের অল্প আয়াসে। তখনকার দিনে এই জন্যেই ডাকাতদের রণ-পা চালাবার অভ্যেস ছিল খুব বেশী। দ্রুত চলা এবং সংগে সংগে অনেক দূর অবধি দেখতে পাওয়াই ছিল এর বিশেষ সুবিধা।

পাশাপাশি অসংখ্য বড় বড় গাছে ঘেরা গ্রামগুলি সব ডান দিকে রেখে বিশে ডাকাত সদলবলে চ'লে এসেছে আরো দু' ক্রোশ। এইখানেই একটু দূরে একটা বাড়ীতে কয়েকটা বড় বড় লণ্ঠন জ্বলছে, অনেক লোকজনের কথাবার্তাও শোনা যাচ্ছে।

হঠাৎ বিশে থামে সেখানে।

তার ঠিক পেছনে ভীমের মতো চেহারার যে লোকটি ছিল সে বললে—"ওটা বোধ হয় বিয়ে বাড়ী, তাই অত সোরগোল।"

"বিয়ের বাড়ী বটে, কিন্তু কান্না শুনতে পাচ্ছি কেন রে? দাঁড়িয়ে শোন্ দেখি।" বলে বিশে তার দলের লোকদের।

দলের সকলেই বললে—"হাঁ, কান্নাই বটে।"

"এক কাজ কর্ দেখি নি। একজন এগিয়ে গিয়ে জেনে আয় না ব্যাপারটা কি?"

লোক একজন যায় খবর আনতে। একটু পরেই সে দৌড়ে এসে খবর দিলে,—"বিয়ের বাড়ী বটে, কিন্তু বিয়ে ভেঙে গেছে। কত কষ্ট ক'রে ভদ্দর লোক মেয়ের বিয়ের ব্যবস্থা করেছিল, সবই পণ্ড গেল।"

"কেন?" জিজ্ঞেস করে বিশে।

বরের বাপের দাবীর সব টাকা মেয়ের বাপ আজ মিটিয়ে দিতে পারেনি। কত কেঁদেকেটে পা জড়িয়ে ধরেছে, তাতেও বুড়োর মন গলেনি। ছেলে আর বরযাত্রী নিয়ে চলে গেছে।"

একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছেড়ে বিশে বলে, "এরাই নাকি ভদ্দর লোক, আর আমরা ডাকাত! এরা চামার, আমাদেরও অধম। আয় দেখি আমার সংগে চামারটাকে ধরতে পারি কিনা।"

যমদূতের মতো এই ডাকাতের দল গিয়ে ওঠে বিয়ের বাড়ী। বাড়ীর লোক, আত্মীয়-স্বজন সব হায় হায় করছে, গাঁয়ের লোকেরাও মুষড়ে পড়েছে। মেয়ের মায়ের বুক-ফাটা আর্তনাদে মানুষ তো দূরের কথা, চারদিকের গাছগুলোও যেন স্তব্ধ হয়ে আছে।

সকলেরই চোখ পড়ে এই ডাকাতদলের ওপর। বিশে জিজ্ঞেস করে, "বলুন তো, চামার বেটা ছেলে আর বরযাত্রী নিয়ে কোন্দিকে, কতদূর গেছে এতক্ষণে?"

দু'তিন জন এক সংগে ব'লে ওঠে,—"এইতো একটু আগে গেছে এই সোজা পূব দিকে। বড় জোর আধ ক্রোশটাক যেতে পেরেছে। প্রায় দেড় ক্রোশ গিয়ে নৌকোয় উঠবে।"

"আপনারা অপেক্ষা করুন একটু। চামারবেটাকে ধ'রে নিয়ে আসছি এখুনি। বিয়ে আজ রাত্তিরেই হবে, না হয় বুড়োর মাথা ফাঁক হবে।" ব'লেই দলবল নিয়ে বিশে বেরিয়ে যায় পূব দিকে। মাঠে নেমে রণ-পা দিয়ে খানিকটা এগিয়েই সামনে দেখতে পায় বরকর্তার দলকে।

গাঁয়ের লোকদের মধ্যে দু'এক জন বিশে ডাকাতকে চিনতে পেরেছে, সুতরাং তার সংগীদেরও তারা তারই দলের লোক বলে অনায়াসেই বুঝতে পারলে। এই লোকগুলির মুখে মুখে তখন বিশে ডাকাতের কথাই কেবল ঘুর-পাক খাচ্ছে। সকলেরই কৌতূহল, কি হয়, কি হয়।

খানিক বাদেই দেখা গেল বরযাত্রীর দল ফিরে আসছে। তাদের চারদিকে ঘিরে আছে লাঠি হাতে বিশে আর তার দল।

সহজেই বোঝা গেল টাকার মায়ার চেয়ে বরকর্তার প্রাণের মায়া ঢের বেশী। যুক্তিতে যেখানে কাজ হয় না, মনুষ্যত্ব ব্যর্থ যেখানে, ন্যায়-অন্যায় বোধই নেই যেখানে, সেখানে সব চেয়ে ভাল কাজ করে লাঠি।

বিশের লাঠির ভয়েই বরকর্তা, বর ও বরযাত্রীরা সুর্ সুর্ ক'রে চলে এসেছে।

সংগে সংগেই বাড়ীতে আবার সোরগোল শুরু হয়। চারদিকে সকলেরই টিট্কারী চলতে থাকে; তবু বরকর্তা নীরবে বরকে এনে আসনে বসান, বসেন দু'পক্ষেরই পুরোহিত, কনেকে এনে বসানো হয়। বিবাহের কাজ শেষ হয়ে যায় খানিকক্ষণের মধ্যেই।

বিবাহের পর বিশে আর তার দলের সকলকেই খুব যত্নের সহিত ভুরিভোজন করানো হ'ল। বিশে ডাকাত যদি ঐ সময়ে হঠাৎ না এসে পড়ত, তা'হলে কি এমন ঘটনা ঘটতে পারত?

এদিকে রাত্তির প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। বরকর্তাকে ডেকে বাসরঘরের সামনে নিয়ে বিশে চেঁচিয়ে বলে, "মশাই, টাকার জন্য তুমি সব করতে পার। তোমাকে সাবধান ক'রে দিচ্ছি, আমার এই ছোট্ট মা-টির ওপর যদি কোন রকমের অত্যাচার করা হয়, তা'হলে জেনে রাখ বিশে ডাকাত শুধু তোমার মাথাই ফাটাবে না, তোমার গোষ্ঠি নিপাত ক'রে ছাড়বে। খবর জানবার লোকের অভাব হবে না আমার।"

তার পর কনের দিকে চেয়ে বলে, "তোমার ভয় নেই মা! তুমি শুধু খবর দিও এখানে। তোমায় কষ্ট দিলে হয় আমি নিজেই যাব, না হয় আমার লোক যাবে শাস্তি দেওয়ার জন্য।"

এই বলেই শেষ রাত্তিরের অন্ধকারে সদলবলে অদৃশ্য হয়ে যায় বিশে ডাকাত।

শ্রাবণ-রাতে

শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য

বিশ্বদেবের স্নানযাত্রার মহা উৎসব মাঝে
শঙ্খ বাজিছে হিমনন্দিনী নন্দা যেথায় রাজে'।
শিখর তুষার-নিঃসৃত ধারা জ্যোতি সম যেন জলে
অতি দুরারোহ দূর প্রসারিত হিমগিরি অঞ্চলে।
ধরাতলে নামে পাথরের স্তূপ টেনে টেনে ভীমবেগে
শ্যামল হোলো যে পথপ্রান্তর পরশ তাহারি লেগে।
শিবের জটার বন্ধন খুলি নামে জাহ্নবী সতী
সিন্ধুচরণে অর্ঘ্য সঁপিতে চলে শত নদ নদী।

শ্রাবণের রাতে মেঘের বলাকা দল বেঁধে ওড়ে নভে,
অলকানন্দা ছুটে চলে কোথা মহাকল্লোল রবে!
গগনে গগনে বিজলীর খেলা ধরাতলে তার আলো—
ক্ষণিকের মত দেখা দেয় আর চারিদিক মেঘে কালো।
জলপ্রপাতের গরজনধ্বনি শোনা যায় নিরজনে
গিরিদরী ভেঙে চলিয়াছে নেচে বরষার বরিষণে।
শালবনে ক্ষ্যাপা বাতাসের চাপে ভেঙ্গে পড়ে শতশাখা,
ভীমভৈরব ডাক শুনে তার কাঁপে পাখীদের পাখা।

আজি বাদলের বন্দনাগীতি মল্লার সুরে সুরে
সুরু করিয়াছে কেতকীকদম রাতের হৃদয় পুরে।
স্বজনহারানো ভেঙেপড়া ঘরে গভীর অন্ধকারে
কে বসে কাঁদিছে কেহ নাহি বুঝি সান্ত্বনা দিতে তারে!
এ রাতে কোথায় আশ্রয়হীনা ভিজিছে পথের পাশে
তার কথা কেহ ভাবে কি এখন, ঝঞ্ঝা বাদল আসে!

শিবঠাকুরের বিয়ের কথাটী গিরিকন্যার সাথে
কে বসে ছন্দে রচিতেছে মাগো এমন বাদল রাতে!

শ্রীকৃষ্ণার্জুন কথা

শ্রীস্নেহকণা দেবী

কুরুক্ষেত্রে কৌরবে পাণ্ডবে মহাযুদ্ধ বেধে গেছে। কৌরব পক্ষের প্রধান ও প্রবীণ সেনাপতি ভীষ্ম শরশয্যায় শুয়েছেন। অস্ত্রগুরু দ্রোণাচার্য্য অর্জুনের হাতে নিহত হয়েছেন। কৌরবদলের এখন একমাত্র ভরসা কর্ণ। এবার কর্ণ সেনাপতি হয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে লড়তে গেলেন পাণ্ডবদের সাথে। কৌরব পক্ষের অন্য সব বীরেরা গেলেন কর্ণের সহকারী হয়ে।

তুমুল যুদ্ধ বেধে গেল। পাঁচ ভাই পাণ্ডবই এসেছেন কৌরবদের প্রতিরোধ করতে। দ্রোণের পুত্র অশ্বথামা পিতৃঘাতী অর্জুনকে সায়েস্তা করবার জন্য বহু সৈন্য-সামন্ত ও আটটি গরুর গাড়ী বোঝাই অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে তাঁকে ঘিরে ধরেছেন চারদিক থেকে। ভীমসেনের হাতে দুর্যোধন আর তাঁর দলবল একেবারে নাজেহাল হয়ে চরম দুরবস্থায় পড়েছে। ওদিকে মহাবীর কর্ণ যুধিষ্ঠির আর নকুল সহদেবকে বাণে বাণে ঘায়েল করে কাবু করে ফেলেছেন। হঠাৎ ভীমের একটা জয়-হুংকার শুনে কর্ণ তাড়াতাড়ি ছুটে গেলেন দুর্যোধনকে সাহায্য করতে। এই সুযোগে আহত যুধিষ্ঠির নকুল সহদেবকে নিয়ে পালিয়ে এলেন শিবিরে। এসেই তিনি অস্ত্রাঘাতের তীব্র যন্ত্রণায় কাতর হয়ে বিছানায় শুয়ে পড়লেন।

ওদিকে অর্জুন অশ্বথামা ও তার সৈন্যদলকে বিধ্বস্ত করে কর্ণের সাথে লড়তে গেলেন। ভীম লক্ষ্য করেছিলেন যে, যুধিষ্ঠির কর্ণের বাণে জর্জরিত হয়ে যুদ্ধক্ষেত্র ছেড়ে চলে গেছেন। তাই অর্জুনকে দেখেই তিনি বললেন, "ভাই, তুমি শিবিরে যেয়ে এখনই ধর্মরাজের সংবাদ নেও, তিনি হয়ত গুরুতর আহত হয়েছেন। এই কুরুদলের সঙ্গে আমি একাই বেশ লড়তে পারব।"

অর্জুন তখনই সারথি শ্রীকৃষ্ণকে রথ চালিয়ে দিতে বললেন শিবিরের দিকে।

কর্ণের বাণে যুধিষ্ঠির খুবই আঘাত পেয়েছিলেন; সব চেয়ে তাঁর বড় লজ্জা ও দুঃখের কারণ হয়েছিল যে, শত্রুর বাণ খেয়ে তাঁকে মাথা নিচু করে যুদ্ধক্ষেত্র ছেড়ে পালিয়ে আসতে হয়েছে শিবিরে। কর্ণের হাতে এভাবে লাঞ্ছিত হয়ে তাঁর উপর রাগও হচ্ছিল তাঁর খুব। তাই শ্রীকৃষ্ণ আর অর্জুন যেতেই তিনি বললেন, "তোমরা সেই হতভাগা কর্ণটাকে বধ করে এসেছ তো? অর্জুন, তোমার হাতে তাঁর মৃত্যু-সংবাদ শুনবার জন্যই আমি অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছি। বল—শীঘ্র বল, সেই পাষণ্ডটা তোমার বাণে মরেছে কিনা।"

অর্জুন বললেন, "আমি যুদ্ধক্ষেত্রে যেতেই কৌরব সৈন্যের অগ্রগামী অশ্বথামা বহু সৈন্য নিয়ে আমাকে ঘিরে ফেলল, সঙ্গে সঙ্গে আমাকে ও শ্রীকৃষ্ণকে সে পাঁচ পাঁচটি বাণে বিদ্ধ করল। আমিও তার সৈন্যদলকে দলিত করে এমন প্রচণ্ডভাবে তাকে আক্রমণ করলাম যে, সে প্রাণের ভয়ে কর্ণের রথ-সৈন্যদের মধ্যে লুকিয়ে রক্ষা পেল। আমাকে দেখেই কর্ণ পঞ্চাশ জন মহারথীকে নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লেন আমার উপর। আমি সেই পঞ্চাশ জনকে বধ করে মধ্যম পাণ্ডবের আদেশে কর্ণকে ছেড়ে

আপনাকে দেখবার জন্য তাড়াতাড়ি ছুটে এসেছি। সত্যি বলতে কি, কর্ণ আজ যে রকম যুদ্ধ করছেন, সে রকম যুদ্ধ আমি জীবনে দেখিনি"—

অর্জুন আরো কি বলতে যাচ্ছিলেন, যুধিষ্ঠির কর্কশ কণ্ঠে তাঁকে ধিক্কার দিয়ে বললেন—"ও তাই বল, তুমি কর্ণের যুদ্ধ দেখে ভয়ে ভীমসেনকে একা ফেলে পালিয়ে চলে এসেছ। ভীরু কাপুরুষ তুমি! পালিয়ে এসে আবার মিছে কথা বলছ যে, আমাকে দেখতে এসেছ। বৃথাই তুমি ঐ গাণ্ডীব নিয়ে আস্ফালন কর—দিয়ে দেও ঐ গাণ্ডীব অপর কোন মহাবীরকে—যিনি কর্ণের যুদ্ধ দেখে ভয় পাবেন না। যোগ্য যোদ্ধার জন্য গাণ্ডীব রেখে চলে যাও এখনি আমার সমুখ থেকে।"

এই কটু ভৎর্সনায় অর্জুনের চোখ হিংস্র ব্যাঘ্রের মত জ্বলে উঠল, সমস্ত শরীর থর-থর করে কাঁপতে লাগল, দাঁতে-দাঁত চেপে তিনি খাপ থেকে তরোয়াল খুলে নিলেন।

অর্জুনের ভাব দেখে শ্রীকৃষ্ণ ঘাবড়ে গেলেন,—এখনই যে তিনি রাগের মাথায় ভ্রাতৃহত্যা করে বসবেন, এতে তাঁর কোন সন্দেহ রইল না। তিনি অর্জুনের হাত ধরে মধুরকণ্ঠে বললেন, "সখা, এখানে তো তোমার কোন শত্রু নেই, তবে কেন তুমি তরোয়াল খুলে দাঁড়িয়েছ? চল সখা, আমরা এখান থেকে যাই।"

অর্জুন ক্রুদ্ধ সাপের মত ফোঁস ফোঁস করতে করতে কক্ষান্তরে চলে গেলেন। শ্রীকৃষ্ণ তাকে বসিয়ে স্নিগ্ধকণ্ঠে বললেন,—"ছি সখা, এ দুঃসময়ে ক্রোধ করা তোমার শোভা পায় না। শান্ত হও।"

অর্জুন কিন্তু তখনও শান্ত হতে পারেননি, তিনি ধরা গলায় বললেন, "সখা, তুমি আমায় শান্ত হতে বলছ, কিন্তু তুমি তো জান আমার প্রতিজ্ঞার কথা—যে আমাকে গাণ্ডীব ছাড়তে বলবে আমি তখনই তাকে বধ করব। আজ দুঃখে ক্ষোভে আমার প্রাণ ফেটে যাচ্ছে এই ভেবে, যাকে আমি দেবতা বলে মান্য করি, সেই জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরই এই কটু ভৎর্সনা করে আমাকে সত্য পালনে বাধ্য করলেন। সখা, সত্য আমাকে রক্ষা করতেই হবে।"

শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বাধা দিয়ে বলে উঠলেন,—"ছি ছি সখা, তুমি যে এতটা বোকা এ আমি ধারণা করতে পারিনি। হঠাৎ রাগের মাথায় একটা গুরুতর অকার্য করে বসা মূর্খেরই লক্ষণ। তুমি ধর্মভীরু, অথচ ধর্ম কি তা জান না। যে ব্যক্তি কর্তব্য কাজকে অকর্তব্য, আর অকর্তব্য কাজকে কর্তব্য বলে মনে করে, সে তো মানুষ নামের যোগ্যই নয়। আমার মতে অহিংসাই পরম ধর্ম। বরং মিথ্যা বলা চলে, কিন্তু প্রাণিহিংসা করা চলে না। আর তুমি কিনা সত্য রক্ষা করবার জন্য তোমার পিতৃসম বড় ভাইকে মারতে তরোয়াল খুলেছ। সত্যের চেয়ে বড় কিছু নেই একথা ঠিক, কিন্তু সত্য কি মিথ্যা কি তা বুঝে কাজ করা খুবই শক্ত। তোমাকে একটা কাহিনী বলছি, তুমি শান্ত মনে শোন।

"এক সময় কৌশিক নামে এক ব্রাহ্মণ তপস্বী কয়েকটা নদীর সঙ্গম স্থানে বাস করতেন। ঐ ব্রাহ্মণ সর্বদা সত্য বলতেন, এজন্য সত্যবাদী বলে তিনি সে অঞ্চলে বিশেষ খ্যাতি লাভ করেছিলেন।

"একদিন হয়েছে কি, কয়েকটা দস্যু জনকয়েক নিরীহ গৃহস্থকে ভীষণ তাড়া করলে। লোকগুলি প্রাণ বাঁচাবার আর উপায় না দেখে কৌশিকের আশ্রমের পাশে একটা ঘন ঝোপের ভিতর ঢুকে চুপ করে বসে রইল। দস্যুরা তাদের খুঁজে না পেয়ে কৌশিককে জিজ্ঞাসা করল। সত্যাশ্রয়ী কৌশিক সেই ঝোপ দস্যুদের দেখিয়ে দিলেন। দস্যুরা লোকগুলিকে মেরে-কেটে তাদের সর্বস্ব লুটে নিয়ে চলে গেল।

"কৌশিক সত্যবাদী বটে, কিন্তু সত্যের সূক্ষ্ম তত্ত্ব তিনি জানতেন না। তাঁর উচিত ছিল চুপ করে থাকা, আর একান্তই কথা বলতে বাধ্য হলে পরিষ্কার মিথ্যা বলা, কারণ এখানে মিথ্যাই সত্য। এই সত্য বলার পাপে কৌশিককে ঘোর নরকে যেতে হয়েছিল।

"আজ যুধিষ্ঠির তোমাকে অসংগত কথা বলেছেন শুধু কর্ণ-বধে তোমাকে তাতিতে তোলবার জন্য। তাঁর মনে তোমার উপর একটুও বিদ্বেষ বা ক্রোধ নেই, এ তুমি ঠিক জেন।"

অর্জুন বললেন, "বন্ধু, ধর্মরাজকে হত্যা করার চিন্তা করাও আমার মহাপাপ, তা আমি জানি। কিন্তু বল তো এখন উপায় কি, যাতে আমারও প্রতিজ্ঞা পালন হয়, আর ধর্মরাজের জীবনও রক্ষা পায়।"

শ্রীকৃষ্ণ বললেন, "সে কথাই বলছি তোমাকে। মানুষকে কেটে ফেললেই যে তাকে হত্যা করা হয়, তা নয়। যে ব্যক্তি মাননীয়, তিনি যতদিন সম্মান লাভ করেন, ততদিনই তিনি জীবিত থাকেন, বলে ধরা যায়; আর তিনি অপমানিত হলেই জীবন থাকতেও মৃতবৎ হয়ে যান। তোমরা সবাই ধর্মরাজকে বিশেষ সম্মান করে থাক, আজ তুমি তাঁকে একটু অপমানিত কর, 'তুই-তোকারি' বলে কথা বল, তবেই তিনি মনে ভীষণ আঘাত পেয়ে ভাববেন, তোমার হাতে তাঁর মৃত্যু হলো। তারপর তাঁকে সব কথা বুঝিয়ে বলে তাঁর পায়ে ধরে ক্ষমা চেয়ে নিও; তাঁর আর তখন তোমার ওপর ক্রোধ থাকবে না। এতে ধর্মরাজেরও প্রাণ রক্ষা হবে, তোমারও প্রতিজ্ঞা পালন হবে।"

শ্রীকৃষ্ণের কথা শুনে অর্জুন যুধিষ্ঠিরের কাছে গিয়ে বললেন,—"শোন্ যুধিষ্ঠির, তোর মুখে এ তিরস্কার অসহ্য। যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালিয়ে এক ক্রোশ দূরে এসে রয়েছিস্, তুই যুদ্ধের খবর জানিস্ কি? যদি ভীমসেন এসব কথা বলতেন, মাথা পেতে নিতাম তাঁর কথা। ভেবে দেখ্, তোর জন্য আমরা কি না সহ্য করেছি! তুই-ই তো বাজি রেখে পাশা খেলতে গিয়েছিলি। তোর জন্যই না আমাদের রাজ্যনাশ, বনবাস, চরম দুঃখকষ্ট হয়েছে। ভেবে দেখ্, তুই আমাদের কি না ক্ষতি করেছিস্! তোর মুখে এসব গালাগালি সাজে না!"

অর্জুনের অপমানকর তিরস্কার শুনে ধর্মরাজের তো চক্ষুস্থির! তিনি গুম্ হয়ে মাথা নুইয়ে বসে ভাবতে লাগলেন,—পৃথিবী তুমি দ্বিধা হও, আমি তোমাতে প্রবেশ করি।

এদিকে হয়েছে কি, অর্জুন যুধিষ্ঠিরকে এসব কথা বলেই লজ্জায়, দুঃখে ম্রিয়মাণ হয়ে মুখ নিচু করে অন্যত্র চলে গেলেন। যে বড় ভাইকে চিরকাল তিনি পিতার মত সম্মান করে এসেছেন, যাঁর

মুখের কথা তাঁর কাছে বেদবাক্যের মত, তাঁকে এভাবে অপমানিত করে তাঁর মন অনুশোচনায় পুড়ে যেতে লাগল। তিনি আত্মধিক্কারে অধীর হয়ে উঠলেন। কোষ থেকে আবার তরোয়াল খুললেন আত্মহত্যা করবার জন্য।

অর্জুনের ভাবভঙ্গি দেখে শ্রীকৃষ্ণের কেমন সন্দেহ হলো, তিনি অমনি ছুটে গেলেন অর্জুনের পিছু পিছু। দেখলেন, অর্জুন তরোয়াল হাতে নিয়ে অধীর ভাবে পায়চারি করছেন। মুহূর্তে তিনি বুঝে নিলেন সব। প্রিয়সখার হাত ধরে জিজ্ঞাসা করলেন —"কি হে সখা! আবার কি হলো তোমার? আবারও দেখছি তরোয়াল খুলে পাগলের মত ছুটাছুটি করছ! ব্যাপারখানা কি?"

—"মহাপাপ করেছি সখা, মহাপাপ করেছি! এ পাপের প্রায়শ্চিত আত্মহত্যা! তাই আমি স্থির করেছি আমি আত্মঘাতী হবো। এবার তোমার নিষেধও আমি মানব না।"

—"বেশ, তোমাকে মানতেও আমি বলি না; কিন্তু একবার ভেবে দেখো তো, যে বড় ভাইকে দুটো কটু কথা বলেই তোমার এত অনুতাপ, তাঁকে সত্যি সত্যি হত্যা করলে তোমার কি অবস্থাটা হতো! আত্মহত্যা করবে? তা বেশ কর, আমার আপত্তি নেই; কিন্তু এটা জানো কি যে শুধু নিজের গলা কাটলেই আত্মহত্যা হয় না। আত্মহত্যার আরো উপায় আছে?"—

অর্জুন সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করলেন—"কি সে উপায় সখা?"

শ্রীকৃষ্ণ উত্তর দিলেন—"আত্মহত্যার অতি সহজ উপায় রয়েছে। যুধিষ্ঠিরাদি অনেকেই ঐ কামরায় রয়েছেন। তুমি ওখানে যেয়ে খুব উঁচু গলায় নিজের গুণগান করতে থাক—আমার মত বীর নেই, গুণী নেই, ধনী নেই, মানী নেই, বিদ্বান নেই; নিজের যতগুণ আছে জোর গলায় প্রচার কর, ব্যস! তোমার আত্মহত্যা হয়ে যাবে। নিজের মুখে নিজের প্রসংসা করা—আত্মশ্লাঘা আর আত্মম্ভরিতা করা, আত্মহত্যারই সামিল। তাই তুমি কর, তোমার সংকল্প পূর্ণ হবে। সবাই অবাক হবেন তোমার কথা শুনে, হয়ত ভাববেন তোমার মাথা বিগরে গেছে। শেষটায় সবাইকে বুঝিয়ে বললেই চলবে।"

অর্জুন বুঝলেন, শ্রীকৃষ্ণের যুক্তিই ঠিক। তিনি যুধিষ্ঠিরের কাছে গিয়ে বলতে লাগলেন, "ওহে ধর্মরাজ, শোনো আমার কথা, এক মহাদেব ভিন্ন আমার মত বীর ত্রিজগতে নেই। আমি মহাত্মা, এই সৃষ্টি আমি মুহূর্তে ধ্বংস করতে পারি। আমিই সমস্ত পৃথিবী জয় করে বসুধার ধনরাশি এনে তোমার পায় সঁপে দিয়েছি। আমার ভয়ে স্বর্গ মর্ত্য পাতাল কম্পমান। তুমি নিশ্চিন্ত থাক, আমি এখনই যুদ্ধে যেয়ে কর্ণকে বধ করব।"

এই ভাবে নিজের আরো অনেক প্রশংসা করে অর্জুন হেট মুখে বসে রইলেন। যুধিষ্ঠির ছাড়া আর সবাই অর্জুনের কথাবার্তা শুনে মুখ চাওয়া চাওয়ি করতে লাগল।

এদিকে যুধিষ্ঠির মুখ কালো করে বসে রয়েছেন, ঘন ঘন দীর্ঘশ্বাস ফেলছেন, চোখে জল টলটল করছে। অর্জুনের শেষের কথাগুলি যে তিনি শুনেছেন, তাও মনে হলো না। তিনি নিতান্ত কোমল মৃদু কণ্ঠে অর্জুনকে বললেন, "ভাই অর্জুন, আমি সত্যিই খুব অসৎ কাজ করেছিলাম, তাই তোমরা আমার জন্য চিরদিন দুঃখ পেয়েছ। আমি মূর্খ, অলস, ভীরু। কি সুখে তুমি আর আমার অধীন হয়ে থাকবে! আর অপমান করার চেয়ে তুমি এখনই আমাকে কেটে ফেল। আমাকে হত্যা করতে যদি না পার, তবে বেশ আমি বনে চলে যাচ্ছি। তুমি সুখী হও। মহাত্মা ভীমসেন রাজা হউক। আমি অকর্মণ্য, রাজকার্য করা আমার শোভা পায় না।"

কথা বলতে বলতে দরদর ধারে যুধিষ্ঠিরের চোখের জল পড়তে লাগল। দাদার চোখে জল দেখে অর্জুন আর স্থির থাকতে পারলেন না। ভাইয়ের পায়ে লুটিয়ে পড়ে চোখের জলে তাঁর পা ভিজিয়ে দিলেন।

শ্রীকৃষ্ণ তখন ধর্মরাজকে বুঝিয়ে বললেন, "মহারাজ, গাণ্ডীবের বিষয়ে অর্জুনের প্রতিজ্ঞার কথাটা হয়ত আপনি ভুলে গেছেন। আপনি অর্জুনকে ভীরু কাপুরুষ বলে অন্যের হাতে গাণ্ডীব দিতে বলায়, অর্জুন তাঁর প্রতিজ্ঞা রক্ষার জন্য ভ্রাতৃহত্যার তুল্য ভীষণ পাপে লিপ্ত হতে চেয়েছিলেন। তাই আপনার মত মাননীয় ব্যক্তিকে অপমান করে আপনার জীবন্মৃত্যুর বিধান করতে আমি ওঁকে পরামর্শ দিয়েছিলাম। ছোটর কাছে গুরুজনের অপমানই মৃত্যু স্বরূপ। তাই ওঁর অপমানজনক কথায় আপনার মৃত্যু হয়ে গেছে। এখন আমার কথায় আপনি পুনর্জীবন লাভ করুন। তারপর অর্জুন আপনাকে অপমান করে মনের ব্যথায় আত্মহত্যা করতে প্রস্তুত হয়েছিলেন। আমি তাকে নিজের মুখে নিজের গুণকীর্তন করে আত্মঘাতী হতে উপদেশ দিয়েছিলাম। তাই তিনি অমন করে উচ্চ কণ্ঠে আত্মশ্লাঘা করেছেন। নিজের মুখে নিজের গুণকীর্তন করে ওঁরও আত্মহত্যা হয়ে গেছে। আপনি ওঁকে ক্ষমা করে প্রসন্ন মুখে যুদ্ধক্ষেত্রে যেতে অনুমতি দিলেই সখা আমার পুনর্জীবন লাভ করবে। আপনি ওঁকে কর্ণ-বধে অভিযান করতে অনুমতি দিন।"

শ্রীকৃষ্ণের কথা শুনে যুধিষ্ঠিরের মনের খেদ দূর হলো। তিনি প্রফুল্ল অন্তরে অর্জুনকে আলিঙ্গন ও আশীর্বাদ করে, বিজয় অভিযানে পাঠিয়ে দিলেন।

আবহাওয়া নিয়ন্ত্রণ

শ্রীঅশোককুমার মিত্র

আবহাওয়া নিয়ন্ত্রণের প্রচেষ্টা চলেছে। এই নিয়ন্ত্রণের প্রথম অধ্যায় হল, মেঘ থেকে কৃত্রিম উপায়ে বৃষ্টি ঝরানো। বৈজ্ঞানিকদের এই প্রচেষ্টা দুঃসাহসিক সন্দেহ নেই। তাঁদের বাহাদুরী অনেকের দৃষ্টিভঙ্গিতে হয়তো বরদাস্তও হবে না। খোদার ওপর খোদকারী পছন্দ করেন না অনেকেই। কিন্তু বৈজ্ঞানিকদের দৃষ্টিভঙ্গি আলাদা। অনুসন্ধিৎসু মন তাঁদের কেবলই নূতন কিছুর দিকে টেনে নিয়ে চলেছে। কোন রকম বাধাবিপত্তিই তাঁরা মানতে নারাজ। এমন কি প্রাকৃতিক নিয়মও তাঁরা ইচ্ছামত ভেঙ্গে গড়তে চান। সার্থকতা হয়তো সংশয়পূর্ণ, কিন্তু সে আলোচনা থাক্। এই দুঃসাহসিক প্রচেষ্টার সাফল্য হয়েছে কতখানি, তাই এখানে দেখা যাক্।

বৈজ্ঞানিকেরা বহুদিন ধরে কল্পনা করে আসছেন, আবহাওয়া নিয়ন্ত্রণ করবেন তাঁরা নিজেদের ইচ্ছামত। এ অসাধ্য সাধনের মধ্যে যে বিরাট সার্থকতা রয়েছে, তারই প্ররোচনায় বৈজ্ঞানিকদের কৃত্রিম বৃষ্টি ঝরানোর এই প্রচেষ্টা সুরু হয়েছে। বৈজ্ঞানিকদের ইচ্ছামত বৃষ্টি ঝরলে, শস্যগুলোর প্রাণ বাঁচে, আমরাও খেয়ে বাঁচি। তাঁদের এই সাধনা অনেক জায়গাতেই সাফল্যমণ্ডিত হয়েছে। কৃত্রিম বৃষ্টিপাত সম্ভব হয়েছে। আমাদের দেশও এ ব্যাপারে পিছিয়ে নেই। থাকলে চলবে কি করে? যার যেখানে ঠেকা! বম্বাইএ, পরে কলকাতায় এই কৃত্রিম বৃষ্টিপাতের গবেষণা সুরু হয়ে গিয়েছে। অনাবৃষ্টির ফলে আমাদের দেশে শস্যের যে অপরিসীম ক্ষতি হয়, তা ভাবলেও আমরা শিউরে উঠি। প্রয়োজনীয় বৃষ্টি না পেয়ে শুষ্ক শস্যগুলো যখন মেঘলোকের পানে তাকিয়ে বৃথাই দীর্ঘশ্বাস ফেলে, তখন সে দৃশ্য সত্যই বড় করুণ। জলসেচন প্রণালী পাঞ্জাব দেশে কিছুটা থাকলেও, অধিকাংশ অঞ্চলেই তার তেমন সুব্যবস্থা নেই। অনাবৃষ্টি হলেই তাই আমাদের দেশের চাষীরা আকাশপানে তাকিয়ে ভগবানকে ডাকতে সুরু করে। প্রকৃতি বিমুখ হলেই আমাদের সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা দেশে ফসল নষ্ট হয়ে যায়। ফলে খাদ্যসংকট দেখা দেয়।

কৃত্রিম বৃষ্টিপাত সম্ভব হলে, এই দুর্ভোগের আংশিক অবসান ঘটবে। প্রকৃতির ওপর আবহাওয়া বিজ্ঞানের আধিপত্যের এটা একটা অভিনব গৌরবময় দৃষ্টান্ত। মানুষের খাদ্যাভাব সত্যি পূরণ করবার জন্য যদি ব্যাপকভাবে এই কৃত্রিম বৃষ্টিপাতের ব্যবস্থা করা যায়, সে উদ্যম দুঃসাহসিক হবে হয়তো, কিন্তু ফলাফল হবে তার সুদূরপ্রসারী, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

আকাশের অনেক উঁচুতে হিমাঙ্ক এলাকার ওপরে মেঘের মধ্যে জলবিন্দু জমে বরফের ক্রিষ্টাল কণার সৃষ্টি হয়ে থাকে। এইসব বরফ ক্রিষ্টাল আবার আশেপাশের জলীয় বাষ্পের সংস্পর্শে এসে পাতলা তুষার খণ্ডে পরিণত হয়। এই তুষার স্তরের নীচেই অপেক্ষাকৃত গরম

আবহাওয়ায় মেঘে শুধু হালকা জলবিন্দুই ভেসে বেড়ায়। হিমাঙ্ক এলাকার ওপরের বরফ ক্রিষ্টাল-গুলো চাপ বেঁধে ভারি হয়ে নীচের দিকে যখন পড়তে থাকে, তখন কিছুটা নেমে এসেই এদের তল্লদেশ গলতে সুরু করে। এই গলা বারিবিন্দুগুলো নিম্নস্তরের মেঘলোকের ভেতর দিয়ে নামার পথে ছোট ছোট জলকণাকে কুড়িয়ে নিয়ে আকারে বড় এবং ওজনে ভারি হয়ে পৃথিবীর ওপর বৃষ্টিধারা হয়ে নেমে আসে। আমেরিকা ও অষ্ট্রেলিয়াতে যে সব কৃত্রিম উপায়ে বৃষ্টিপাতের প্রচেষ্টা চলছে তাদের কায়দা হল এই ধরনের। শূন্যডিগ্রী টেম্পারেচারের নীচেও যেসব মেঘে বরফ ক্রিষ্টালের জন্ম হয় না—অতিশৈত্য জলকণাই কেবল মেঘের রূপ নিয়ে ঘুরে বেড়ায়—সেই সব মেঘের মাথায় কৃত্রিম উপায়ে বরফ ক্রিষ্টাল রোপন করা হয়। এরোপ্লেনে উড়ে শুকনো বরফ (বা শক্ত Carbon dioxide) এমন মেঘের মাথায় ছড়িয়ে দিতে হয় যার ওপরের স্তরে অন্তত অতিশৈত্য জলবিন্দু বর্ত্তমান। এর পরই কৃত্রিম বৃষ্টি ঝরানোর কাজ সুরু হয়ে যায়। এ কাজ ব্যয়সাপেক্ষও নয় তেমন। শক্ত কাজ হল কেবল, এরোপ্লেনে উড়ে ঘুরে ঘুরে ঠিকমত মেঘকে খুঁজে বার করা। সন্ধান মিলে গেলে, উপযুক্ত স্থানে উচিত সময়ে সামান্য কিছু শুকনো বরফগুড়ো ছড়িয়ে দিলেই কেল্লা ফতে। এই উপায়ে সের পনেরো শুকনো বরফেই কৃত্রিম বৃষ্টি ঝরানো সম্ভব হয়ে থাকে।

এত সহজেই যদি কাজ সারা হবে, তবে তো দেশ থেকে অনাবৃষ্টি অনায়াসেই তাড়ানো চলতো! এর মধ্যে কথা আছে। উপরি উক্ত উপায়ে কৃত্রিম বৃষ্টির সাফল্য পেতে গেলে অনেকগুলো অনুকুল অবস্থা থাকা একান্ত প্রয়োজন। এর মধ্যে অন্যতম হল, উচিতমত মেঘ থেকেই এই ধরনের কৃত্রিম বৃষ্টি ঝরানো সম্ভব হবে। তাই এই উপায়কে ঠিকমত বলতে গেলে বলা উচিত—"মেঘকে বৃষ্টি ঝরানোয় প্রেরণা দেওয়া।" কৃত্রিম বৃষ্টি ঠিক সৃষ্টি করা হচ্ছে না। অষ্ট্রেলিয়াতে এই উপায়ে বৃষ্টি ঝরুতে গিয়ে দেখা গেছে যে, যে মেঘ থেকে বৃষ্টি ঝরানো হবে তার উচ্চতা এমনই হওয়া প্রয়োজন যেখানে শূন্য ডিগ্রী (সেন্টিগ্রেড) চেয়ে ৭ থেকে ১৫ ডিগ্রী পর্য্যন্ত কম থাকে। আর মাটি থেকে মেঘের তলা পর্য্যন্ত যে উচ্চতা তার সমান কিম্বা তারও চেয়ে বেশী হওয়া উচিত মেঘের স্তরের দৈর্ঘ্য। অষ্ট্রেলিয়াতে তাই শুকনো বরফ ছড়াতে হয় মেঘের মাথায় ৮০০০ থেকে ১২০০০ ফিট উঁচুতে উঠে। আমাদের ভারতবর্ষের ভৌগলিক অবস্থান এমন যে, এখানের বেশীর ভাগ অঞ্চলেই এই উপায়ে কৃত্রিম বৃষ্টিপাত করাতে গেলে, আকাশের ওপর উঠতে হবে বিশ হাজার ফিট। অত উঁচুতে উঠে উপরি উক্ত উপায়ে মেঘ থেকে বৃষ্টি ঝরাবার প্রেরণা জোগানো তাই আমাদের দেশে কত ঝঞ্ঝাট সহজেই বুঝা যাচ্ছে। এরোপ্লেনকে অত উঁচুতে ঠেলে তুলতে গেলেই অনেক কাঠখড়, তারপর অত উঁচুতে উঠেই যে ঠিক মনোমত মেঘের দেখা মিলবে তাই বা কে বলে দিতে পারে? ওই অত ওপরে উঠে যদি আবার অতিশৈত্য মেঘের জন্য 'গরু খোঁজা' আরম্ভ হয়, তবে কাজটা যে কত ব্যয়সাপেক্ষ তা বোধ হয় বলে দিতে হবে না। এই সব কারণেই আমাদের দেশে এখনও কৃত্রিম

বৃষ্টিপাতের সাফল্যের কথা শুনিনি আমরা আজও। তাই বলে আবহাওয়া বৈজ্ঞানীরা চুপ করে বসেও নেই। গবেষণা তারা চালিয়ে যাচ্ছেন, অন্য কোন সহজ উপায়ে ইচ্ছামত বৃষ্টি ঝরানো সম্ভব কিনা তাই দেখবার জন্য।

বর্ত্তমানে যে উপরি উক্ত কৃত্রিম বৃষ্টিপাতের প্রচেষ্টা, তার গোড়ার কথা বলি। যুদ্ধের সময় সামরিক দপ্তর জেনারল ইলেকৃট্রিক কোম্পানীকে একটি বেতার বিষয়ে গবেষণা করতে বলে। সেটা হল, এরোপ্লেন যখন বরফ-ঝড়ের (Snow storm) মধ্যে দিয়ে উড়ে যায়, তখন বেতারে খবরাখবর আদান-প্রদান করা মাঝে মাঝে ব্যাহত হয় কেন? সেফার (Schaefer) নামে এক বৈজ্ঞানিকের সঙ্গে কোম্পানীর ডাইরেক্টর Dr. Langmuir এই বিষয়ে গবেষণা আরম্ভ করেন। এই গবেষণার মধ্যেই Schaefer একটি আশ্চর্য্য তথ্য আবিষ্কার করেন। সেটা হল, ওই প্রাকৃতিক-নিয়ম-না-মানা অতিশৈত্য মেঘ (Supercooled cloud)। যে টেম্‌পারেচারে জল বরফ হয়ে যাবার কথা, তারও চেয়ে কম টেম্‌পারেচারেও এই অতিশৈত্য মেঘের জলবিন্দুগুলো জমতে চায় না। মেঘের জলবিন্দুগুলো এতই ছোট্ট এবং হালকা যে, তারা মাটির ওপর ঝরে পড়তেও পারে না। এই রকম আশ্চর্য্য মেঘ হয়তো কোন কারণে হঠাৎ বরফে পরিণত হত। কারণটা কেউ বলতে পারতো না তখন। Schaefer এই ধরনের মেঘ নিয়ে গবেষণা সুরু করলেন তাঁর পরীক্ষাগারে। তাঁর Laboratoryতে একটা বরফরাখা বাক্সর মত তৈরী করলেন তিনি। বাক্সর ভেতর দিকগুলো কাল ভেলভেট দিয়ে মোড়া হল। ওপরের ডালাটাতে একটা মাইক্রোস্‌কোপ বসানো রইলো। বাক্সর ভেতর যাতে একটি আলোর বিন্দু ইচ্ছামত ঘোরানো-ফেরানো যায়, তার ব্যবস্থাও করা হল। আলোর বিন্দুতে বাক্সর ভেতর কি হচ্ছে না হচ্ছে তাই দেখা যেতো মাইক্রোস্‌কোপের মধ্যে দিয়ে। বাক্সর ভেতরটা ঠাণ্ডা করা হল প্রায় শূন্য ডিগ্রী ফারেনহাইটে। ৩২ ডিগ্রী ফারেনহাইটেই জল বরফ হয়ে যাবার কথা। বাক্সর শূন্য ডিগ্রী ফারেনহাইট্ টেম্‌পারেচারে Schaefer তাঁর নিজের নিঃশ্বাস খানিকটা ওই বাক্সর মধ্যে ঢুকিয়ে দিলেন। নিজের নিঃশ্বাসে যে জলীয় বাষ্প আছে তাই যেন অতিশৈত্য মেঘে পরিণত হল। ওই টেম্‌পারেচারে জলীয় বাষ্প বরফক্রিষ্টালে রূপ নেবার কথা, কিন্তু Schaefer তাঁর মাইক্রোস্‌কোপের মধ্যে দিয়ে দেখলেন, সে রকম কিচ্ছুই হল না। প্রকৃতিতে এরপর এমন কোন প্রক্রিয়া আছে যার প্রেরণায় অতিশৈত্য মেঘে হঠাৎ বরফের ক্রিষ্টাল দেখা দেয়। Schaefer গভীর গবেষণায় মগ্ন হলেন। এ বিষয়ে যত কিছু বই আছে সব কিছু পড়ে ফেললেন। আবহাওয়া বিজ্ঞানীদের প্রশ্ন করে উত্যক্ত করে তুললেন। কিন্তু তাঁর সমস্যার সুরাহা তিনি করতে পারলেন না; শেষে বরাত জোরে তিনি হঠাৎ একদিন জয়ী হলেন। এক গ্রীষ্মের দিনে Schaefer পরীক্ষা করছিলেন তাঁর পরীক্ষাগারে। সেদিন টেম্‌পারেচার এত বেশী ছিল যে, সহজে তিনি অতিশৈত্য মেঘ তৈরী করতে পারলেন না। শেষে এক চাঁই শুকনো বরফ (যা আইসক্রিম ঠাণ্ডা রাখার জন্য ব্যবহার করা হয়) দিয়ে তাঁর তৈরী বাক্সের ভেতরের টেম্‌পারেচার কমিয়ে দেবার চেষ্টা করলেন।

মাইক্রোস্কোপের মধ্যে দিয়ে তিনি আনন্দে আত্মহারা হয়ে দেখলেন যে, তার Supercooled মেঘ বরফের ক্রিষ্টালে পরিণত হচ্ছে। এরা শেষে জড়াজড়ি করে তুষারকণায় পরিণত হয়ে ঝরে পড়তে লাগলো নীচের দিকে।

কি করে কি হল? পরে দেখা গেছে, শূন্য ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড টেম্পারেচারের ৩৯ ডিগ্রী কম টেম্পারেচারের নীচে নামলেই অতিশৈত্য মেঘের জলবিন্দুগুলো বরফের ক্রিষ্টালে পরিণত হয়। এ প্রক্রিয়া স্বাভাবিক—এর জন্য বাইরের কোন শক্তির প্রয়োজন হয় না। Schaeferএর পরীক্ষাতেও হয়েছিল তাই। শুকনো বরফ দিয়ে ঠাণ্ডা করতে গিয়ে, যে টেম্পারেচারে জল বরফ হয়ে যাবার কথা, তারও চেয়ে ৩৯ ডিগ্রী কিম্বা তারও বেশী ডিগ্রী টেম্পারেচার নেমে গিয়েছিল তাঁর বাক্সের ভেতরটা।

পরীক্ষাগারের বাইরেও তাহলে এই আশ্চর্য্য কৃত্রিম বরফ পড়ানো সম্ভব হতে পারে বিশেষ ধরনের মেঘ থেকে। Schaeferএর স্বপ্ন সাফল্য মণ্ডিত হল।

এরোপ্লেনে করে আকাশে উড়ে অতিশৈত্য মেঘে শুকনো বরফের কুচি ছড়িয়ে তিনি সত্যই সেই মেঘ থেকে কৃত্রিম বরফ ঝরানো সম্ভব করালেন; আগেই বলেছি, এই বরফ-ঝরা অনুকূল আবহাওয়া পেলেই কৃত্রিম বৃষ্টির ধারা হয়ে মাটিতে নামতে লাগলো।

এর পর থেকেই পরীক্ষামূলক কাজ সুরু হয়ে গেল। এখানে ওখানে কৃত্রিম বৃষ্টিপাতের প্রচেষ্টা চললো—প্রায় সবগুলোতেই ফল পাওয়া গেল আশানুরূপ। যাঁরা বৈজ্ঞানিক সাফল্যে সন্দিগ্ধ, তাঁরা বললেন—"ও বৃষ্টি এমনিতেই হত, এরোপ্লেনে উড়ে মেঘের মধ্যে গিয়ে অত হৈচৈ করার কোন প্রয়োজন ছিল না।" কিন্তু বৈজ্ঞানিকদের কাছে প্রমাণ রয়ে গেল যথেষ্ট যে, তাঁদের প্রচেষ্টাতেই মেঘলোক বৃষ্টি ঝরাতে প্রেরণা পেয়েছে। (আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)

জীয়ন পুতুল

শ্রীমণীন্দ্র দত্ত

সারাদিন পুতুলকুমার সাগরের জলে সাঁতার কাটল।

এল রাত। সে কী ভীষণ রাত! জল ঝরছে মুষলধারায়। বিজলি চমকায় ধারাল তলোয়ারের মত। বাজ ডাকে কড়-কড়-কড়াৎ।

আবার সকাল হ'ল।

একটা বড় ঢেউ পুতুলকুমারকে ফেলে রেখে গেল সাগরতীরে বালুবেলায়। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিল পুতুলকুমার। এ যাত্রায়ও সে বেঁচে গেছে।

কিন্তু বাবা? কোথায় তিনি? সাগরের বুকে যতদূর চোখ যায় পুতুলকুমার বার বার চেয়ে দেখল। কোথাও জনমানবের চিহ্নও নেই।

তীরের কাছে ভুঁস করে নিশ্বাস ছাড়ল একটা মাছ। যাহোক তবু একটা প্রাণীর দেখা পাওয়া গেল। পুতুলকুমার সাগ্রহে বলল:

মাছমশায়, মাছমশায়, একটু শুনে যাও।

মাছ মুখ তুলে জবাব দিল:

অত কেন বিনয়? যাহা বলবে বলে নাও।

পুতুলকুমার শুধাল:

বলতে পার কোথায় পাব একটুখানি ঠাঁই।
আমি বড়ই ক্ষিধেয় কাতর, খাবার কিছু চাই।

মাছ জবাব দিল:

একটুখানি বায়ে যেয়ে নাক বরাবর যাবে।
কাজীগাঁয়ে গেলে খাবার শোবার সবি পাবে।

পুতুলকুমার শুধাল:

জলে থাক জলের মৎস্য, শুধাই তোমারে,
কোথাও কিগো দেখতে পেলে আমার বাবারে?

মাছ জবাব দিল:

তোমার বাবা কেমন ধারা, দাও গো পরিচয়।

পুতুলকুমার বলল:

সবার সেরা বাবা আমার, পরম স্নেহময়।

একটু ভেবে মাছ বলল:

কাল রাতে যে ঝড় গিয়েছে—বাতাস এলোমেলো,
তোমার বাবা তিমিংগিলের পেটেই বুঝি গেল!

পুতুলকুমার ভয়ে আঁতকে উঠে বলল:

কী ভয়ানক কথা তোমার, শুনে লাগে ভয়।
তিমিংগিল কি এতই বড় বল মহাশয়!

মাছ জবাব দিল:

বড়? তুমি বলছ কি গো? তবে বলি শোন:
পাঁচ-তলা এক বাড়ীর চেয়েও মস্ত তাহার দেহ।
মুখটি তাহার কত বড় ভাবতে পার কেহ?
অনায়াসে পার হয়ে যায় যে কোন এন্‌জিনও।

বলেই মাছটি ডুব দিল সাগরের জলে। পুতুলকুমারও পা বাড়াল কাজীগাঁয়ের পথে।

প্রথমেই তার দেখা হ'ল এক বুড়োর সাথে। লোকটি দুই গাড়ী কয়লা ঠেলে নিয়ে চলেছে।

পুতুলকুমার বলল : দয়া করে দুটো পয়সা দিন্ আমায়, বেজায় ক্ষিধে পেয়েছে।

কপালের ঘাম মুছে বুড়ো জবাব দিল : তুমি কি জান না খোকা, এটা কাজীগাঁ? কাজ না করে এখানে কিছু পাওয়া যায় না। তুমি যদি কয়লাগুলো বয়ে নিতে আমাকে একটু সাহায্য কর, আমি তোমাকে দু আনা দেব।

পুতুলকুমার রেগে বলল : কেন? আমি কি গাধা নাকি যে বোঝা বইব?

বুড়ো বলল : তবে না বইলে। আমি চললাম।

আবার চলতে চলতে পুতুলকুমার এক রাজের দেখা পেল। রাজের মাথায় এক ভাড়া চুণ। তার কাছে দুটি পয়সা চাইতেই লোকটি বলল : দুটি পয়সা কেন, আমি তোমাকে পাঁচ আনা দিতে পারি যদি আমার সংগে থেকে কাজের যোগাড় দাও।

পুতুলকুমার ঠোঁট বেঁকিয়ে বলল : সে আমি পারব না।

রাজ বলল : তাহলে বরং দুটো হাই তুলে তাই খেয়ে পেট ভরো গে। দেখো যেন বদহজম না হয়।

হাসতে হাসতে রাজ চলে গেল। কাজীগাঁয়ের একি আপদ রে বাবা! পুতুলকুমার ক্ষিধের জ্বালায় ছটফট করতে লাগল।

দুই বাল্তি জল হাতে নিয়ে পথ চলেছে একটি মহিলা। তাকে দেখে পুতুলকুমার বলল : আমাকে একটু জল দেবে?

মহিলা বলল : বেশ তো খাও।

জল খেয়ে পুতুলকুমার বলল : আমার বেজায় ক্ষিধে পেয়েছে।

—খেতে আমি তোমাকে দিতে পারি সরু চালের ভাত, যদি তুমি এই দু বালতি জল আমার বাড়ীতে পৌছে দাও।

পুতুলকুমার জলের বালতির দিকে চেয়ে চুপ করে রইল, হাঁ না কোন জবাবই দিল না।

—শুধু ভাত নয়, সাথে দেব পুঁটিমাছের ঝোল।

পুতুলকুমার তবু চুপ। বালতি দুটি যা ভারী।

—ভেবে ছাখো খোকা, তার সাথে দেব কাজলী গাইয়ের ঘন দুধ আর নতুন গুড়ের পাটালি।

পুতুলকুমার আর লোভ সামলাতে পারল না। বলল : বেশ, জল দু বালতি তোমার বাড়ী পৌছে আমি দেব।

মাথায় করে সে বালতি দুটোকে একে একে পৌছে দিল মহিলার বাড়ীতে। মহিলাও তাকে

পেট ভরে খেতে দিল সরু চালের ভাত, পুঁটিমাছের ঝোল, ঘন দুধ আর পাটালি। খেয়েদেয়ে খুশি হয়ে পুতুলকুমার মহিলাকে ধন্যবাদ দেবার জন্য তার মুখের দিকে চাইতেই—অবাক হয়ে গেল সে। একি সত্যি না স্বপ্ন!

পুতুলকুমার কাতর গলায় বলল: তুমি……তুমি……তুমি কি সেই?……ঠিক সেই চোখ

…সেই গলা……সেই নীল চুল……বল…বল…তুমিই নীলপরী……আমার নীলপরী……বল…বল…আমায় আর কাঁদিও না……অনেক দুঃখ আমি পেয়েছি……

বলতে বলতে পুতুলকুমার মহিলাটির দু'পা জড়িয়ে ধরে হাউ-হাউ করে কাঁদতে লাগল।

মহিলাটি ওকে সাদরে তুলে ধরে বলল: হ্যাঁগো হ্যাঁ, আমিই তোমার নীলপরী। তুমি আমাকে চিনতে পেরেছ তা হলে?

—কেন চিনতে পারব না? আমি যে তোমাকে ভালবাসি। তবে হ্যাঁ, তুমি অনেক বড় হয়ে গিয়েছ এখন। ছিলে এতটুকু মেয়ে, হয়েছ এত বড় এক মহিলা।

—হ্যাঁ, একেবারে তোমার মায়ের বয়স, না?

—সত্যি। এবার থেকে তোমাকে মা বলেই ডাকব, কি বল?

—সেই ভাল।

একটু পরে পুতুলকুমার বলল: আমার বড় অবাক লাগছে, তুমি এত বড় হলে কেমন করে?

নীলপরী বলল: সে এক গোপন কথা।

—আমাকে শিখিয়ে দাও না সেই গোপন কথা। আমি এবার বড় হতে চাই।

—তুমি তো বড় হতে পারবে না।

—কেন?

—কারণ, পুতুলরা কখনো বড় হয় না। তারা চিরকালই খোকা-পুতুল।

—না না, আমি আর পুতুল হয়ে থাকতে চাই না। এবার আমি মানুষ হতে চাই!

—চাইলেই তো হয় না। তার জন্য চাই সাধনা।

—কেমন সাধনা?

—খুব সহজ। ভাল ছেলে হতে শেখো।

—আমি কি ভাল ছেলে নই?

—মোটেই না। বরং উলটো। ভাল ছেলেরা গুরুজনের কথা শোনে। আর তুমি?

—আমি কখনো তাদের কথা শুনি না।

—ভাল ছেলেরা লেখাপড়া পরে, কাজকর্ম করে। আর তুমি?

—আমি সারা বছর হৈ-হৈ করে বেড়াই।

—ভাল ছেলেরা সদা সত্য কথা বলে।

—আমি বলি সদা মিথ্যে কথা।

—ভাল ছেলেরা মনের সুখে পাঠশালায় যায়।

—পাঠশালায় যেতে আমার মাথায় বাজ পড়ে :······তবে তোমাকে বলছি নীলপরী, এবার হতে আমি ভাল ছেলে হব।

—ঠিক বলছ?

—ঠিক।

—আমার কথা শুনবে? আমি যা বলব তাই করবে?

—হ্যাঁ।

—কাল থেকে নিয়মিত পাঠশালায় যাবে?

—যাব—যাব—যাব—

দেখতে দেখতে একটি বছর কেটে গেল।

পুতুলকুমার এবার তার কথা রেখেছে। সত্যি সে ভাল ছেলে হয়েছে। বার্ষিক পরীক্ষায় সে প্রথম হ'ল। তার চলনে—বলনে সবাই খুশি।

নীলপরীর খুশি আর ধরে না। একদিন সকালে পুতুলকুমারকে ডেকে সে বলল: কাল তোমার মনের সাধ পূর্ণ হবে।

পুতুলকুমার শুধাল : কি সাধ ?

—কাল হতে তুমি আর পুতুল থাকবে না, তুমি হবে একটি মানব-শিশু।

—ওঃ, কাল থেকে আমি মানুষ হব!—খুশিতে লাফিয়ে উঠল পুতুলকুমার। নীলপরীকে প্রণাম করল চোখের জলে ভেসে।

নীলপরী বলল : কাল তোমার পাঠশালার সাথীদের এখানে খেতে বলে এস। সবাইকে বলবে। কেউ যেন বাদ না পড়ে।

—তাই হবে, তাই হবে। ছোট খরগোসের মত লাফাতে লাফাতে পুতুলকুমার চলে গেল সবাইকে শুভ খবরটা জানাতে। কাল যে তার নব-জীবনের শুভদিন!

কিন্তু—মাঝে মাঝে একটা 'কিন্তু' এসেই তো সব গোলমাল করে দেয়। কারণ—

না, সে কাহিনী আজ আর নয়। আর একদিন শোনাব, কেমন? (ক্রমশঃ)

খোকা

শ্রীপ্রভাকর মাঝি

খোকা—খোকা—খোকা।
খোকার নামটি রয়েছে সব মনের খাতায় টোকা।
তাইতো সাঁঝে নিত্যি দেখি খোকন-সোনার তরে,
এক দুই তিন তারার পিদিম জ্বলছে নীলাম্বরে।
খোকার তরে কুলকুলিয়ে শিলাই নদী বয়,
বাউল-বাতাস কানে কানে কোন্ কথাটি কয়!

খোকা—খোকা—খোকা।
এতোটুকু ছেলের গুণের নাই যে লেখাজোখা।
ফুলকো গালে টোল খেয়ে যায় সাত সাগরের ঢেউ,
হাসিতে তার মুক্তা ঝরে—কেউ দেখেছো, কেউ?
হৈ হুল্লোড় করে যখন নাচিয়ে দুটী হাত
মনে হয়, ও খোকা তো নয়—খোকন-পারিজাত।

খোকা—খোকা—খোকা।
মেধোর মতো হাঁদা ও নয়, কেলোর মতো বোকা।
আঁকতে পারে ফিঙের ছবি, লিখতে-পারে ছড়া,
একটা জিনিষ বাকি কেবল উড়োজাহাজ চড়া।
অয়-অজগর সাপটাকে আর করেই না তো ভয়,
মস্ত বড় বই পড়ে সে বর্ণ-পরিচয়।

পরোপকার

শ্রীলীনা দত্তগুপ্তা

তিনকড়ি বাবু অতি নিয়মনিষ্ঠ ব্যক্তি, বিশেষ করে অফিসের ব্যাপারে। আর কোথায়ই বা যান তিনি অফিস ছাড়া? আত্মীয় স্বজন? ও বাবা, ও-সব ঝামেলা তিনি পছন্দ করেন না মোটেই। কেবল অফিস আর বাড়ী—বাড়ী আর অফিস। কারো কোন নিমন্ত্রণেও যান না তিনি,—সে যত নিকট আত্মীয় বা বন্ধুই হোক না। এজন্য অনেকেই অনেক রকম বাক্যবাণ ছোঁড়েন, কিন্তু সে সব তাঁর কর্ণে প্রবেশ করলেও মর্ম্ম স্পর্শ করতে পারে না। সামাজিকতা—লৌকিকতা—নেহাৎ যা না করলে নয়—তাও তার স্ত্রী করেকম্মে পুষিয়ে নেন।

তিনকড়ি বাবুর নিয়মিত ঠিক সাড়ে ন'টায় অফিসে হাজির হতে পারলেই হ'ল। পৃথিবী রসাতলে গেলেও এর নড়চড় হয় না কখনও। স্বাস্থ্য তার বেশ ভালই। অসুখ-টসুখ হয় না বড়। যদিই বা হয়, দুধ বার্লি খেয়েও অফিসে তিনি যাবেনই। বাড়ীতে কারো বেশী অসুখ হলে ঘণ্টায় ঘণ্টায় 'ফোন' করে খবর নেবেন, তবুও অফিস কামাই করবেন না। এহেন ব্যক্তি তিনকড়ি বাবু—হঠাৎ সেদিন পাশের বাড়ীর জামাই সুধীরের প্রতি কৃপা-পরবশ হয়ে পড়লেন।

পাশের বাড়ীর বটুক বটব্যালের সঙ্গে বহুদিনের জানাশোনা। বন্ধুত্বও বলা যায়, অবিশ্যি অন্দর মহলের তরফ থেকে। সেই ভদ্রলোকটি অসুস্থ হয়ে পড়ায় জামাই সুধীর তাকে দেখতে এসেছে কলকাতা থেকে। আজ ফিরে যাচ্ছে। তার শাশুড়ী দুঃখ করছিল তিনকড়ি বাবুর স্ত্রীর কাছে,—নতুন জামাই, নতুন এসেছে এ দেশে, বাছাকে স্টেশনে গিয়ে গাড়ীতে উঠিয়ে দিয়ে আসবে, এমন একটি লোক নেই। বটুক-গিন্নির ঐ খেদোক্তি নিজের গিন্নীর মুখ থেকে শুনে তিনকড়ি বাবু লাফিয়ে উঠলেন,—"তার আর কি,—এতে ভাববার কি আছে? আমিই উঠিয়ে দিয়ে আসব'খন বয়ে মেলে।"

তিনকড়ি ভাববার কিছু নেই বলে আশ্বাস দিলেও তাঁর স্ত্রী কিন্তু রীতিমত ভাবিত হয়ে পড়লেন; বললেন,—"সে কি,—তুমি? তুমি যাবে স্টেশনে? তুমি কি জান, কোন্ গাড়ী কখন কোন্ প্ল্যাটফরম থেকে ছাড়ে? আজ পনের বছরের মধ্যে একটিবারও তো তুমি রেল স্টেশনের ধার মাড়াওনি; তা ছাড়া তোমার অফিসের দেরী হয়ে যাবে না?"

তিনকড়ি বাবু চটেমটে চেঁচিয়ে উঠলেন—"না—না, লেট্ হবে না। ওকে গাড়ীতে তুলে দিয়ে অমনি অফিস চলে যাব। পরের একটু উপকার করতে গেলে কেন যে তুমি বাধা দাও বুঝতে পারিনা।"

তিনকড়ি বাবুর গিন্নী হাসবেন না কাঁদবেন ভেবে পান না। গালে হাত দিয়ে বললেন,—

"ও—মা—তুমি পরের উপকার করতে গেলে বাধা দোব আমি? কবে কার উপকার করতে গিয়েছিলে শুনি? মাথা কুটে মরলে একটা অনুরোধ রাখ না—তা আবার—"

গিন্নীর গলার স্বর উদারা থেকে তারায় উঠতে দেখে—হাত নেড়ে তাকে থামতে বলে চট্ করে ওবাড়ীর দিকে পা বাড়াচ্ছেন তিনকড়ি, এমন সময় সুধীর এসে হাজির।

সব শুনে সুধীর বেচারী লজ্জিত হয়ে বলল,—"সে কি?—না—না, আমার সঙ্গে কাউকেই যেতে হবে না। কি আশ্চর্য্য! আমি কি ছেলেমানুষ? আপনি কেন কষ্ট করতে যাবেন মিছি-মিছি!"

কিন্তু কার কথা কে শোনে? তিনকড়ি বাবুর পরোপকার স্পৃহা মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে। প্রতিবেশীর এ উপকারটুকু আজ তিনি করবেনই—এ সুযোগ তিনি ছাড়তে রাজী নন।

হুড়োহুড়ি করে, স্নান খাওয়া সেরে স্যুটকেশ বেডিং শুদ্ধ জামাই সুধীরকে নিয়ে এক টাঙ্গায় চড়ে স্টেশন অভিমুখে রওনা হলেন তিনকড়ি। সারা রাস্তা অফিসে তাঁর কতখানি কর্তৃত্ব এবং কৃতিত্ব সে সম্বন্ধে অনর্গল ঝড়ের বেগে বক্তৃতা দিয়ে চলেছেন। জামাই সুধীর নিশ্চুপ শুনে যাচ্ছে। না শুনেই বা উপায় কি? কি আর সে করতে পারে বল!

স্টেশনে এসে পড়তে গাড়ীর গতির সঙ্গে সঙ্গে তিনকড়ি বাবুর বাক্যস্রোতের গতিও থেমে এল। হঠাৎ হাতঘড়িতে নজর পড়তেই চেঁচিয়ে উঠলেন, "এঃ—হে—হে! ন'টা যে বেজে গেছে—চল, চল, শীগ্‌গীর চল—" বলে মালপত্র কুলীর মাথায় চাপিয়ে সুধীরকে নিয়ে তিনি রীতিমত ছুট লাগালেন প্ল্যাটফর্মের দিকে।

এক নম্বর প্ল্যাটফর্মে একখানা গাড়ী দাঁড়িয়ে আছে দেখে তিনি আঙুল দিয়ে দেখিয়ে সুধীরকে বললেন,—"ওহে এই যে এই গাড়ী—এই গাড়ীতে মালপত্তর নিয়ে উঠে পড়। বাঃ, বেশ ফাঁকা আছে ভেতর গুলো। উঠে বেশ, গুছিয়ে নিয়ে বসে পড়—উঃ, বড্ড দেরী হয়ে গেল আমার—" এক নিঃশ্বাসে গড়-গড় করে কথাগুলো বলেই হাতটা একটু নেড়ে তিনি জামাতা বাবাজীকে হতভম্ব করে দিয়ে হাইফাই করে ছুট দিলেন।

এদিক ওদিক চেয়ে এটাই বম্বে মেল কিনা সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ দেখা দিল সুধীরের মনে।

সুধীরকে গাড়ীতে উঠতে ইতস্ততঃ করতে দেখে কুলী বলল,—"বাবু, আপ কাঁহা যায়েঙ্গে ?"

সুধীর বললে,—"কলকাতা।"

"আরে সাহাব, এ-তো দুসরা গাড়ী হ্যায়। বম্বে মেল উধার, তিন নম্বর প্ল্যাটফরমমে গাড়ি হ্যায়। চলিয়ে বাবুজী মেরে সাথ।" বলে কুলী মালপত্তর নিয়ে ওভারব্রিজ পার হয়ে বম্বে মেলের উদ্দেশ্যে রওনা হ'ল। সুধীরও চলল তার সঙ্গে। ওভারব্রিজ পার হতে না হতেই হুইস্‌ল দিয়ে বম্বে মেল ছেড়ে দিল।

সুধীর কি আর করে! আবার স্টেশনের বাইরে এসে একটা ট্যাক্সি ডেকে শ্বশুরবাড়ী ফিরে এল। জামাইকে আরও একটা দিন রাখতে পেরে বাড়ীর সবাই খুশীই হ'ল।

সন্ধ্যেবেলা তিনকড়ি বাবু অফিস থেকে বাড়ী ফিরছেন। অন্য দিন তিনি সন্ধ্যার আগেই বাড়ী আসেন, আজ একটা মিটিং ছিল বলে দেরী হয়ে হয়েছে। বাড়ীর কাছাকাছি আসতে আবছা অন্ধকারে সামনে পাশের বাড়ীর জামাই সুধীরকে দেখে হঠাৎ ভুত দেখার মতই তিনি চমকে উঠলেন। —এ-কি এঁ্যা! ওকে যে বম্বে মেলে তুলে দিয়ে এলাম। তবে কি—কথাটা কল্পনা করতেই মুহূর্ত্তে সারা গা ঘেমে উঠল তিনকড়ির। মনে মনে রাম রাম বলতে বলতে কাঁপতে লাগলেন তিনি। তার মনে তড়িৎগতিতে এই কথাটাই খেলে গেল, বম্বে মেল য্যাকসিডেণ্টে সুধীরের কিছু হয়েছে এবং এ—তারি—কি বলে—ইয়ে—! কিন্তু ও বাবা! সুধীরের ইয়ে যে এগিয়ে আসে তাঁর দিকে—দাঁত বের করে কি যেন বলছে ও। ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন তিনকড়ি বাবু, পা বাড়াবার ক্ষমতাটুকুও লোপ পেয়েছে তাঁর,—মনে হচ্ছে এখনই 'হার্টফেল' করবেন, নয়তো অজ্ঞান হয়ে পড়ে যাবেন। কিন্তু সুধীর তাঁকে পড়তে দিল না, তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসে ধরে ফেলল,—"এ-কি! আপনার মাথা ঘুরছে না-কি? মুখখানা এমন হয়ে গেল কেন?"

তিনকড়ি বাবু অতি কষ্টে বললেন,—"ওঃ! এই তো তোমার হাত বেশ গরম—তা—তা হলে ট্রেন য্যাকসিডেণ্টে তোমার কিছু হয়নি বল! তা হলে তুমি ভালই আছ, মানে সুস্থই আছ?"

তিনকড়ি বাবু কি অনুমান করেছেন বুঝতে পেরে সুধীর হো হো করে হেসে উঠল—"না না, আমি মরিনি। বেশ সুস্থ শরীরে ভালই আছি। আপনি আমায় ভুল গাড়ীতে উঠতে বলেছিলেন।" তারপর সব কথা সে তিনকড়ি বাবুকে খুলে বলল। সব শুনে তিনকড়ি বাবু মনে মনে ভাবলেন—নাঃ! কারো উপকার করা তার অদৃষ্টে নেই—নইলে এমন হয়? প্রতিবেশীর উপকার করার যে আনন্দটুকু তার মনকে খুশী করে রেখেছিল, নিমেষে তা অন্তর্হিত হ'ল।

একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে তিনকড়ি বাবু শুধু বললেন,—"যাক্ তুমি বেঁচে আছ তা হলে? আঃ—আমিও বাঁচলুম।"

চশমা

শ্রীমায়া দেবী

বাড়ীর সবারই চশমা আছে ; এমন কি ছোট পিসির পর্য্যন্ত। নেই শুধু অমলার। মার যদি চশমা পরবার দরকার না হয়, সে তার কি করতে পারে ? আর খোকন তো এখনো অ. আ. ক. খই চিনলো না। ও চশমা দিয়ে করবে কী ?

অমলা শোনে চোখের দোষ হলেই নাকি চশমা নিতে হয়। যদি সত্যিই তাই হবে, তাহলে ছোটকাকুর চোখে একটুও দোষ হয়নি। নতুবা ছোটকাকু বই পড়বার সময় কখ্খনো চশমা খুলে রাখতে পারতো না। সে অনেক দিন দেখেছে, ছোটকাকু চশমা খুলে রেখে বই পড়ে।

অমলা যদি বলে, তার চোখে দোষ হয়েছে, অমনি সবাই হেসে অস্থির হয়। সব চেয়ে বেশী হাসে ছোটপিসিটাই। এই জন্যেই তো তার ওপর অমলার এত রাগ। ছোটপিসির সব কিছুতেই খালি হাসি। অমলার ব্যাপার নিয়ে তার এত হাসি কেন ? ভেবে পায় না সে। ছোটকাকুও তা বলে কম যায় না।

অথচ অমলা অনেকবার লক্ষ্য করেছে, এক দৃষ্টে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকলে চোখ বেশ জ্বালা করে। জলও আসতে চায় একটু একটু। ঘুম থেকে উঠে আয়নায় সে দেখেছে চোখ দুটো কেমন লাল ফোলা ফোলা হয়ে থাকে। তবুও সবাই বলবে তার চোখে দোষ হয় নি, তার চশমা পরবার সখ হয়েছে ! তার বেলাতেই সকলের ঠাট্টা আর গাফিলতি। অমলার দুঃখও কম হয় না রাগের চেয়ে।

ঠাকুমা আছেন তাই রক্ষে। নইলে এ বাড়ীতে অমলার তিষ্ঠনোই দায় হতো। সবাই যখন তাকে ক্ষেপিয়ে অস্থির করে তোলে, ঠাকুমার ধমকই বাঁচিয়ে দেয় তখন তাকে। তাঁর কোলেই মাথা গুঁজে অমলা পিসি আর কাকুর আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষা করে।

সবাইকে যদি সে চশমা পরতে দেখে, তাহলে তার চশমা পরবার সখ হবেই বা না কেন ? সখ যদি একটু হয়ই তাতে কী এমন ক্ষতি সকলের ? সেদিন অমলা বলেছিলো, দাও না ছোটপিসি, তোমার চশমাটা একটু পরি।

আর যায় কোথায় ? ছোটপিসি চশমা তো দিলোই না, উল্টে তাকে হিড়্ হিড়্ করে টানতে টানতে নিয়ে গেলো বাবার কাছে। আবার বললো কিনা, দেখো বড়দা তোমার মেয়ের সখ, আমার চশমাটাই নাকি একবার পরতে হবে। নাঃ ! এবার ওকে একটা চশমা না দিলেই নয়। আর খোকনই বা বাদ যাবে কেন ? তাকেও একটা দিয়ো। ছোটপিসির হি হি করে সেই কী হাসি !

বাবা কিছু বললেন না অবশ্য, কিন্তু এমনি হাসলেন যে লজ্জায় অমলার মাথা মাটির সঙ্গে মিশে যেতে চাইছিলো।

সে জোর করে পিসির হাত ছাড়িয়ে দৌড়ে চলে গেলো চিলে কোঠায়। অমলা ভেবেছিলো, আর কিছুতেই নামবে না সেখান থেকে, শত ডাকলেও না। কিন্তু একটু পরে ছোটপিসি এসে হিড়্ হিড়্ করে টানতে টানতে নামিয়ে নিয়ে গেলো একেবারে ঠাকুমার কাছে। তাঁর কাছে গিয়ে পড়লে কি আর রাগ করে থাকবার উপায় আছে? সেদিন অমলা প্রতিজ্ঞা করেছে, যেদিন সে ছোটপিসির মত বড় হবে, সেদিন তার এ ব্যবহারের প্রতিশোধ অমলা নেবেই নেবে। চশমাটা একটু পরতে চেয়েছিলো বলে এতো অপমান করা কি উচিত হয়েছে ছোটপিসির?

এর পর যতই দিন যেতে লাগলো, ছোটপিসির ওপর থেকে অমলার রাগও কমে আসছিলো ততো। ছোটপিসি একটু বিরক্ত করে অবশ্য, ভালও কিন্তু কম বাসে না। কলেজ থেকে আসবার সময় তার জন্যে লজেন্স, চকোলেট কিনে আনে প্রায়ই। কত সুন্দর সুন্দর রঙীন ছড়ার বই কিনে দেয়। নতুন ডিজাইনের জামা দেখলেই তৈরী করে পরায় তাকে। কোথাও বেড়াতে গেলে সাজিয়ে দেয় সুন্দর করে। চুলের ফিতেটাও পিসি না বেঁধে দিলে পছন্দ হয় না।

ছোটপিসির সে দিনের ব্যবহারের কথা বেমালুম ভুলে গেলো অমলা। আজকে আবার তার চশমা চোখে দেবার সাধ জাগলো নতুন করে। তাকে আজ চশমা পরতেই হবে, যেভাবে হোক। আর শুধু পরলেই চলবে না, পরে স্কুলেও যেতে হবে। স্কুলের, অন্ততঃ ক্লাসের মেয়েরাই যদি না দেখলো, তবে চশমা পরার সার্থকতা কি?

অমলা ভাবতে সুরু করলো, কি ভাবে আর কার চশমাটাই বা নেওয়া যায়। সকলেই তো যে যার চশমা বিশেষ সাবধান করে রাখে। তবে বাবা আর ছোটকাকুরটা তো এক দম বাদ। কারণ চওড়া কালো ফ্রেমের চশমা তাদের। পরলে কেমন যেন পেঁচা পেঁচা দেখায়। তার মুখে আরও বিশ্রী লাগবে। ছোটপিসিরটাই সব চেয়ে ভালো, সোনালী ফ্রেমের, কাচের সাইজটাও দেখতে বেশ। কিন্তু সেটা কি আর পাবার উপায় আছে? এক স্নান করবার সময় যা একটু খোলে চোখ থেকে। তাও বাথরুমে তাকের ওপর রেখেই স্নান করে ছোটপিসি। রাত্রে অবশ্য খুলে রাখে, তখন যে অমলা ঘুমিয়ে পড়ে। আবার সে ঘুম থেকে ওঠবার আগেই ছোটপিসি পড়তে বসে যায় চশমাটা চোখে এঁটে। থাকগে, ঠাকুমারটাই পরা যাবে একটু, যদিও কাঁচগুলো কেমন যেন লম্বা ধরনের, ফ্রেমটা রূপালী রংয়ের। কিন্তু কি আর করা যাবে? তবু তো ঠাকুমার চশমাটা ইচ্ছে করলে একটু চোখে দিতে পারবে সে।

অমলা দেখলো, ঠাকুমা পূজো সেরে বাবার সঙ্গে গল্প করছেন ও-ঘরে। চশমাটা থাকে ঠাকুরঘরে তাকের ওপর। এইবেলা চশমাটা পেনসিলের বাক্সে রেখে দেওয়া যাক্। পেন্সিল জলন্যাকড়ার কৌটো ইত্যাদি স্কুলে নিয়ে যাবার জন্যে অমলার একটা সাবানের বাক্স আছে।

খাপসুদ্ধ চশমাটা বাক্সে পুরে অমলা ঘড়ির দিকে চেয়ে দেখলো মাত্র নয়টা বাজে। মতিদি (স্কুলের ঝি) আসতে এখনও দেড় ঘণ্টা বাকী। তাড়াতাড়ি বাড়ী থেকে বেরিয়ে পড়া দরকার, নইলে চশমার খোঁজ পড়লে তাকেই সকলে সন্দেহ করবে।

তাড়াতাড়ি স্নান সেরে, রান্না ঘরে খেতে বসলে মা বললেন, কি রে, আজ যে এত তাড়া? রোজ তো মতি এসে আধ ঘণ্টা বসে থাকে তোর জন্যে।

অমলা গম্ভীর হয়ে বললো, এখন থেকে খেয়ে, জামা-জুতো পরে রেডি হয়ে থাকবো রোজ।

—সেতো খুব ভাল কথা। মা খুসী হয়ে বললেন।

অমলা যখন বাড়ী থেকে বেরুলো তখন মাত্র সাড়ে নটা বাজে। তাদের বাড়ীর আগে বারোয়ারী দুর্গা পূজার ঠাকুর দালান, সেখানে এসে বসে রইলো সে। বসে থাকতে থাকতে যেন পিঠ ব্যথা হয়ে গেলো। আজকে অমলার সব কাজ সারা হয়ে গেছে কি না, মতির আসতে দেরী তো হবেই। অন্যদিন যেই সে ভাত খেতে বসে অমনি মতি এসে হাজির হয়, অমলার বুক থেকে ভাত নামতে চায় না যেন, জল দিয়ে ভাত গিলতে হয়।

হঠাৎ অমলা চিন্তা করলো, চশমাটা চোখে দেবে কখন? মতিদিকে দেখতে পাওয়া মাত্র চোখে দিতে হবে। নইলে বাড়ীর কারো চোখে পড়ে যেতে পারে।

অমলা ভাবতে সুরু করলো, কী ভঙ্গিতে হাঁটবে সে চশমাটা চোখে পরে। স্কুলের গেটের সামনে যখন যাবে তার মনটাই বা কতখানি গর্ব্বে ভরে উঠবে তখন! মেয়েরা কেমন করে তাকিয়ে থাকবে তার দিকে! আজ কিন্তু সে সকলের কাছে একেবারে তুচ্ছ নয়, তার চোখেও চশমা থাকবে একটা। না হয় হলোই সে ক্লাস ওয়ানের ছোট্ট একটা মেয়ে।

তার ক্লাসের ফার্ষ্ট গার্ল মাধুরী যদি জিজ্ঞাসা করে, অমলা তুই চশমা নিয়েছিস্ নাকি? অমলা তার কথার কোন উত্তরই দেবে না। মুখ ঘুরিয়ে বসে থাকবে। ইন্‌ফেণ্ট ক্লাস থেকে ফার্ষ্ট হয়ে উঠেছে বলে ভারি অহঙ্কার মাধুরীর। অহঙ্কার করতে অমলাও যে জানে, আজ তা বুঝিয়ে দিতে হবে মাধুরীকে।

আর যদি উমাদি জিজ্ঞাসা করেন? কি বলবে সে? মিথ্যা কথা যে বলতে নেই। তা'ছাড়া অনেক উঁচু ক্লাসে পড়লেও উমাদি কী ভালবাসে তাকে! কিছু বলবে না উমাদিকে, ছুটে পালিয়ে যাবে তার কাছ থেকে অমলা।

কিন্তু ক্লাস টীচার লতিকাদি যখন জিজ্ঞাসা করবেন, কি বলবে সে? নাঃ, আর ভাবতে পারা যায় না। তখন যা হয় বলা যাবে একটা।

এমনি সময়ে অমলা দেখলো পাঁচিল ঘেরা বাগানের ফটক পার হয়ে মতি আসছে। তাকে দেখতে পেয়ে বাক্স খুলে চশমাটা পরে নিলো ঠিক করে। হাত নেড়ে মতিকে আর আসতে মানা করে হাঁটতে সুরু করলো সে। কিন্তু একি? সামনের জায়গাগুলো এমন উঁচু নীচু মনে হচ্ছে কেন?

সামনের দিকে পা বাড়াতে গেলেই পড়ে যাবার উপক্রম কেন হয়? মাথাটাও যে ঘুরতে আরম্ভ করেছে। সব ঝাপসা দেখাচ্ছে। বমি আসতে চাইছে পেটের ভিতর পাক দিয়ে। চশমাটা চোখে পরেই কি এমন হলো? এত কষ্ট করেই কি সবাই চশমা পরে? কি করা যায় কিছুই ভেবে পাচ্ছে না অমলা। মনে হলো চশমাটা চোখে দেবার পর থেকেই এমনি হচ্ছে। একটু আগেও তো তার শরীর বেশ ভাল ছিলো। চশমাটা চোখ থেকে খুললেই সব ঠিক হয়ে যাবে। কিন্তু খুলতে যে লজ্জা করছে! মতিদির সঙ্গে যে মেয়েরা রয়েছে, তারা যদি অমলার চোখে চশমাটা দেখে থাকে!

যেখানে বাঘের ভয়, সেখানেই রাত হয়। তখনই অমলার ছোট কাকা কলেজে যাচ্ছিলো। অমলার দিকে চোখ পড়তেই হেসে ফেল্লো সে,—কিরে, মায়ের চশমাটা পরেছিস্ তো! এক্ষুণি আছাড় খেয়ে মরবি যে।

সে অমলার কাছে এসে তার চোখ থেকে চশমাটা খুলে নিলো।

অমলা যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলো। আজকে তার চশমা পরার জন্যে হাসলে পরও ছোটকাকুর ওপর রাগ হলো না একটুও। ভাগ্যিস্ ছোটকাকু এসেছিলো, নইলে কি করতো সে?

চশমাটা খুলে নেবার পরও অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত সব ঝাপসা হয়ে রইলো অমলার কাছে। ছোটকাকুর কোচার খুঁট দিয়ে বেশ করে চোখ দুটো মুছে নিয়ে সে বড় বড় চোখ করে চাইলো চারদিকে। বাব্বাঃ! এমন চশমাও লোকে পরে!

দক্ষিণাপথের যাত্রী

শ্রীসাধনা চট্টোপাধ্যায়

কলিকাতা হইতে মাদ্রাজ; মাদ্রাজ হইতে মাদুরা আর মাদুরা হইতে ত্রিবেন্দ্রম। যাত্রা একটানা নহে, মাঝে মাঝে যথেষ্ট বিরতি আছে। ম্যাপখানা খুলিয়া বসিলেই বুঝিতে পারিবে দূরত্বের অঙ্ক; ভারতবর্ষের একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্তে। এখন অবশ্য হাওয়া-জাহাজে চড়িয়া অনেক অল্প সময়ে কলিকাতা হইতে ত্রিবেন্দ্রম পাড়ি দেওয়া চলে, কিন্তু আমার সেরূপ ভ্রমণ ভাল লাগে না। যাত্রাপথের মনোহর দৃশ্যগুলিই যদি না দেখা যায়, তবে আর ভ্রমণের কি অর্থ থাকে?

আমি আজ কন্যাকুমারিকার কথা বলিব। সারা ভারতবর্ষের কথা উঠিলেই লোকে বলে হিমালয় হইতে কন্যাকুমারিকা, অর্থাৎ উত্তরে হিমালয় হইতে সুরু করিয়া দক্ষিণের শেষপ্রান্ত কন্যাকুমারিকা পর্য্যন্ত। কন্যাকুমারিকা দক্ষিণ ভারতের শেষসীমা। সম্মুখে ভারত মহাসাগর, বামে বঙ্গোপসাগর, আর দক্ষিণে আরব সাগর—এই তিন মহাসাগর ও সাগরের জলে স্নান করিয়া কন্যাকুমারিকার অপরূপ মূর্তি।

ঠিক সন্ধ্যায় আমরা ত্রিবেন্দ্রম পৌঁছিলাম। সকালে মাদুরা ছাড়িয়াছি : সারাদিন গাড়ীতে কাটিয়াছে। শীতকাল, ডিসেম্বরমাস, কিন্তু এখানে শীতের লেশ মাত্র নাই, বরং গরমের দাহ অসহ্য। এমনি সমুদ্রের ধারে শীতের প্রকোপ থাকে না, তার উপর দক্ষিণ ভারতের শেষপ্রান্ত বিষুব রেখার নিকটবর্ত্তী।

ত্রিবেন্দ্রম হইতে কন্যাকুমারিকার দূরত্ব পঞ্চান্ন মাইল। সিমেণ্ট কংক্রিট বাঁধানো রাস্তা প্রায় ধূলিহীন। পরিবেশও মনোরম।

ত্রিবেন্দ্রম রেল ষ্টেশনের প্রাঙ্গণ হইতেই কন্যাকুমারিকার বাস্ ছাড়ে। আড়াই ঘণ্টার
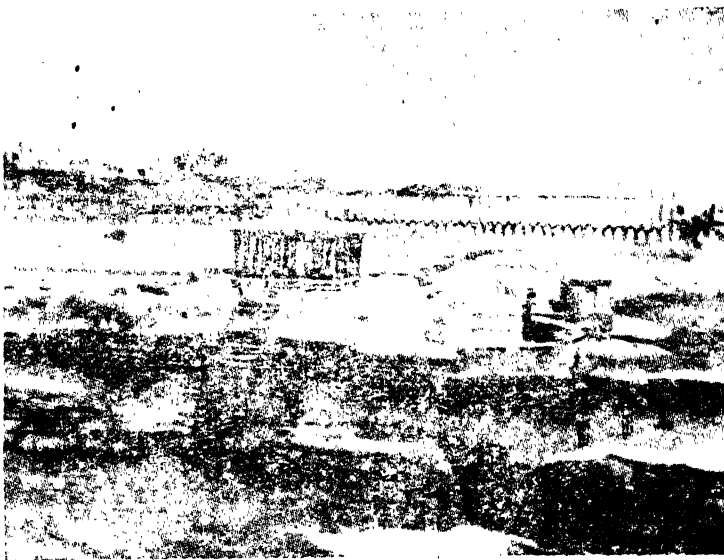
মাতৃতীর্থ

যাত্রা। বাস্-এর ব্যবস্থাও ভাল। ইহা সময়মত ছাড়ে, অনিয়মিত ভাবে রাস্তায় দাঁড়াইয়া পড়ে না, আর সময়মত পৌঁছায়। বসিবার ব্যবস্থাও উত্তম ; সিট পূর্ব্ব হইতেই রিজার্ভ করা চলে।

পথে চারিদিকে সবুজের শোভাসম্ভার। সতেজ, সবুজ ধানের ক্ষেত মাটির সহিত গলাগলি করিতেছে। পাশে কলাগাছের সারি আর তার পাশে ঘন নারিকেলকুঞ্জ। এদিকে ওদিকে পাহাড়ের চূড়া দেখা যাইতেছে ; কোনটি ধূসর, কোনটি শ্যামল। পথে কয়েকটি বাজার পড়িল ; তাহার মধ্যে সর্ব্বপ্রধান 'নাগের কয়েল।'

ক্রমে বাস্ কন্যাকুমারিকার নিকটবর্ত্তী হইল। এদিকে ওদিকে দুই-একটি বাড়ী। তারপর ছোট ছোট দোকান—চড়াই রাস্তা ; প্রায় পোষ্ট অফিসের কাছে আসিয়া চড়াই শেষ হইয়াছে। সেই

চড়াইএর শেষ সীমায় পৌছিয়া যে দৃশ্য চোখে পড়িল, তাহা কোনোদিন ভুলিবার নহে। বামে, দক্ষিণে ও সম্মুখে কেবল ফেনিল জলোচ্ছ্বাস। সম্মুখে ঢালু রাস্তা সোজা গিয়া যেন সমুদ্রের বুকে ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছে। পাশেই দেবী কন্যাকুমারিকার মন্দির; তাহার পর বিখ্যাত স্নানের ঘাট—মাতৃতীর্থ।

সরকারী বাস্ সরকারী হোটেলের প্রাঙ্গণে আসিয়া থামিল। আমাদের এখানেই থাকিবার কথা, কিন্তু পূর্ব্ব হইতে ঘর ঠিক করা হয় নাই। সেজন্য থাকিবার ব্যবস্থা করিয়া লইতে একটু সময় লাগিল।

এই হোটেলটি ছাড়াও এখানে সরকারী ডাকবাংলা আছে। আর আছে একটি বেসরকারী হোটেল ও ধর্ম্মশালা। ধর্ম্মশালায় নানা প্রদেশের তীর্থযাত্রীর সংখ্যা যথেষ্ট। তাহার মধ্যে বাংগালীর সংখ্যা অবশ্য বেশি নহে।

কন্যাকুমারিকা একটি ছোট গ্রাম মাত্র। গ্রামে বাজার নাই—অতি ছোট কয়েকটি দোকান আছে। দশ মাইল দূরবর্ত্তী 'নাগের কয়েল'এ সমস্ত দরকারী জিনিষ কিনিতে পাওয়া যায়। ফলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ সুমিষ্ট আনারস। আর আছে বহু প্রকারের কলা, তাহার মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা সুদৃশ্য জিনিষটিকে কিন্তু বিস্বাদ বলিয়া মনে হইল।

দেবী কন্যাকুমারী

কন্যাকুমারিকার প্রাকৃতিক দৃশ্য অতিশয় মনোরম। তিন দিক ঘেরিয়া অগাধ জলরাশি। তীরে মাঝে মাঝে নারিকেল গাছের সারি। তীর হইতে একটু দূরে সমুদ্রের মধ্যে কোথাও পাথর মাথা তুলিয়া জাগিয়া আছে। সর্ব্বাপেক্ষা চমৎকার সূর্য্যোদয় ও সূর্য্যাস্ত। এই সূর্য্যোদয় ও সূর্য্যাস্ত যে একবার দেখিয়াছে, সে আর সারা জীবনে তাহা ভুলিতে পারিবে না।

কন্যাকুমারিকা হিন্দুদিগের শ্রেষ্ঠ তীর্থের মধ্যে একটি। সমুদ্রের তীরে দেবীর মন্দির। মন্দিরটি বড় নহে কিন্তু মূর্ত্তিটি চমৎকার। এত সুন্দর জীবন্ত মূর্ত্তি বড় দেখা যায় না।

দেবী কুমারীর কল্পনাটিও চমৎকার। দেবী কুমারী মহাদেবকে পতিরূপে লাভ করিবার জন্য তপস্যা করিতেছেন। মহাদেবের বাস হিমালয়ে—কৈলাসে। দেবীর তপস্যার প্রভাব একদিন সেই সুদূর হিমালয়বাসী মহাদেবকে টানিয়া আনিবে এই আশা। সেই সাধনা, সেই তপস্যাই দেবী কুমারীর।

মাতৃতীর্থে স্নান হিন্দুদের বহু আকাঙ্ক্ষার বস্তু। পরশুরাম মাতৃহত্যা করিয়া মহাপাতক করিয়াছিলেন। সেই পাপ হইতে রক্ষা পাইবার জন্য তিনি এই তীর্থে স্নান করেন। এই স্নান-পুণ্যে তাঁহার মুক্তিলাভ হয়।

মাতৃতীর্থের স্নানের ঘাটটি বড়ই মনোরম। ঘাটটি একেবারে সমুদ্রের বুকে, কিন্তু ঘাটের তিনদিক ছোট বড় নানা প্রকারের পাথরে ভরা। ঘাটে ঢেউয়ের আঘাত লাগে না, আর লাগিলেও তাহার বেগ থাকে না। ঘাটের সিঁড়ি বাঁধানো; মনে হয়, পুকুরেই স্নান করিতেছি। ঘাটের উপর বসিবার জন্য একটি গোলাকৃতি চত্বর আছে, তাহার ছাদ পাথরের। বহুদূর হইতে সে চত্বরটি দেখা যায়।

দুইজন যুগ-বিপ্লবী বাঙ্গালী মহাত্মার পাদস্পর্শে এই ঘাট পবিত্রতর হইয়াছে। একজন শ্রীচৈতন্যদেব—নদের নিমাই, অন্যজন স্বামী বিবেকানন্দ। তীর হইতে কিছু দূরে সমুদ্রের মধ্যে দুইটি সম আকারের পাথর মাথা জাগাইয়া আছে। ইহাদের সঙ্গে স্বামীজীর নাম জড়িত। এই দুইটিকে বিবেকানন্দের পাথর বলা হয়। কথিত আছে, স্বামীজী নাকি এই দুইটি পাথরের উপর বসিয়া সন্ধ্যাপূজা করিতে ভালবাসিতেন।

গরুড়জী

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

চল্‌ছে যুদ্ধ—ভীষণ যুদ্ধ
নিত্য গজ ও কচ্ছপেতে,
লক্ষ্য করেন গরুড় পাখী
আকাশ-পথে যেতে যেতে।
দুইজনাকে বলেন ডেকে,
"বন্ধু, সবে শান্তিতে রও,
ভাবছো যত শক্তিশালী
মোটেই তা নও, মোটেই তা নও।"

বারণ বলে, "বাহন তুমি,
ছোট মুখে কি সব কথা।
মুখর চাকর দুর্বিষহ,
মৌন থাকাই সুবিজ্ঞতা।"
ঈষৎ হাসি গরুড় কহেন,
"একটু দাবী আমার আছে,
সতর্ক হও দম্ভী—থাকি
সর্ব্বশক্তিধরের কাছে।

ধ্বংস পথে আর ছুটো না, আমায় জেনো কুশলকামী,
চতুর্ভুজের চাকর বটি, চতুষ্পদের মনিব আমি।"

শ্রীরবিদাস সাহা রায়

(৪)

এবার নিধিরাম সর্দ্দারের কথা একটু বলি, কেমন ?

তার আবার গোঁফ গজাচ্ছে। কাজেই মন তার খুব খুশী।

নতুন গজানো ছোট ছোট গোঁফ রোজ আয়নায় দেখে আর গুন্ গুন্ করে গান গায়।

এমনি করে দিন যায় আর গোঁফ বাড়ে। শেষে সত্যি তার আগের মত গোঁফ গজিয়ে উঠল

নিধিরাম সর্দ্দারের আহ্লাদ আর ধরে না। সে প্রায় নাচতে নাচতে ছুটে গেল রাজার সভায়।

মন্ত্রী বললেন—উহুঁ, ঠিক আগের মত গোঁফ হয় নি। বলেই তিনি একটি ফিতে বের করে মাপতে লাগলেন।

মাপ শেষ হলে বললেন—ডাইনে দু' আঙুল আর বাঁয়ে দেড় আঙুল বড় হলে ঠিক আগের মত হবে।

নিধিরাম এবার রাজার পায়ে গিয়ে পড়ল—মহারাজ, আমাকে দয়া করুন। আমাকে সর্দ্দারী না দিলে উপোস করে মরব—মাথা কুটে মরব।

রাজার দয়া হ'ল। নিধিরামকে তিনি আবার সর্দ্দারী পদে বহাল করলেন।

আবার সর্দ্দার হ'ল নিধিরাম। এবার আর বাঁশের লাঠি নয়—এক হাতে বর্শা আর এক হাতে রামদা নিয়ে ঘুরে বেড়ায়। সৈন্যদের দেখাশোনা করে। সৈন্যদের হাতে আর বাঁশের লাঠি নেই। তাদের হাতেও বর্শা। রাজ্যের চেহারা যেন বদলে গেছে।

নিধিরাম কিন্তু বেচারামের উপর মোটেই খুশী নয়। সেই ইঁদুরের গর্ত্ত থেকে গোঁফ বার করার পর থেকেই নিধিরাম তাকে আর দু'চোখে দেখতে পারে না।

এখন নিধিরাম দিনরাত ভাবতে লাগল—কেমন করে বেচারামকে রাজার সভা থেকে তাড়ানো যায়।

এদিকে হ'ল কি, রাজার কাছে বেচারামের কদর দিন দিন বাড়তে লাগল। রাজা এখন বেচারামকে কাছে কাছে রাখেন। রাজার আর মন্ত্রীর সিংহাসনের কাছেই বেচারামের জন্য আসন তৈরী হ'ল।

দিন যায়, আর রাজা জিজ্ঞেস করেন—বেচারাম, সেই ভিন্ দেশী রাজা আজ কতদূর এগুল ?

বেচারাম আন্দাজেই বলে—এই মহারাজ, সাত ক্রোশ।

পরের দিন আবার জিজ্ঞেস করেন—আজ ক'ক্রোশ ?

—আজ তিন ক্রোশ।

মহারাজের মুখ আনন্দে ভরে ওঠে। বলেন—আজ এত কম কেন ?

—সৈন্যরা খেয়েছে, বিশ্রাম করেছে, ঘুম থেকে উঠতেও দেরী করেছে তারা। তাই বেশী পথ আজ এগুতে পারেনি।

পরের দিন আবার জিজ্ঞেস করেন রাজা—আজ ক'ক্রোশ ?

বেচারাম জবাব দেয়—আজ দশ ক্রোশ।

কথা শুনে রাজার মুখ শুকিয়ে যায়। আর কিছু জিজ্ঞেস করতে ভরসা পান না।

পরের দিন আবার জিজ্ঞেস করেন রাজা—আজ ক' ক্রোশ ?

বেচারাম জবাব দেয়—আজ মোটে এক ক্রোশ।

খুসী হয়ে রাজা জিজ্ঞেস করেন—আজ এত কম কেন ?

—হ্যাঁ মহারাজ, আজ একটা নদীর সামনে এসে তারা আটকে গেছে। পার হতে পারছে না।

—তাই নাকি ? রাজা আরও খুসী হয়ে ওঠেন। মন্ত্রীর দিকে চেয়ে বলেন—ওরা আটকে থাকলেই ভাল হয়, কি বলো মন্ত্রী ?

মন্ত্রী মুচকি হেসে জবাব দেন—তা কি আর বলতে ?

বেচারাম বলল—কিন্তু এরা বেশী দিন আটকে থাকবে না। শীগ্গীর নদী পার হবার ব্যবস্থা করবে।

রাজা অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন—কেমন করে ?

বেচারাম বলল—নৌকোর যোগাড় হলেই।

রাজা এবার ঘাড় নেড়ে বললেন—তা হলে ওদের খুব বুদ্ধি আছে বলতে হবে।

এমনি করে দিন যায়। মাস যায়। বছর যায়।

এদিকে সেনাপতি, কোটাল আর সর্দ্দাররা রামদা ও বর্শার বোঝা বয়ে বয়ে হাঁপিয়ে উঠেছে। বর্শাটাও ভারী আর রামদাটা এমন বেয়াড়া যে সেটাকে কোমরেও ঝুলিয়ে রাখা যায় না, হাতে ধরে ঘুরানোও চলে না। মহা মুস্কিল।

তারা প্রস্তাব করল—এর চেয়ে হাল্কা কোন অস্ত্রের আবিষ্কার করতে হবে।

তিন মাস ধরে রাজসভায় পরামর্শ চলল। কেউ কোন বুদ্ধি ঠিক করতে পারল না।

তখন রাজ্যের সব কামারদের ডেকে আনা হ'ল। মন্ত্রী জিজ্ঞেস করলেন সবাইকে—পারবে কোন অস্ত্র তৈরী করতে?

কেউ কিছু বলতে সাহস করল না।

এক বুড়ো কামার এগিয়ে এসে বলল—মহারাজ, আমি পারব।

রাজা খুসী হয়ে বললেন—বেশ, তোমায় পুরস্কার দেব।

একমাস একুশ দিন পর বুড়ো কামার একটা অস্ত্র এনে হাজির করল। অস্ত্রটি ঠিক রামদার মত লম্বা কিন্তু সরু। রামদার চেয়ে অনেক হাল্কা।

রাজা দেখে খুসী হলেন। খুসী হলেন সবাই।

সেনাপতি সেটাকে হাতে ধরে খানিকটা ঘুরিয়ে নিল। বাঃ! বেশ তো ঘোরানো যায়!

রাজা বুড়ো কামারকে একশো মোহর পুরস্কার দেবার আদেশ দিলেন।

বুড়ো কামার জীবনে এত মোহর কখনো চোখে দেখেনি। সে তো মহাখুসী।

রাজা তাকে আরো অস্ত্র তৈরী করতে আদেশ দিলেন।

বুড়ো কামার ভয়ানক চালাক। সে করল কি জানো? ঠিক একমাস একুশ দিন পর এক একটি অস্ত্র এনে হাজির করে, আর একশো করে মোহর পুরস্কার নিয়ে বাড়ী যায়। তার আগে আসে না কখনো। তাড়াতাড়ি এলে রাজার কাছে অস্ত্রের দাম কমে যাবে—পুরস্কার কম দেবে—সেজন্য আসে ঠিক একমাস একুশ দিন পরে।

একমাস একুশ দিন যায়, আর একটি করে অস্ত্র তৈরী হয়। এই অস্ত্রই হ'ল তরোয়াল। ছ'মাসে অস্ত্র তৈরী হ'ল মাত্র তিনটি।

প্রথম তরোয়ালটি রাজা নিজে দড়ি বেঁধে কোমরে ঝুলিয়ে রাখলেন। দ্বিতীয়টি মন্ত্রী আর তৃতীয়টি নিল সেনাপতি।

কোটালও একটি তরোয়ালের জন্য আবেদন জানাল।

তাকে তরোয়াল দেওয়া হবে কিনা সেজন্য গোপনে পরামর্শ সুরু হ'ল। কারণ তরোয়াল তো আর সবাইকে দেওয়া যায় না। তরোয়াল থাকা একটা মস্ত বড় সম্মানের চিহ্ন।

অনেক পরামর্শের পর ঠিক হ'ল কোটাল একটি তরোয়াল পাবে—সঙ্গে পাবে একটি ঢাল। কারণ নগর রক্ষার ব্যাপারে তাকে ঘোরাফেরা করতে হয়। কখন বিপদ ঘটে কে জানে? কাজেই ছোটখাট একটা ঢালও দরকার।

কোটাল তো ঢাল তরোয়াল পেল। এখন নিধিরামের হ'ল চক্ষুশূল। কোটাল ঢাল হাতে নিয়ে আর তরোয়াল কোমরে বেঁধে ড্যাং ড্যাং করে ঘুরে বেড়ায়। নিধিরাম জ্বলে মরে।

লোকে ক্ষেপায় নিধিরামকে—ঢাল নেই তরোয়াল নেই নিধিরাম সর্দার! নিধিরাম সত্যি ক্ষেপে উঠে।

হাতে লাঠি নিয়ে নিধিরাম গাঁয়ের পথ দিয়ে যায়। গাঁয়ের ছেলেরাও চেঁচিয়ে ওঠে—ঢাল নেই তরোয়াল নেই নিধিরাম সর্দার!

নিধিরাম লাঠি নিয়ে তেড়ে যায় ছেলেদের দিকে। ছেলেরা পালিয়ে যায় ঝোপের আড়ালে—বাড়ীর আনাচে কানাচে।

কিন্তু শাসন করে কি লোকের মুখ ঢাকা যায়? তাতে খারাপ হয় আরো। ধরো কেউ যদি তোমার কোন দোষ ধরে ক্ষেপায়, তখন কি তোমার উচিত তাকে মেরে বা জব্দ করে প্রতিশোধ নেওয়া? তা নয়। তোমার উচিত সে দোষ শুধরে নেওয়া। আর যদি সেটা শুধরে নেওয়া অসাধ্য হয়, তবে অন্য কোন গুণ দিয়ে সেটা ঢেকে লোকের সঙ্গে খুব ভাল ব্যবহার করবে। তবেই তারা পরাজিত হবে।

কিন্তু নিধিরামের ঘটে কি আর সে বুদ্ধি আছে?

ক্ষেপালেই যে ক্ষেপে গিয়ে লোককে আরো ক্ষেপাবার সুবিধে করে দিল। তারপর যখন দেখল কিছুতেই আর ঘরে বাইরে টেকা যায় না, তখন রাজার দরবারে গিয়ে হাজির হ'ল।

রাজসভায় রাজা বসে আছেন, মন্ত্রী বসে আছেন—বসে আছে তার পারিষদরা। এমন সময় নিধিরাম সেখানে গিয়ে হাজির হ'ল। মুখ গম্ভীর—কাঁদো কাঁদো।

রাজা জিজ্ঞেস করলেন—ব্যাপার কি?

মন্ত্রী জিজ্ঞেস করলেন—ব্যাপার কি?

নিধিরাম ভ্যাঁ করে কেঁদে ফেলল।

কান্না আর নালিশের পালা শেষ হলে নিধিরাম দাবী জানাল, তারও ঢাল তরোয়াল চাই, নইলে মান নিয়ে বাঁচতে পারবে না সে।

রাজা ও মন্ত্রী মহা ভাবিত হয়ে পড়লেন। সঙ্গে সঙ্গে জরুরী সভা ডাকা হ'ল।

নিধিরাম ঢাল তরোয়াল পাবে শুনে বেচারাম হিংসায় জ্বলে উঠল। সে বলল—মহারাজ, নিধিরামকে ঢাল তরোয়াল দেওয়া উচিত হবে না।

—কেন? মহারাজ জিজ্ঞেস করলেন।

—আমি গুণে দেখলাম, তা'কে অস্ত্র দিলে রাজবংশের হানি হবে।

—তাই নাকি? রাজা শিউরে উঠলেন। সর্ব্বনাশ! তা হলে ত কিছুতেই দেওয়া হবে না।

কিন্তু নিধিরাম বেপরোয়া। কেঁদেকেটে মহা কাণ্ড বাধিয়ে তুলল।

মন্ত্রী বললেন—কিছুতেই কি এর ব্যবস্থা করা যায় না?

বেচারামের মাথায় এবার একটা বুদ্ধি খেলে গেল। সে বলল—হ্যাঁ যায়, তবে সেই তরোয়ালটা আমাকে দিয়ে পরখ করিয়ে নিতে হবে।

—কি রকম? সবাই অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল।

'বেচারাম বলল—আমি নাকে শুঁকে দেখব—সেই তরোয়ালের ভেতর কোন দোষ আছে কিনা। যদি না থাকে তবে সেটা দেওয়া হবে নিধিরামকে। নইলে যে কোন তরোয়াল দিলে সে অনর্থ বাঁধিয়ে বসবে।

শেষে তাই স্থির হ'ল। বুড়ো কামারকে বলা হ'ল তরোয়াল তৈরী করতে। সে একমাস একুশ দিন পর একটি তরোয়াল এনে হাজির করল।

বেচারাম শুঁকে বলল—না, এতে চলবে না।

আবার একমাস একুশ দিন পর এনে হাজির করল আর একটি তরোয়াল। বেচারাম এবারও বলল—না, এটাতেও চলবে না।

বুড়ো কামার ভারী বেকুব বনে গেল। এমনটি তো আগে কখনো হয়'নি।

রাজা খবর দিলেন রাজ্যের সব কামারকে। হুড়মুড় দুড়দুড় করে তারা সব এসে হাজির হ'ল।

রাজা নিজের তরোয়ালটা দেখিয়ে বললেন—এরকম্ তরোয়াল তৈরী করতে হবে।

রাজার হুকুম। কামারদের ঘরে তরোয়াল তৈরী হতে লাগল। হাতুড়ির খটাখট্ শব্দ, লোহার ঝন্ ঝন্ কন্-কন্ শব্দ—কানে তালা লাগে। সেই শব্দে রাত্রে কেউ ঘুমুতে পারে না।

তরোয়াল তৈরী করে কামাররা দলে দলে আসতে লাগল রাজবাড়ীর দিকে। বেচারাম ভারিক্কী চালে বসে আছে।

এক একটি তরোয়াল এনে তার কাছে হাজির করে, আর সে নাকের কাছে নিয়ে বলে—না, এতে চলবে না। এমনি করে যত তরোয়াল তৈরী হয়েছিল, সবই গেল বাতিল হয়ে। কামারের দল মুখ নীচু করে যার যার বাড়ী চলে গেল।

এদিকে বেচারাম করল কি জানো? চুপি চুপি দু'একজন কামারকে ডেকে বলল—যদি কেউ দশটি মোহর, দশ ধামা ধান আমাকে ঘুষ দিতে পারো, তবে তার তরোয়াল আমি মঞ্জুর করতে পারি। কিন্তু সাবধান, এ ঘুষের কথা যেন কেউ রাজা বা মন্ত্রীর কাছে বলো না। তা হলে কিন্তু কারুর ঘাড়ে মুণ্ডু থাকবে না। জানো, আমি গুণতে পারি!

কামাররা সব গরীব। তারা কেমন করে দেবে মোহর আর ধান? কাজেই চুপ করে রইল। মুণ্ডু যাওয়ার ভয়ে রাজার কাছেও কেউ নালিশ করতে সাহস পেল না।

সেই বুড়ো কামার কিন্তু তার অপমানের কথা ভোলে নি। সে পুরানো একটা তরোয়াল ঘসে-মেজে ঝকঝক করে আবার নিয়ে চলল রাজদরবারে।

এবার সে করল কি জান? তরোয়ালের ধারালো দিকটায় কিছু তামাক পাতার গুঁড়ো মাখিয়ে নিল। বেচারামের কাছে গিয়ে বলল—হুজুর, এবার একটা খুব ভাল তরোয়াল এনেছি, পরখ করে দেখুন।

বেচারাম তার ট্যাঁকের দিকে তাকাল। অর্থাৎ ইসারায় জিজ্ঞেস করল—ঘুষের দরুন কিছু এনেছ কি না?

বুড়ো কামার ঘাড় নাড়ল। অর্থাৎ জানাল সে কিছুই আনে নি।

বেচারাম বিরক্ত হয়ে তরোয়ালটা নাকের কাছে নিয়ে শুঁকল। অমনি হ'ল কি, তামাক পাতার গুঁড়োর গন্ধ গিয়ে ঢুকল নাকের ভেতর।

যেই নাকে ঢোকা—অমনি হ্যাচ্চো—হ্যাচ্চো······হ্যা······ঘ্যাচ করে নাকটা গেল কেটে। হাউ মাউ করে কেঁদে উঠল বেচারাম।

ছুটোছুটি পড়ে গেল—হুড়োহুড়ি পড়ে গেল। রাজা ছুটলেন, মন্ত্রী ছুটলেন, ছুটল কোটাল আর সেনাপতি। কিন্তু বেচারামের নাক আর জোড়া লাগল না।

নিধিরাম সর্দ্দার এসে বলল—মহারাজ, নাককাটা লোককে রাজসভায় রাখতে নেই। অকল্যাণ হবে। তাড়িয়ে দিন্।

রাজা ভাবলেন—তাইতো।

মন্ত্রী ভাবলেন—তাইতো।

বেচারামকে সরিয়ে দেওয়া হ'ল। তার কুচক্রের কথাও ফাঁস হয়ে পড়ল।

নিধিরাম পেল ঢাল আর তরোয়াল। এবার সত্যি সত্যি সর্দ্দার হয়ে উঠল সে। (চলবে)

জড়দ্‌গব

শ্রীগৌরী গুপ্তা

প্রফুল্ল বাবু বাইরের ঘর থেকে হাঁকলেন,—বলি ও গিন্নি, একটা চাকর এসেছে, রাখবে?

প্রফুল্ল বাবুর স্ত্রী সতী দেবী বললেন,—রাখব না কে বললে? সেই কবে থেকে বলে বলে হায়রাণ হচ্ছি! কোথায় দেখি?

এখানে একটু বলে রাখা দরকার—গিন্নি হচ্ছেন বদ্‌মেজাজি, ভাল কথা কাকে বলে জানেন কি না সন্দেহ।

—কৈ, কোথায় তোমার চাকর?

—এই যে।

—হ্যাঁরে, তোর নাম কি?

—জড়দ্‌গব, আঁইগা মাঠান!

—কি বললি? জড়দ্‌গব?

—হ্যাঁ মাঠান!

—কত টাকা মাইনে চাস?

—আপনারা যাই দেন মাঠান!

—আমরা তোকে ৮৲ টাকা দেব, কেমন?

—না মাঠান, আমার সংসার অচল মাঠান! আমি পারচি না। দয়া করেন মাঠান, আমায় চার টাকা দেন মাঠান!

—সে কি রে? আমি ত তোকে বেশী দেব বলছি। আট টাকার চেয়ে চার টাকা অনেক কম রে! আট-টাকা তো চার টাকার দুইগুণ বেশী!

—না মাঠান, আপনার দুইটা পায়ে পড়ি, দয়া করেন, আমার বড় বিপদ! আমায় চার টাকা দেন। বলে সে কি কান্না!

গিন্নি আর কি করেন, বললেন,—আচ্ছা থাক, তুই কি কি কাজ করতে পারবি?

—বাইগান সাফ করতে পারমু, স-ব কাজ পারমু।

—ছেলে নিতে পারবি?

—হ্যাঁ, সব পারমু মাঠান!

কর্ত্তার বাগানের সখ চিরকালের। গিন্নি ভাবলেন, হাবাগোবা চাকর, মাইনেও বেশী না; সংসারের কাজ করবে, ছোট ছেলেটাকে রাখবে, আবার বাগান দেখবে, মন্দ কি! খুব খুসী হলেন, অবশ্য মুখে কিছু প্রকাশ করলেন না।

সকালে উঠতে না উঠতে কর্ত্তা হন্তদন্ত হয়ে এসে বললেন,—গিন্নি, তোমার গুণধর চাকরের কাণ্ড দেখ।

—কেন কি করেছে? আহা! ও নতুন মানুষ, কিছু জানে না, সব শিখিয়ে পড়িয়ে নিতে হবে ত। কি করছে কি? গিন্নি আবার যার উপর সন্তুষ্ট হন তার কথাই আলাদা।

—দেখ না কি করেছে!

গিন্নি গিয়ে দেখেন, কর্ত্তা অফিস-ফেরত যে টুলে বসেন, সেই টুলটা একমনে দা দিয়ে কাটছে।

গিন্নি চোখ কপালে তুলে বললেন,—হ্যাঁরে জড়ৎ, এ কি করছিস্?

—মাঠান, উনান ধরবো নে?

—উনুন ধরাবি ত, ওটা কাটছিস্ কেন? ঐ টুল কেটে তোর উনুন ধরান হবে?

—হ্যাঁ মাঠান, উটা ত কাঠ মাঠান!

—তা হলে ঘরে যত চেয়ার টেবিল আছে সব তোর উনুন ধরানর কাজে লাগবে?

এক গাল হেসে জড়ৎ ঘাড়টা বাঁদিকে হেলিয়ে বলল,—হ্যাঁ, মাঠান!

তার বলার অর্থ সবই ত কাঠের তৈরী অর্থাৎ কাঠ।

রাগে দুঃখে গিন্নি আর কিছু বললেন না। খালি বললেন,—তোকে আর উনুন ধরাতে হবে না। মনে মনে গিন্নির জড়দ্গবকে ভাল লেগেছে, তার কারণ বড় ভালমানুষ, বোকা, কিছু জানে না।

খানিকক্ষণ বাদে গিন্নি জড়ৎকে বললেন,—ওরে জড়ৎ, বাগানটা বেশ পরিষ্কার করে আগাছা গুলি তুলে আমায় ডাকিস্, দেখব কেমন বাগান পরিষ্কার করতে পারিস্।

প্রায় বেলা ১১টার সময় জড়ৎ গলদ্-ঘর্ম্ম হয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে এসে একগাল হেঁসে বললে,—মাঠান! বাগান বেশ পইস্কার করছি।

গিন্নি ভাবলেন, যাক ঘরের কাজ না করুক, বাগানের কাজ করলেই বাঁচি।

—মাঠান, আমায় কিন্তুক বইসিস দিতে হবে।

গিন্নি মনে মনে খুব সন্তুষ্ট হয়ে বললেন,—আচ্ছা আচ্ছা, হবে'খন আগে দেখি।

গিন্নি হাতের কাজ সারতে সারতে বললেন,—আগাছা টাগাছা সব তুলে পরিষ্কার করছিস ত?

—হ্যাঁ মাঠান!

কর্ত্তা ১১টার সময় রোজ অফিস যান। জামা-কাপড় পরে রোজকার অভ্যেস মত বাগানটা দেখতে গিয়ে বাগানের অবস্থা দেখে একেবারে চক্ষুস্থির! তার আর অফিস যাওয়া হোল না।

গিন্নি হাতের কাজ শেষ করে অন্য সব কাজ ফেলে জড়ৎকে সঙ্গে নিয়ে বাগানের দিকে আসতে আসতে কর্ত্তাকে উদ্দেশ করে বললেন,—ওগো, যাবার সময় বাগানটা ভাল করে দেখে জড়ৎকে বকসিস দিও, ও আবার বকসিস চেয়েছে—বলতে বলতে দেখেন যে কর্ত্তা নিশ্চল হোয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছেন, অসম্ভব গম্ভীর। তারপর বাগানের দিকে চেয়ে গিন্নিও হাঁ করে রইলেন, মুখ

দিয়ে কোন কথা বেরুল না। কতক্ষণ এই ভাবে কাটল কে জানে! হঠাৎ জড়তের ডাকে দুজনেরই চমক ভাঙল।

—কেইমন পইস্কার করেছি মাঠান! ভাল হয় নাই?

—তোকে কে এমন করে সব গাছ তুলতে বলেছে? আহা, গাছগুলি কত কষ্ট করে কর্ত্তা কোথা কোথা থেকে এনেছেন! কত ফলের, কত ফুলের—পাতাবাহার গাছ দিয়ে কি সুন্দর বাগান করেছিলেন! তোকে কে বলল এমন করে সব তুলে বাগানটাকে নষ্ট করতে?

—মাঠান, গাছগুলা কি উঠতি চায়, হেঁইও হেঁইও কইরে সব গাছ তুলেছি মাঠান!

—বেশ করেছ, আমার মাথা কিনেছ! যেমন ভাল মানুষ বলে দয়া করে রাখলাম, খুব আক্কেল সেলাম! দুধকলা দিয়ে সাপ পোষা! বের! এই মুহূর্ত্তে বের বাড়ি থেকে!

কর্ত্তা এতক্ষণে কথা বললেন,—কেন গিন্নী, বকছ কেন? নতুন এসেছে, থাকলে সব শিখবে। দাঁড়াও চেয়ার-টেবিলগুলি সব জ্বালানির কাজে লাগাক, টবের গাছ কটা আগাছার মত তুলে ফেলুক, তবে ত? এখন এরি মধ্যে যাবে কেন? দাও, তোমার গুণধর চাকরকে বকসিস দাও।

জড়দ্গব একগাল হেঁসে বলল,—আঁইগা কর্ত্তা, সব জ্বালায়ে দেমু, সব গাছ তুলে দিমু। ওর ধারণা খুব ভাল কাজ করেছে, তাই কর্ত্তা খুব সন্তুষ্ট হয়েছেন। আঁইগা আমার বইসিসটা মাঠান?

কর্ত্তা রাগে ফেটে পড়লেন; বললেন,—দাঁড়াও বাছাধন, তোমায় বকসিস দিচ্ছি! একবেলায় এত উপকার করেছ, তোমায় বকসিস দেব না! বলে বাগানের বেড়া থেকে একটা বাঁশ টেনে নিয়ে প্রহারেণ ধনঞ্জয় করে বিদায় দিলেন।

বেচারা জড়দ্গব কত আশা করেছিল বকসিস পাবে বলে, তা না পেয়ে পেল মার! হায়রে বরাত! বেচারা জড়দ্গব!

শিশুসাথীর দপ্তর

বাইশে শ্রাবণ—মৃদুলকান্তি বসু। বাইশে শ্রাবণে কবিগুরুর প্রতি নিবেদিত তোমার শ্রদ্ধার অর্ঘ্যটি সুরচিত হয়েছে। হিমালয়ের অনন্ত ঐশ্বর্য যেমন আবিষ্কারের অপেক্ষায় রয়েছে, তেমনি কবিগুরুর বিরাট রচনাশৈলী নতুন নতুন আবিষ্কারকের সন্ধানের অপেক্ষায় রয়েছে। পুরানো পথ ছেড়ে অনাবিষ্কৃত নতুন পথে যাত্রা সুরু কর, তাহলে তোমার শ্রম একদিন সার্থক হবে।

কবিগুরুর যে কবিতাটি বুঝতে চেয়েছ, তা শিশুসাথীর দপ্তরে আলোচনা করা চলবে না। তোমার চিঠিতে ঠিকানা দেয়া থাকলে লিখে জানাতুম।

বিচিত্র মন—'কৃত্রিম' (গ্রাহক নং ১১৪৯৯)। তোমার রচনাটি সুন্দর হয়েছে। আয়নার

মত স্বচ্ছ তোমার ঐ মনের ওপর বিশ্ব প্রকৃতির রূপমিছিলের ছায়া দেখে খুশীতে মনটা ভরে উঠল। বাস্তব জগতের টুকরো টুকরো বস্তুগুলোকে নিয়ে তোমার বিচিত্র কল্পনার রঙে রাঙিয়ে এবার থেকে প্রকাশ করবার চেষ্টা কর। ছদ্মনাম ব্যবহার করেছ কেন? এবার থেকে সবাই লেখা পাঠালে রচনার মধ্যে নাম, ঠিকানা, গ্রাহক নম্বর অবশ্যই দিয়ে দিও।

অপরূপ রাত—উৎপল হালদার (গ্রাহক নং ১২৮১৮)। তোমার গদ্য কবিতাটি পড়ে বেশ ভালই লাগল। শিশুসাথীর ভাইবোনদের ওপর আমার এ বিশ্বাস আছে যে, তারা কোনদিন অন্যের রচনাকে আত্মসাৎ করে নিজের বলে চালাবে না। তোমার ওপর সম্পূর্ণ বিশ্বাস রেখেই কবিতাটি নীচে তুলে দিলুম।

কাল এসেছিল এক অপরূপ রাত।
আকাশ নির্মেঘ নীল, স্নিগ্ধ বনছায়া,
দিগন্তে অদ্ভুত চাঁদ কাল উঠেছিল
অপার অসীম এক সমুদ্রের মতো
স্বপ্নময় তরংগের নীলকান্ত রূপে
বার বার মনে জেগেছিল।

শেষ অংশটুকু আর দিলুম না। আশা করি এর থেকেই তোমার সততার পরিচয় পাওয়া যাবে।

বর্ষা—মৃগাঙ্কশেখর দে। তোমার কবিতায় ভাই ছন্দের আর মিলের অনেক ভুল আছে। তবে প্রথম চেষ্টায় অনেক গোলই থাকবে। নিরুৎসাহ হয়ো না। লিখে যাও।

বাংলা মা—শুভ্রা গাংগুলি। তোমার কবিতার সহজ ভাবটি মনকে আকৃষ্ট করে। পল্লী-মায়ের ডাক ইঁটপাথর রচা সহরে বসেও আমরা শুনতে পাচ্ছি। তবে ভাই, শেষের দিকে তোমার কবিতায় বড় ছন্দদোষ এসে গেছে। ছন্দের দোষটুকু নিজেই চেষ্টা করে সংশোধন করে নিও।

সাজ, সাজ, সাজ—মোহাম্মদ আলী। কবিতাটিতে ছন্দের দোষ নেই। সংগীতের সুর-ধর্মটি বজায় আছে। তবে ভাবের দিক থেকে খুব পুষ্ট হতে পারেনি বলে মাঝে মাঝে আড়ষ্ট হয়ে পড়েছে। লেখায় তোমার হাত আছে। চেষ্টা করলে ভাল লিখতে পারবে।

স্মৃতি—জয়দেব ধাড়া। গল্পটির মাঝে মাঝে লেখকের মনের ছোঁয়াচ পাওয়া গেলেও কাহিনীর দিক থেকে গল্পটি তেমন জোরাল নয়। তোমার ভাষাটি মোটামুটি ভালই। এবার থেকে গল্পের কাহিনী নির্বাচনে একটু সতর্ক হবে।

উৎস—হরেন্দ্রচন্দ্র দে। কবিতা ও প্রবন্ধ দুটি পড়ে দেখলুম ; ভাষাটি বেশ মিষ্টি। শব্দ-চয়নের বৈশিষ্ট্য আছে। তবে কবিতার মাঝে মাঝে ছন্দের গরমিল কাণকে বড় পীড়া দেয়। কবিতাটি তাল দিয়ে দিয়ে আবৃত্তি করলে নিজের ভুল আপনিই ধরা পড়বে।

মধুকর
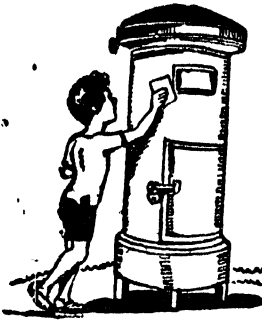
ভাইবোন সব, তোমরা আমার শুভেচ্ছা ও প্রীতি গ্রহণ করো। অনেক দিন বাদে আজ আলাপ করছি। নিশ্চয়ই তোমরা সুস্থ সবল আছো এবং এই দীর্ঘ ছুটিতে পড়াশুনার ও ব্যায়ামের প্রতি অবহেলা করনি। আগামীতে তোমাদের কৌতূহল ও শুভ-সংবাদপূর্ণ পত্রের প্রত্যাশা রাখি।

আজ বহুদিনকার কয়েকটি কাজের চিঠির জবাব দিচ্ছি—সবাই মন দিয়ে দেখো।

নাম—(১) সুজিত চক্রবর্ত্তী (গুপাইগাছা ৭৭ পি), (২) অশোক রায় (মজফরপুর ১২৬৪৯), (৩) অমিয় ও আশরাফ (ডোমকল), (৪) রবীন্দ্রনাথ দাস (কুচবিহার), (৫) প্লাবন ভট্টাচার্য্য (আসাম ১১৩৬৮), (৬) আলোক ঘোষ (ভাগলপুর), (৭) সুশীল সেন (হুগলী ১৩৩২০), (৮) নির্ম্মল সেন (সিউরী), (৯) গৌরহরি দে সরকার (হাজারীবাগ), (১০) নির্ম্মল পোদ্দার (কলিকাতা) (১১) মমতা ব্যানার্জ্জি (বালীগঞ্জ)।

উঃ—(১) অপরের ব্যায়াম-পদ্ধতি তুমি গ্রহণ করেছো। সে অবস্থায় কি কি ব্যায়াম করবে, আমায় জিজ্ঞেস না করে তাঁকে করো যাঁর ব্যায়ামের চার্ট সংগ্রহ করেছো—আমার চেয়েও সে ভাল বলতে পারবে। তার সঙ্গে তাঁকে তোমার শরীরের মাপগুলি পাঠিয়ে দিও। (২) তোমার শরীরে চর্ব্বি বেশী আছে কিনা সেটা তোমার শরীরের মাপ এবং বয়স না জানালে বলা শক্ত। আর বারবেল ব্যায়াম যারা করে তাদের বাস্তবিকই ম্যাসাজ করা দরকার। শিশুসাথীতে উল্লিখিত self massageই উচিত। যে অঙ্গের ব্যায়াম হবে সঙ্গে সঙ্গে ঠিক সেই অংশেরই ম্যাসাজ করা উচিত। গ্রীষ্মকালে ব্যায়ামের পরে ম্যাসাজ তেল ছাড়া করা উচিত, আর শীতকালে ব্যায়ামের সময় এবং ম্যাসাজ তেল মেখে করা চলে। (৩) যারা প্রথম ব্যায়াম সুরু করে তাদের প্যারালাল বার বা কোনও যন্ত্র নিয়ে ব্যায়ামটা আমি ঠিক সমীচীন বোধ করি না। তাদের পক্ষে খালি হাতে দুই তিন মাস এবং আসন ও খালি হাতে ব্যায়াম করা উচিত। তারপর শরীরের উন্নতি এবং অবস্থা বুঝে যন্ত্র নিয়ে করা চলে। (৪) তুমি দিনে রাত্রে অন্ততঃ তিন থেকে সাড়ে তিন সের ঠাণ্ডা জল পান করবে, তাছাড়া ডাবের জল, পাকা পেপে এবং অন্যান্য ফলমূল ইত্যাদি খাওয়ার যথাসাধ্য ব্যবস্থা করতে পারলে খুব উপকার পাবে, প্রস্রাবের লাল রং শীঘ্রই চলে যাবে। (৫)

সাধারণতঃ দাঁত সময় মত এবং বয়স্ক অবস্থায় না ওঠার কারণ শরীরে ক্যালশিয়ামের অভাব। তোমায় কিছু ক্যালশিয়াম জাতীয় খাদ্য এখন থেকেই খাওয়া অভ্যাস করা উচিত। আর তোমার যে পায়ে Infantile Paralysis হয়েছিল, সেই পায়ে কোনও একজন অভিজ্ঞ Massagistএর তত্ত্বাবধানে নিয়মিত মালিশ ছাড়া এই পা ভাল করার আর বিশেষ কোনও ঔষধ নাই। যদি তুমি Massagist না পাও, বাবা বা মাকে "সপ্তপ্রস্থ মহামাষ তেল" দিয়ে মালিশ করতে বোলো। মালিশটি পায়ের নিচ দিক থেকে উপর দিকে হবে। পূর্ব্বের শিশুসাথীতে প্রকাশিত ম্যাসাজ প্রবন্ধে নিয়মকানুন পাবে। (৬) তোমার এই ১২ বছর বয়সেই যখন গা হাত পা ব্যথা এবং একটু পরিশ্রম করলে হাফ হয়, সেক্ষেত্রে যদি এখন থেকেই হুশিয়ার না হও, তবে ভবিষ্যতে হয়তো বা কষ্ট পেতে পারো। তোমার এখন কি করা উচিত জানো? সকালে রোদ না উঠতেই ঘুম থেকে উঠে বাইরে বেড়াতে যাবে। তারপর হয় বাড়ী এসে, নচেৎ বেড়াতে যাবার সময় অন্ততঃ আধ ঘণ্টা খালি গায়ে রোদ লাগাবে। আপাততঃ এছাড়া এখন অন্য কোনও ব্যায়াম বা পরিশ্রম কোরো না। দুধ, নারকেল এবং ভেজিটেবল স্যুপ ও মাংসের মেটুলির ঝোল খাবে। বিকালে সামান্য একটু ছানা খেতে পার। শিশুসাথীতে প্রকাশত বজ্রাসনটি প্রত্যহ তিনবার অভ্যাস করবে। (৭) শিশুসাথী অফিসে জানিয়ে আশুতোষ ঔষধালয়ের আবিষ্কৃত সুফলপ্রদ দাঁতের মাজনটি সংগ্রহ করবে। (৮) তোমার প্রেরিত দেহের মাপ উচ্চতা এবং বয়স পেয়ে খুব দুঃখ হলো যে, এই রুগ্ন দেহ নিয়ে তোমরা কি করে কলেজে পড়তে যাও! ১৮ বছরের ছেলে যার উচ্চতা ৫ ফুট ১০ ইঞ্চি, তার বুকের ছাতি যদি ২৮½ ইঞ্চি হয়, তবে তার জীবনের ভবিষ্যৎ কি! যদি নিজেকে সর্ব্বতোভাবে মজবুত করতে চাও ত এখন হতেই ব্যায়ামে মন দাও এবং তা হবে খালি হাতে ব্যায়াম। (৯) পেটে মল নিয়ে ব্যায়াম করাটা এক হিসাবে উচিত নয়, যদিও যাদের কোষ্ঠ-কাঠিন্যের দোষ আছে তাদের করতেই হবে; তবে সকালে ব্যায়ামের পূর্ব্বে খালিপেটে ঈষৎ উষ্ণ গরম জলে আধখানা পাতিলেবুর রস এবং তার সঙ্গে পরিমাণ মত নুন মিশিয়ে পান করে নিয়ে ব্যায়াম করবে। তাতে ব্যায়ামের পর পায়খানা পরিষ্কার হয়ে যাবে অথবা ব্যায়ামের পূর্ব্বেই পায়খানার অভ্যাস হবে। দেহ যদি খাওয়া এবং বিশ্রাম পায়, তবেই ক্রমশঃ দেহে চর্ব্বি আসতে সাহায্য করে। (১০) ওজন বাড়াবার পদ্ধতি অনেক রকমের আছে, তবে তুমি ৯নং জবাবের নির্দ্দেশ পালন করতে পার। (১২) ১৪ বছর বয়সেও শিশুসাথীর মেম্বার হওয়া যায়। আর ব্যক্তিগত ভাবে জবাব যদি চাও তবে stamp কেন পাঠালে না। মেয়েরা ছেলেদের ন্যায় আধুনিক বিজ্ঞান-সম্মত উপায়ে যন্ত্র নিয়ে ব্যায়াম করতে পারে, তবে তাদের দেহ ছেলেদের মত পেশীবহুল হবে না নিশ্চিত জেনো।

তোমাদের মঙ্গল কামনা করে আজকের মত চিঠিপত্রের জবাব শেষ করছি। জয় হিন্দ্‌।

তোমাদের—মনতোষ দা

খেলাধূলা

—অষ্টাবক্র—

প্রচণ্ড গ্রীষ্মের পর আষাঢ়ের প্রথম দিন থেকেই এবার বর্ষা নেমেছে এবং কলকাতার ময়দানে লীগের খেলাও জমে উঠেছে। এর মধ্যে লীগের প্রথমার্দ্ধের খেলা শেষ হয়ে ফিরতি লীগের দু'একটা করে খেলাও হয়ে গেছে। লীগের বর্ত্তমান অবস্থায় ইষ্টবেঙ্গল শীর্ষস্থান, মোহনবাগান দ্বিতীয় স্থান (একটা কম খেলে), ভবানীপুর তৃতীয় ও রাজস্থান চতুর্থ স্থান অধিকার করে আছে।

ইষ্টবেঙ্গল দলের খেলা অন্যান্য দলের তুলনায় উন্নত এবং গোল করার দক্ষতা থাকায় শীর্ষস্থানে থাকাটা তাদের পক্ষে অসম্ভব কিছু নয়। তবে এবার মাঝে মাঝে এ দলের খেলাতেও যেন ঝিমুনী আসছে। বিশেষ করে জুন মাসের প্রথম সপ্তাহের পর যখন অলিম্পিকগামী খেলোয়াড়দের স্থানীয় প্রতিযোগিতায় যোগদান বন্ধ হয়ে গেল, তারপর থেকেই সারা জুন মাসটা তাদের খেলার পূর্ব্বেকার দীপ্তি হ্রাস পায়। বি-এন-আর, উয়াড়ী, জর্জ টেলিগ্রাফ প্রভৃতি ক্লাবগুলির কাছে নাস্তা-নাবুদ হয়ে ইষ্টবেঙ্গল অবশেষে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে খেলোয়াড় আমদানী করে দলের শক্তি বৃদ্ধি করেছে। বাইরে থেকে খেলোয়াড় আমদানীর বাতিক থেকে ইষ্টবেঙ্গলকে নিরস্ত করা কঠিন হয়েছে। তা না হলে পূর্ব্ব পাকিস্তান থেকে বিতাড়িত হয়ে পশ্চিম পাকিস্তানের খেলোয়াড় আমদানী করেন তাঁরা কোন বিবেচনায়? আমরা বরাবরই ব'লে আসছি, বড় বড় ক্লাবগুলির এই পরমুখাপেক্ষিতা ত্যাগ না করলে বাংলার ফুটবলে বাঙ্গালীর প্রাধান্য থাকতে পারে না। ধার-করা খেলোয়াড়রা যখন অলিম্পিক খেলতেই গেলেন, তখন এই সমস্ত ক্লাব স্থানীয় তরুণদের খেলিয়ে দেখছেন না কেন?

মোহনবাগানের যা টিম তাতে তাকে নেহাৎ দুর্ব্বল বলা চলে না। তবে খেলার সময় তাদের একটু তাজা হয়ে এবং গোল করবার সঙ্কল্প নিয়ে খেলা দরকার। প্রয়োজন হলে ক্লাব-কর্ত্তারা সেজন্য নূতন রক্ত আমদানী করতে পারেন।

ভবানীপুর এ বছর খেলছে মন্দ না, তবে বর্ষাটা আর একটু চেপে পড়লে কেমন খেলে সেটা না দেখলে কিছু বুঝা যাচ্ছে না। রাজস্থান দেশ ঢুঁড়ে খেলোয়াড় আমদানী করেও এ পর্য্যন্ত চ্যাম্পিয়ানশিপ মুঠোর মধ্যে আনতে পারছে না বলে আফশোষের শেষ নেই। তবে কর্ত্তাদের মনে রাখা দরকার, বেছে বেছে খেলোয়াড় আমদানী করলেই সব সমস্যার সমাধান হয় না—এজন্য চাই দলগত সংহতি ও সঙ্কল্প।

৬ই জুলাই পর্য্যন্ত লীগ তালিকায় প্রথম চারিটি স্থান দখলকারী টিমগুলির অবস্থা দেখান হল:—

	খেলা	জিত	ড্র	হার	গোল দিয়েছে	গোল খেয়েছে	পয়েন্ট
ইষ্টবেঙ্গল	১৭	১১	৫	১	২৩	২	২৭
মোহনবাগান	১৬	৮	৬	২	২৩	৭	২২
ভবানীপুর	১৭	৯	৪	৪	২১	১৩	২২
রাজস্থান	১৭	৮	৪	৫	১৭	১৪	২০

ইংলণ্ডের নিকট দুটি টেষ্টে ভারতের পরাজয়—ইংলণ্ড সফরকারী ভারতীয় ক্রিকেট দল জুন মাসে দুটো টেষ্ট ম্যাচ খেলেছে। দুটোতেই ইংলণ্ডের নিকট ভারতের পরাজয় ঘটেছে—প্রথমটায় সাত উইকেটে ও দ্বিতীয়টায় আট উইকেটে। পরাজিত হলেও ভারত শেষ পর্য্যন্ত বীরের মতই লড়েছে এবং শেষ সময় পর্য্যন্ত টেষ্ট ম্যাচের উদ্দীপনা অব্যাহত রেখেছে। প্রথম টেষ্ট ম্যাচে তরুণ ব্যাটস্‌ম্যান মঞ্জারকার ১৩৩ রাণ করে টেষ্টম্যাচে জীবনের প্রথম সেঞ্চুরীর গৌরব এবং দলের পতনের মুখে দৃঢ়তাপূর্ণ খেলা দেখিয়ে সকলের প্রশংসা অর্জ্জন করেছেন। আর দ্বিতীয় টেষ্টম্যাচে মানকড় ব্যাটিং ও বোলিংএ যে অসাধারণ নৈপুণ্য দেখিয়েছেন, তাতে জয়-পরাজয় সমস্তের উর্দ্ধে এই সত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে, বর্ত্তমান বিশ্বে তিনি শ্রেষ্ঠ চৌকস ক্রিকেট খেলোয়াড়। আর উভয় টেষ্টেই হাজারে ব্যাটিংয়ে যে দৃঢ়তার পরিচয় দিয়েছেন, তা বিশ্বের অতি অল্পসংখ্যক ব্যাটস্‌ম্যানের পক্ষেই সম্ভব।

প্রথম টেষ্টম্যাচ অনুষ্ঠিত হয় লীড্‌স মাঠে। অধিনায়ক হাজারে টসে জিতে স্বীয় দলকে ব্যাট করতে পাঠালেন। ভারতের গোড়ার দিকের ব্যাটস্‌ম্যানরা মোটেই সুবিধে করতে না পারায় মাত্র ৪২ রাণে তিনটে উইকেট পড়ে গেল। পঙ্কজ রায়, গায়কোয়াড় ও উমরিগড় আউট হয়ে গেলে সঙ্কটের মুখে অধিনায়ক হাজারে ও তরুণ মঞ্জারকার দৃঢ়ভাবে খেলে বিপর্য্যয় প্রতিরোধ করলেন। চতুর্থ উইকেট জুটিতে তাঁরা উভয়ে ২২২ রাণ যোগ করলেন। মঞ্জারকার ১৩৩ রাণ করে টেষ্টম্যাচে জীবনের প্রথম সেঞ্চুরী করলেন। তাঁর ব্যাটিং দেখে সেদিন ইংলণ্ডের ক্রীড়ামোদীরা প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠল। হাজারেও অধিনায়কের মতই খেলে ৮৯ রাণ করলেন। দলের রাণ উঠেছে ২৬৪, ইংলণ্ডের নবাগত টেষ্ট বোলার ট্রুম্যান তখন হাজারেকে আউট করে দিলেন। মঞ্জারকারও টিকতে পারলেন না, গোপীনাথ ব্যাট নিয়ে এলেন আর গেলেন। ২৬৪ রাণেই দলের তিনটে উইকেট পড়ে গেল। প্রথম দিনের শেষে ভারতীয় দলের ৬ উইকেটে ২৭২ রাণ হল। দ্বিতীয় দিনের সকালে যখন খেলা আরম্ভ হল, তখন পূর্ব্ব রাত্রের বৃষ্টিপাতে উইকেটের অবস্থা বোলারদের অত্যন্ত অনুকূলে ছিল। অধিনায়ক হাজারে যদি ডিক্লেয়ার করে দিতেন, তা হলে ইংলণ্ডকে ভীষণ অসুবিধায় পড়তে হত। তা না করে তিনি আবার শেষের ব্যাটস্‌ম্যানদের ব্যাট করতে পাঠালেন। ফলও হল মারাত্মক। লেকারের নয়টি বলেই বাকী চারজন ব্যাটস্‌ম্যান আউট হয়ে গেলেন। লেকার মাত্র দু রাণ দিয়ে ৪টি উইকেট নিলেন। ২৯৩ রাণে ভারতের প্রথম ইনিংস শেষ হল।

ইংলণ্ডও গোড়ার দিকে সুবিধে করতে পারে নি। তাদের ৬২ রাণে তিনটে উইকেট পড়ে যায় এবং ৯২ রাণের মধ্যেই হাটন, সিম্পসন, কম্পটন, পিটারসে আউট হয়ে যান। গ্রেভনী ও ওয়াটকিন্স এসে এই বিপর্য্যয় রোধ করলেন এবং এর পরে ইংলণ্ডের বাকী ব্যাটস্‌ম্যানরাও দৃঢ়তার সঙ্গে রাণ ওঠাতে লাগলেন। গ্রেভনী ৭১, ওয়াটকিন্স ৪৮, ইভান্স ৬৬ ও জেঙ্কিন্স ৩৮ রাণ করায় প্রথম ইনিংসে ইংলণ্ডের ৩৩৪ রাণ হল। ইংলণ্ড ভারত অপেক্ষা ৪১ রাণে অগ্রগামী হল। ভারতের বোলারদের মধ্যে গোলাম আমেদ ১০০ রাণ দিয়ে ইংলণ্ডের ৫টি উইকেটের পতন ঘটিয়ে কৃতিত্বের পরিচয় দেন।

দ্বিতীয় ইনিংসের সুরুতেই ভারতীয় ব্যাটস্‌ম্যানরা বিশ্বের ক্রিকেটের ইতিহাসে ব্যর্থতার এক ইতিহাস রচনা করলেন। সুরুতে প্রথম চৌদ্দটি বলে বিনা রাণে ভারতের ৪টি উইকেটের পতন হল। পঙ্কজ রায়, গায়কোয়াড়, মন্ত্রী ও মঞ্জারকার শূন্যহাতে ফিরে এলেন। দলের পতনের মুখে অধিনায়ক হাজারে উমরিগড়ের সহযোগিতায় এই বিপর্য্যয় রোধ করলেন। কিন্তু উমরিগড়ও টিকতে পারলেন না। ফাদকার দৃঢ়তার সঙ্গে খেলতে লাগলেন অধিনায়ক হাজারের সঙ্গে। হাজারে ৫৬ রাণ করে এবারেও ট্রুম্যানের বলেই আউট হলেন। ফাদকার ৬৪ রাণ করে বিদায় নিলে আবার বিপর্য্যয় দেখা দিল। ১৪৩ রাণের মাথায় পর পর সপ্তম, অষ্টম ও নবম উইকেটের পতন হল, এবং ভারতের দ্বিতীয় ইনিংস শেষ হল মাত্র ১৬৫ রাণে। এই ইনিংসে ট্রুম্যান ২৭ রাণে ৪ উইকেট ও জেঙ্কিন্স ৫০ রাণে ৪ উইকেট পান। বিশেষ উল্লেখযোগ্য—এই ইনিংসে ভারতের পাঁচজন ব্যাটস্‌ম্যান গোল্লা করেন। দ্বিতীয় ইনিংসে ইংলণ্ড তিন উইকেটে ১২৮ রাণ করে সাত উইকেটে বিজয়ী হয়।

দ্বিতীয় টেষ্ট—ভারতের সেরা চৌকস খেলোয়াড় বিনু মানকড় ইংলণ্ডে ল্যাঙ্কাশায়ার লীগের অন্যতম ক্লাব হ্যাসলিংডন ক্লাবের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হয়ে খেলছিলেন। তাকে খেলাতে হলে ঐ ক্লাব-কর্ত্তাদের অনুমতি দরকার। প্রথম টেষ্টের আগেও ভারতের কর্ত্তারা তাঁকে দলে নেবার চেষ্টা করেন। কিন্তু ক্লাবের কর্তৃপক্ষ কতকগুলো সর্ত্ত আরোপ করায় তখন তা সম্ভব হয় নি। প্রথম টেষ্টের পর হ্যাসলিংডন কর্তৃপক্ষ বিনা সর্ত্তে মানকড়কে বাকী তিনটি টেষ্টেই ভারতের হয়ে খেলবার অনুমতি দেন।

মানকড় ভারতের হয়ে খেলে ইংলণ্ডের লর্ডস মাঠে যে অসাধারণ নৈপুণ্য দেখিয়েছেন, ইংলণ্ড-বাসীরা তা কোনদিন বিস্মৃত হবে না। এক কথায় দ্বিতীয় টেষ্টকে ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে মানকড়ের টেষ্ট বলা যেতে পারে। একটি খেলোয়াড় যে সমস্ত দলের খেলাকে গৌরবে দীপ্যমান করে তুলতে পারেন, মানকড় এই টেষ্টে তাই প্রমাণ করেন। ভারতের পক্ষে ওপনিং ব্যাটস্‌ম্যান হিসেবে নেমে প্রথম ইনিংসে তিনি ইংলণ্ডের শ্রেষ্ঠ বোলারদের সর্ব্বপ্রকার চাতুর্য্যকে উপেক্ষা করে পিটিয়ে ৭২ রাণ করে ব্যাটস্‌ম্যান হিসেবে তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করেন। তারপর ইংলণ্ডের বিপক্ষে অমিত বিক্রমে একটানা ৭৩ ওভার বল করে ১৯৫ রাণে টেষ্টম্যাচে পাঁচটি উইকেট নিয়ে বোলার রূপে স্বীয় শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করলেন। এর পরই এল সবচেয়ে বিস্ময়কর অধ্যায়। দ্বিতীয় ইনিংসেও তিনি বেপরোয়াভাবে ব্যাট চালিয়ে ১৮৪ রাণ করে ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে ভারতের ব্যক্তিগত সর্ব্বোচ্চ রাণ করার গৌরব অর্জ্জন করলেন। আর অধিনায়ক হাজারের সহযোগিতায় তৃতীয় উইকেটে ২১১ রাণ সংগ্রহ করে ভারতের পূর্ব্বতম রেকর্ডের সমান রাণ করলেন। কি দিনশেষের ক্ষীয়মাণ আলোকে, কি ইংনিসের প্রারম্ভে, ইংলণ্ডের ফাষ্ট বোলারদের তীব্র গতি-সম্পন্ন বলের বিরুদ্ধে যেভাবে ব্যাট চালাতে লাগলেন, তাতে দর্শক, সমালোচক, ক্রীড়াবিদ সকলেই বিস্ময় বোধ করেছেন। তাঁর চার আর ছয়ের মার সকলের তাক লাগিয়ে দিয়েছে। আজ ইংলণ্ডের সকল শ্রেণীর লোকের মুখে একই কথা—'মানকড় কি

ক্রিকেটার!' তাঁর এই অভূতপূর্ব্ব নৈপুণ্যের জন্য ভারতীয় দল পরাজয়ের মধ্যেও যে গৌরবময় ঐতিহ্য রচনা করেছেন, বিশ্বের ক্রিকেট খেলার ইতিহাসে চিরকাল তা স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকবে।

দ্বিতীয় টেষ্টেও অধিনায়ক হাজারে টসে জিতেছিলেন। ব্যাট করতে নেমে ভারতীয় দল প্রথম ইনিংসে ২৩৫ রাণ করে। এবার মানকড় ও পঙ্কজ রায় গোড়াপত্তনটা ভাল করলেও পরবর্ত্তী ব্যাটস্‌ম্যানরা মোটেই দাঁড়াতে পারেন নি। এক উইকেটে ১০৬ রাণ হলেও সাত উইকেটে রাণ হয়েছিল মাত্র ১৬৩। অধিনায়ক হাজারে দৃঢ়তার সঙ্গে খেলে ৬৯ রাণ করে দলের রাণ ২৩৫ সংখ্যায় নিয়ে যেতে সমর্থ হন।

ইংলণ্ড দলের অধিনায়ক হাটন প্রথম টেষ্টের দু ইনিংসেই ১০ রাণ করেছিলেন বলে দৃঢ়সঙ্কল্প নিয়ে খেলতে লাগলেন। তিনি নিজে ১৫০ রাণ করে ভারতের বিপক্ষে প্রথম সেঞ্চুরী করার গৌরব অর্জ্জন করলেন। উইকেট-রক্ষক ইভান্সও ভারতের বিরুদ্ধে সেঞ্চুরী করলেন। বেপরোয়া পিটিয়ে তিনি ১০৪ রাণ করেন। এ ছাড়া সিম্পসন ৫৩, পিটারসে ৭৪, গ্রেভনী ৭৩ রাণ করে ইংলণ্ডের প্রথম ইনিংসের রাণ সংখ্যাকে ৫৩৭ অঙ্কে নিয়ে যান।

এর উত্তরে দ্বিতীয় ইনিংসে মানকড় ও হাজারে অসাধারণ দৃঢ়তার সঙ্গে যথাক্রমে ১৮৪ ও ৪৯ রাণ করলেও তাঁদের আউট হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ভারতের ব্যাটিং শক্তি কর্পূরের মত উবে গেল। ৩৭৮ রাণে ভারতের দ্বিতীয় ইনিংস সমাপ্ত হয়।

ইংলণ্ড দ্বিতীয় ইনিংসে ২ উইকেটে ৭৯ রাণ করে আট উইকেটে বিজয়ী হয়। নির্দ্ধারিত চারটি টেষ্টের মধ্যে এইভাবে প্রথম দুটিতেই ইংলণ্ড বিজয়ী হয়।

উইম্বলেডন টেনিস—লন টেনিসে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ প্রতিযোগিতা উইম্বলেডন (লণ্ডন) সদ্য অনুষ্ঠিত হল। অষ্ট্রেলিয়ার ফ্রাঙ্ক সেজম্যান এবার এই প্রতিযোগিতায় 'ত্রি-মুকুট' জয় করে নিজেকে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ টেনিস খেলোয়াড় বলে প্রমাণিত করেছেন। উইম্বলেডন কর্ত্তৃপক্ষের ক্রমপর্য্যায় তালিকার অনুসরণ করেই যেন এবার পুরুষদের সিঙ্গলস্ ফাইন্যাল অনুষ্ঠিত হল। ফাইনালে সেজম্যানকে মিশরের জরোশ্লাভ ড্রবনির সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে হয় এবং তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা হলেও সেজম্যান জয়ী হয়ে সিঙ্গলস্ চ্যাম্পিয়ানশিপ অর্জ্জন করেন।

পুরুষদের ডবলস খেলায় সেজম্যান স্বদেশবাসী কেন-ম্যাপ্‌গ্রিগারের সহায়তায় মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের ভিক সেক্সাস ও দক্ষিণ-আফ্রিকার এরিকষ্টার্ণসকে পরাজিত করে ডবলস্ চ্যাম্পিয়ান হন।

মিক্সড ডবলসে ও সেজম্যান মার্কিণবাসিনী মিস ডোবিসহার্টের সহযোগিতায়, আর্জেন্টিনার মিস মোরিয়া ও অষ্ট্রেলিয়ার মিসেস থেলমালংকে পরাজিত করে মিক্সড চ্যাম্পিয়ান হন।

নারীদের সিঙ্গলস প্রতিযোগিতায় মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের সপ্তদশী মরীন কনোলি প্রথম প্রবেশেই উইম্বলেডন চ্যাম্পিয়ানশিপ অর্জ্জন করেন। পর পর তিনবার উইম্বলেডন সিঙ্গলস্ চ্যাম্পিয়ান মিস লুই ব্রাউকে পরাজিত করে এই বিজয় গৌরব অর্জ্জন করে তরুণীটি বিশ্বের বিস্মিত দৃষ্টি আকর্ষণ

করেছেন। বিংশশতকে এই চ্যাম্পিয়ানশিপ বিজয়িনীদের মধ্যে তিনিই সর্ব্বকনিষ্ঠা। অবশ্য উনবিংশ শতকে তাঁর চেয়েও কম বয়সে এই চ্যাম্পিয়ানশিপ অর্জ্জন করেছিলেন ১৮৮৭ সালে পঞ্চদশী মিস্ লোটিডড।

নারীদের ডবলসে গত বৎসরের বিজয়িনী জুটী মার্কিনবাসিনী মিস ডোরিস হার্ট ও মিস শার্লি ফ্রাই স্বদেশবাসিনী জুটী মিস লুইব্রাউ ও মিস কনোলিকে পরাজিত করে চ্যাম্পিয়ান খেতাব অক্ষুণ্ণ রেখেছেন।

উইম্বলেডন জুনিয়ার খেলোয়াড়দের জন্য যে প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করেছিলেন, তাতে ভারতের মিস রিতা দাভার হল্যাণ্ডের মিস বসের নিকট ফাইনালে পরাজিত হয়েছেন।

গত মাসের ধাঁধার উত্তর

১। মহাভারত ২। অশোক, শিবাজী, বিক্রমাদিত্য, আকবর, সাজাহান, মমতাজ, নূরজাহান, নানা সাহেব ৩। চিতল।

উত্তরদাতাদিগের নাম

যাহাদের ৩টি উত্তর ঠিক হইয়াছে—শ্রীমৈত্রেয়ী ও শুভেন্দু ধর, গোয়ালিয়র; কুমারী গীতি ও শ্রীঅশোককুমার মুখার্জি, পাটনা; দোলন গুপ্ত, ১২৬১ নং গ্রাহক; অনন্তকুমার দাস, কাজলা এম. ই. স্কুল; দীপু, মিতান, টুসান, দেবু ইত্যাদি, গোরক্ষপুর; স্বপনকান্তি রায়, ১৩০৮৮ নং গ্রাহক; চম্পা সরকার, ভাগলপুর; রবি, কাজল ও প্রশান্ত মজুমদার, গৌহাটী; প্রদীপকুমার সেনগুপ্ত, গোরক্ষপুর, দিলীপকুমার চন্দ, বারুইপুর; শ্রীনমিতা ঘোষ দস্তিদার, ১২২৪৯ নং গ্রাহিকা; সুশান্তকুমার সিংহ রায়, ১১৯৬৩ নং গ্রাহক, কুমারী শেফালি ও শ্রীপার্থসারথি ঘোষ, ১২৮৯১নং গ্রাহক; উপেন, তপতী ও যোগমায়া দেবী, খাগড়াবাড়ী—কুচবিহার; শ্রীঅনন্তকুমার ও প্রশান্তকুমার ভট্টাচার্য্য, ১০০৬০নং গ্রাহক; মঞ্জু, ভানু, ছানু, বেণু, জলপাইগুড়ি; কল্যাণকুমার রায় চৌধুরী, কালীঘাট; মিহিরকুমার চক্রবর্ত্তী ৭১৩৯ নং গ্রাহক; শ্রীঅঞ্জনকুমার গোস্বামী, বার্ণপুর; মিস নিভা চৌধুরী, করিমপুর চা-বাগান; রণজিত ও মনোজিত দত্ত রায়, শিলং; সাধনা, বন্দনা, আল্পনা, কল্পনা, বনানী ও ব্রততী লাহিড়ী, পূর্ণিয়া; হীরেন্দ্রনাথ সান্ন্যাল, ৭৯১৭ নং গ্রাহক; পূরবী মুখোপাধ্যায়, নয়া দিল্লী; শ্রীবিমলাবালা ভট্টাচার্য্য, বেনারস সিটী; ধ্রুব, ১০৭৫৬ নং গ্রাহক; কুমারী মঞ্জু দাশগুপ্তা, বড়জুলী—আসাম; ভারতী বিশ্বাস, ভীমপুর; সুভাষ রাহা, ১৩২৫৮ নং গ্রাহক; কানাই স্মৃতি

পাঠাগারের সভ্যবৃন্দ; দীপক, সুহাস, সুব্রত ও বিশ্বনাথ দে, কাটিহার; জ্যোতি, অসীম, শ্যামল, অরূপ, বারহাট্টা; শঙ্করপ্রসাদ ও প্রতিমারাণী ঘোষ, ১৩৪৯১ নং গ্রাহক; মায়ারাণী বন্দ্যোপাধ্যায়, ৭৩৩৩ নং গ্রাহিকা; দিব্যেন্দু ও শুভেন্দু দে, ঝাড়গ্রাম; কুমারী সুদীপা কর ও সুমিত্রা দাশ, হবিগঞ্জ; কুমারী স্নেহ দাশ, কার্শিয়াং; বাবলু বাগচি, ৫১২৪ নং গ্রাহক; সাধন রায়, ১৩২৯৯ নং গ্রাহক; গৌরী সান্ন্যাল, ঘুঘুডাঙ্গা; মতিলাল গুহ রায়, গৌহাটী; তুষারকান্তি মুখোপাধ্যায়, কাঁচড়াপাড়া; দেবজ্যোতি দাশগুপ্ত, আগরপাড়া; অমিতা ও বিশ্বনাথ চাটার্জি, জামালপুর; শান্তিপদ রায়, ১২৮৩৪ নং গ্রাহক; নৃপেন্দ্রনাথ দে, তেজপুর (আসাম); পশুপতি ভট্টাচার্য্য, ৬২৮৪ নং গ্রাহক; রবীন্দ্রকৃষ্ণ রায় দস্তিদার গৌহাটী; বিজয়ী সব-পেয়েছির আসর, দিঘাঘাট; হিমাংশু, প্রদীপ প্রভৃতি মুকুন্দপুর; কুমারী কল্পনা চৌধুরী ৯৫৭০ নং গ্রাহিকা; বুলবুল দাস ৪৩৮৬ নং গ্রাহক; দীপক সেন, কলিকাতা—১২।

যাহাদের ২টি উত্তর ঠিক হইয়াছে—প্রণতি ও জয়তী গোস্বামী ১০৯৭১ নং গ্রাহক; আবুল কাশেম জহিরুল হক্‌ ৫২৫৬ নং গ্রাহক; উদ্ধব ও নীলিমা মুখার্জি ১০৯৭৮ নং গ্রাহক; দীপেন্দ্র, রথীন্দ্র, তপতী ও সত্যেন্দ্র নাথ ঘোষ, ১৩৫১৯ নং গ্রাহক; কুমারী ছায়ারাণী চাটার্জী, পূর্ণিয়া; গোপী, মিনতি, শেফালী চট্টোপাধ্যায়, ইত্যাদি পূর্ণিয়া; পূর্ণেন্দু ঘোষ, আমতা; প্রশান্ত রুদ্র, ১০৬৫৪ নং গ্রাহক; অনীতা বসু, বাউনিয়া; সুরঞ্জন দাশগুপ্ত, বেনারস; কালু, লালু ও লীলা, বেরিলি; গুরুপদ পাল, রাণাঘাট; শুভ্রা, সিপ্রা ও সুমিত্রা কোলে, চাঁচাই; দেবব্রত ভট্টাচার্য্য, ৯৫০০ নং গ্রাহক; গীতা, গায়ত্রী, শীলা, ইলা ও সমীর চাটার্জি, রাঁচি; শচীকুমার ঘোষ, ১০৩৪২ নং গ্রাহক; পিনাকপ্রসূত দাস, তেজপুর; শুক্লা, বন্দনা প্রভাত ইত্যাদি, পাটনা; রতনমালা ও ছবি ২১৭৩ নং গ্রাহক; বাণীপ্রসাদ ৪৪৬২ নং গ্রাহক; রঞ্জন ও পূরবী বন্দ্যোপাধ্যায়, ১০৭৬৫ নং গ্রাহক; বীণা চট্টোপাধ্যায় ১৩৩০৯ নং গ্রাহিকা; তারাশঙ্কর ও শান্তিলতা বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৩০৪৭ নং গ্রাহক; দিলীপ, তপন, মীরা ও মন্দিরা মিত্র, চেতলা; বহ্নিবলয় পাঠাগারের সভ্যবৃন্দ, কসবা; কুমারী সুধা রায়, তেজপুর; তুষার, প্রণতি ও দীপালী ইত্যাদি, চন্দননগর; কুমারী ছবিরাণী ধর, ১০৪২২ নং গ্রাহিকা; কুমারী শুভ্রা ভট্টাচার্য্য, ১২৬৩৫ নং গ্রাহিকা; কালাচাঁদ, রণজিৎ, পুতুল, প্রতিমা ইত্যাদি, বালিগঞ্জ; সিপ্রা ও সুজাতা গুহ রায় ৮৭১৪ নং গ্রাহক; দিলীপকুমার দত্তগুপ্ত, ১৩০৫৮ নং গ্রাহক; সুনীলচন্দ্র দেব ১৫১৭৬ নং গ্রাহক; নিখিলচন্দ্র পাল, ঢাকা; দিলীপকুমার বসু, নয়াদিল্লী; শ্রীসমীরণ চৌধুরী ১২৩২৪ নং গ্রাহক; শ্রীবিশ্বজিৎ ও ভারতী মতিলাল, ১৩১৮৪ নং গ্রাহক; শ্রীহীরেন্দ্র, হেমেন্দ্র, মায়ারাণী, তৃপ্তি ইত্যাদি, কলিকাতা; বীথিকা মিত্র, ৪৯২৫ নং গ্রাহিকা।

সম্পাদক—শ্রীআশুতোষ ধর
৫নং বঙ্কিম চাটার্জি ষ্ট্রীট, কলিকাতা, শ্রীনারসিংহ প্রেস হইতে
শ্রীপরেশনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

[প্রথম প্রকাশ—১৩২৯ সাল, ইং ১৯২২]

৩১শ বর্ষ } ভাদ্র, ১৩৫৯ { ৫ম সংখ্যা

ভাদরে

শ্রীক্ষেত্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

ঝর্‌ঝরিয়ে অঝোর ঝারা
ঝর্‌ছে ভাদরে ;
মেঘে-মেঘে জড়িয়ে গলা
কী খেলা করে !
পুকুর নদী ছাপাছাপি,
রুই কাত্‌লার লাফালাফি,
পানকৌড়ি সাঁতার কাটে
সুখের সাগরে।

তালগাছেরা তালে তালে
দুলছে রে ঝড়ে ;
হাস্‌নুহানার ঝাড়গুলি সব
লুটিয়ে যে পড়ে।
কেয়া-কদম বিলায় রেণু,
বাঁশের বনে বাজে বেণু,
পারুল দিদি জাগায় ডেকে
চাঁপায় আদরে ॥

যুক্তাক্ষরহীন

রাজকন্যা পদ্মাবতী

শ্রীঅমিতাকুমারী বসু

সে অনেক দিনের কথা। অন্ধ্রদেশে এক প্রতাপশালী রাজা ছিলেন, নাম বিক্রমসিংহ। রাজা বিক্রমসিংহের শুধু একটি মাত্র ছেলে, তার নাম অমরসিংহ। অমরসিংহের মত এমন কুৎসিত চেহারার লোক দুনিয়ায় খুব কমই ছিল। কিন্তু তা বলে কি হয়, এমন কুৎসিত ছেলেই রাজার নয়নের মণি, প্রাণের ধন। ছেলে যাতে সর্ব্ববিদ্যায় বিশারদ হয়, তার জন্য বিক্রমসিংহ ছেলের জন্য ভাল পণ্ডিত রেখে দিলেন। বালক অমরসিংহ কৈশোর থেকে যৌবনে পদার্পণ করলেন। তাঁর মধুর স্বভাবে প্রজারা মুগ্ধ, শৌর্য্যে বীর্য্যে সন্ত্রস্ত। তিনি তাঁর পিতার আশা পূর্ণ করে সর্ব্ববিদ্যায় পারদর্শী হলেন। চারদিকে তাঁর খ্যাতি রটে গেল। রাজা এমন গুণবান ছেলের বিবাহ দেবার জন্য অস্থির হয়ে পড়লেন। কিন্তু ছেলের ধনুকভাঙ্গা পণ, তিনি কিছুতেই বিয়ে করবেন না।

একদিন রাজা ছেলেকে অনেক আদর করে বল্লেন, "বাবা অমর, আমি বুড়ো হয়েছি, আমার বড় সাধ একটি রাঙ্গা টুকটুকে বৌ ঘরে আনি।" কিন্তু অমরসিংহ বিয়ের নামে বেঁকে বসলেন, বল্লেন, "বাবা, এখন আমি বিয়ে করতে প্রস্তুত নই, আমাকে কিছুদিন সময় দাও।" কিন্তু বুড়ো বাপ অমরকে বিয়ের জন্য ব্যস্ত করে তুল্লেন। অমর আর উপায় না দেখে সোনা দিয়ে খুব চমৎকার একটি মূর্ত্তি তৈরী করিয়ে বাবাকে দেখিয়ে বল্লেন, "যদি ঠিক এর মত সুন্দরী কন্যা পাওয়া যায়, তবেই বিয়ে করব।" রাজা খুসী হয়ে চারদিকে দূত পাঠালেন। রাজার দূতেরা সেই স্বর্ণমূর্ত্তির মত সুন্দরী কন্যার সন্ধানে সারা ভারতবর্ষ ঘুরতে লাগল।

বহুস্থান ঘুরে অবশেষে তারা মদ্রদেশে এসে উপস্থিত হল। মদ্ররাজের খুব সুশ্রী আটটি কন্যা ছিল। বড় রাজকন্যা পদ্মাবতী খুব সুন্দরী, অমরসিংহের তৈরী সোনার প্রতিমার মতই দেখতে।—অন্ধ্রদেশের দূতেরা খুব খুসী হয়ে তাদের যুবরাজের জন্য মদ্রদেশের রাজকন্যা পদ্মাবতীকে প্রার্থনা করল। মদ্রদেশের রাজাও অমরসিংহের শৌর্য্য-বীর্য্যের কাহিনী অবগত ছিলেন। তিনি এই বিবাহের প্রস্তাবে অত্যন্ত আনন্দের সহিত রাজী হলেন, এবং দূতকে বললেন, "অন্ধ্রাধিপতি যদি তাঁর পুত্রের সহিত পদ্মাবতীর বিবাহ স্থির করেন, তবে আমি গৌরব অনুভব করব।" দূত হৃষ্টচিত্তে এই খবর নিয়ে অন্ধ্রদেশে এল। রাজা বিক্রমসিংহ বিবাহের প্রস্তাবে আনন্দিত হলেন, কিন্তু অমরসিংহের মুখ ম্লান হয়ে গেল, বল্লেন, "বাবা, তুমি এ কি করলে? এমন সুন্দরী রাজকন্যা কখনও আমার মুখ দর্শন করবে না, আমার এই কুরূপ দেখলেই আমাকে পরিত্যাগ করে চলে যাবে।" বিক্রমসিংহ বল্লেন, "অমর, তুমি কেন এ ব্যস্ত হচ্ছ, তোমার কোন ভাবনা নেই; আমি আমাদের রাজ্যের একটি

পুরাতন নিয়ম আবার প্রচলন করব। বলব, আমাদের দেশের নিয়ম—রাজকন্যা এক বৎসর স্বামীর মুখ দিনে দেখতে পারবেন না, এবং তুমিও এক বৎসর তোমার স্ত্রীর সঙ্গে অন্ধকারের মধ্যেই দেখাসাক্ষাৎ করবে।" অমরসিংহ বললেন, "বাবা, এক বৎসর পরও আমি এখন যেমন কুৎসিত তেম্নি থাকব, তখন রাজকন্যা আমাকে পছন্দ করবে না।" কিন্তু রাজা বল্লেন, "সে জন্য কোন চিন্তা নেই, এই এক বৎসরের মধ্যে তোমার প্রতি রাজকন্যার এমনই স্নেহ ভালবাসা হবে যে, তখন রাজকন্যার চোখে তুমি অসুন্দর থাকবে না, সুন্দর হয়েই দেখা দিবে।" অমরসিংহ তবু ইতস্ততঃ করছিলেন। কিন্তু রাজা আর দেরী না করে খুব ধুমধাম করে বাদ্যভাণ্ড নিয়ে রাজকন্যা পদ্মাবতীকে নিজের দেশে নিয়ে এলেন ও রাজপুত্রের সঙ্গে বিয়ে দিলেন।

বিয়ে ত খুব জাঁকজমক করে হল, কিন্তু পদ্মাবতী শুনলেন, এক বৎসর তিনি স্বামীর মুখ দেখতে পাবেন না। একথা শুনে রাজকন্যা অবাক হয়ে গেলেন, মনে মনে ভাবলেন, এ আবার কি দেশে বিয়ে হল, বরের মুখ দেখতে পাব না? এমন কথা ত কখনও শুনিনি! যা হোক, বুদ্ধিমতী পদ্মাবতী কিছু না বলে চুপ করে রইলেন।

রাজকন্যার জন্য একটি ঘর খুব সুন্দর ভাবে সজ্জিত করা হল; কিন্তু সেই ঘরে সূর্য্যালোক ঢুকতে পারে না। সেই অন্ধকার ঘরে অমরসিংহ তার স্ত্রী পদ্মাবতীর সহিত দেখা করতে আসেন। অমরসিংহ দূর থেকে তার স্ত্রীর রূপ দেখে মুগ্ধ হলেন। পদ্মাবতীর গায়ের রং সোনার মত হলদে, বাঁশীর মত সরু নাক, পটলচেরা চোখ, সরু ভ্রূ, রাঙ্গা ঠোঁট, আর একরাশ কালো চুল। একবার দেখলে চোখ ফিরান যায় না এমনি অপরূপ সৌন্দর্য্য! অমরসিংহ স্ত্রীকে খুব ভালবাসলেন। তিনি বীণা বাজাতে পারতেন। রোজ পদ্মাবতীকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বীণা বাজিয়ে শুনাতে লাগলেন। আঁধারে বসে অমরসিংহ তাঁর শিকারের কত আশ্চর্য্য গল্প বলতেন, পদ্মাবতী অবাক হয়ে শুনতেন। অমর তাঁর সুন্দর মধুর ব্যবহারে পদ্মাবতীর হৃদয় জয় করে ফেললেন। রাজকন্যা ভাবলেন, যাঁর হৃদয় এত সুন্দর, ব্যবহার এত মধুর, তাঁর চেহারা না জানি কত সুন্দর! পদ্মাবতী স্বামীর মুখ দেখবার জন্য অস্থির হয়ে গেলেন।

একটি মাস হল বিয়ে হয়েছে, তাতেই অধৈর্য্য; পদ্মাবতী এক বৎসর কি করে অপেক্ষা করবেন? তাঁর কৌতূহল দিন দিন বেড়ে যেতে লাগল। তিনি তাঁর সখীদের জিজ্ঞেস করলেন, "রাজপুত্র অমরসিংহ দেখতে কেমন?" কিন্তু সখীরা কোন সন্তোষজনক উত্তর দিতে পারল না। তখন পদ্মাবতী একদিন তাঁর স্বামীকে বললেন, "রাজপুত্র, বিয়ে হয়ে এতদিন চলে গেল, আমি তোমার মুখ আজো দেখতে পেলাম না। আমার মনে বড় কষ্ট হচ্ছে। দিনের আলোতে তুমি আমার সামনে দাঁড়াও, আমি তোমায় দেখি।" রাজপুত্র অনুনয়ের সুরে বললেন, "পদ্মাবতী, তুমি আমায় ক্ষমা করো, আমি বাবার আদেশ অমান্য করতে পারব না, এই কয়টা মাস দেখতে দেখতে কেটে যাবে।" কিন্তু রাজপুত্রের কথায় পদ্মাবতীর মন আরো অস্থির হয়ে গেল; তিনি

তখন তাঁর সখীদের ধরলেন, যেমন করেই হোক গোপনে তাঁকে স্বামীর মুখ মুহূর্ত্তের জন্যেও দেখাতে হবে। সখীরা আর কি করে, রাজী হল। তারা সুযোগ খুঁজতে লাগল।

একদিন রাজপুত্র সহরে বের হবেন এই কথা জানতে পেরে সখীরা পদ্মাবতীকে তেঁতালার জানালায় দাঁড় করিয়ে দিল। আশঙ্কায় উত্তেজনায় পদ্মাবতী স্বামীকে দেখবার জন্য রাস্তার দিকে তাকিয়ে রইলেন। হঠাৎ বাদ্যভাণ্ড বেজে উঠল। লোকদের কলরব শোনা গেল। পদ্মাবতী মর্ম্মর প্রাসাদের জানালায় দাঁড়িয়ে দেখলেন, শ্বেত হাতীর উপর সোনার সিংহাসনে রাজপুত্র বসে আছেন। প্রজারা 'রাজপুত্র অমরসিংহ দীর্ঘজীবী হউন,' 'রাজপুত্র অমরসিংহের জয় হোক' বলতে বলতে আসছে, আর রাজপুত্রের পায়ে ফুল ও ফুলের মালা ছুড়ে ফেলছে। সোনার ছাতার নীচে শ্বেত-হস্তীর পিঠে রাজপুত্র অমরসিংহের মুখ দেখে ঘৃণায় লজ্জায় 'মাগো' বলে পদ্মাবতী মুখ ঢাকলেন। তিনি বলে উঠলেন, "সখী, এই কদাকার লোকটা কখনও আমার স্বামী নয়।" কিন্তু সখীরা যখন বললে, 'রাণি, এই তোমার স্বামী', তখন পদ্মাবতী বললেন, "আমি আর এক মুহূর্ত্তও এখানে থাকব না। আমাকে প্রতারিত করে এমন কুৎসিত লোকের সঙ্গে বিয়ে দিয়েছে, এ আমার স্বামী নয়, আমি মদ্রদেশে চলে যাব।" একথা রাজাকে জানানো হল। রাজা বিক্রমসিংহ রেগে বললেন, "আমার আদেশ—পদ্মাবতী এ রাজ্য ছেড়ে যেতে পারবে না।" কিন্তু অমরসিংহ বিষাদমাখা সুরে উত্তর দিলেন, "না বাবা, তাকে বাধা দিও না, যেতে দাও।" পদ্মাবতী মদ্রদেশে চলে গেলেন।

পদ্মাবতীকে ছেড়ে অমরসিংহের সংসার অন্ধকার হয়ে গেল। কিছুদিন পর আর থাকতে না পেরে অমরসিংহ ছদ্মবেশে মদ্রদেশে রওয়ানা হলেন। অমরসিংহ একদিন মধ্যরাত্রে পদ্মাবতীর জানালার নীচে বসে অতি মধুর সুরে বীণা বাজাতে আরম্ভ করলেন। গভীর নিস্তব্ধ রাত্রে বীণার কোমল করুণ সুর ঘুমন্ত পুরীতে এক অপরূপ মায়া সৃষ্টি করল। সুপ্ত অধিবাসীরা মনে করল, তারা স্বপ্নে এক আশ্চর্য্য সঙ্গীত শুনছে। স্বপ্নে তারা হেসে উঠল। পদ্মাবতী চমকে জেগে উঠলেন, এ সুর যে তাঁর অতি প্রিয়! রাজপুত্র এই অপরূপ সুরের মাধুর্য্যে দিনের পর দিন তাঁর হৃদয় কেড়ে নিয়েছিলেন। ক্ষণিকের জন্য পদ্মাবতী বিমনা হলেন, কিন্তু পরমুহূর্ত্তেই তাঁর হৃদয়ে আনন্দের পরিবর্ত্তে ভয়ের সঞ্চার হল। যদি তাঁকে তাঁর পিতা আবার এই কুৎসিত স্বামীর হাতেই অর্পণ করেন? অমরসিংহ তাঁর আসবার খবর কাউকে জানাতে ইচ্ছা করলেন না; কারণ তাঁর মনে হয়েছিল, যদি রাজকন্যা স্বেচ্ছায় তাঁর নিকট আসতে রাজী হন, তবে তাঁকে সঙ্গে করে দেশে ফিরবেন, কিন্তু তাঁর অমতে জোর করে নিবেন না। অমরসিংহ রাজ্যের মধ্যে যে শ্রেষ্ঠ কুমোর তার বাড়ীতে আশ্রয় নিলেন। তাঁর মনে আশা, তিনি গোপনে এমন কোন নিদর্শন পাঠাবেন যাতে রাজকুমারী তাঁকে চিনতে পারেন। তিনি কুমোরকে বললেন, "ভাই কুমোর, আমি যদি কিছু বাসন তৈরী করে দি, তুমি সেগুলো রাজবাড়ীতে নিয়ে যাবে কি?" কুমোর বল্লে, "নেবার উপযুক্ত হলে নেব।" তখন

রাজপুত্র এমন চমৎকার জিনিষ তৈরী করলেন, যা দেখে কুমোর অবাক হয়ে রাজবাড়ীতে নিয়ে গেল।

রাজা জিনিষগুলির সূক্ষ্ম কারুকার্য্য দেখে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হলেন। জিজ্ঞেস করলেন, "কে এগুলো তৈরী করেছে?" কুমোর বল্লে, "এক বিদেশী যুবক এগুলো তৈরী করেছে।" একথা শুনে রাজা সেই যুবককে শত মুদ্রা পুরস্কার দিলেন, এবং তাঁর আটটি মেয়ের জন্য আটটি পুষ্পপাত্র তৈরী করে আনতে বল্লেন। পরদিন কুমোর রাজার আদেশ মত আটটি ফুলদানী এনে রাজকন্যাদের উপহার দিল। রাজকন্যারা এমন চমৎকার কাজকরা জিনিষ দেখে খুব খুশী হলেন। কিন্তু পদ্মাবতী তাঁর ফুলদানীতে নিজের প্রতিমূর্ত্তি চিত্রিত দেখে চমকে উঠলেন। তিনি কুমোরকে ফুলদানী ফিরিয়ে দিয়ে বল্লেন, "এ যার ফুলদানী তাকে ফিরিয়ে দাও, আমি তার কোন জিনিষ চাইনে।" কুমোরের মুখে পদ্মাবতীর কাহিনী শুনে অমরসিংহ দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে নিজের মনে বল্লেন, 'হায়! আমি কুৎসিত বলে পদ্মাবতী এখনও আমাকে ঘৃণা করে। আমি যদি কোন রকমে তার কাছে যেতে পারি, তবে হয়ত তার পাষাণ হৃদয় গলবে।' এই ভেবে অমরসিংহ তার শতমুদ্রা কুমোরকে দান করে রাজপ্রাসাদের পাচকের নিকট এলেন এবং রাজার জন্য রান্না করবার অনুমতি চাইলেন। পাচকেরও একটি লোকের দরকার ছিল, সে অমরসিংহকে কাজে ভর্ত্তি করে নিল।

অমরসিংহ একটি খুব সুস্বাদু খাদ্যদ্রব্য প্রস্তুত করলেন; রাজা খেয়ে এত তৃপ্ত হলেন যে, তিনি খোঁজ নিলেন, কে এই খাদ্য তৈরী করেছে। নতুন যুবকের কথা শুনে রাজা তাকে শতমুদ্রা পুরস্কার দিলেন, এবং রাজকন্যা ও তাঁর জন্য খাদ্য তৈরী করতে আদেশ করলেন। পরদিন অমরসিংহ নানা রকম সুখাদ্য তৈরী করে রাজাকে পরিবেশন করলেন। তারপর রাজকন্যাদের ঘরে তাঁদের খাবার নিয়ে গেলেন। অমরসিংহকে ছদ্মবেশে দেখেও পদ্মাবতী স্বামীকে চিনে ফেল্লেন, এবং ঘৃণায় লজ্জায় শিউরে উঠলেন। তিনি রেগে বলে উঠলেন, "শীগ্‌গির এসব খাবার এখান থেকে নিয়ে যাও, আমি এসব খাব না।" অন্য রাজকন্যারা চেঁচিয়ে বলে উঠল, "দিদি বোকা, এমন চমৎকার রান্না খাবে না বলছে, আমরা কখনও এমন সুস্বাদু রান্না খাইনি।" দিন কতক অমরসিংহ রান্না করে রাজকন্যাদের পরিবেশন করলেন, কিন্তু পদ্মাবতী স্বামীর তৈরী একটি খাদ্যও স্পর্শ করলেন না। অমরসিংহ নিরাশ হয়ে গেলেন, দেখলেন পাষাণীর হৃদয় গলবে না। তাঁর মন তিক্ত হয়ে গেল। ভাবলেন, পদ্মাবতীর মন গলাবার জন্য এই কতদিন কত কষ্টই না সহ্য করলাম, কিন্তু আর না। পদ্মাবতীকে জন্মের মত ছেড়ে আমার বাবার কাছে চলে যাব, তারপর রাজ্যে কোথাও কোনো আশ্রমে থেকে আমার দুঃখকষ্ট গোপন করব।

অমরসিংহ যখন রাজপ্রাসাদ ত্যাগ করে নিজ রাজ্যে যাবার জন্যে তৈরী হলেন, তখন শুনতে পেলেন, মদ্ররাজার বড় বিপদ উপস্থিত। সাত দেশের সাতটি প্রতাপশালী রাজা, পদ্মাবতীর

সৌন্দর্য্যের কথা শুনে তাকে হরণ করে নিয়ে যেতে এসেছেন। মদ্ররাজার মাথা ঘুরে গেল, এ মহাবিপদে কে তাঁকে রক্ষা করে? সাতটি প্রতাপশালী রাজার হাত থেকে তাঁর এ রাজ্য কে উদ্ধার করবে! হায়! দুষ্ট পদ্মাবতী যদি আজ তার স্বামীকে পরিত্যাগ না করত, তবে আজ রাজ্যের এই অবস্থা ঘটত না। মদ্ররাজা মন্ত্রীদের ডেকে সভা করলেন। মন্ত্রীরা বল্লেন, "মহারাজ, পদ্মাবতীকে কেটে সাতটুকরো করে সাতরাজার হাতে দিন্, নইলে রাজ্যের এই বিপদ থেকে আমরা রক্ষা পাব না।" রাজা শিউরে উঠলেন, তাঁর এত আদরের রাজকন্যার অদৃষ্টে কি এই ছিল? মন্ত্রীদের বিদায় করে দিয়ে রাজা বিষন্ন বদনে গালে হাত দিয়ে বসে রইলেন, এমন সময় অমরসিংহ পাচকের পোষাক পরেই রাজার নিকট উপস্থিত হয়ে বল্লেন, "মহারাজ, আপনি আমাকে সহস্র সৈন্য চালাবার অনুমতি দিন্, আমি যুদ্ধে তাদের পরাজিত করে আপনাকে বিপদ হতে উদ্ধার করব।"

রাজা খুব অবাক্ হয়ে বল্লেন, "কি বল্লে? শেষকালে পাচক গিয়ে রাজ্য উদ্ধার করবে? হায় অদৃষ্টের কি পরিহাস!" কিন্তু অমরসিংহ হাতযোড় করে বল্লেন, "মহারাজ, আমি পাচক নই, আমি রাজপুত্র অমরসিংহ।" রাজা একথা বিশ্বাসই করতে পারলেন না যে, এই লোকটা তাঁর মেয়ের জামাই রাজপুত্র অমরসিংহ। তিনি পদ্মাবতীকে ডেকে পাঠালেন, পদ্মাবতী বল্লেন, "হ্যাঁ বাবা, এই অমরসিংহ।" তখন রাজা পদ্মাবতীর উপর খুব রেগে গেলেন ও পদ্মাবতীকে অনেক মন্দ বলে ভিতরে পাঠিয়ে দিলেন। তারপর রাজা তাঁর কন্যার ব্যবহারের জন্য অমরসিংহের নিকট ক্ষমা ভিক্ষা চাইলেন ও তাঁকে হাজার সৈন্য দিয়ে যুদ্ধের জন্য পাঠিয়ে দিলেন। সাতটি রাজা যেই শুনলেন অমরসিংহ সসৈন্যে যুদ্ধে আসছেন, অমনি এ-ওর মুখ চাওয়াচাওয়ি করতে লাগলেন; পদ্মাবতীকে নিয়ে যাওয়ার সখ সবার উবে গেল! অমরসিংহ অমিতবিক্রমে সকলকে যুদ্ধে পরাজিত করে সাত রাজাকে বন্দী করে নিয়ে এলেন। মদ্ররাজের হাতে বন্দীদের অর্পণ করে বল্লেন, "মহারাজ, এরা আপনার বন্দী, আপনার ইচ্ছামত এদের প্রতি শাস্তি বিধান করুন"। মদ্ররাজ অমরসিংহের শৌর্য্যে মুগ্ধ হলেন, তিনি বল্লেন, "বাবা, তুমি এদের জয় করেছ, তুমিই এদের শাস্তি বিধান কর।" তখন অমরসিংহ বল্লেন, "রাজন, আপনার অন্য সাতটি কন্যাও পদ্মাবতীর মতই সুন্দরী। এই সাত রাজপুত্রের সহিত সেই সাত রাজকন্যার বিবাহ দিলে আনন্দের ব্যাপার হবে।" সকলেই এই প্রস্তাব আনন্দের সহিত গ্রহণ করলেন এবং খুব ধুমধামের সহিত সাতকন্যার বিবাহ ব্যাপার সুসম্পন্ন হল। রাজকন্যারাও যে যার স্বামী পেয়ে নিজকে সৌভাগ্যবতী মনে করলেন। এত উৎসব আনন্দের মধ্যে রাজকুমার অমরসিংহ একদিন সবার অগোচরে নিজ রাজ্যে চলে গেলেন।

ওদিকে পদ্মাবতী ধীরে ধীরে নিজের নিষ্ঠুরতা ও নীচ ব্যবহার বুঝতে পেরে গোপনে চোখের জল ফেল্লেন। তিনি বুঝলেন যে, তাঁর স্বামীর হৃদয় কত মহান, কত উদার। এমন অশেষ গুণশালী স্বামীকে তিনি তাচ্ছিল্য করেছেন। তিনি সেই স্বামীর স্নেহ ভালবাসা আর ফিরে পাবেন না। রাজকন্যা শুধু মনের দুঃখে অশ্রুজল বিসর্জ্জন করেন।

একদিন দূত এসে খবর দিল, রাজপুত্র অমরসিংহ তাঁর সঙ্গে দেখা করতে চান। পদ্মাবতীর আর ধৈর্য্য রইল না, স্বামীকে দেখে তাঁর পায়ে কেঁদে লুটিয়ে পড়লেন, আর বল্লেন, "আমাকে ক্ষমা কর, আমাকে তোমার দাসী করে তোমার সেবা করতে দাও।" রাজপুত্র তাঁকে ধীরে ধীরে হাত ধরে তুললেন, তারপর বিষাদমাখা স্বরে বল্লেন, "পদ্মাবতী, তুমি কি আমার সাথে যেতে চাও? কিন্তু আমার দিকে চেয়ে দেখ, তুমি আমায় ছেড়ে পালিয়ে আসবার সময় আমি যেমন কুৎসিত ছিলাম এখনও ঠিক তেম্নি আছি।" পদ্মাবতী অমরসিংহের দিকে চেয়ে রইলেন। অমরসিংহ সে চোখের ভাষা বুঝতে পারলেন। সেই বিশাল নয়ন কোমল হয়ে এসেছে, তাতে ঘৃণার পরিবর্ত্তে স্নেহের দৃষ্টি। পদ্মাবতী তাঁর স্বামীকে বল্লেন, "তোমার চেহারা একেবারে বদলে গেছে, তুমি কত সুন্দর!"

কিন্তু অমরসিংহের চেহারা বদলে যায়নি, পদ্মাবতীর স্বভাব বদলে গিয়েছিল। পদ্মাবতী তাঁর কুৎসিত স্বামীর মুখে বুদ্ধির দীপ্তি, অন্তরের পবিত্রতা, পুরুষের শৌর্য্য দেখতে পেয়ে মুগ্ধ হলেন। রাজপুত্র অমরসিংহের পাষাণী রূপসী স্ত্রী এখন পরম স্নেহময়ী সুন্দরী পদ্মাবতীতে পরিবর্ত্তিত হয়ে গেল। রাজপুত্র অমরসিংহ ও রাণী পদ্মাবতী সুখে রাজ্য করতে লাগলেন।

অন্ধ্র দেশীয় উপকথা

শ্রীদুর্গামোহন মুখোপাধ্যায়

ডাকাতের শিষ্টতা

ভাল হোক্ আর মন্দ হোক্, বিশেষ কোন উদ্দেশ্য পূর্ণ করতে গিয়ে যদি বাধা পায়, তা হ'লেই তো মানুষ বিরক্ত হয়, রেগে যায় এবং হারিয়ে ফেলে সব রকমের বিচার-বুদ্ধি। আধুনিক শিক্ষিত ও সভ্য সমাজেও কি এটা আমরা দেখতে পাই না? জগতে এই যে মানুষে মানুষে, দেশে দেশে, জাতিতে জাতিতে এত বিদ্বেষ, এত হিংসা, এত হানাহানি চলেছে, তা কিসের জন্য? নিজের স্বার্থ, নিজের উদ্দেশ্য পূর্ণ না হওয়ায়ই তো মানুষ আজ হ'য়ে উঠেছে উন্মাদ।

এবার তোমাদের যে ডাকাতের গল্পটি শোনাব, সে কিন্তু বাধা পেয়েও বিরক্ত হয় নি, একটুও রাগ করে নি, কাজেই কোনও রকমের অশিষ্ট ব্যবহার তো করেই নি, বরঞ্চ এমন ব্যবহার করেছে যা অসাধারণ লোকদের কাছেও ঐ অবস্থায় পাওয়া যায় খুবই কম। অতি সহজেই তো ধৈর্যচ্যুতি ঘটতে দেখি বিশিষ্ট শিক্ষিত ও সভ্য লোকদেরও, অথচ একটা ডাকাত মনুষ্যত্বের এমন পরিচয় দিলে যা আমাদের সভ্য সমাজেও খুবই কম দেখি।

* * *

ডাকাত হিসাবে হুগলী জেলার কালী সর্দারের নাম তখন ঘরে ঘরে। তাকে ভয় করত না এমন লোক ছিল না। তার দলে লোকও ছিল অনেক। সে ছিল সকলের সর্দার।

লোকে তার সম্বন্ধে কত অদ্ভুত কথাই না বলত। সত্য ও মিথ্যায় মিশানো কত কাহিনীই না তখন তার সম্বন্ধে রচিত হয়েছিল।

কেউ বলত, কালী সর্দার রীতিমত ভেল্কিবাজী জানে; কেউবা বলত, মন্তর জানে, তাই কোন কোন জায়গায় ডাকাতির সময়ে তাকে ধরবার জন্যে যত রকমের ব্যবস্থা করা হয়েছে, যত কৌশল খাটানো হয়েছে, সবই ব্যর্থ ক'রে দিয়ে সদলবলে সে অদৃশ্য হ'য়ে গেছে। তাকে আটকানো সহজ ছিল না। তার যেমন ছিল দেহের শক্তি, তেমনি ছিল উপস্থিত বুদ্ধি। তার অদ্ভুত কৌশলে অনেক চতুর লোকও বোকা ব'নে গেছে; তাই তার সম্বন্ধে পল্লীর সরল জনসাধারণের মধ্যে নানা আজগুবি গল্প প্রচলিত ছিল।

হুগলী জেলার সিংগুর অঞ্চলে ছিল কালী সর্দারের বাড়ী। তখনকার দিনের ডাকাতদের মধ্যে প্রচলিত সাধারণ নিয়ম অনুসারে কালী সর্দারও দলবল নিয়ে কালীপূজা করত। কোন বড় রকমের ডাকাতি করবার পূর্বে ডাকাতরা যাত্রাই করত না মা কালীকে খুশী না ক'রে। ডাকাতরা নির্জন স্থানে, বড় বড় বনের মধ্যে যে সব কালীপূজা করত, সেই সব কালীঠাকুরকে সকলে বলত 'ডাকাতে কালী'। এখনও বাংলা দেশের বহু জায়গায় 'ডাকাতে কালী' মন্দিরের ভগ্নাবশেষ দেখতে পাওয়া যায়। মন্দিরের গায়ে সহস্র ফাটল সৃষ্টি ক'রে অসংখ্য শেকড় চালিয়ে বিশালকায় সব অশ্বত্থ চারদিকে বিস্তৃত শাখা-প্রশাখা আর ঘন পল্লবে তাকে এমনি চাপা দিয়ে রেখেছে যে, আর তাঁর অস্তিত্বও টের পাওয়া যায় না।

শেওড়াফুলির কাছে এক বনের মধ্যে ডাকাতে কালীর এক মন্দির ছিল। কালী সর্দার এই মন্দিরে পুজো দিয়ে ডাকাতি করতে বেরুত।

তারকেশ্বরের কাছে এক পল্লীগ্রাম। এখানে সংগতিপন্ন কয়েকঘর ব্যবসাদারের বাস। এই গাঁয়েরই একটি বাড়ীতে কালী সর্দার ডাকাতি করতে গিয়েছে তার দলবল নিয়ে। ডাকাতদের হা-রে-রে-রে ডাকের চোটে গাঁয়ের ওপরের আকাশ থেকে নীচে মাটি অবধি কেঁপে উঠল।

ধড়মড় ক'রে বিছানা ছেড়ে বেরিয়ে আসে নানান বাড়ীর লোকেরা। ডাকাতের হাঁক শুনে সকলেরই বুকের ভেতরটা ধড়াস্ ধড়াস্ করছে। স্ত্রীলোকেরা শিশুগুলিকে বুকে জড়িয়ে ধ'রে একেবারে কাঠ হ'য়ে আছে।

কালী সর্দারের সাক্রেতেরা মশাল হাতে এগিয়ে আসছে যেন কতকগুলি যমদূত।

ডাকাত পড়েছে বুঝতে পেরেও গাঁয়ের লোক বেরিয়ে এসে বাধা দিতে সাহস করছে না। প্রাণের মায়া বড় মায়া। কে চায় বাধা দিতে গিয়ে কাঁচা মাথাটা দিতে? বাধা পেলে এই যমদূতেরা তো কারই রক্ষে রাখবে না, তাই নিরাপদ দূরত্ব রক্ষা ক'রে তারা থ' হয়ে দাঁড়িয়ে দেখে।

জ্বলন্ত মশাল নিয়ে যে বাড়ীটা ঘিরে কালী সর্দারের লোকেরা দাঁড়িয়েছে, সে বাড়ী থেকে কোন চীৎকার উঠল না, কোন শব্দই শুনতে পাওয়া গেল না। বাড়ীতে যে কোন লোক আছে তাও টের পাওয়া যাচ্ছে না। ভয়ে সব একেবারে নিস্তব্ধ হ'য়ে গেছে।

কালী সর্দার নিজে দাঁড়িয়েছে সদর দরজার সামনে। দমাদম কয়েকটা লাথি মারে সর্দার সেই রুদ্ধ দরজায়। লাথিতে সেই লৌহ-কপাট ভাঙে না।

হঠাৎ দরজার একটি পাট খুলে যায়। দরজায় দাঁড়িয়ে এক নারী মূর্তি। তার গায়ের রং মা কালীর রংএরই মতো। লম্বা এলো চুল ছড়িয়ে পড়েছে সারাটা পিঠের ওপরে। আঁট-সাঁট ক'রে লাল শাড়ী পরা। সিঁথিতে সিঁদুররেখা টক্‌টক্ করছে তাজা রক্ত রেখার মতো। হাতে মা কালীর

খাঁড়ার মতোই একটা খাঁড়া। চোখ দুটো থেকে যেন দুটো আগুনের তীর বেরিয়েছে অন্ধকারের বুক ফুটো ক'রে।

–সর্দার ঢুকতে গিয়েই থমকে দাঁড়ায়। বলে, "পথ ছেড়ে দাও মা, বড্ড দেরী হয়ে যাচ্ছে।"

মূর্তি নিরুত্তর।

সর্দার যেমনি এগিয়েছে অমনি মূর্তি ব'লে ওঠে, "আমার কাছে এলেই এই খাঁড়া দিয়ে তোমায় বলি দেব। আমি পথ ছেড়ে দেব মনে করেছ? আমাকে না মেরে রেখে তুমি বাড়ীতে ঢুকতে পাবে না। ভয়ে বাড়ীর লোক পাথর হয়ে গেছে, আমার বাছাদের দম আটকে আসছে। ওদের মারবার আগে আমাকে মার। এস, এগিয়ে এস।"

"কাউকেই মারব না মা, মারব না, বিশ্বাস করুন।"

"ডাকাতকে আবার বিশ্বাস! প্রাণ থাকতে আমি দরজা ছাড়ব না।"

কালী সর্দার একটু কাল চুপ ক'রে চেয়ে থাকে এই মাতৃমূর্তির দিকে। ভাবে, সে যেন মা কালীকেই দেখছে। এই যে এক মা দাঁড়িয়ে আছেন মা কালীর বেশ নিয়ে, এঁকে কোন রকমে অসম্মান করলে মা কালীই রুষ্ট হবেন, এই আশংকায় কালী সর্দার ভূমিষ্ঠ হ'য়ে প্রণাম করে বলে,—"মা, দরজা বন্ধ করে দিয়ে তুমি ঘরে যাও, আমি চ'লে যাচ্ছি।"

সমস্ত গাঁয়ের লোক বিস্মিত হ'য়ে চেয়ে দেখে কালী সর্দারের মতো ডাকাত সদলবলে ডাকাতি করতে এসে ডাকাতি না ক'রে এমনিভাবে নিঃশব্দে চলে যায়।

সত্যিকারের রূপকথা

শ্রীঅনিলকুমার চট্টোপাধ্যায়

[প্রকৃতি যাকে পাঠালেন সর্বসম্পদরিক্তা মূক-বধির অন্ধ ক'রে, সেই মেয়েই একদিন হয়ে উঠলো পৃথিবীর অষ্টম বিস্ময়সমা অসামান্যা, অনন্যা।]

মার্ক টোয়েন্ একবার বলেছিলেন : উনবিংশ শতাব্দীর দু'টি অসাধারণ চরিত্র হচ্ছে নেপোলিয়ঁ আর হেলেন কেলার।......

মার্ক টোয়েন্ যখন একথা বলেছিলেন, হেলেন কেলার তখন মাত্র পনেরো বছরের মেয়ে। তারপর কতো বছর কেটে গেছে, আজো কিন্তু হেলেন কেলার হয়ে আছেন এই বিংশ শতাব্দীরও অন্যতম অসাধারণ চরিত্র।...

হেলেন কেলার সম্পূর্ণ অন্ধ, তবু চক্ষুষ্মান্‌দের চেয়ে অনেক বেশী বই তিনি পড়েছেন।...... কত বেশী জানো ?...সাধারণ মানুষের চেয়ে অন্ততঃ একশো গুণ বেশী। শুধু তাই নয়। তিনি নিজে লিখেছেন এগারোখানা প্রসিদ্ধ বই। তাঁর নিজের জীবনী নিয়ে আস্ত একখানা ছায়াছবি তোলা হয়েছে,—তাতে তিনি আত্মচরিত্রে অভিনয়ও ক'রেছেন। পুরোপুরি বধির তিনি,—তবু কাণে-যারা-শুন্‌তে-পায় তাদের অনেকের চাইতে সঙ্গীতের তিনি ভাল সমঝদার।

জীবনের সুদীর্ঘ ন'টা বছর ধ'রে তিনি বাচনশক্তি থেকে বঞ্চিত ছিলেন,—তবু দেশদেশান্তরে তিনি বক্তৃতা দিয়ে বেড়িয়েছেন,—সারা য়ুরোপ তিনি পর্যটন ক'রেছেন।

জন্মের সময় আর পাঁচজনের মতই হেলেনও ছিলেন সুস্থ, স্বাভাবিক। জীবনের প্রথম দেড়টা বছর অন্যান্য কচিদের মত তিনিও দেখতে শুনতে পেতেন,—এমন কি আধো আধো কথাও ফুটেছিল তাঁর মুখে। তারপর...

সহসা তাঁর জীবনে দেখা দিল কাল অভিশাপ। অসুখে পড়লেন হেলেন কেলার,—হয়ে গেলেন একেবারে বধির, মূক আর অন্ধ। মাত্র উনিশ মাস বয়সেই সারা সৃষ্টি তাঁর কাছে হয়ে উঠলো রূপ-রস-শব্দ-অর্থহীন।...

দুর্দান্ত বুনো একটা জন্তুর মত তিনিও বড় হতে লাগলেন। যা কিছু তাঁর পছন্দ না হোত তাকেই তিনি ভেঙ্গে-চুরে তছনছ ক'রে ফেলতেন। চিবানো খাবার মুখ থেকে বা'র ক'রে দুহাতে চট্‌কে ছড়াছড়ি করতেন,—সর্বাঙ্গে মাখ্‌তেন। কেউ মানা করতে বা বোঝাতে গেলেই ঘট্‌তো মহা অনর্থ। মেঝের উপর আছড়ে প'ড়ে হাত-পা ছুঁড়ে চিৎকার ক'রে গড়াগড়ি সুরু ক'রে দিতেন।

তাঁর ভবিষ্যৎ সম্পর্কে পুরোপুরি হতাশ হয়ে শেষকালে তাঁর বাবা-মা বোষ্টনের অন্ধদের প্রতিষ্ঠান পার্কিনস্ ইনস্টিটিউটে একটি শিক্ষয়িত্রীর খোঁজ করলেন তাঁর জন্যে। ফলে, হেলেন কেলারের অভিশপ্ত জীবনে কল্যাণময়ী এক স্বপন-পরীর মত দেখা দিলেন কুমারী এ্যানি

ম্যান্‌স্‌ফিল্ড স্যালিভান্‌। পার্কিনস্‌ ইন্‌ষ্টিটিউটের কাজে ইস্তাফা দিয়ে কুমারী স্যালিভান্‌ যখন ছোট একটি মূক, বধির, অন্ধ অথচ দামালদস্যি মেয়েকে শিক্ষাদানের প্রায় অসম্ভব দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নিলেন, তখন তাঁর নিজেরও বয়স মাত্র কুড়ি বছর। কুমারী স্যালিভানের নিজের জীবনও ছিল বুকফাটা করুণতম দুর্দশা ও দৈন্যে ভরা।

মাত্র দশবছর বয়সে এ্যানি স্যালিভান্‌কে তাঁর ছোট একটি ভাইয়ের হাত ধ'রে এসে উঠতে হয় ডিউক্‌স্‌বেরীর এক অনাথাশ্রমে। সে-অনাথাশ্রমেও তখন এত ভীড় যে, স্থানাভাবে ছোট্ট ভাইটিকে নিয়ে বোনটিকে রাতের বেলায় শুতে হোত সেখানকার "ঘড়িঘরের" মেঝেয়; আশপাশে পড়ে থাকতো এমন অনেক মড়া—যাদের সৎকার হতে তখনও হয়ত ক'দিন বাকী। ছোট্ট ভাইটি ছিল চিররুগ্ন। এত কষ্ট সহ্য হোল না তার ক্ষীণ দেহে,—মারা গেল ছ'মাসের মধ্যেই। এ্যানি নিজেও—মাত্র চৌদ্দ বছর বয়স তখন তাঁর—দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে প্রায় অন্ধ হ'তে বসেছিলেন। তাই সেখান থেকে তাঁকে পাঠিয়ে দেওয়া হোল পার্কিন্‌স্‌ ইন্‌ষ্টিটিউটে,—যাতে সেখানে তিনি আঙ্গুলের সাহায্যে লেখাপড়া শিখতে পারেন।······

ভাগ্যক্রমে চোখদুটি তাঁর সেযাত্রা অন্ধ হ'তে হ'তেও বেঁচে যায়। পরে—প্রায় পঞ্চাশ বছর বাদে মৃত্যুর মাত্র কিছুদিন আগে তাঁর দু'চোখে নেমে আসে জগৎজোড়া অন্ধকার।···

হেলেন কেলারের শিক্ষয়িত্রী নিযুক্ত হয়ে এ্যানি স্যালিভান যেন কোন মোহনকাঠির ছোঁয়ায় সৃষ্টি করলেন অভূতপূর্ব ইন্দ্রজাল। যে-মেয়ে ডুবেছিল অথৈ অন্ধকার আর সীমাহীন নৈঃশব্দের মধ্যে, মাত্র একমাসের অধ্যবসায়ে তার সঙ্গে তিনি সাঙ্কেতিক যোগাযোগ স্থাপন ক'রে ফেললেন। "আমার জীবন-কথা" গ্রন্থে হেলেন কেলার সেই কাহিনী লিখে গেছেন অবিস্মরণীয় ক'রে। যাঁরা সে-বই পড়েননি তাঁরা হয়ত কল্পনায় অনুভব করতে পারছেন, কী মহা আনন্দের ঝড় উঠতে পারে একটি মূক-বধির ও অন্ধ শিশুর মনে যেদিন সে প্রথম টের পায় মানবিক ভাষার অস্তিত্ব।

হেলেন কেলার লিখেছেন: দিনান্তে সেদিন যখন আমি আমার বিছানাটিতে শুয়ে কূলভাঙ্গা আনন্দে ডুবে জীবনে সেই প্রথমবার সাগ্রহে কামনা করছিলাম অনাগত পরের দিনটির জন্য, তখন খোঁজ করলে বোধহয় আমার চেয়ে সুখী শিশু সারা বিশ্ব-সংসারে আর পাওয়া যেত না।···

কুড়ি বছর বয়সে হেলেন কেলারের লেখাপড়া এতদূর এগিয়ে গেল যে, তাঁর শিক্ষয়িত্রী তাঁকে নিয়ে গেলেন র‍্যাডক্লিফ্‌ কালেজে ভর্তি ক'রে দেবার জন্য। তিনি যে তখন কালেজের অন্যান্য ছাত্রছাত্রীর মত শুধু লেখাপড়াতেই পারদর্শিতা অর্জন করেছেন তাই নয়, তাঁর হারানো বাক্‌শক্তিও তখন ফিরে পেয়েছেন। প্রথম যে বাক্যটি তিনি উচ্চারণ করতে শেখেন তা' হোল: আর আমি বোবা নই।······

বারবার মহানন্দে তিনি সেদিন আবৃত্তি করেছিলেন ঐ একটি কথাই। এই অভূতপূর্ব ঘটনায় ক্ষণে ক্ষণে তাঁর সর্বদেহে উঠেছিল অসহ আনন্দ শিহরণ।···

সামান্য একটু টান্ থাকলেও আজ তিনি অনর্গল কথা বলেন। তাঁর যতকিছু বই আর পত্রিকা-নিবন্ধের পাণ্ডুলিপি তিনি নিজেই ছেপে নেন এমন একটি "ব্রেলি" টাইপ-রাইটারে যাতে যে কোনও জিনিষ লেখা চলে পলতোলা একরকম সাঙ্কেতিক বিন্দুর সাহায্যে।

পথ চলতে চলতে নিজের মনেই তিনি অনর্গল কথা বলেন। তা ব'লে আর সবার মত তখন তাঁর ঠোঁট নড়ে না,—সাঙ্কেতিক প্রথায় আঙুল নেড়ে কথা চলে। অনেকের মতে অন্ধ-বধির হেলেন কেলারের মধ্যে জেগে উঠেছে একটা অসাধারণ ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়ের তীক্ষ্ণ প্রভাব;—কিন্তু এ কথা যে সত্য নয়, তা বারবার প্রমাণ হয়েছে বৈজ্ঞানিক যাচাইয়ে। তাঁর স্বাদ-গন্ধ স্পর্শানুভূতি সবার মতই স্বাভাবিক। তাই দেখা গেছে যে, ঘরের আসবাবপত্রগুলোকে ঠাঁইনাড়া ক'রে রাখায় পথ ভুল ক'রে দিশেহারা হয়ে পড়েছেন তিনি।

অথচ আত্মীয়-স্বজনের ঠোঁটের ওপর আলতোভাবে একবার মাত্র আঙুল বুলিয়ে নিয়েই তিনি বুঝে নিতে পারেন তাদের বক্তব্য:—পিয়ানো বা বেহালার কাঠের ওপর হাত বুলিয়ে তিনি অক্লেশে উপভোগ করতে পারেন সুরসুধা;—বেতারযন্ত্রের আবরণীটার উপর থেকে হাতের ছোঁয়ায় কাঁপনটুকু থেকেই শুনতে পান তার অনুষ্ঠানাবলি,—যে কোনও গায়কের কণ্ঠনলিতে হাত রেখে তিনি গান শোনেন। অথচ তাঁর নিজের কণ্ঠ থেকে কোনদিন উচ্চারিত হয়নি একখানি গান কিম্বা এতটুকু সুর।

একবার যার কর স্পর্শ করবেন তিনি, পাঁচ বছর পরেও তার হাত ধরেই অনায়াসে তিনি তাকে চিনতে পারেন,—বলে দিতে পারেন তার সঠিক মানসিক অবস্থা আর মনের কথা।...

হেলেন কেলার দাঁড় বাইতে পারেন, সাঁতার জানেন, ঘোড়া হাঁকান জোর কদমে। বিশেষভাবে তৈরী ছক আর ঘুঁটি নিয়ে তিনি দাবা আর পাশা খেলেন—তাসও। বর্ষার দিনে তিনি একা ব'সে জামা সেলাই করেন, মোজা বোনেন, কম্ফর্টার আর সোয়েটারও বাদ যায় না।...

সৃষ্টির প্রথম প্রভাত থেকে আজ পর্যন্ত পৃথিবীতে মহীয়সী, বিদুষী আর অসামান্যা নারী এসেছেন অনেক—আরো আসবেন। তবু সর্বসম্পদরিক্তা হয়েও শুধু অধ্যবসায় আর মানসিক দৃঢ়তার বলে প্রকৃতিকে পর্যন্ত পরাস্ত ক'রে বিদুষী সুলেখিকা ও মনস্বিনী হেলেন কেলার হয়ে উঠেছেন অনন্যা,—সৃষ্টির অষ্টম বিস্ময়। পৃথিবীর ইতিহাসে হেলেন কেলারের উপমা আজ পর্যন্ত মেলেনি,—অনাগত যুগেও হয়ত মিলবে না।

সবারই ধারণা, অন্ধত্বের চেয়ে শোচনীয় অভিশাপ দুনিয়ার আর কিছুই নেই। অথচ হেলেন কেলার বলেন যে, অন্ধ হওয়ার জন্য তত খেদ নেই, তাঁর যত দুঃখ হয় তাঁর বধিরতার জন্য। অন্ধকার আর নৈঃশব্দ একজোট হয়ে মানুষের দুনিয়া থেকে যেখানে তাঁকে নির্বাসিত ক'রে রেখেছে, দিনের পর দিন সেখানে একা বাস ক'রে শুধু একটা জিনিষেরই কামনা জাগে তাঁর মনে। তা হোল—যে কোনও চেনা মানুষের কণ্ঠে একটুখানি সহৃদয় ডাক।...

ভরা ভাদরে

শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য

বন্ধ করো না জানালার ঝিলিমিলি,
তোমাতে আমাতে কথা হবে নিরিবিলি।
ঝরে ঝর-ঝর ভরা ভাদরের ধারা,
স্বপনকুমার কোথা হোলো পথহারা!
মেঘ ডাকে আর বাজ পড়ে গাছে গাছে;
নাগকেশরের ঝরা কেশরের মাঝে
কার চরণের ধ্বনি বাজে অবিরল
চপলা চমকে কেন মন চঞ্চল!
রাজার মেয়ের সোনার দেউড়ী থেকে
স্বপনকুমারে কে গেছে বাদলে ডেকে!
কোথা মাগো বলো, ঘুমায়েছে রাজবালা?
স্বপনকুমার তারে দেবে নাকি মালা?

পথে আছে কত দৈত্য ডাকাত খুনে
বালক বীরের অস্ত্র আছে কি তূণে?
দূর হতে মাগো দুরান্তরের পারে
কোথা রাক্ষসী কোন্ পাহাড়ের ধারে
বসে আছে আজ ভুতুড়ে রাতের কোলে,
স্বপনকুমার যদি সেথা যায় চলে?
কেমন করে মা বাঁচিবে সোনার ছেলে,
লড়িবে কেমনে তরবারি নাহি পেলে?
গহন ধাঁধার আঁধার মেঘেরা এসে
বারি বরিষণে বিদ্যুৎ যায় হেনে!
পথ চাওয়া দীপ জ্বলে কি বিজন ঘরে?
রাজার মেয়ের আঁখি ছল ছল করে!

কেয়ার গন্ধে নদী ওঠে দুলে দুলে
স্বপনকুমার গেল কি মা পথ ভুলে?
কাতর কণ্ঠে কে যেন কোথায় ডাকে
তারি মাঝে শোনো গুরু গুরু দেয়া হাঁকে।
এপার ওপার করে বুঝি কানাকানি,
এ ভরা ভাদরে বনানীর যত বাণী
ভেসে ভেসে যায় কল-কল্লোল বুকে
ঝড়ের কপোত কেঁদে মরে কোথা দুখে?
ত্রাসে উল্লাসে বর্ষণ ঘন রাতে
মন্থর গীতি মেঘমল্লার সাথে
ঘুমপরীদের করে বুঝি আরাধন!
হারায়ে গেল কি তোমার আমার মন?

গঙ্গার ইলিশ

শ্রীঅক্ষয়কুমার চক্রবর্ত্তী

বরফের মত হাল্কা বৃষ্টি পড়ছে ফিন্ ফিন্ ক'রে।

এই রকম বর্ষণে গঙ্গায় ইলিশ মাছ ওঠে বেশ। আষাঢ়ের শুরু থেকে নদীতে ইলিশের মরশুম আসে ফি বছর। কিন্তু এ বছর এখনও ভালো রকম মাছ উঠতে দেখা যাচ্ছে না। সারা জোয়ারে জাল ঠেঙিয়ে কোন ডিঙ্গিতে ওঠে দু' একটা কোনদিন, আর কোনদিন বা নিরামিষ জালখানা উঠে আসে সুড়সুড় ক'রে লাল জলরাশি থেকে।

এখনও অনেকটা রাত আছে, তিথিটা হবে বোধ হয় নবমী-দশমী। জোয়ার শুরু হতে রাত চারটার কাছাকাছি। তা এতক্ষণে জেলেরা জাল দিতে শুরু করেছে বৈ কি!

রায় মশাই আর স্থির হয়ে শুয়ে থাকতে পারলেন না। বড় ছেলে নরেশ বিদেশে থেকে চাকরি করে। আজই সন্ধ্যায় সে বাড়ি এসেছে। দুদিন থাকতেও পারবে না,—কালই, নিতান্ত পক্ষে পরশু তাকে যেতেই হবে ফিরে কর্ম্মস্থলে। দেশের সময়ের একটা জিনিস, এসেই যখন পড়েছে—এই সুযোগে তাকে একটা না খাওয়ালে চলে কেমন ক'রে,—তা সে যত কষ্টই হোক সংগ্রহ করতে, আর যতো দামই লাগুক।

এই তো কয়টা বছর আগের কথাই-বা, মাত্র সেদিন মনে হয়—পয়সা-পয়সা, বড় জোর দু' পয়সায় একটা ইলিশ—এ তাঁরা হামেশাই কিনেছেন। এতো মাছ উঠতো তখন যে, জাল টেনে তুলতেই হিমসিম খেয়ে যেতো জেলেরা; কিন্তু কি সময় এসেছে কে জানে, মা গঙ্গা হাত গুটিয়ে বসেছেন। কোথায় যেন সব মাছগুলো লুকিয়ে পড়েছে। আষাঢ় মাস শেষ হতে চললো, অম্বুবাচীর সময় থেকে পাহাড়ে লাল জলে নদী ভর্ত্তি কানায় কানায়, অথচ কোথাও কিছু নেই। পাহাড়ে এই লাল জল নামলেই না সমুদ্র থেকে ইলিশের ঝাঁক নদীমুখে উজানে ছুটতে থাকে আনন্দে। কিন্তু এখন আর কৈ সে সব?

এবার অগত্যা উঠতেই হয় রায় মশাইকে—আর দেরি করা চলে না। ঘরের বের হয়ে বারান্দা থেকে হাত বাড়িয়ে বৃষ্টির পরিমাণটা পরখ ক'রে নিলেন তিনি—না, এখনও তেমনি ইলশে গুঁড়ি পড়ছে সমানে! অথচ ভেজার ভয়ে ঠিক সময়টিতে নদীর ঘাটে হাজিরা দিতে না পারলে ফড়েদের হস্তগত হবে সব মাছগুলোই। তখন পাওয়াই হবে অসম্ভব, আর পাওয়া গেলেও ওরা দর-হাঁকবে চতুর্গুণ। তার চেয়ে একটুকু কষ্ট মেনে নিয়ে এখনি বের হয়ে পড়াই উচিত হবে।

কষ্ট?—হাঁ, তা একটু হবে হয় তো, বয়সও তো কম হয়নি, কিন্তু শরীরের তাগোৎ এখনও বেশ আছে। সেকালের মানুষ—পাকা বাঁশ, ভোগ করেছেন চুটিয়ে। ঘি-দুধ মাছ-ভাতের অভাব

[illegible]নি সেকালে। দুধ বলতে গরু-দোওয়া তরল জিনিস আর ঘি বলতে আসল গাওয়া বুঝে এসেছেন তাঁদের কালে। আজকার সভ্য যুগেই না শুনতে হচ্ছে,—দুধ হয় গুঁড়ো, আর ঘি বলতে মেলে গাছের মারফৎ। যাক্ গামছাটা মাথায় জড়িয়ে একহাতে লাঠিগাছ আর অপর হাতে ছাতাখানা নিয়ে 'দুর্গা' বলে পথে বেরিয়ে পড়া যাক তো।

বাড়ি থেকে নদী খুব বেশি পথ নয়। বড় জোর মিনিট কুড়ি লাগবে পৌছুতে—বর্ষার কাদা রাস্তায়, অন্ধকারে পা টিপে টিপে চলা। একটু অসাবধান হলেই সরু জাঙাল থেকে ঠিকরে ধান-ক্ষেতে আছড়ে পড়তে হবে। তাতে হাত-পা ভাঙ্গার সম্ভাবনা,—চাই কি—কপালে লেখা থাকলে মা-মনসার চেলাদের সাদর চুম্বন ভবলীলা সাঙ্গের পক্ষে যথেষ্ট হতে পারে।

এত সব সামাল ক'রে, অতি সাবধানে নদীর কিনারায় 'পি-ডব্লুউ-ডি'র বাঁধের উপর এসে পৌছলেন রায় মশাই। নদীর বুকে নৌকাগুলো এখনও চোখে পড়ে না, শুধু তাদের মধ্যেকার অস্পষ্ট আলোগুলো মিটমিট ক'রে দেখা যায়। অজস্র জোনাকি যেন ক্রমান্বয়ে নেচে নেচে বেড়াচ্ছে। প্রতি দুইখানি নৌকায় নদীর এপার থেকে ওপার পর্য্যন্ত লম্বা ইলশে জাল বিছিয়ে গেছে পর পর। কালো কালো চোঙ্গাগুলো বিশ-ত্রিশ হাত অন্তর শুধু ভাসতে থাকে, তাই দেখে জালের অবস্থান নির্ণয় করা যায়। এখন অবশ্য সেগুলো দেখা যাচ্ছে না। একটু পরে জাল গুটানো আরম্ভ হবে—বাঁধের ওপর এখন একেবারেই জনমানব নেই। কিন্তু খানিক পরে এক এক ক'রে আসতে থাকবে মাছের খরিদ্দার। পাটকলের কুলিরাও এ পথে যায়। তাদেরও যাত্রা শুরু হবার সময় হয়েছে প্রায়। ইলিশ এখনও তেমন উঠছে না, তবুও ছোট ছোট ডিঙ্গিতে বহু পায়কেড় এরই মধ্যে উৎপাত শুরু ক'রে দিয়েছে। জেলে-ডিঙ্গির থেকে তাদের ডিঙ্গির সংখ্যা বেশি। মাঝে মাঝে ইঙ্গিতে জিজ্ঞাসা করছে—'টু', অর্থাৎ—মাছ আছে কিনা জানতে চাইছে।

যে নৌকায় থাকে, তা থেকে ঐ শব্দের অনুকরণে উত্তর আসে—টু। মানে—আছে। ফড়েরা তখন মাছের নৌকায় তাদের ডিঙ্গি ভেড়ায়। দরদস্তুর ক'রে গঙ্গার বুকেই এ-নৌকা থেকে ও-নৌকায় সব মাছ তুলে নিয়ে কলকাতা বা লাগোয়া শিল্পাঞ্চলে চালান দেয়। সেখানে অনেক চড়া দামে বিক্রী হয়ে মুনাফার পুঁটুলি স্ফীততর হয়। রায় মশাইয়ের বড় রাগ ওদের 'পরে, কারণ ওদের লাভের চাহিদায় স্থানীয় খরিদ্দারেরা মাছ খেতে পায় না, বা দ্বিগুণ দাম কবুল করতে বাধ্য হয়।

কাদামাখা পিছল বাঁধে একা একা দাঁড়িয়ে পা ধ'রে আসে রায় মশাইয়ের। মন বিরক্তিতে ভ'রে ওঠে—তার ওপর মশার কামড় আর ঘাস বনে চিনে জোঁকের লোলুপ দৃষ্টি। জনহীন নদীতীর নিস্পন্দ, নিঝুম। ভোর হ'তে এখনও বেশ খানিক দেরি আছে। উষার আগমনী গানে ভোরের আকাশ এখনও কেঁপে কেঁপে উঠছে না। এখনও ঘণ্টাখানেক হয়তো এভাবে দাঁড়াতে হবে। ফড়েদের লোভাতুর দৃষ্টি এড়িয়ে কোন নৌকা যদি ঘাটে ভেড়ে তবেই আজ বাদ্‌লা [illegible] [illegible] ছেড়ে আসার এই কষ্টের সুরাহা একটা হতে পারবে যা হোক।

এতক্ষণে জাল গোটান শুরু হ'ল। একখানা জেলে-ডিঙি দাঁড়ে ছপাৎ-ছপাৎ শব্দ করতে করতে ঘাটের মুখেই আসছে বোঝা যায়। একবার ডেকে জিজ্ঞেস করলে কেমন হয়? কিন্তু 'মাছ আছে?' একথা বলার উপায় নেই। মাঝিরা রেগে ওঠে ওকথায়, নৌকার 'পয়' নাকি নষ্ট হয় ওতে। এ রকম আরও অনেক কুসংস্কার আছে ওদের মধ্যে—জেলে-ডিঙিতে কোন ব্রাহ্মণকে ওরা কিছুতেই তুলতে চায় না। নদী-কিনারার বাসিন্দারা এসব আটঘাট জানে, তাই ওদের খুশী রাখতে এসব সংস্কারে আঘাত দেয় না ওরা। ডিঙিখানা ঘাটের কাছ বরাবর হতেই হাঁক দিলেন রায় মশাই—ও মাঝি, আছে?

বাতাসে উত্তর ভেসে এলো—নেই গো, নেই।

দাঁড়ের একটানা শব্দ করতে করতে নৌকাখানা এগিয়ে গেল উত্তর মুখো। আর একবার জাল দেবার প্রস্তুতি চলছে বোঝা গেল। এমনি আরও কয়েকটা ডিঙি চ'লে গেল—কোনটাতেই মাছ নেই। আর একখানা আসছে এদিকে জাল গুটাতে গুটাতে। রায় মশাই আবার হাঁক ছাড়লেন—মাঝি ভাই, আছে?

—আছে।…এবার আশাপ্রদ উত্তর। রায় মশাই উৎসাহে বাঁধ থেকে নদীর পাতায় ঠাহর ক'রে ক'রে নামতে নামতে হাঁকলেন—ভেড়াও দেখি তবে।

ডিঙিখানা থেকে পরিচিত গলার উত্তর ভেসে এলো—আরে, রায় মশাই নাকি? এমন অসময়ে!

—আরে বাবা, ছেলে কাল বাড়ি এসেছে, হয়তো আজই চ'লে যাবে। তাই ভাবলুম—তা কে কথা কইলে? বুদ্ধুকের পো, না?

—হাঁ গো রায় মশাই! তা এত কষ্ট করা কেন রেতের বেলায়? ব'লে দিলেই তো পারতেন গো।

—তোদের নাগাল পাই কোথায় বল্? দিনরাত তো জলে জলেই কাটে—

—তা যা বলেছেন, রায় মশাই! আজ তিনটে দিন ডাঙায় নাবিনি। তবু হয় কৈ? গাঙেও দেখি আকাল লেগেছে। এই ক্ষেপেই না গোটা তিন পেনু—

—তিনটে পেয়েছিস্? বেশ বেশ। দেখে শুনে একটা দে দেখি, বাবা! আবার সৃষ্টিছাড়া দর হেঁকে বসিস্নি যেন।

কথিত 'বুদুকের পো' স্মিত হেসে নৌকার খোল থেকে বাছাই ক'রে একটা মাছ দু'আঙুলে কান গলিয়ে টেনে তুলে ধ'রে বললো—গলুই-এর দিকে এগিয়ে আসুন রায় মশাই! আবার দাঁড়খানা লক্ষ্য রাখবেন যেন।—ডিঙিটা ততক্ষণে ঘাটে ভিড়ে গেছে। হাঁটুভর জলের মধ্যে পা টিপে ঠাহর ক'রে ক'রে রায় মশাই নির্দ্দেশ মত গলুই-এর দিকে এগিয়ে এলেন। কুপির স্বল্প আলোকে মাছটা লক্ষ্য ক'রে তিনি সন্তুষ্ট হলেন। বললেন—বেশ। বল্, কত নিবি?

—তা চারটে টাকাই দেন। যা মেহনৎ—

—চা-র—টা-কা!—রায় মশাই প্রায় ককিয়ে উঠলেন—বল্‌লি কেমন ক'রে, বাপু!—পয়সা-পয়সায়ও যে বেচেছিস্ একদিন!

—সেদিন কি আর আসবে রায় মশাই? দেখতেই যা চার টাকা—এক দোন্ চাল কিনতেই সব ফরসা—

—মরশুমে তো খাবি খালি 'সড়ু চাল', ফরসা না হয়ে যায় কি ক'রে বল্?—রসিকতা করতে চান রায় মশাই মিহি চালকে 'সড়ু' ব'লে, কারণ এখানের জেলেরা 'সড়ু' ব'লে থাকে।

হেসে জবাব দেয় বুদ্ধক—সড়ু মোটার দিন আর নেই গো, যা হোক দু'বেলা দুমুঠো পেলেই বাঁচি।

—ওকথা এখন যাক। কি নিবি ঠিক ক'রে বল দেখি, বাপু!

শেষ পর্য্যন্ত তিন টাকায় রফা হ'ল। মাছটা আঙুলে ঝুলিয়ে রায় মশাই হৃষ্টমনে থুপ্‌থাপ্ ক'রে বাড়িমুখো রওনা হলেন জল-কাদা ভেঙ্গে। দাম নিক, কিন্তু খাসা হয়েছে মাছটি। ওজন আন্দাজ পাঁচ পোয়া হবে। পেটির কাছটা কতোখানি চওড়া, অল্প হয়তো ডিমও হয়েছে। আর জল থেকে সদ্য তোলা, টাটকা—তেলে ভর্ত্তি সুপুষ্ট গড়ন।

অন্ধকার এখনও কাটেনি, বাঁধে লোক চলাচল এখনও তাই শুরু হয়নি। মাছ কেনার উৎসাহে কোন ক্রমে কেটেছে এতক্ষণ, এবার সে উৎসাহ নিবে আসছে। কাদার প্যাচপেঁচ আর পিছল পথে টাল সামলানোর কষ্টে রায় মশাই স্তিমিত হয়ে আসছেন। তবু এটুকু পথ যেতেই হবে। এবার বাঁধ থেকে নেমে গ্রামের মুখে যাবার জন্যে নিচের রাস্তাটা সন্তর্পণে ধরতে হবে; ঠিক ঐ বরাবর এসে পৌঁছাতেই একটা ডাক শুনতে পেলেন তিনি—ওঁ রাঁয় মঁশাই!

আওয়াজটায় নাকি সুর, আর আসছে ঠিক ওপাশের জোড়া বট-অশ্বত্থ গাছের নিচ থেকে। জায়গাটার একটা কিংবদন্তীও আছে। ভরসা ক'রে আড়চোখে একবার পিছন ফিরে চেয়ে দেখলেন তিনি। জোড়া বট-অশ্বত্থ গাছের তলায় অস্পষ্ট আলো-আঁধারির মাঝে সোজা উঠে দাঁড়ালো, ও কে? মানুষের মত আকার, কিন্তু মাথাটা—যেন বিরাট একটা ঝাঁকা!

সারা শরীরে বিদ্যুৎপ্রবাহ ছুটে গেল। বাঁচি মরি ক'রে পথে নেমে পড়লেন রায় মশাই। মানুষ ছাড়া ইলিশ মাছের উপর এক জাতীয়া উপদেবীদের লোভ যে ভয়ানক রকম বেশি, সে কথা জানতে এত বয়সে তাঁর আর বাকী নেই। কিন্তু কি আপদ, মূর্ত্তিটি যে সচল হয়ে এদিকেই এগিয়ে আসছে! আবার স্পষ্ট খোনা আওয়াজ কানে আসে—ওঁ রাঁয় মঁশায়, ইলিশ মাঁছটা কঁতো—?

রায় মশাই-এর আত্মাপুরুষ তখন খাঁচা ছাড়া হবার উপক্রম, যদিও সাহসী পুরুষ ব'লে এ-তল্লাটে তাঁর সুনাম আছে। কিন্তু এ রকম অবস্থায়—আর কি সম্ভব সাহস দেখানো—রাম, রাম, রাম! নিকষ কালো আঁধারে সে কালো মূর্ত্তি লম্বা হাত উর্দ্ধে তুলে অসম্ভব রকম বিরাট মাথাটা দোলাতে দোলাতে এগিয়ে আসছে, আর ডাকছে নাকি সুরে—ভঁয় নেঁই রায় মঁশায়, আঁমি আঁমি।

আর আমি! কে কার কথা শোনে, তার সময়ই বা কোথায়! দু'জনার মাঝে ব্যবধান তখন মাত্র হাত ত্রিশেক। স্পষ্ট তাঁকে দ্রুত পলায়ন থেকে নিবৃত্ত করার চেষ্টায় প্রাণপণে চীৎকার করছে—ওঁ রাঁয় মঁশাই, রাঁয় মঁশাই গোঁ, দাঁড়ান—দাঁড়ান। ভঁয় নেঁই, আঁমি—আঁমি শিবু—

—শিবু…!—শিবু সর্দ্দার? থমকে দাঁড়িয়ে পড়েন এবার তিনি। কথাটা তো ভেবে দেখা হয়নি! ভয়েই শুধু ছুটছিলেন। তা হলে যা ভেবেছিলেন সত্যি তা নয়! পুবপাড়ার শিবু সর্দ্দার মাছের ব্যবসা করে অনেক দিন থেকে। সে-ই হবে হয়তো, ভোরে মাছ কিনতে বেরিয়েছে তাঁরই মত, কিন্তু অতো বড় মাথাটা!……

পিছন ফিরে দেখতে চান রায় মশাই। সন্দেহ এখনও কাটেনি।

বাঁধের উপর শিবুর মূর্ত্তিটা তখন স্পষ্ট হয়েছে—পূর্ব্ব দিগন্তে সূর্য্যোদয়ের সুস্পষ্ট আভাষ। মাথা থেকে কি একটা নামাচ্ছে সে দু'হাতে—হা ভগবান্, এ যে মাছের ঝুড়িটা।

স্পষ্ট এবার নরাকৃতি—শিবুই বটে, আর ভুল নেই। কি একটা ভারী অসুখে বারো-তেরো বছর বয়সে ওর গলার স্বরটা খোনা হয়ে গেছে, তা আর সারেনি।

রাগে অপমানে রায় মশাই-এর মুখ রাঙা হয়ে ওঠে। পাজি বেটা! বসার আর জায়গা পেলো না, দেখে শুনে একেবারে ঐ বটগাছের তলা আর মাথায় ঝুড়ি! ছুঁচোটাকে খুন করলে তবে রাগ যায়।

হাতের লাঠিটা বাগিয়ে তেড়ে আসেন রায় মশাই—দাম জিজ্ঞেস করার আর জায়গা পেলি না? দেবো মাথাটা গুঁড়িয়ে—

শিবু কাঁচুমাচু হয়ে সবিনয়ে বললো—কি কঁরবো রাঁয় মঁশায়! বিঁষ্টি হচ্ছিল যেঁ, তাঁই এঁকটু আঁশ্চয় নিঁয়েছিনু। রাঁতে ঠাঁহর কঁরতে পাঁরিনি, আঁমাদের ডিঁঙ্গি ঘাটে ভিঁড়তে এঁখনও খাঁনিক দেঁরি আঁছে।

—

আবহাওয়া নিয়ন্ত্রণ

শ্রীঅশোককুমার মিত্র

Schaferএর কায়দার চেয়ে আজকাল আরও সহজসাধ্য উপায় বেরিয়েছে। এই উপায়ের সম্ভাবনা সম্বন্ধে Schaferও অবশ্য চিন্তা করেছিলেন এবং অনেক পরীক্ষাও চালিয়েছিলেন। মেঘের মধ্যে তিনি অনেক রকমের জিনিসের গুঁড়ো ছড়িয়ে মেঘের বারিবিন্দুগুলোকে একত্রিত হবার অবলম্বন দেবার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু ধূলা, বালি ইত্যাদিতে এ কাজ সম্ভব হয় নি। ১৯৪৭ সালে Dr. Bernard Vonegut নামে আর একজন বৈজ্ঞানিক Silver Iodide ব্যবহার করে বহু চেষ্টিত সুফল পেয়ে গেলেন। শূন্য ডিগ্রির চেয়ে টেম্পারেচার চার ডিগ্রি centigrade নীচে নামলেই অতি সূক্ষ্ম Silver Iodideএর গুঁড়োর ওপর অতিশৈত্য মেঘের বারিবিন্দু তুষার ক্রিষ্টালে পরিণত হ'ল। এই বরফের ক্রিষ্টালের ওপর আবার আশেপাশের বারিবিন্দু জমে তুষারকণার (Snow-flakes) সৃষ্টি করলো। যথেষ্ট ভারী হয়ে যখন এই তুষারকণা মাটির দিকে নামতে আরম্ভ করলো, তখন অপেক্ষাকৃত গরম বাতাসের মধ্য দিয়ে চলতে গিয়ে তা গলে বৃষ্টির ফোঁটা হয়ে মাটিতে ঝরে পড়লো। Silver Iodideএর ক্রিষ্টালের কাঠামো বরফ ক্রিষ্টালের অনুরূপ। Silver Iodideকে বাষ্পরূপে মেঘের মধ্যে ছড়িয়ে দিলেই কাজ সুরু হয়ে যায়। ঊর্দ্ধগামী কোন বাতাসের টান থাকলে Silver Iodideএর বাষ্প নীচে থেকে ছেড়ে দিলেও তা মেঘের মধ্যে গিয়ে হাজির হয় এবং কৃত্রিম বৃষ্টিপাতের প্রক্রিয়া আরম্ভ করে। অনেকের মতে যে মেঘ থেকে বৃষ্টি হবার তা ঠিক হবেই। আগে আর পরে। তবে এই কৃত্রিম উপায় মেঘকে যে বৃষ্টি ঝরাবার প্রেরণা দেয়, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। বলা বাহুল্য, প্রাকৃতিক অনুকূল অবস্থা না পেলে কৃত্রিম বৃষ্টি সৃষ্টি করা সম্ভব নয়।

অতিশৈত্য মেঘ ছাড়াও অন্য মেঘও যে কৃত্রিম বৃষ্টি সৃষ্টি করতে পারে, আধুনিকতম গবেষণায় তার সম্ভাবনার কথাও বলা হয়েছে। কোন অঞ্চলে বাতাসের তোলপাড়ানি ভাবটা যদি বেশী থাকে এবং সেখানের মেঘে যদি যথেষ্ট পরিমাণে জলীয় বাষ্প বর্তমান থাকে, তা'হলে সেখানে কৃত্রিম বৃষ্টি ঝরানো সম্ভব হয় অন্য আর এক উপায়ে। গ্রীষ্মমণ্ডল অঞ্চলে মেঘে টেম্পারেচার শূন্য ডিগ্রি centigrade পর্য্যন্ত নামে না সহজে। এসব অঞ্চলে এরোপ্লেনে উড়ে মেঘের মাথায় জল ছিটানো হয়। মেঘের মধ্য দিয়ে প্রত্যেক জলের ফোঁটা নীচের দিকে পড়তে গিয়ে মেঘের জলবিন্দু কুড়িয়ে নিয়ে আকারে বড় হতে থাকে; তারা পরে এত বড় হয়ে ওঠে যে, শেষে নীচের দিকে নামতে নামতে নিজেরাই ভেঙ্গে খান্ খান্ হয়ে যায় আবার। ছোট্ট হাল্কা ফোঁটাগুলো তখন ঊর্দ্ধগামী বাতাসের টানে আবার উপরে উঠতে থাকে। তখন তারা আবার মেঘের মধ্য থেকে জলবিন্দু কুড়িয়ে আকারে

বড় হতে থাকে। ভারী হয়ে আবার তাদের যাত্রা সুরু হয় নীচের দিকে। এমনি করে ক্রমাগত হাল্কা জলের ফোঁটাগুলো ওপর-নীচ করতে থাকে যতক্ষণ না তারা যথেষ্ট ভারী হয়ে মাটিতে ঝরে পড়ে। এই প্রক্রিয়ায় মেঘের সমস্ত জলবিন্দু যেন নিঙড়ে বের হয়ে আসে।

আকাশের মেঘ কার সম্পত্তি? এ নিয়ে তর্ক-বিতর্ক অনিবার্য্য। নদীর জল নিয়ে কত বাক্‌বিতণ্ডাই না হতে চলেছে দুই সদ্যপ্রসূত স্বাধীন রাজ্যের মধ্যে। মেঘ থেকে বৃষ্টি ঝরানো যখন আয়ত্তে আসবে, তখনও এই সমস্যার সম্মুখীন হতে হবে। যে মেঘ বাতাসে উড়ে গিয়ে এক দেশে জল ঢালবে, সেই মেঘকে যদি আর এক দেশ ধমক দিয়ে শাসন করে, তার থেকে বৃষ্টি নামিয়ে দেয়, তখন অন্য দেশ নিশ্চয়ই নির্ব্বাক হয়ে থাকবে না। খোদার ওপর খোদকারী তারা বরদাস্ত করবে কেন? পাশাপাশি দুই সাম্রাজ্যের মধ্যে, এমন কি দুই প্রদেশের মধ্যেও মন-কষাকষি তাই চলবেই।

মেঘ থেকে কৃত্রিম উপায়ে বৃষ্টি ঝরাতে পারলেই যে আনন্দ করতে হবে, এমন কোন কথা নেই। একজনের কাছে এটা আশীর্ব্বাদ হলে, আর একজনের কাছে এটা অভিসম্পাতও তো হতে পারে। বৃষ্টি প্রাকৃতিক হলে, অনুযোগ অভিযোগ সব কিছু ভগবানের বিরুদ্ধে। সেখানে মামলা-মকদ্দমার অবকাশ নেই। কিন্তু যখন বৃষ্টি হবে মানুষের ইচ্ছানুযায়ী, বৈজ্ঞানিকদের ইঙ্গিতে, তখন দেশের দুই দলের মধ্যে সুরু হবে দলাদলি। একদল দেবে বাহাবা, আর একদল—যারা অযাচিত বৃষ্টিতে নাজেহাল হয়েছে, তারা দেবে গালাগালি। তাই এ নিয়ে আইনের খসড়াও করতে হবে। আইন অমান্য করবে যারা, তাদের সাজা দেবার আয়োজনও করে রাখতে হবে। এ ব্যাপার নিয়ে গল্প আছে। ক্যালিফোরনিয়াতে এক বছর অনাবৃষ্টি হয়। সেই সময় হ্যাটফিল্ড (Hatfield) নামে এক সেলাই-কলের এজেন্ট দাবি করতেন যে, তিনি আকাশের মেঘ থেকে ইচ্ছামত বৃষ্টি ঝরাতে পারেন। জনকয়েক নাগরিক হ্যাটফিল্ড সাহেবকে ক্যালিফোরনিয়াতে ডেকে নিয়ে এলেন। তিনি প্রতিশ্রুতি দিলেন—'এ অনাবৃষ্টির আমি অবসান ঘটাবো।' দেশের কয়েকজন মাতব্বরের সঙ্গে তাঁর একটা রফা হ'ল। একটা উঁচুমত ঘর তৈরী করে তিনি সেখান থেকে তাঁর তৈরী কি সব গ্যাস আকাশে ছাড়তে লাগলেন। এরপরই বৃষ্টি সুরু হ'ল। সে বৃষ্টির শেষ আর হয় না যেন! ৩৬ ইঞ্চি বৃষ্টি হয়ে গেল সে বছর। ক্যালিফোরনিয়াতে অমন অতিবৃষ্টি নাকি হয়েছে খুব কমই। বহু টাকার জিনিসপত্তরের ক্ষতি হয়ে গেল। অনেকে মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লো। সহরের ক্ষতিগ্রস্ত কয়েকজন নাগরিক নালিশ করার ভয় দেখালেন তাঁদের বিরুদ্ধে যাঁরা হ্যাটফিল্ড সাহেবকে ডেকে এনে এই অনাসৃষ্টি ঘটিয়েছেন। হ্যাটফিল্ড কিন্তু একটুও না দমে, দশ হাজার ডলারের বিল পাঠালেন চুক্তিকারীদের কাছে। মন্ত্রণা-সভা মূল্য দিতে নারাজ হ'ল। তাঁরা বললেন—অত বৃষ্টি তাঁরা চাননি। সত্যই বৃষ্টি হয়েছিল বাড়াবাড়ি রকমের। কিন্তু বৃষ্টি একবার আরম্ভ হলে তাকে ঠেকিয়ে রাখবার ক্ষমতা তো আর মানুষের হয় নি। এই নিয়ে সুরু হ'ল বাক্‌বিতণ্ডা। হ্যাটফিল্ড শেষ পর্য্যন্ত তাঁর পারিশ্রমিক পেয়েছিলেন কিনা জানা নেই। ... ...

এক শীতের দিনে Schæfer পথ হাঁটছিলেন ঘন কুয়াসার মধ্য দিয়ে। তাঁর হাতে ছিল বরফের কুচি ভর্ত্তি একটা তারের ঝাপি। পথ চলতে চলতে এই ঝাপিটা মাথার ওপর মাঝে মাঝে ঘোরাচ্ছিলেন তিনি। কিছুক্ষণ পরে তিনি পিছন পানে তাকিয়ে দেখেন—গভীর কুয়াশার মধ্য দিয়ে তিনি পরিষ্কার একটা পথ যেন তৈরী করে চলেছেন। পরে Schæfer এই কায়দা চেষ্টা করলেন আকাশের ওপর এরোপ্লেনে চড়ে। মাত্র সের সাতেক শুক্‌নো বরফ দিয়ে তিনি প্রায় পনের মাইল লম্বা ও তিন মাইল চওড়া কুয়াশাচ্ছন্ন আকাশ পরিষ্কার করে ফেললেন। এর মানে এই যে, কুয়াশাচ্ছন্ন এরোড্রোমে বৈমানিকেরা যখন নামতে না পেরে দিশেহারা হয়ে এদিক-ওদিক ঘোরাফেরা করে, তখন এরোড্রোমের ওপরটা এইভাবে পরিষ্কার করে দিতে পারলে, এরোপ্লেনের রানওয়েতে নেমে আসা কত যে নিরাপদ হয়, বলা বাহুল্য। তবে কুয়াশাচ্ছন্ন আকাশ পরিষ্কার করা এইভাবে সম্ভব হবে তখনই, যখন সেই কুয়াশা অতিশৈত্য মেঘের জন্য হয়ে থাকে। এ না হলে, শুক্‌নো বরফ দিয়ে এ কাজ চলবে না। তখন দরকার হবে আর এক কায়দার—যাকে গত যুদ্ধের সময় বলতো FIDO অর্থাৎ Fog Intensive Disposal Of। এতে কুয়াশাকে নীচে থেকে গরম করে বাষ্পাকারে উবিয়ে দিয়ে কুয়াশাচ্ছন্ন আকাশকে পরিষ্কার করা হয়। এরোড্রোমের রানওয়ের দুধারে সারি বেঁধে তেলের বড় বড় টেমি জেলে খুব বেশী রকমের তাপের সৃষ্টি করা হয়। এতে মাটির কাছের কুয়াশার এবং খুব নীচু মেঘের জলবিন্দুগুলো বাষ্পে পরিণত হয়ে ঠিক রানওয়ের ওপরটা কিছুক্ষণের জন্য পরিষ্কার হয়ে যায়। রানওয়ের ওপর এরোপ্লেনের নামা-ওঠা করা তখন নিরাপদ হয়। প্রশ্ন হবে, তা'হলে কুয়াশাচ্ছন্ন সব এরোড্রোমের ওপরই এই ব্যবস্থা চালু করা হয় না কেন? কারণ আর কিছু নয়, খরচ। ব্যয়সাপেক্ষ বলেই এই ব্যবস্থার ব্যবহার তেমন বেশী হয়নি আজও।

আবহাওয়া বিজ্ঞানীরা বলেছেন—আবহাওয়ার পূর্ব্বাভাস জানলেই শুধু চলবে না। আবহাওয়াকে যথাসম্ভব আয়ত্তে আনতে হবে। বৃষ্টি, কুয়াশা, শিলাবৃষ্টি এসব তো অনেকটা আয়ত্তের মধ্যে এসে যাচ্ছে। গবেষণা করে এও বলা হয়েছে যে, আকাশে এত বিদ্যুৎ বজ্রপাত হয়ে যে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, তা ধরে নিয়ে আমাদের কাজে লাগাতে হবে। আকাশের বিদ্যুৎ কয়েক হাজার ভোল্টের (Volt) হলে, এ কাজ হয়তো অনেকটা আয়ত্তে আসতো, কিন্তু বজ্রপাতের বিদ্যুৎ হ'ল লক্ষ লক্ষ ভোল্টের। তাকে পোষ মানানো এবং কাজে লাগানো সত্যই এক অসাধ্য সাধনা। টাকার হিসাবে, বিদ্যুৎ চমকালেই, প্রায় বিশ হাজার টাকার বিদ্যুৎ নষ্ট হয়ে যায়। অনুমান, প্রায় দশ কোটি টাকার বিদ্যুৎ এইভাবে সারা জগতে প্রত্যেক ঘণ্টায় নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। এত ক্ষতি বৈজ্ঞানিকেরা বরদাস্ত করবেন কি করে? এ বিদ্যুৎকে নিয়ন্ত্রণ করে আয়ত্তের মধ্যে আনতেই হবে। কবে তা সম্ভব হবে, তা কে জানে!

বন-মহোৎসব

শ্রীসুধা দেবজা

(একটি চাষী গৃহস্থের কুটীর দেখা যাচ্ছে। পাশ দিয়ে মেঠো রাস্তা বেরিয়ে গিয়েছে। মাচায় লাউ-কুমড়ো লতা ছেয়ে আছে; চাষী সেইদিকে তাকিয়ে দাওয়ায় বসে খেলো হুঁকোয় তামাক টানছে। আঙিনার এপাশে ওপাশে বুনো গাছের জঙ্গল। জনকয়েক ছেলেমেয়ে কলরব করতে করতে এলো—তাদের কারু হাতে কোদাল, কারু ঝুড়ি, কারু কারু কলসী। মন্টু বয়সে অপেক্ষাকৃত একটু বড়, তার হাতে একটি অশ্বত্থগাছের চারা, অতি যত্নে দু'হাতে ধরে আছে।)

চাষী (ত্রস্তে হুঁকো হাতে উঠে এগিয়ে এলো)—হেঁ হেঁ দাদাভাই দিদিমণিরা, বলি কথাডা কি?

টঙ্কু (পথের ধারে কোদাল বসাতে সুরু করলে)—তোমার এখানে আমরা বন-মহোৎসব করব গদাইদা।

গদাই (তাড়াতাড়ি একহাতে কোদাল ধরে ফেলে)—আরে কও কি দাদা, আমার এখানডায় জঙ্গল করবা কেনে? আরে ভাবছ কি দিদিমনি, ওই অশথ গাছ বসাতে চাও, এ্যাঁ? সাতদিন বাদেই ওনার শেকড় তো তা'লে আমার এই পুরাণি ভিটেখান উপড়াতে লাগবে।

মন্টু—তবে আমরা কোথায় বন-মহোৎসব করব গদাইদা?

গদাই (চারদিক দেখিয়ে)—বনের মচ্ছব তো এদিককারে এমনিতেই লেগে আছেন দিদি ঠাকরোণ, এই বর্ষার জল লেগে তানারা নিজেরাই মহা মচ্ছব লাগায়ে দেছেন। দেখ না চারদিক তাকায়ে, মচ্ছবের কিছু বাকী আছে? আবার ওরই ভেতর থেকে সাঁঝের বেলায় ঝাঁকে ঝাঁকে বেরিয়ে মচ্ছব লাগাবেন'খনি মশা মশায়রা। সারাদিন পর সাঁঝে এট্টু তামাকে টান দেবে দাওয়ায় বসে কার সাধ্যি! ইধারে মারি তো উধারে কুটুস্, উধারে মারি তো ইধারে কুটুস্ (মশা মারার ভঙ্গী)। আর তানাদের যা গাহান দিদিমণি, তোমাদের ওই হারমনি স্যাতার লাগে কোনডায়? এর পরে আছেন ম্যালোয়ারী, ত্যাখন তেনাদের ঐ গুণ-গুণানি আমাদের গলায়ই গণগণানি হয়ে বেরোবে; পেত্যয় না যাও, এসো একবার অমাবস্যা না হয় পুন্নিমের মুখে, নিজের চোখেই দেখতে পাবা—সে কাঁথা মুড়ি দিয়ে গানের সঙ্গত—এ দাওয়ায় আমি উঁহুঁহুঁ—উ দাওয়ায় বৌ হিঁ হিঁ হিঁ—আর কি সে গিটকিরি কাঁপুনির ঠ্যালায়—

(গদাইয়ের ভঙ্গী দেখে ছেলেমেয়েরা উচ্চ স্বরে হেসে উঠল)

টঙ্কু—জঙ্গল সাফ করাও না কেন? বল তো আমরাই করে দি এক্ষুনি···(কোদাল তুলে ধরতেই গদাই হাত ধরলে)।

গদাই—নাও ঠ্যালা! সাফ করন কি চাড্ডিখানি কথা! ই বাপের আমলের জঙ্গল জমী বুড়ো কত্তার, সাফ করতে গেলে ঝগড়া হবে না?

মন্টু—তবে আমাদের উৎসব হ'ল না?

গদাই—আহা, হবে না কেনে গো? এসো একটা পরামোশ দি'।

(এই সময়ে এক ভুঁড়িওলা জাঁদ্রেল গোছের কর্তাকে আসতে দেখা গেল। তাই দেখে গদাই চুপি চুপি ইশারায় পরামর্শ দিলে। ছেলেমেয়েরা খুশী হয়ে মাথা নেড়ে স্বীকার করে নিলে। ভুঁড়িওলা কর্তা—মাধোলাল সাহু কাছাকাছি এসে পড়লে—গদাই তাকে প্রণাম জানিয়ে সরে পড়লে।)

সাহু—ওহে ওহে ছেলেরা! এসো এসো এসো—ওগো মায়েরা—এসো এসো এসো—আমার ওখানে বন-মহোৎসব করবে এসো। ও হতভাগা এসব কি জানবে? দেখি দেখি মন্টুয়া, ওই অশথগাছটি নিশ্চয় বোবিবৃক্ষ নয়, ওটা ফেলে দাও। আর এইদিকে এসে ছাখো, এই ফজলি আমের চারাটি এখান থেকে তুলে নিয়ে—আমার ঐ বাগানের কোণে বেশ করে গর্ত খুঁড়ে সার দিয়ে বসিয়ে দাও দেখি, আর খুব করে মহোৎসব কর, এসো এসো—(অগ্রসর হলেন)

মন্টু—উঁহু! গদাইদা বলেছে আমাদের স্কুলে যাবার রাস্তা ফাঁকা মাঠের ওপর দিয়ে চলে গিয়েছে, সেখানে রাস্তার ধারে লাগালে চোত-ব'শেখ মাসে দিব্যি ছায়া দেবে অনেকটা জুড়ে, স্কুলে যেতে ঐ রোদ্দুরের দিনে সবাই বেশ খানিকটা জিরিয়ে নিতে পারবে। আমরা তো বড় হয়ে যাব, আমাদের ছোটরা যখন স্কুলে যাবে, তখন সেই গাছের ছায়ায় বসবে, গাছের গায়ে কেটে কেটে নিজেদের সব নাম বসাবে—খেলা করবে; সেখানেই বসাব।

সাহু—বটে? গদাই বেশ কায়দাটি বে'র করেছে তো! তোমরা ছেলেমানুষ, ওর চালাকী ধরতে পারোনি, ক্ষেতে লাঙল দিতে গিয়ে—ও না হয় ততদিন নাই রইল, ওর ছেলেই হয়ত আদ্ধেক বেলা ঘুমিয়েই কাটাবে, কি গরু চরাতে যেয়ে দিব্যি আরামে তামাক টানতে পারবে, এ তারই ফিকির! ওসবের মধ্যে যেয়ো না। আর আমার বাগানে গাছ লাগালে যখন গাছটি বড় হবে তোমরা বড় হয়ে সব বিদেশ থেকে বাড়ী ফিরবে—আসতে যেতে দেখবে এই বড় বড় ভারী ভারী ফজলী আম ঝুলছে গাছ ভর্তি, সে কেমন হবে বলতো?

মন্টু—কেমন হবে? দেবেন আমাদের খেতে?

সাহু—আরে ও আর দেয়া দেয়ি কি?—ও তো দিলেই হ'ল।

আন্না—তবে এখন দুটো দিন্ না। ওই যে ঐ গাছে ঝুলছে? নেব দুটো পেড়ে? (ছুটল)

সাহু—(তাড়াতাড়ি হাত ধরে ফেলে) আরে এখনও নারায়ণকে দিইনি—

টঙ্কু—কল্‌কাতার ব্যাপারীরা এসে নিয়ে যাবে সমস্ত নারায়ণকে না দিতেই—

সাহু—আরে ওসব হলোগে ব্যবসা-বাণিজ্যের কথা, ওসব কথায় ছেলেমানুষদের থাকতে নেই! এসো (মন্টুর হাত ধরলেন)।

মন্টু (টঙ্কুর পানে তাকিয়ে যেন একটা গোপনীয় বিষয়ে পরামর্শ করলে এই ভাবে)—সাহু মশায়কে বলব?

টঙ্কু—(গম্ভীরভাবে) বলাই উচিত।

মনু (মুখখানি অত্যধিক গম্ভীর করে)—সাহু মশায়, আজকের দিনে আপনার বাগানে গাছ লাগাবেন না। আসবার সময়ে পথে বেরিয়েই দেখি—

সাহু (উৎসুক ভাবে)—কি?

মনু—দেখি এক জটাজুটধারী সন্নিসি—

সাহু—সন্নিসি? গুরুদেব নন্ তো?

মনু (চোখ অর্ধমুদ্রিত করে)—গুরু গুরুই মনে হ'ল, তিনি আপনার কথা শুধোলেন—

সাহু (সাগ্রহে)—কি শুধোলেন? এলেন না যে?

মনু—শুধোলেন, আপনার কুশল কিনা? বললেন, 'আমি আর যাব না, আমাকে এক্ষুনি যেতে হবে এক মরণাপন্ন শিষ্যের কাছে। তোমরা যখন তাকে চেনো, তোমাদের'পরেই আদেশ রইল সাহুকে বলবে, আষাঢ়ের দ্বিতীয় সপ্তাহে ঘোর অমাবস্যার অন্তে দিবা ভাগে চতুর্থ দণ্ডে এক পায়ে দাঁড়িয়ে সূর্যের আরাধনা করতে, আর এই বৎসর মধ্যে নিজ বাড়ী, বাগান অথবা বাগানের লাগাও কোনও অংশে কোনও রূপ বৃক্ষ রোপণে চেষ্টা বর্জন করতে, না হলে সমূহ ক্ষতির সম্ভাবনা—

সাহু—সমূহ ক্ষতি?

মনু—ভীষণ ক্ষতি—

সাহু—ভীষণ ক্ষতি? হায় হায়। কি ক্ষতি তা কিছু উল্লেখ করেন নি?

মনু—করেছেন। (টঙ্কুকে) বলব টঙ্কু (চোখ খুললে)?

টঙ্কু—(একটু ভাবিত ভাবে) বলাই ভালো, কোন ব্যবসার কথা যেন বললেন।

সাহু (উদ্‌গ্রীব হয়ে)—মিষ্টি দ্রব্য?

টঙ্কু—মিষ্ট দ্রব্য বলেছেন, কিন্তু কি যেন—

সাহু—চিনি?

মনু—ঠিক চিনি,—চিনিই—সেই চিনি একদম—(হাতের ভঙ্গী)

সাহু—একদম? হায় হায়! সেটা যে পাঠিয়েছি নৌকা'য়। একদম কি? একদম গলে টলে নষ্ট হবার কথা কিছু বলেছেন কি?

মনু—একদম গলে জল—

সাহু—গলে জল!—

মনু—একদম জল, ধুলো আর কাচের গুঁড়ো মানে ভেজালগুলো শুধু পড়ে থাকবে—চা করতেও কেউ নেবে না—

সাহু—জল?—হায় হায়! গুরুদেব তোমার আজ্ঞায়ই এতে হাত দিলুম—তুমি এ কি বলছ? (ব্যস্ত হয়ে একবার হাত জুড়ে উদ্দেশ্যে প্রণাম করে আবার ফিরে) হায় হায়! তাঁকে ধরে আনলে না কেন? কেন ডেঁপোমি করে ওখান থেকেই বিদায় করে দিলে? যাও সব—

মনু—এলেন না যে!—আরও বললেন বাড়ীর সীমানার পূর্বধারের জঙ্গল বেবাক সাফ করিয়ে দিতে। পূর্বদিকটা সূর্যদেবের দিক কিনা—তাঁর দিকটা অন্ধকার হয়ে থাকলে তাঁকেই অবজ্ঞা করা হয় যে! ওই দিকটা পরিষ্কার করে তাঁকে আহ্বান করতে হবে, তবেই চিনি যতদিন না পৌছয়, তিনি নিজে পাহারা দিয়ে শুকনো রাখবেন—জলের সাধ্য কি ঘেঁসে—এই রকম কত কি বললেন। আমরা বললুম, 'যাচ্ছি বৃক্ষরোপণ উৎসব করতে'—তিনি বললেন 'সাবধান! সাহুর ওখানটায় কদাপি নয়!' উঃ! কি চেহারা—কি জ্যোতি!—যেন সূর্যদেব স্বয়ং—(মনু চোখের তারা উপরে তুলে রইল)।

টঙ্কু (তাড়াতাড়ি)—থাক মনুদি, আমার গায়ে কাঁটা দিচ্ছে—

সাহু—(শিউরে) আমারও। উঃ! কি ভাগ্য আমার যে নিজে এসে সময়ে সতর্ক করে দিলেন! চিনির অমন বাজারটা মা হলে মাটি হচ্ছিল আর কি—(দু'হাত জুড়ে উর্ধ্বমুখে) হে গুরু, হে সূর্যদেব,

তোমাদের লীলা বোঝা ভার—এ অধমকে তোমরা রক্ষা কোরো—জবাকুসুম সঙ্কাশং—(ইত্যাদি বলতে বলতে চলে গেলেন)।

টঙ্কু—চল মনুদি, পালাই (হাসি-কলরবের সঙ্গে ওরা এগোল)। ও গদাই দা, তুমিও এসো আমাদের সঙ্গে—

গদাই (কোদাল হাতে বেরিয়ে এল)—চল কোথায় যাবা। তোমাদের এই কোদালবাজির নাচে যখন আমার নাতীর সাথে আমাকেও নাচাবা ঠিক করেছ, তখন চল ভালো করেই নেচে আসি।

দৃশ্যান্তর

(মস্ত খোলা মাঠের ওপর দিয়ে রাস্তা চলে গিয়েছে—মেঘের আড়াল থেকে লাল সূর্য খানিক উঠে এসেছে, কিছু দূরে ধানক্ষেত পর পর সাজান মনে হচ্ছে। একটু দূরে একটি সরু খালের মত দেখা যাচ্ছে। ছেলেমেয়েদের দল আসছে কোলাহল করে, গদাইও সঙ্গে আছে।)

ছেলেরা (সুর করে)— ও-ও-ও আজ আমাদের বন-মহোৎসব—

(ঝুড়ি কোদাল নামিয়ে ছোটরা খানিক হাত তুলে ঘুরপাক খেয়ে নিলে)

ও-ও-ও—বলো।

কোথায় বসাই কোপ সয় না দেরী

তাড়াতাড়ি গো—ও-ও-।

(আবার সবাই কোদাল তুলে নিলে, কারু কারু হাতে ঝুড়ি, মেয়েদের কাছে ঘড়া। জায়গা বেছে দিলে গদাই কোদাল নিয়ে)

ছেলেরা (সুরে)—লাগাও কোদাল—
মারো কোপ—
হেঁইয়ো হো—হেঁইয়ো হো!
বারে বারেই—থামছ কেনে
হানবে জোরে—চলবে হেনে
সাফ করা চাই—ঘরের কোণের
বনবিছুটির বাদাড় ঝোপ—
মারো কোপ মারো কোপ।

ইঁদুর-ছুঁচো খণ্ড করে
মূল যে তাদের দন্ত-ঘায়—
উপড়ে ফেলে মহীরুহ—
দূর কর সে দুরাত্মায়।
মা মনসার ওই যে খোঁদল
দেখিস যেন দেয় না ছোবল—
আঁট করে ধর হাতের হাতল করবি ওদের বংশ লোপ;
হেঁইয়ো হো—হেঁইয়ো হো—মারো কোপ, মারো কোপ।

(কোদাল মারা ভঙ্গী)

(ঝুরঝুর করে বৃষ্টি ঝরছে। মন্টুর হাতে চারা। অন্য মেয়েরা ঘড়া নিয়ে জল আনতে যাচ্ছে; একদল একদল এসে ঢালছে—পায়ের ঘুঙুর বাজিয়ে গাইছে)

ঝরো ঝরো ঝর ঝর—ঝরণা ঝারি—
ঘড়া ঘড়া বয়ে আনি—শীতল বারি;
কঠিন জমি হয় কোমল,
নরম মাটি হয় সজল,
জল-ছল-ছল কাজল মেঘের মন যে ভারি।
কান্না কেন মেঘলা মেয়ে, ধরায় নাম না—
গুর-গুর ধ্বনিতে কও মনের কামনা।

অঝোর ধারায় ঝরি
সিক্ত শ্যামল করি
ভাসিয়ে বহিয়ে যাওয়া
খেলা তোমারি—
ঘড়া ঘড়া ভরে ঢালি
শীতল বারি—
ঝরণা ঝারি।

(হৈ-চৈ স্ফূর্তির সঙ্গে গাছ লাগান হ'ল—তারপর মাটির দেয়াল তুলে ঘিরে দেওয়া হ'ল)

সবাই—(গান)
শূন্য মাঠ রইল না আর ফাঁকা
আসতে যেতে ভর দুপুরে—
রইবে ছায়া ঢাকা;
ওরে মাঠে যেতে রাখাল ছেলে
বারেক বসিয়ো,
একলা বসে আপন মনে বাঁশী বাজিয়ো,
লাঙল কাঁধে ও চাষী ভাই
দারুণ রোদে কি পিপাসাই—
ক্ষণেক বসে জিরোতে নাই
কেমনে খাটি গো—
আগুন মাটি যায় যে ফাটি
কোথায় হাঁটি গো!
এই অশথ তরু দিলাম রোপি—
মেলবে হাজার শাখা,
শূন্য মাঠে মায়ের স্নেহ—
ছায়ায় রবে আঁকা—
আ—আ-আ!

(মাঝখানে গদাই; ছেলেমেয়েদের তাঁকে ঘিরে নৃত্য। সবাই কাদামাটি-মাখা।)

বীজাণু সংগ্রাম

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

বিষ ও বীজাণু ছড়ানোয় আছে
বিষম মৌলিকতা,
মরে নর যথা তথা।
শত জনপদ শ্মশান করা তো
দণ্ড কয়ের কথা।
অনিলে বীজাণু, সলিলে বীজাণু,
বীজাণু ধূলার 'পর,
এক নিঃশ্বাসে নিঃশেষ পুরী
মহা মন্বন্তর।
বর্ত্তমানকে ভূত করে দিতে
এমন অস্ত্র নাই।
যাই বলিহারি যাই

নূতন ভুবন সৃষ্টির বীজ
ওই বীজাণুই বুঝি
বাহির করেছে গুণী বিজ্ঞানী
গোটা যমপুরী খুঁজি।
যাহারা এমন পাপের বীজাণু
বপন করিছে হাসি,
ভয়াল ফসল কাটিতে হইবে
নয়নের জলে ভাসি।
মহাপ্রলয়ের অনেক কাণ্ড
হবে ইহাদের দ্বারা,
সৃষ্টি স্থিতি ছাড়া।

জীয়ন পুতুল

শ্রীমণীন্দ্র দত্ত

একে একে সব সাথীর সাথেই পুতুলকুমারের দেখা হ'ল। সবাইকে সে খেতে বলল। সবাই রাজীও হ'ল।

কিন্তু পুতুলকুমারের আর একটি সাথী ছিল। তার নাম সমীর। ছেলেরা তার নাম রেখেছিল 'সুপুরি গাছ'। কেন জান? সমীর ছিল সুপুরি গাছের মত সরু আর ঢ্যাঙা। তার উপরে মাথায় একরাশ ঝাকড়া চুল—ঠিক যেন একটি জীয়ন সুপুরি গাছ। তাই ছেলেরা তাকে ডাকত সুপুরি গাছ।

সুপুরি গাছের বাড়ি দু'বার ঘুরেও পুতুলকুমার তার দেখা পেল না। কি আর করে সে? এখানে ওখানে খুঁজতে খুঁজতে সে সুপুরি গাছের দেখা পেল মাঠের ধারে একটা বটগাছের পাশে।

পুতুলকুমার শুধাল: কি ব্যাপার? তুই এখানে লুকিয়ে আছিস্ যে?

সুপুরি গাছ ফিস্‌ফিস্ করে জবাব দিল: আমি এখানে লুকিয়ে আছি রাত দুপুরে পালিয়ে যাব বলে।

—পালিয়ে যাবি? কোথায়?

—অনেক—অনেক দূরে।

—অনেক দূরে কোথায়?

—'কেবল-ছুটির দেশে'। তুইও চল্ না পুতুল!

—আমি? না, আমি কোথাও যাব না।

—তুই ভুল করছিস্ পুতুল। না গেলে কিন্তু ঠকবি। জানিস্ ছেলেদের কাছে কেবল-ছুটির-দেশের মত দেশ আর হয় না? সেখানে একটাও পাঠশালা নেই, একজনও গুরুমশায় নেই। একখানা বইও কোথাও খুঁজে পাবি না। কী মজার সে দেশ! কেউ সেখানে পড়াশুনা করে না। বেস্পতিবারে সেখানে পাঠশালা বসে না। আর সে দেশে সপ্তাহের ছ দিন হ'ল বেস্পতিবার আর একদিন হ'ল রবিবার। আরে শুধু কি তাই? সেখানে ফি বছর পয়লা বোশেখ পাঠশালা ছুটি হয় আর চত্তির মাসের একত্রিশে নাগাদ চলে সে ছুটি। ভেবে দেখ তা হলে, কেমন মজার দেশ সেই কেবল-ছুটির-দেশ!

শুনতে শুনতে পুতুলকুমারের চোখ ছানাবড়া হয়ে উঠছে। একটা ঢোক গিলে সে শুধাল: সেখানে তা হলে লোকে করে কি? কি করে তাদের দিন কাটে?

সুপুরি গাছ হেসে জবাব দিল: কেন? সকাল থেকে রাত নাগাদ তারা খেলা করে বেড়ায়। তারপর রাত হলেই কসে ঘুম লাগায়। কেমন মজা বলতো?

পুতুলকুমার চুপ করে রইল, কোন জবাব দিল না। সত্যি, দেশটা তো বড় মজার।

তাড়া দিল সুপুরি গাছ : কিরে, যাবি কিনা বল্। খুব তাড়াতাড়ি জবাব দে। এখুনি আবার গাড়ি এসে পড়বে।

—গাড়ি? কিসের গাড়ি?

—বাঃরে, আমরা কি হেঁটে যাব নাকি? এখুনি যে কেবল-ছুটির-দেশের গাড়ি আসবে আমাদের নিতে।

—তুই তা হলে একা যাবি, না?

—পাগল না ক্ষ্যাপা! একা যাব কেন? কম করেও একশোর বেশি ছেলে যাবে।

—বলিস্ কি?

—তবে আর বলছি কি! নে, এখন যাবি কিনা বল্।

পুতুলকুমারের মনে তখন ঝড় বইছে। আহা, কী মজার দেশেই ওরা চলেছে! আমিও কেন যাই না ওদের সাথে? কিন্তু নীলপরী যে তা হলে বড় দুঃখু পাবে।

নীলপরীর কথা মনে পড়তেই পুতুলকুমার মন ঠিক করে ফেলল। সে বলল : না ভাই, আমি যাব না। এখুনি বাড়ি ফিরতে হবে আমাকে।

ঠাট্টা করে বলে উঠল সুপুরি গাছ : কেন, একটু রাত হলে কি তোকে প্যাঁচায় খাবে নাকি?

—ঠাট্টার কথা নয় রে। ফিরতে রাত হলে নীলপরী খুব ভাববে। সে আমাকে বড় ভালবাসে।

—তবে তুই যা, নীলপরীর নীল আঁচলের তলেই ঘুমুগে।

এমন সময় দূরে একটা গড়গড় আওয়াজ শোনা গেল।

সুপুরি গাছ বলে উঠল : ওই আমাদের গাড়ি আসছে। কিরে পুতুল, যাবি নাকি?

—না ভাই, আমি যাব না। বৃথা আমাকে লোভ দেখাস্ নি। নীলপরীকে আমি কথা দিয়েছি, এখন থেকে ভাল হয়ে চলব। সে কথা আমি কিছুতেই ভাঙব না। আমি চলি।

পুতুলকুমার বাড়ির দিকে পা বাড়াল। ঠিক সেই সময়ই কেবল-ছুটির-দেশের গাড়িখানি এসে হাজির হ'ল সেখানে।

অবাক ব্যাপার। গাড়িখানি ছুটে এল বেগে, তবু একটুও আওয়াজ শোনা গেল না। গাড়িটা টানছে বার জোড়া গাধা। গাধাগুলি দেখতে একই রকম, তবে রঙ-বেরঙের। কেউ সাদা, কেউ মেটে, কারো গায়ে নীল-হলদে ডোরা টানা। আরো অবাক ব্যাপার, একটা গাধারও পায়ে খুর নেই। সবগুলির পায়েই ছোট ছেলেদের মত সাদা কেডস্ জুতো!

আর গাড়োয়ান? সে এক আজব চীজ। বেটে খাটো মানুষটি। লম্বার চেয়ে চওড়ায় বেশি। পা থেকে মাথা পর্যন্ত তেল কুচকুচ করছে। মুখ হাঁড়ির মত গোল। ঠোঁটে মিঠে মিঠে হাসি। হাতে চাবুক।

কি মনে করে পুতুলকুমার ফিরে দাঁড়াল।

সুপুরি গাছ একলাফে গাড়িতে উঠল।

গাড়োয়ান মিঠে মিঠে হেসে শুধাল : কি গো খোকাবাবু, তুমি যাবে না ?

পুতুলকুমার বলল : না।

সুপুরি গাছ বলল : চলে আয় পুতুল, চলে আয়। ভারি মজা হবে।

পুতুলকুমার তবু অটল, বলল : না, না, না।

গাড়ির ভিতর থেকে চারজন একসাথে বলে উঠল : এস ভাই, এস। ভারি মজা হবে।

সাথে সাথে কথা বলল একশোটি ছেলে : ভারি মজা হবে ভাই, ভারি মজা হবে!

পুতুলকুমার লোভ আর সামলাতে পারছে না। শুধাল : আমি যে যাব তোমাদের সাথে, শেষে নীলপরী কি ভাববে ?

—অতশত ভাববার সময় নেই। শুধু ভেবে দেখ, যে দেশে আমরা চলেছি, সেখানে পাঠশালা নেই, গুরুমশাই নেই, পড়া নেই। শুধু খেলা আর ঘুম, ঘুম আর খেলা।

পুতুলকুমারের মুখে ফুটে উঠল হাসি। সে বলল : আমি যাব—আমি যাব।

সকলে একসাথে চেঁচিয়ে উঠল : এস—এস—এস।

পুতুলকুমার গাড়িতে চাপল।

সপাং করে চাবুক কসে গাড়োয়ান গাড়ি ছুটিয়ে দিল।

সারারাত গাড়ি চলল।

কাক ডাকা ভোরবেলায় গাড়ি পৌঁছল কেবল-ছুটির-দেশে।

এ এক আজব দেশ। শুধু ছেলে আর ছেলে। একজনও বড় মানুষ নেই। সব চেয়ে যে বড় তাঁর বয়স তের। আর ছোটদের মধ্যে আট বছরের ছেলেও আছে। পথে পথে কেবল হাসি আর হল্লা, গান আর খেলা। ফুটবল আর মার্বেল, ডাং-গুলি আর কপাটি। এখানে ওখানে ছড়িয়ে আছে কত কাঠের ঘোড়া আর তিন-চাকার গাড়ি। যার যেটা খুশি নিয়ে চড়লেই হ'ল। বাস, সেইটেই তোমার। কেউ কিছু বলবে না। কেউ কখনো বকবে না।

পথের পাশে পাশে থিয়েটারের ঘর, সিনেমার হল, সার্কাসের তাঁবু। টিকিটের বালাই নেই। মন চায় তো ঢুকে পড়। যতক্ষণ খুশি দেখ। কী মজা!

পথে পথে দেয়ালে দেয়ালে কয়লা দিয়ে বড় বড় হরফে লেখা রয়েছে :

খেলনারা দীর্ঘজীবী হোক!
পাঠশালা আমরা চাই না!
অংকের বই নিপাত যাক্!

এমন মজার দেশে মজার মাঝে পুতুলকুমারের দিন কাটে মনের সুখে।

দিন যায়—মাস যায়—বছর ঘুরে আসে—

একদিন সুপুরি গাছ বলল: কি ভাই পুতুল, এখন কেমন?

পুতুলকুমার হেসে বলল: সত্যি ভাই, বড় মজার দেশ। তোর কথা না শুনলে কী ঠকাটাই না ঠকতাম! তুই আমার প্রকৃত সখা।

পুতুলকুমার দুই হাতে সুপুরি গাছের গলা জড়িয়ে ধরল।

তবু একদিন দু'জনে ছাড়াছাড়ি হয়ে গেল।

কেন?—সেই কথাই বলছি।

একদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে একটা হাঁই তুলে মাথার চুলে হাত দিতেই—

এ কি?

পুতুলকুমার অবাক! এ কি? একহাত লম্বা দুটো কান গজিয়েছে নাকি তার মাথায়?

ছুটল পুতুলকুমার আয়নার খোঁজে। আয়না না পেয়ে মুখ দেখল জলের গামলায়।

হায় হায়! এ কি হ'ল? তার মাথায় দুটো গাধার কান গজাল কেমন করে?

হায় হায় করে ডুকরে কেঁদে উঠল পুতুলকুমার। মাথা ঠুকতে লাগল ঘরের দেয়ালে।

যত কাঁদে কান তত বড় হয়। তাই দেখে পুতুলকুমার আরো কাঁদে।

কাঁদন শুনে ঘরে এল একটি ধেড়ে ইঁদুর।

ইঁদুর শুধাল: তুমি কাঁদছ কেন? কি হয়েছে?

পুতুলকুমার বলল: আমার অসুখ করেছে। তুমি কি নাড়ি দেখতে জান?

—তা জানি।...বলে ধেড়ে ইঁদুর পুতুলকুমারের নাড়িটা টিপে টিপে দেখল। তারপর একটা বড় রকমের নিশ্বাস ছেড়ে বলল: খবর বড় খারাপ।

—কি রকম?

—তোমার গাধা-জ্বর হয়েছে।

—গাধা-জ্বর? সে আবার কি?

—খানিক পরেই তুমি একটি ছোটখাট গাধা বনে যাবে।

কথা শুনে পুতুলকুমারের চক্ষু তো চড়কগাছ! দুই হাতে বুক চাপড়ে সে কাঁদতে শুরু করে দিল।

ধেড়ে ইঁদুর বললে: কেঁদে আর কি করবে ভাই, এ তোমার কর্মফল। যে-সব ছেলে আলসে, যারা পড়তে ভালবাসে না, পাঠশালায় যায় না, গুরু মশায়কে দেখলে পালায়, যারা দিনরাত শুধু খেলে আর খেলে, তারাই শেষে একদিন গাধা বনে যায়,—এ কথা কি তুমি জান না?

পুতুলকুমার হাউ-মাউ করে কেঁদে উঠল: আমি এ সব কিছুই জানি না ইঁদুর ভাই, কিছুই জানি না। আর কেমন করেই বা জানব? আমি তো আর মানুষ নই, আমি যে পুতুল। আমি তো আর কিছু বুঝি না। সুপুরি গাছ আমাকে যেমন বুঝিয়েছে, আমি তেমনই বুঝেছি।

ধেড়ে ইঁদুর শুধাল: কে সুপুরি গাছ?

—সুপুরি গাছ আমার সখা।

—ওই সখাই তোমাকে ডুবিয়েছে। যাও এখন তার কাছে।

—হাঁ, তার কাছেই যাব। একবার তাকে খুঁজে পেলে হয়, মজাটা দেখিয়ে তবে ছেড়ে দেব।

পুতুলকুমার তখনি তৈরী হ'ল সুপুরি গাছের খোঁজে বেরোবার জন্যে।

কিন্তু—মাথার উপর দুটো গাধার কান নিয়ে কেমন করে সে পথে নামবে?

ভেবে ভেবে একটা উপায় বের করল পুতুলকুমার। কাগজ দিয়ে একটা গাধার টুপি বানিয়ে তাই মাথায় দিল কান ঢেকে; তারপর নেমে গেল পথে। (ক্রমশঃ)

বাংলার মেলা ও উৎসব

শ্রীপ্রীতিকণা দেবী

'মেলা!'—নামটা শুনলে ছোটদের মন আনন্দে নেচে ওঠে। কত রং-বেরংয়ের পোষাক পরা মানুষ! হৈ-চৈ রব! ভেঁপু বাঁশীর আওয়াজে কান ঝালাপালা। রঙীন বেলুনের ঝকমকি। মাটির পুতুলের দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে খুকুমণির চোখ ছানাবড়া—কোন্ পুতুলটা কিনবে!

ওদিকে তেলে ভাজার গন্ধে বাতাস আকুল। তার লোভনায় আমন্ত্রণকে উপেক্ষা করে তুমি হা করে তাকিয়ে দেখছ,—বেণু, কানু, পুটে, ফটকে তোমার স্কুলের বন্ধুরা নাগরদোলায় মজাসে চরকী

পাক খাচ্ছে। ওমা! একটু পরেই দেখা গেল, তুমিও দিব্যি কাঠের ঘোড়ার পিঠে চেপে বন্-বন্ করে ঘুরছ!

মেলা দেখতে কে না ভালবাসে?—কিন্তু মেলা শব্দের অর্থ কি তা নিয়ে আমরা কখনই ভাবি না। বহু লোক যেখানে মিলিত হয় তাকে মেলা বলা চলে; কিন্তু মেদিনীপুর জেলাতে মেলাকে 'যাত্রা' বলতে শুনে প্রথমটা অবাক হয়েছিলাম। পূর্ব্ববঙ্গের গ্রামাঞ্চলে মেলাকে 'আরঙ্গ' বলে।

'বাংলাদেশে বারো মাসে তের পার্ব্বণ।' এখন অবশ্য বারো মাসই আছে, তের পার্ব্বণ ঠিক নেই। তার কতকগুলিকে কেন্দ্র করেই মেলা বসে। বৎসরের প্রথম বৈশাখ মাসে অনেক ধর্ম্ম অনুষ্ঠান হয়ে থাকে—বৃক্ষরোপণ, জলদান, পুণ্যাহ, অক্ষয় তৃতীয়া ব্রত।

জ্যৈষ্ঠ মাসে—জামাই ষষ্ঠী একটি বড় পর্ব্ব। তা ছাড়া আছে ষষ্ঠী ব্রত। জগন্নাথদেবের স্নানযাত্রা। আষাঢ় মাসে রথযাত্রা। এই উপলক্ষে বাংলার প্রায় সব জেলাতেই 'মেলা' উৎসব হয়ে থাকে। ঢাকা জেলার শ্রীনগর, ধামরাই, পশ্চিমবঙ্গে মাহেশ, মহিষাদল, এ সব জায়গার রথ প্রসিদ্ধ। শ্রাবণে ঝুলন-যাত্রা। তা ছাড়া পূর্ব্ববঙ্গের মনসা পূজা উৎসবটি খুবই সমারোহের ছিল। সারা মাস ধরে চলত পদ্মপুরাণ পাঠ। মেয়েরা করতেন মনসা পঞ্চমীর ব্রত। মনসাদেবীর ভাসান উপলক্ষে গ্রামাঞ্চলে চলত মেলা ও বাইচ্ খেলা। ভাদ্রে শ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমী। এই উপলক্ষে ঢাকায় মিছিল বের হ'ত। পাকিস্তান হওয়ার ফলে সেই সুন্দর উৎসবটি বন্ধ হয়ে গেছে।

আশ্বিনে দুর্গা পূজা বাঙ্গালীর শ্রেষ্ঠ উৎসব। কার্ত্তিক মাসে শ্যামা পূজা বাংলার নিজস্ব জিনিস হলেও দেওয়ালী উৎসবে সারা ভারতবর্ষই মেতে ওঠে। তারপর ভাইফোঁটা; তা ছাড়া আছে কার্ত্তিক ব্রত, মায়েরা করে থাকেন। কার্ত্তিক পূর্ণিমায় শান্তিপুরের রাস বিখ্যাত। বিভিন্ন দেবালয়ে বিগ্রহ পূজিত হন, গোস্বামীদের বাড়ীতে বহু শিষ্য এসে থাকেন, নাচ-গানের আনন্দ চলে, তারপর দেবদেবীরা নগর পরিভ্রমণে বের হন। একে বলে ভাঙ্গা রাস।

অগ্রহায়ণ মাসে নবান্ন। নূতন ধান ও নূতন দ্রব্য দিয়ে গৃহদেবতার পূজা দেওয়া হয়। নূতন চাল, গুড়ের পায়েস খাওয়া এই পরবের একটি প্রধান অঙ্গ। এ মাসে জগদ্ধাত্রী পূজা হয়। পৌষ সংক্রান্তি পিঠা খাওয়ার পরব। বাস্তুপূজা হয়। ঘরে ঘরে মা-বোনেরা কোমর বেঁধে লাগতেন, কত রকমের পিঠা তৈরী করা যায়। আজকাল পিঠার আদর কমে গেছে। অনেক জিনিসই আজকাল দুষ্প্রাপ্য। কেউ কেউ কোন রকমে নিয়মরক্ষা করেন। পৌষ সংক্রান্তিতে সাগর স্নান বিখ্যাত। গঙ্গাসাগর সঙ্গমে বিরাট মেলা বসে থাকে, লক্ষ লক্ষ যাত্রীর সমাগম হয়। এখানে কপিল মুনির আশ্রম আছে। রামায়ণে বর্ণিত সগর-সন্তান ভস্ম ও ভগীরথের গঙ্গা আনয়ন, কে না জানে এই কাহিনী! এখানেই সগর রাজার ষাট হাজার ছেলে মুক্তিলাভ করেছিলেন। মকরসংক্রান্তিতে বীরভূম জেলায় জয়দেব কেন্দুলীতে বাউলদের এক মেলা বসে থাকে। বীরভূমের মাটি বহু সাধকের পদস্পর্শে ধন্য। সাধক বিল্বমঙ্গলের সিদ্ধপীঠ এইখানে। নান্নুর গ্রামে কবি চণ্ডীদাস সিদ্ধিলাভ করেছিলেন।

পৌষের কৃষ্ণা একাদশীতে ফুলিয়ার মেলা বসে থাকে। সেকালের একটি গ্রন্থে এই প্রসিদ্ধ মেলার সুন্দর বর্ণনা আছে। এখানে গোপাল চাপালোর সমাধি আছে। কাছেই একটি ছোট মন্দিরে গৌর-নিতাই বিগ্রহ আছেন। হরিনামের জন্য এই মেলাটি বিখ্যাত। যাত্রীর দল সারাদিন উপবাস থেকে হরিনাম করেন, একে বলে 'হরি-বাসর'।

ফুলিয়ার অপরদিকে প্রায় দু'মাইল দূরে ঘোষপাড়া। কর্তাভজা সম্প্রদায়ের পীঠস্থান এই ঘোষপাড়া। এখানে এই সম্প্রদায়ের একটি বিরাট উৎসব হয়। এই উৎসবটি সুরু হওয়ার মূলে একটি সুন্দর কাহিনী আছে। যে সময় চৈতন্যদেব নীলাচলে দেহত্যাগ করেন, ঠিক সেই সময়ে উলা গ্রামের একটি পান-ব্যবসায়ী তার পানের বরজে একটি সুন্দর শিশু কুড়িয়ে পায় এবং তাকে প্রতিপালন করে। আট বছর বয়সে শিশুটি পালিয়ে যান বিক্রমপুরে; বারো বছর সেখানে শিক্ষা লাভ করেন, পরে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন এবং পরবর্ত্তী জীবনে বাবা আউলচাঁদ নামে খ্যাত হন। তাঁর বাইশ জন শিষ্য। রামচন্দ্র তাঁদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। আউলচাঁদের তিরোধানের পর তিনিই হন এই সম্প্রদায়ের নেতা বা কর্তা। রামচন্দ্রের পুত্র রামদুলাল কতকগুলি সাঙ্কেতিক সঙ্গীত রচনা করেন। এই গানগুলিই কর্তাভজাদের ধর্ম্মশাস্ত্র। কর্তাভজা রূপান্তরে হিন্দুদের 'গুরু' পূজা বলে মনে করা যায়। বেদ-বেদান্তের ছড়াছড়ির যুগে, একটি নূতন ধর্ম্মমতের প্রচার ও লক্ষ লক্ষ লোককে সেই ধর্ম্মে আকৃষ্ট করা সহজসাধ্য নয়। সর্ব্বধর্ম্মের সামঞ্জস্য রেখে, আউলচাঁদ যথেষ্ট উদারতা দেখিয়ে গেছেন। অতএব তিনি একজন নমস্য ব্যক্তি সন্দেহ নাই।

কবি কৃত্তিবাসের জন্মস্থান ফুলিয়াতে। কবিগৃহের কাছেই একটি তীর্থস্থান আছে—'হরিদাসের পাট'। এখানে তাঁর বিগ্রহ স্থাপিত। বৈরাগী সম্প্রদায়ের একটি বড় মেলা এইখানে বসে থাকে। খেতরী গ্রামের রাজা কৃষ্ণচন্দ্র খেতরীর প্রসিদ্ধ মেলার প্রবর্ত্তক। তিনি পরম বৈষ্ণব ছিলেন।

মাঘ মাসে শ্রীপঞ্চমী। কুড়ি-পঁচিশ বছর আগে ছোট ছোট মেয়েরা এ মাসে করত 'মাঘমণ্ডল ব্রত'। পরিষ্কার নিকানো উঠান জুড়ে আঁকা হ'ত—লাল ইটের গুঁড়ো দিয়ে মণ্ডল বা পৃথিবী। ভেতরের নক্সাকে রঙ্গীন করবার জন্য ব্যবহার করা হ'ত—বেলপাতার গুঁড়ো, চালের গুঁড়ো, তুষ কালী, হলুদ গুঁড়ো ও আবীর। মণ্ডলের উপর সূর্য্যঠাকুর। চারিদিকে ছড়ানো জটা, লাল চোখ আবীর দিয়ে আঁকা। ইয়া কালো কুচকুচে গোঁফ। মণ্ডলের নীচে চন্দ্রঠাকুরের সাদা ধপধপে রং, আবীরে আঁকা লাল ঠোঁট, যেন মুচকি হাসছেন।

রোদভরা উঠানে শিশু ব্রতীদের মন্ত্র পাঠে ভরে উঠত প্রতিটি গৃহস্থ-বাড়ী—

"চন্দ্র সূর্য্য পূজন সোনার থালায় ভোজন।"

হালে এই সব ব্রত লোপ পেয়েছে। এখনকার খুকুমণিরা লেপ ছেড়ে উঠে এসে বাসি মুখেই চা-খাবার খেয়ে স্কুলের পড়া তৈরী করতে ব্যস্ত হয়।

ফাল্গুন মাসে দোল ও শিবচতুর্দ্দশী ব্রত। শিবরাত্রি উপলক্ষে সীতাকুণ্ডের (চন্দ্রনাথ) মেলা প্রসিদ্ধ।

চৈত্র মাসে নীল সংক্রান্তির গাজন উৎসব। বাংলাদেশের সব জেলাতেই এই উৎসবটি মহা সমারোহে হয়ে থাকে। তারকেশ্বরের নীল সংক্রান্তি খুব প্রসিদ্ধ উৎসব। পূর্ব্ববঙ্গের লাঙ্গলবন্দের অষ্টমী স্নান বিখ্যাত। বিরাট মেলা বসে ও বহু যাত্রীর সমাগম হয়ে থাকে।—পরশুরাম এখানে স্নান করে মাতৃহত্যার পাপ থেকে মুক্ত হয়েছিলেন। চৈত্র মাসে বাসন্তী দেবীর পূজা হয়। আসল দুর্গা পূজা এইটি। ফরিদপুর জেলার কোটালীপাড়াতে দুর্গা পূজার মত ঘরে ঘরে এই পূজা হ'ত।

বাংলাদেশে বারো মাসেই কত রকমের মেয়েলী ব্রত হ'ত, যার পরিচয় এই সামান্য লেখার ভিতর দেওয়া সম্ভব নয়। তা ছাড়া আছে—কত সাধক ও মহাপুরুষের আবির্ভাব ও তিরোভাব উৎসব।

কৃত্তিবাস, জয়দেব, বিল্বমঙ্গল, চণ্ডীদাস প্রভৃতি সাধক ও কবিদের স্মরণ-উৎসব এযুগে শিক্ষিত বাঙ্গালীরা করে থাকেন। এই সব মেলা ও উৎসব দ্বারা ধর্ম্ম ও বিভিন্ন মতের আসল রূপটির সাথে পরিচয় ঘটত ভক্ত বা যাত্রীদের। কিন্তু মনে হয় এসব মেলা শীঘ্র লোপ পেয়ে যাবে। আমরা সহরে যে মেলা দেখে থাকি তাকে ভদ্রভাষায় মেলা বলা চলে না, এগ্‌জিবিসন বলতে হয়। ছেলেবেলা থেকে দেখা অনেক এগ্‌জিবিসনের স্মৃতি ভুলে গেছি। কিন্তু মেলার ছবিগুলি ভুলতে অনেক সময় লাগবে বৈ কি! জ্যোৎস্না রাতে মেলা ফিরতি পথে কাদের একটি ছোট মেয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। সাধ করে কেনা কেষ্টনগরের মাটির পুতুলটি তার হাত থেকে পড়ে ভেঙ্গে গেছে। একটু পরেই দেখা গেল তার মুখ হাসিতে ঝলমল! কান পেতে শুনছে ভীড়ের মাঝে কোন অদেখা বাউল তার একতারাটি বাজিয়ে নেচে নেচে গাইছিল—

"কোন্ রঙ্গে ঘর বান্দিলা বান্দা! এ দুনিয়ায় সব ভাণ্ডাবাজী।"

গানের ভাষাটা ভারি কটমটে, তা হোক, যে শুনছে সেই গান, তারি মনের গোপন তারে সেই সুরটি বার বার ছুঁয়ে যাচ্ছে। একধারে বসে আছে হরিদাস বৈরাগী, রুক্ষ জট-পাকানো চুল, আধ-ময়লা ছেঁড়া কাপড় পরা। তার মধুর কণ্ঠস্বর সারেঙ্গীর সুরে মিশে গেছে—

"হরি দিন তো গেল, সন্ধ্যা হোল—পার কর আমারে।"

আজ কোন্ ফাঁকে ওর বিছানো নোংরা গামছাটার উপর একটা তামার পয়সা ছুঁড়ে দিয়েছে পাড়ার সব চেয়ে দুষ্টু ছেলে কানু। হরিদাসকে আজ তার খুব ভাল লাগছিল। সূয্যিঠাকুর পাটে বসেছেন। রক্ত সন্ধ্যার ম্লান আলোয় হরিদাসের ভাবব্যাকুল আত্ম-নিবেদনের ছবি ও গানের সুর চিরকালের জন্য ছাপ এঁকে রেখে গেছে তোমার মনের ভিতর।

মেলায় জ্ঞানী, মূর্খ, ধনী, দরিদ্র, সাধু, চোর—সব কিছু বিরাট জনতার সঙ্গে মিশে একাকার হয়ে যায়। কয়েকদিন বা কয়েক ঘণ্টার জন্য সবাই এক তীর্থে মিলিত হয়। মেলার ভিতর দিয়ে এই যে মহামিলনের ক্ষেত্র রচনা এটুকুর দাম কি খুবই সামান্য?

জন্মদিন

শ্রীহরিপদ চক্রবর্ত্তী

আজ স্বপনের একাদশ জন্মদিন। ধনী পিতার একমাত্র ছেলে সে। আত্মীয়-পরিজন, বন্ধু-বান্ধবের কোলাহলে সমস্ত বাড়ী মুখরিত। জন্মদিনের বিচিত্র বাহারের অসংখ্য উপহারে একটি কক্ষ প্রায় পূর্ণ হয়ে গিয়েছে। বাবার দেওয়া দামী ঘড়িটি ও মায়ের দেওয়া হীরা-বসানো আংটিটি সব চেয়ে পছন্দ হয়েছে স্বপনের। কত রকমের পোযাক আর খেলনা পেয়েছে সে। আত্মীয়-স্বজন সবার কাছেই তার একটা বিশেষ মূল্য আজকের দিনে। সবাই তাকে আদর করছে, কামনা করছে দীর্ঘ জীবন।

অন্যান্য বছরের জন্মদিনগুলির কথাও অস্পষ্ট মনে পড়ে স্বপনের। এই একটি দিনের আদর-আপ্যায়ন ভুলবার নয়! স্বপন ভাবে: জন্মদিনগুলি আরো তাড়াতাড়ি হয় না কেন? বছরে একটা জন্মদিন না হয়ে মাসে একটা হলে বেশ হ'ত।

অন্যমনস্ক হয়ে স্বপন তার ঘরের জানালার ধারে এসে দাঁড়াল। বাড়ীর বাইরে একটা কোলাহল শোনা যায়। খাবারের প্রচুর আয়োজন করা হয়েছিল। নিমন্ত্রিত অতিথিবর্গ যত খেয়েছে তার বেশী নষ্ট করেছে। সেই উচ্ছিষ্ট খাবারের লোভে একদল ভিখারী বাড়ীর বাইরে ভীড় করে আছে। চাকর-বাকর এক এক বার পাতা ফেলে আসছে, আর বুভুক্ষু ভিখারীরা উল্লাসে সেগুলির উপর হুমড়ি খেয়ে পড়ছে। দৃশ্যটা ভাল লাগল না স্বপনের।

এমন সময় স্বপনের ছোট পিসীমা কল্যাণী ঘরে ঢুকল। অত্যন্ত সাদাসিধে পোযাক। কল্যাণীর বিয়ে বড় ঘরে হয়নি। স্বামী প্রফেসর। সে নিজেও বি. এ. পাস করেছে। তার স্বামীর ঘর ধনে সমৃদ্ধ ছিল না, ছিল শিক্ষায়। ঘরে এসে স্বপনকে মলিনমুখে জানালার ধারে দাঁড়াতে দেখে বলল, 'কিরে, ওখানে কি করছিস্?'

স্বপন ভাঙ্গা গলায় বললে, 'দেখে যাও পিসীমা!'

কল্যাণী তার পাশে এসে দাঁড়াল। স্বপন বললে, 'ঐ ভিখারীগুলির কাণ্ড দেখেছ পিসীমা, যেন কতদিন কিছুই খায় নি। ঐ ভাবে নোংরা ঘেঁটে খাওয়া কি ভাল?'

কল্যাণী একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বলল, 'সহজে কি আর কেউ ওসব খায় রে বোকা! ক্ষুধার জ্বালা সহ্য করতে না পেরেই ওগুলি খাচ্ছে।'

স্বপন বলল, 'নোংরা খাবার খেয়ে ওদের অসুখ করে না পিসীমা?'

—'করে বৈ কি স্বপন! এসব খেয়ে ওদের মধ্যে অনেকে মারাও যায়।'

—'বল কি পিসীমা! অসুখ হলে ভাল ডাক্তার ওরা দেখাতে পারে না?'

—'ভাল ডাক্তার দূরে থাক্ কোন রকম ডাক্তারই ওরা ডাকে না। ওদের বাড়ীঘরই তো নেই। রাস্তাঘাটে শুয়ে থাকে। যা পায় তা-ই খায়। এ এক অদ্ভুত সমাজ-ব্যবস্থার ফল!'

শেষের কথাটা স্বপন বুঝতে পারল না। বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞেস করল, 'কি বললে পিসীমা?'

কল্যাণী সস্নেহে স্বপনের মাথার উপর হাত রেখে বলল, 'ওসব তুই এখন বুঝতে পারবি না স্বপন। বড় হলে নিজেই সব জানতে পারবি। এখন চল্ দেখি, দাদা তোকে ডেকেছেন।'

এমন সময় 'স্বপন কইরে' বলে ভুবনবাবু নিজেই এসে উপস্থিত হলেন। স্বপন জবাব দিল, 'কি বাবা?' ভুবনবাবু বললেন, 'চল্ তো ওঘরে। আমার অফিসের কয়েকজন বন্ধু-বান্ধব এসেছেন তোকে আশীর্ব্বাদ করতে।' স্বপন ফট্ করে বলে বসল, 'ঐ ভিখারীগুলিকে খাইয়ে দাও না বাবা!'

ভুবনবাবু খানিকক্ষণ স্তম্ভিত হয়ে রইলেন। তারপর কল্যাণীর উপর একটা জলন্ত দৃষ্টি নিক্ষেপ করে বললেন, 'এসব তো ভাল নয় কল্যাণী! ছোট ছেলের মাথায় উদ্ভট খেয়াল ঢুকিয়ে দেওয়ার মত অন্যায় আর কিছু নেই।'

এই ছোট বোনটির উপর ভুবনবাবু মোটেই খুশী ছিলেন না। ছেলেবেলা থেকেই কল্যাণী তাদের পরিবারে কেমন জানি খাপছাড়া প্রকৃতির। গরীবের দুঃখ দেখলে কেঁদে সারা হয়। লেখাপড়া শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে তা যেন আরো বেড়েই গিয়েছে। বিয়েও হয়েছে এমন এক পরিবারে যাঁদের শিক্ষা-দীক্ষা, আদব-কায়দার উপরে দিনে দিনে বীতশ্রদ্ধ হয়ে গেছেন ভুবনবাবু। স্বপনের সঙ্গে কল্যাণীর এতক্ষণ যে গরীব-দুঃখীর আলোচনাই চলছিল, সে বিষয়ে তিনি কোন সন্দেহ করলেন না। তা না হলে স্বপন হঠাৎ এমন কথা বলে বসবে কেন?

কল্যাণীও দাদার মনোভাব বুঝতে পারল। তবু ঐসব কথার কোন জবাব না দিয়ে স্বপনকে বলল, 'স্বপন, এখন দাদার সঙ্গে ওঘরে যাও।'

বিষণ্ণমুখে স্বপন ভুবনবাবুর সঙ্গে চলে গেল। ভুবনবাবুর বন্ধু-বান্ধবেরাও প্রচুর উপহারের সঙ্গে স্বপনের দীর্ঘ জীবন কামনা করলেন। কেউ কেউ স্বপনের পিঠ চাপড়ে উৎসাহ দিয়ে বললেন, 'বড় হয়ে বাবার মত হওয়া চাই।'

স্বপনের এখন আর এসব ভাল লাগছিল না। সে কোন কথাই বলল না। ধীরে ধীরে ঘর ছেড়ে চলে এল।

কিছুক্ষণ পর কি মনে করে দ্বারবান-রক্ষিত প্রকাণ্ড গেট পেরিয়ে ভিখারীদের কোলাহলের মাঝে এসে দাঁড়াল স্বপন। তার মূল্যমান পোষাক ও অভিজাত চেহারা দেখে কিছুক্ষণের জন্য থমকে গেল ভিখারীর দল। একপাশে একটি মধ্যবয়স্কা ভিখারিণী একটা অর্দ্ধ-উলঙ্গ ছেলে নিয়ে জড়সড় হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ছেলেটার সমস্ত শরীরে ময়লার একটা স্তর পড়ে গেছে। রুক্ষ লম্বা লম্বা চুলগুলি জট বেঁধে আছে। অন্যান্য ভিখারীদের সঙ্গে মারামারি করে খাবার সংগ্রহ করার ক্ষমতা এদের ছিল না; শুধু লোলুপ দৃষ্টিতে ওদিকে তাকিয়েছিল।

স্বপনকে দেখে সেই ভিখারিণীটি কাকুতি-মিনতি জানিয়ে বলল, 'কিছু খেতে দাও বাবু! ও রাজাবাবু, ছেলেটাকে কিছু খেতে দাও।'

স্বপন কি বলতে যাচ্ছিল। দারোয়ানরা হৈ-হৈ করে উঠল। 'হটো হিঁয়াসে' বলে লাঠি নিয়ে তেড়ে গেল।

স্বপন তাদের থামিয়ে দিল, তারপর ভিখারিণীর সঙ্গে অন্তরঙ্গ ভাবে কথাবার্ত্তা বলতে লাগল।

'স্বপন!'—হঠাৎ ভুবনবাবুর গম্ভীর কণ্ঠস্বর শুনে চমকে উঠল স্বপন। ফিরে চেয়ে দেখল, দোতালার বারান্দায় দাঁড়িয়ে তিনি স্বপনকে ডাকছেন। স্বপন আস্তে আস্তে বাবার কাছে গেল।

ভুবনবাবু জিজ্ঞেস করলেন, 'ওখানে কি করছিলি?' ছলছল চোখে স্বপন বলল, 'ওখানে একটি ভিখারীর ছেলে ঠিক আমার বয়সী বাবা! ওকে আমার একটা পোষাক আর কিছু খাবার পাঠিয়ে দাও না।'

'চোপ', গর্জ্জে উঠলেন ভুবনবাবু, 'আজ জন্মদিনে কোথায় শান্ত শিষ্ট হয়ে বসে থাকবে, না সারা বাড়ী টহল দিয়ে বেড়ানো হচ্ছে। শিগ্‌গীর তোমার ঘরে যাও।'

স্বপন আস্তে আস্তে চলে গেল। ঘরে গিয়েই তার পোষাক ছেড়ে ফেলল। হাতের আংটি ও ঘড়িটি খুলে রাখল। একটা পুরানো পোষাক পরে মুখ গুঁজে শুয়ে পড়ল বিছানার উপর।

কিছুক্ষণ পর ভুবনবাবু আবার স্বপনের ঘরে এসে ছেলের দিকে তাকিয়ে চমকে উঠলেন। একটু আগে ছেলের জন্মদিনে তাকে ধমক দিয়ে মনটা ভাল ছিল না ভুবনবাবুর। তাই এসে সান্ত্বনা দেবেন ভেবেছিলেন। কিন্তু ছেলের অবস্থা দেখে তাড়াতাড়ি বিছানার ধারে এসে বললেন, 'কিরে এরকম ছোটলোক সেজে শুয়ে আছিস্ কেন?'

স্বপন হু-হু করে কেঁদে উঠল। সে কি করে বাবাকে বুঝাবে, কোথায় তার দুঃখ! বললেও বাবা বুঝবেন না। ছোট পিসীমা হয়ত বুঝতে পারবেন। তার জন্মদিনে এত সমারোহ আর অপচয়, আর ঐ ভিখারী ছেলেটা একমুঠো ভাতের জন্য কেঁদে কেঁদে ঘুরে বেড়াচ্ছে! কেন এমন হয়? এর কি কোন প্রতিকার নেই? আর সব চেয়ে আশ্চর্য্য, ভিখারিণী মায়ের মুখে সে এইমাত্র শুনে এল, তার ছেলেও আজ এগার বছরে পড়ল। তা হলে তো ভিখারী ছেলেটারও আজ জন্মদিন।
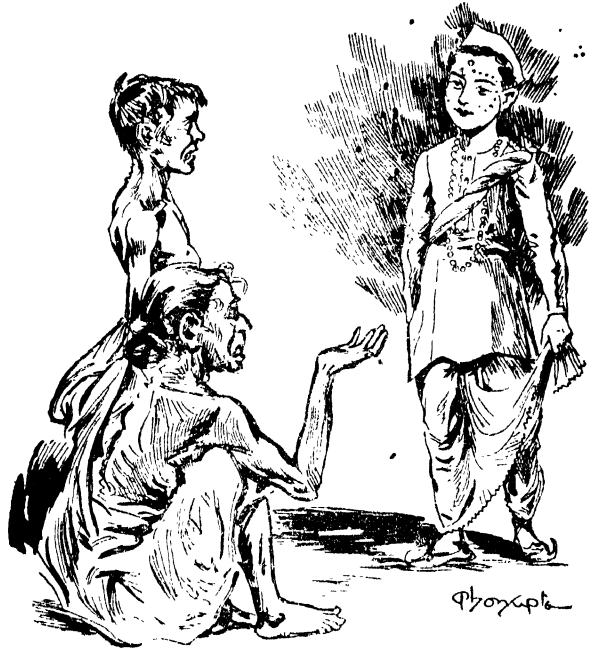
কাটাকাটি-কাব্য

শ্রীনীলরতন দাশ

বাজনার তাল কাটে, রেগে ওঠে কালোয়াত;
সাতকড়ি সুতা কাটে চরকায় সারারাত।
গাঁট কাটে গুণ্ডারা ট্রেনে-বাসে-ট্রামেতে;
ফোঁটা কেটে ভণ্ডরা ভিখ্ মাগে গ্রামেতে।
কান-কাটা বেহায়ার লাজ নাই কিছুতে;—
টেরি কেটে আগে ধায়, হটে না সে পিছুতে।
ও পাড়ার এককড়ি একেবারে ষণ্ড,—
নাক কেটে অপরের যাওয়া করে পণ্ড।
ডেঁপো ছেলে কথা কাটে ছোট বড় সবাকার,—
তাড়া খেলে কেটে পড়ে, নাহি করে দেরী আর।

দেশী মাল কাটে নাকো বিদেশের বাজারে;
গল্পের বই কাটে হাজারে ও হাজারে।
কারো কাল কাটে সুখে, কাহারো বা দুঃখে;
ব'সে যদি কাটে দিন, খাটে কোন্ মূর্খে?
কাটা ঘায়ে আর নুন দিস্ নারে ছিঁটায়ে—
কেন কথা কাটাকাটি? ফ্যাল সব মিটায়ে।
এতটুকু বুদ্ধি কি নাই তোর ভাণ্ডে?
লজ্জায় মাথা কাটা গেল তোর কাণ্ডে।
ফাঁড়া তোর কেটে গেছে, নাহি আর ভাবনা;
রেলের টিকিট কেটে চ'লে যা'না পাবনা।

সময় কাটে না মোটে, ব'সে কত ভাববো?
খাটাখাটি করে লিখি কাটাকাটি-কাব্য।

সত্যের জয়

শ্রীগৌরী গুপ্তা

বামড়া বলে একটি ছোট্ট স্বাধীন রাজ্য ছিল। সেই রাজ্যে অমরসিংহ নামে এক রাজা ছিলেন। সেই রাজ্যের শেষ সীমানায় একটা ছোট্ট কুঁড়ে ঘরে ঝন্টু ও তার মা থাকেন। ঝন্টুর বয়স দশ বৎসর। ঝন্টুর বাবাকে মনে নেই, ওর খুব ছোট বয়সে বাবা মারা গিয়েছেন। মা তারাসুন্দরী কারুর বাড়ীতে চাল ঝেড়ে, কারুর বাড়ীতে ডাল বেটে বহু কষ্টে সংসার চালাতেন, আর ঝন্টুকে পড়াতেন। ঝন্টু পঞ্চম শ্রেণীতে পড়ে এবং প্রত্যেক বৎসর প্রথম হয়। স্কুল থেকে গরীব ছেলেদের জন্যে একটা বৃত্তি আছে, তাইতে পড়ে। ঝন্টু পড়ায় যেমন ভাল, দুষ্টুমিতেও সেই রকম অদ্বিতীয়। ওর জোড়া ছেলে পাড়ায় নেই। কারু বাগানের পাকা কলার কাঁদি কেটে ছেলেদের খাওয়াচ্ছে— আবার কখন কার পেয়ারা গাছ সাবাড় করছে। ওর একটা দল আছে, সেই দলের সর্দ্দার ও। তবে ঝন্টুর একটি গুণ ছিল, কখন মিথ্যা কথা বলত না। ঝন্টুর ভাল নাম মৃত্যুঞ্জয় ঘোষ।

একদিন চাটুয্যেদের বাড়ীতে ডাল বেটে তারাসুন্দরী গরমে ঘামতে ঘামতে বাড়ী এসে দেখেন বাড়ী লোকে লোকারণ্য। ভয়ে তারাসুন্দরীর প্রাণ উড়ে গিয়েছে। ভাবলেন, ঝন্টু নিশ্চয় কারও বাড়ীতে কিছু করে এসেছে। হে ঠাকুর, তুমি আমার ঝন্টুকে রক্ষা কর।...ভয়ে একপা একপা করে যেই বাড়ীর সামনে গিয়েছেন, অমনি পাড়ার মাতব্বর হরেন মুখুজ্যে বললেন, 'বলি ঘোষ-গিন্নি, তোমার ছেলেকে নিয়ে কি করব? বাগানে কলমের গাছে আম ধরেছিল, তোমার ছেলে স্কুলের সব ছেলেদের ঝেঁটিয়ে নিয়ে গিয়ে সব আম খাইয়েছে। কি হে তোমরাই বল না!'

তখন পাড়ার যত লোক এসেছিল সকলে 'হ্যাঁ নিশ্চয়, হ্যাঁ নিশ্চয়' বলে উঠল। আর এক পাশে দাঁড়িয়ে তারাসুন্দরী ঠক্‌ঠক্ করে কাঁপতে লাগলেন, শেষে হাত জোড় করে বললেন, 'আপনারা ওকে যা হয় করুন; আমি গরীব, কেন যে ও এ রকম করে জানি না।'

'কি করব শুনি? তোমার ছেলে কি এখানে আছে? এবার রাজার কাছে তোমার ছেলের কাণ্ড সব বলা হবে।' বলে রাগে কাঁপতে কাঁপতে মুখুজ্যে মশাই মুখে যা এল বলে যেতে লাগলেন।

ঝন্টুর অপেক্ষায় রাত দশটা পর্য্যন্ত সব বসে রইলেন। তারপর সবাই যখন যে যার বাড়ী চলে গেলেন, তখন ঝন্টু বাড়ী ঢুকল।

রাগে কাঁপতে কাঁপতে তারাসুন্দরী একটা কাঠ নিয়ে ঝন্টুর কাছে এসে বললেন, 'হতচ্ছাড়া ছেলে, কি করেছিস্? ওরা তোকে রাজার দরবারে নিয়ে যাবে বলেছে।'

এক পা না নড়ে ঝন্টু বলল, 'জান মা, মুখুজ্যে মশায়ের এতগুলি বাগান আর এত আম, একদিন ছেলেদের দুটো আম হাত তুলে দিতে পারেন না। কাল আম পাড়া হ'ল, গাড়ী করে সব বাজারে বিক্রি হতে গেল, তা আমাদের কালু ডোমের ছেলে দুটো আম চাইলে তাকে মারতে মারতে বের করে দিলেন, আম দেওয়া ত দূরের কথা। আজ সেই জন্যে ওকে প্রাণ ভরে আম খাইয়েছি, আর স্কুলের ছেলেদেরও খাইয়েছি। আর আমায় রাজার কাছে পাঠাবেন, ভালই হবে মা! রাজ-দরবার কখন দেখি নি, দেখব। রাজা যদি বোঝেন অন্যায় করেছি, শাস্তি দেবেন, মাথা পেতে নেব। তবে অন্যায় আমি করি নি। জান মা, বড় হাড়কিপ্‌টে ঐ মুখুজ্যে মশায়!'

তারাসুন্দরীর রাগ কোথায় চলে গেল। ছেলেকে কোলের কাছে বসিয়ে উপদেশ দিতে লাগলেন। আর প্রাণভরে আশীর্ব্বাদ করলেন, 'তুই খুব বড় হবি, দশজনের একজন হবি বাবা, যত বিপদ আসুক কখনো মিথ্যা কথা বলবি নে।'

মার কাছ থেকে গিয়ে একটা পিদ্দিম জেলে ঝন্টু পড়তে বসল। কারণ পরদিনের পড়া তার কিছুই হয় নি। তেল খরচ হয় বলে সে বিকেলেই পড়া করে রাখে।

সকাল হতে না হতে রাজার সিপাই এক পরোয়ানা নিয়ে এল,—রাজদরবারে ঝন্টুর ডাক পড়েছে, এখুনি ওর সঙ্গে যেতে হবে। ঝন্টুর মা ভয়ে সারা হয়ে গেলেন, কোন কথা বলতে পারলেন না। ঝন্টু এসে বলল, 'ভয় কি মা, রাজদরবার দেখব, রাজা যদি শাস্তি দেন, মাথা

পেতে নেব। আসি মা, রাজার লোক অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে আছে। তুমি আমার জন্যে মোটেও ভেবো না।'

ঝন্টু মাকে প্রণাম করে মার আশীর্ব্বাদ মাথায় নিয়ে চলল রাজবাড়ী। তারাসুন্দরী শুধু বললেন, 'সর্ব্বদা সত্য কথা ব'লো বাবা! আর রাধামাধবকে স্মরণ ক'রো, কেমন?'

ঝন্টু সম্মতিসূচক মাথা নেড়ে 'আসি মা' বলে রাজার সিপাহীর সঙ্গে বেরিয়ে পড়ল।

রাজদরবারে অনেক লোক। রাজা অমরসিংহ সিংহাসনে বসে আছেন। সিপাহী ঝন্টুকে নিয়ে রাজদরবারে ঢুকে বলল, 'জয় মহারাজের জয়!' ঝন্টুও সেই সঙ্গে নমস্কার করে বলল, 'জয় মহারাজের জয়!' সিপাহী রাজার সামনে গিয়ে বলল, 'মহারাজ, সেই বালককে এনেছি।'

রাজা—তোমার নাম কি বালক?

ঝন্টু—আমার নাম শ্রীমৃত্যুঞ্জয় ঘোষ।

রা—কোন্ শ্রেণীতে পড়?

ঝ—পঞ্চম শ্রেণীতে মহারাজ!

রা—তোমাদের বাড়ীতে আর কে আছেন?

ঝ—মা আর আমি থাকি, বাবা বহুদিন আগে মারা গেছেন।

রা—তুমি মুখুজ্যে মশায়ের গাছের আম চুরি করেছ?

ঝ—না মহারাজ!

রা—মুখুজ্যে মশায় আর তাঁর সাক্ষীরা বলছেন, তুমি সব বাগানের আম ছেলেদের নিয়ে চুরি করেছ। তোমার সঙ্গে আর কে কে ছিল?

মুখুজ্যে মশাই ও তাঁর লোকেরা বলে উঠল, 'ধর্ম্মাবতার, ঐ ছোঁড়াই সব ছেলেদের নিয়ে আম চুরি করেছে আমরা দেখেছি। ও আবার সব ছেলেদের মোড়ল হুজুর!'

রা—এখন শুনলে ত সব, কি বল তুমি?

ঝ—না মহারাজ, আমি চুরি করি নি, মুখুজ্যে মশায়ের সামনে নিয়েছি। সব গাছের আম নয়, একটা গাছের। আর এরা যে বলছেন যে—আমরা দেখেছি, তা মিথ্যা; কারণ, মুখুজ্যে মশায় ছাড়া আর কেউ সেখানে ছিলেন না।

—দেখছেন হুজুর! যত বড় মুখ নয় তত বড় কথা! আবার আমাদের মিথ্যুক বলা!

রা—তুমি কেন পরের বাগানের আম নিচ্ছিলে? জান এর সাজা তোমায় পেতে হবে?

ঝ—মহারাজ, আমার যদি কোন দোষ হয়ে থাকে নিশ্চয় সাজা দেবেন; কিন্তু আমার মনে হয় আমি কোন দোষ করি নি।

রা—কি রকম? দোষ করে আবার বল কর নি। খুব স্পর্দ্ধা ত তোমার। কার সামনে কথা বলছ মনে নেই?

ঝন্টু নির্ভীক ভাবে অতি বিনয়ের সঙ্গে বলল, 'আমি ত কোন অন্যায় আচরণ করি নি রাজাধিরাজ! যদি করে থাকি ক্ষমা করুন।'

রা—তোমায় কে শিখিয়েছে রাজাধিরাজ বলতে?

ঝ—আমার মা।

রা—আচ্ছা বল, কেন আম নিয়েছিলে?

ঝ—একদিন মুখুজ্যে মশায়ের বাগান থেকে গাড়ী গাড়ী আম পাড়া হয়ে বাজারে চালান গেল বিক্রি হবার জন্যে। সেখানে কালু ডোমের ছেলে ছিল, ওরা বড় গরীব, আম কিনে খেতে পায় না, তাই দুটো আম মুখুজ্যে মশায়ের কাছে খেতে চেয়েছিল। তা বেচারাকে মারতে মারতে বের করে দিলেন উনি, আম দেওয়া ত দূরের কথা। তাই আমি ওকে পেট ভরে আম খাওয়ালাম, আর সব ছেলেদের দিলাম। একটা গাছের আম বৈ ত নয়! ওঁর ত কত বাগান, কত আমগাছ; কেন, একটা করে আম ছোট ছেলেদের দিতে পারেন না?

রা—তা বলে জোর করে খাবে?

ঝ—কে বলবে আমি খেয়েছি? মার বিনা অনুমতিতে কোথাও আমি কিছু খাই না।

রা—তুমি কি প্রতি বছর ফেল কর?

ঝ—না মহারাজ, প্রতি বৎসর প্রথম হয়ে থাকি এবং স্কুল থেকে বৃত্তি পাই, তাইতে পড়ি।

রা—তোমার এই অপরাধের জন্যে যদি বৃত্তিটা বন্ধ করে দি?

ঝ—রাজাধিরাজ! আমায় যে কোন সাজা দিন্ মাথা পেতে নেব, আমার বৃত্তিটা বন্ধ করবেন না। আমরা যে বড় গরীব···বলে ঝন্টু কেঁদে ফেলল।

রা—তুমি এখন বস। একটু পরে তোমায় জানাব তোমায় কি শাস্তি দেওয়া হবে।... মন্ত্রীর দিকে তাকিয়ে রাজা বললেন, 'মুখুজ্যেকে ডাকুন।'

মুখুজ্যে মশাই এসে খুব বড় এক প্রণাম করে দাঁড়ালেন।

রা—আপনার বাগানের আম সব নিয়েছে ঐ বালক?

মু—সব নয়, তবে অনেক ধর্ম্মাবতার!

রা—এই যে বললেন সব আম? আর আপনি কেন বললেন, ছেলেটি প্রতি বছর ফেল করে?

মু—অ্যাঁ তাই ত জানতাম। তবে ছোঁড়াটা বলে যে প্রথম হয়, কে জানে, জানি না মহারাজ! মিথ্যে বলছে নিশ্চয়। খেতে পায় না, সে আবার প্রথম হবে!

রা—আপনি বলছেন, আপনার বাগানে বেশী আম হয় নি, আম তোলা হয় নি! তবে গাড়ী গাড়ী আম বাজারে গেল কেমন করে? দুটো আম চাওয়ার জন্যে কালু ডোমের ছেলেকে মেরেছেন কেন? আম দেবার ইচ্ছে না থাকে দেবেন না, মারবেন কেন?

মু—তা তা যত বা—বা—জে কথা। আমার আ—ম ত বাজারে বি—ক্রি হয় নি।

রা—বিক্রি হয় নি? সিপাহি, কত গাড়ী আম বাজারে চালান গ্যাছে?

সিপাহী—হুজুর, সাত গাড়ী।

রা—উচিত সাজা দিতে বলেছিলেন, নিশ্চয় উচিত সাজাই দেব। তবে সেটা আপনাকে।

মুখুজ্যে মশাই ককিয়ে উঠলেন, 'দোহাই ধর্ম্মাবতার, আমায় এই বারের মত ক্ষমা করুন।'

রা—এবারের মত ছেড়ে দিচ্ছি, তবে বাগানের সব আম এবারে রাজবাড়ীতে আসবে। যান।

রাজসভার মাঝখান থেকে কে বলে উঠল, 'যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল, মশা মারতে গালে চড়'।

রা—মৃত্যুঞ্জয়, শোন এদিকে। তোমার সত্যবাদিতার জন্যে খুব সন্তুষ্ট হয়েছি। তোমার আর কষ্ট করে পড়তে হবে না। তোমার মাকেও কষ্ট করতে হবে না। যতদিন তুমি পড়বে সব খরচ ষ্টেটের। আর ষ্টেট থেকে তোমার নামে মাসে মাসে ৫০৲ টাকা করে পাঠান হবে।

ঝন্টু আনন্দে কেঁদে ফেলল, বলল, 'জয় রাধামাধবের জয়! জয় মহারাজার জয়! মহারাজ, আমার মার নামে টাকা পাঠাবেন, আমার মার নাম...' বলতে গিয়েই ঝন্টু থেমে গেল। একখানা কাগজে মার নাম লিখে দিল।

রাজা ঝন্টুর বুদ্ধি দেখে মুগ্ধ হলেন। বললেন, 'তাই হবে।'

ঝন্টু ছুটে বাড়ী গিয়ে মাকে বলল, 'মা, আমি যত দিন পড়ব রাজা মশাই পড়াবেন, আর আমাদের মাসে ৫০৲ টাকা করে দেবেন, আমাদের কোন কষ্ট থাকবে না মা! মা, তুমি আর কারুর বাড়ী ডাল বাটতে যেও না মা!' মা ঝন্টুকে প্রাণভরে আশীর্ব্বাদ করলেন। নীরবে ওঁর চোখ বেয়ে জল গড়িয়ে পড়ল। বললেন, 'রাধামাধবই করেছেন বাবা! সত্য পথে থেকো। সত্যের জয় হবেই!'

শ্রীরবিদাস সাহা রায়

(৫)

রাজা হবুরাম। মন্ত্রী গবুরাম। সর্দ্দার নিধিরাম।

এবার বলছি কেনারামের কাহিনী। কেনারাম আর কেউ নয়—রাজ্যের বুড়ো নাপিত। দেখতে ক্যাবলা ক্যাবলা চেহারা। লম্বা সরু দেহটার ওপর মস্ত বড় বেমানানো তার মাথাটি। হঠাৎ দৈত্য-দানার মাসতুতো ভাই বলে ভুল হয়।

সেদিন সে দাড়ি কামাতে গিয়ে রাজার গাল খানিকটা কেটে ফেলল। রাজা লাফিয়ে উঠলেন। সঙ্গে সঙ্গে কেনারামও।

মন্ত্রী ছুটে এলেন। সর্ব্বনাশ! কি অলুক্ষুণে কাণ্ড!

রাজা হুকুম দিলেন—নাপিতকে বেঁধে ঘোড়াশালে আটকিয়ে রাখ।

কেনারাম হাত জোড় করে বলল—মহারাজ, ক্ষমা করুন। এতদিন ধরে কামাচ্ছি, কই কোন দিন তো এমনটি হয় নি। নিশ্চয়ই আপনার কোন খারাপ সময় আসছে।

রাজা কিন্তু গালের ব্যথাটা ভুলতে পারছিলেন না। তিনি বললেন—সে ভাবনা পরে হবে; কিন্তু তোমাকে ছাড়ছি না। যতদিন গালের ব্যথা না কমবে ততদিন আটক থাকতে হবে।

হবুরামের আদেশে কেনারাম বন্দী হ'ল।

ঘুটঘুটে অন্ধকার ঘোড়াশাল। তার উপর মশার উৎপাত। কেনারাম দিনরাত ছটফট করে।

এদিকে হ'ল কি, রাজার গালে যেখানটায় কেটে গিয়েছিল সেখানে হ'ল ঘা। ঘা বেয়ে রক্ত পড়ে, পুঁজ পড়ে। আর ভ্যান-ভ্যান করে মশা এসে বসে। রাজা ভারী মুস্কিলে পড়লেন। হাত নেড়ে তাড়িয়ে দেন মশাকে। আবার এসে গালে বসে। বস্ তো বস্—একেবারে ঘায়ের উপর। রাজা ভারী বিরক্ত হয়ে যান।

এবার থাপ্পড় বসিয়ে দেন মশাকে। কিন্তু মশা যায় উড়ে—থাপ্পড় লাগে নিজের গালে। রাজা এবার ভীষণ রেগে উঠলেন। আদেশ দিলেন—মশা মারো।

সাজ সাজ রব পড়ে গেল। সেনাপতি এল। কোটাল এল। সৈন্য ছুটে এল শত শত।

মন্ত্রী হুকুম দিলেন—মশা মারো।

সেনাপতি তরবারি তুলল। কোটালও তুলল ঢাল-তরোয়াল। সৈন্যরা বর্শা নিয়ে তৈরী হ'ল। নিধিরামও তার নতুন পাওয়া ঢাল-তরোয়াল নিয়ে একবার ঘরের এদিক আর একবার ঘরের ওদিক ছুটাছুটি করতে লাগল।

ভ্যান করে মশা ওড়ে আর সৈন্যরা বর্শা নিয়ে তাক করে। সেনাপতি, কোটাল তরোয়াল ঘুরাতে সুরু করে দেয়। মশাগুলোও যেন বেয়াড়া হয়ে উঠল এই সব কাণ্ড-কারখানা দেখে, তারাও দল বেঁধে ছুটাছুটি করতে লাগল।

ছোট্ট মশা! তাদের বাড়াবাড়ি এত!

সৈন্যদের রাগও গেল বেড়ে। তারা এবার বর্শা ছুড়তে সুরু করল। কিন্তু মশার গায়ে বর্শা লাগে না। লাগে গিয়ে অন্য সৈন্যদের গায়ে। হৈ-চৈ, কান্না আর চীৎকার।

সে এক ভয়ানক ব্যাপার!

তারপর যখন এই মশার সঙ্গে যুদ্ধ শেষ হ'ল, তখন দেখা গেল মশা একটাও মরে নি। সৈন্য মরেছে পাঁচজন আর ঘায়েল হয়েছে পঞ্চাশ জন!

ওদিকে কেনারাম তখনো ঘোড়াশালে বন্দী। ঘোড়াশালে নোংরা আবর্জ্জনা···মশামাছির আড্ডাখানা। তাদের জ্বালায় কেনারাম ঘুমুতে পারে না। কানের কাছে ভ্যান-ভ্যান······নাকের কাছে প্যান-প্যান······কেনারাম রেগে মেগে চড়-চাপড় মারতে থাকে। গালে লাগে চড়···পিঠে লাগে চড়···দশ, কুড়ি, পঞ্চাশ···মশামাছিও মরে শত শত। মশামাছি মারে আর এক জায়গায় জমিয়ে রাখে।

জমতে জমতে সেখানে হ'ল এক ছোটখাটো পাহাড়—মশামাছির পাহাড়।

এর মধ্যে রাজা একদিন এলেন ঘোড়াশাল দেখতে। মশামাছির পাহাড় দেখে অবাক হয়ে গেলেন।

ঘোড়াশালের রক্ষীকে জিজ্ঞেস করলেন—এটা কি?

রক্ষী বলল—আজ্ঞে এটা কেনারামের কাণ্ড। বসে বসে কাজ নেই—মশামাছি মারে আর জমিয়ে জমিয়ে পাহাড় তৈরী করে।

রাজা দুই চোখ কপালে তুলে বললেন—সর্ব্বনাশ, এত কাণ্ড! আমার সৈন্যরা পারল না একটি মশা মারতে আর একা কেনারাম মেরে ফেলল এক পাহাড় মশা?

রক্ষী বলল—হ্যাঁ মহারাজ!

রাজা বললেন—তা হলে লোকটা নিশ্চয়ই গুণী?

রক্ষীও সায় দিয়ে বলল—হ্যাঁ মহারাজ!

রাজা অমনি কেনারামকে ছেড়ে দেবার হুকুম দিলেন। আর বেচারামের জায়গায় তাকে নিযুক্ত করলেন।

কেনারামও ভারী খুশী। তাকে ক্ষুর-কাঁচি নিয়ে লোকের দোরে দোরে ঘুরতে হবে না। এবার সে একেবারে রাজসভার সরফরাজ।

কেনারাম মনে মনে ভাবল—রাজার গাল কেটেই এই অবস্থা। কান কাটতে পারলে হয়তো মন্ত্রীই হতে পারতুম।

কথাটা ভেবেই কেনারাম দমে গেল। ইস্ কি ভুল করলে সে! এমন পাওনাটা ফস্কে গেল।

আবার সেই সুযোগের আশায় দিন গুণতে লাগল কেনারাম।

(৬)

দিন যায়। রাত যায়।

রাজা হবুরাম সোনার পালঙ্কে ঘুমান, মন্ত্রী গবুরাম ঘুমান রূপার পালঙ্কে।

ভাবনা নেই, চিন্তা নেই। সৈন্যরা দিন-রাত জেগে থাকে, পাহারা দেয়।

গাঁয়ের লোকদের কিন্তু অত সুখ নেই। বন থেকে বাঘ আসে, ভল্লুক আসে, বন-হস্তীও ছুটে আসে মাঝে মাঝে। তারা ভয়ানক উৎপাত করে। গরু-বাছুর ধরে খায়; বাগে পেলে মানুষও খায়।

প্রজারা দলে দলে এসে রাজার কাছে নালিশ জানায়—প্রভু, এর একটা উপায় করতে হবে।

রাজা বললেন—আচ্ছা তোমরা যাও, আমরা বিবেচনা করে দেখি।

প্রজারা চলে গেল।

তিন দিন ধরে বিবেচনা করে স্থির হ'ল—সৈন্যসামন্ত নিয়ে রাজা ও মন্ত্রী নিজেরাই বাঘ-ভালুক মারতে যাবেন বনে। রাজা আর মন্ত্রী থাকবেন হাতীর পিঠে—সৈন্যরা যাবে হেঁটে।

রাজা ভাবলেন—কেনারামকে সঙ্গে নিয়ে যাবেন। যে এত মশা মারতে পারে, সে বাঘ-ভালুক মারবার ফন্দী ভাল জানে নিশ্চয়ই। তাই হুকুম করলেন—কেনারাম, চলো।

কেনারাম ঘাবড়ে গেল। সে লোকের চুল কেটেছে, নখ কেটেছে—কিন্তু বাঘ-ভালুক মারে নি কোনদিন। এ আবার কোন্ ফ্যাসাদ! কিন্তু রাজার হুকুম। মানতেই হবে।

রাজা চললেন, মন্ত্রী চললেন, সঙ্গে চলল কেনারাম। বুক ধড়ফড়···দাঁত কড়মড়···মশা মেরে কেনারাম হয়েছে সরফরাজ···আজ বাঘ মারতে গিয়ে বুঝি তার প্রাণ যায়।

কেনারাম চলেছে আলাদা ঘোড়ায় চড়ে।

এক পা এগোয়, দু' পা পিছোয়। দু'পা এগোয়, তিন পা পিছোয়।

রাজা হাতীর ওপর থেকে ডেকে বলেন—কি কেনারাম, পিছিয়ে পড়ছ কেন? ভয় করছে?

কেনারাম বলে—না মহারাজ, আমি ভয় করব কেন? ঘোড়াটা ভয় করছে, এগোতে চায় না।

—ওঃ তাই নাকি? তা হলে হাতীতে এসো।

রাজা কেনারামকে হাতীতে উঠিয়ে নিলেন। হৈ-হল্লোড় করতে করতে সৈন্যরা এগিয়ে চলল বনের দিকে।

অস্ত্র করে ঝল্‌মল! মাটি কাঁপে টল্‌মল! (চলবে)

কিশোরের স্বাস্থ্য

বিশ্বশ্রী মনতোষ রায়

(আসন ব্যায়ামে গ্রন্থি-পরিচয়)

গত বারে তোমাদের সাধারণ কতকগুলি প্রয়োজনীয় নীতির নির্দ্দেশ দিয়েছি মাত্র, যার থেকে তোমরা উক্ত ব্যায়ামের গ্রহণীয় এবং বর্জ্জনীয় অনুষ্ঠানগুলি নিজের অন্তরে গেঁথে রাখতে পার। এই আসন ব্যায়ামের উপকারিতা বলে তো শেষ করা যায় না। যাই হোক, এবারেও আমি আসন ব্যায়ামের নির্দ্দেশ দেবার আগে আর একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ সরলভাবে তোমাদের বুঝিয়ে দিতে চাই, যাতে আসন ব্যায়ামের প্রতি চূড়ান্ত শ্রদ্ধা ও ভক্তির প্রকাশ পায়। সেই জিনিসটি কি জান? আমাদের শরীরের বিশেষ কতকগুলি গ্রন্থির কথা। দেহ রক্ষার্থে এবং ধ্বংসার্থে এই গ্রন্থিগুলির কর্ম্মতৎপরতার মাত্রা কতটা তা তোমরা জানতে পাবে। ফলে আসন ব্যায়াম যখন শেখাতে সুরু করব, তখন নির্দ্দিষ্ট আসনের নির্দ্দিষ্ট গ্রন্থি ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় তথ্য সম্বন্ধে আর উদাসীন থাকবে না। তাই আজ যা পড়বে এবং শিখবে আজীবন তা কাজে আসবে। অতএব মন দিয়ে পড়ো।

'শরীরম্ ব্যাধি-মন্দিরম্'—কথাটার মানে হ'ল, 'দেহটা একটা ব্যাধি-মন্দির'। জন্ম মৃত্যু যেমন প্রকৃতিগত নির্দ্দেশ—তেমনি এই রক্ত-মাংসে গড়া দেহেও সুস্থতা অসুস্থতা প্রকৃতিগত নির্দ্দেশ।

তবে সৃষ্টিকর্তা আমাদের দেহটাকে কেবলমাত্র ব্যাধির মন্দির করেই ক্ষান্ত হন নি—তার সাথে তোমার আমার প্রত্যেকের দেহের ভেতর ঔষধের এক বিরাট ভাণ্ডার গড়ে রেখেছেন; যাতে দেহ অসুস্থ হ'লে দেহ নিজেই তার মধ্যস্থিত ঔষধের ভাণ্ডার থেকে প্রয়োজনীয় ঔষধের সাহায্যে নিজকে নীরোগ করে তুলতে পারে।

অল্পবিস্তর রোগ-বীজাণু প্রত্যেক প্রাণীর মধ্যেই থাকে, থাকাটা হয়ত বাঞ্ছনীয়ও, কেন জান? নীরোগ বীজাণুগুলি শক্তিশালী এবং ক্রিয়াশীল হবার জন্য যেমন তোমরা আমরা ডাম্বেল বারবেল বা যোগ ব্যায়ামের সাথে লড়াই করে, মানে তাদেরকে নিজের আয়ত্তে এনে হই পালোয়ান, এরাও তেমনি—রোগ আর নীরোগ বীজাণুদের সঙ্ঘবদ্ধ লড়াইএ নীরোগ বীজাণুগুলি শক্তিশালী এবং কর্ম্মতৎপর হয়ে উঠবার বিশেষ সুযোগ পায়। আবার দেখ, ভুল প্রথায় ব্যায়াম করলে বা অমনোযোগী হয়ে ব্যায়াম করলে—শরীর ভালর জায়গায় নিশ্চয় খারাপ হবে; ঠিক তেমনি যদি নীরোগ বীজাণুগুলিকে রোগ-বীজাণুর সাথে প্রকৃতির নির্দ্দেশমত লড়াই না করানো হয়, তখন বাধ্য হয়েই অক্লেশে রোগ-বীজাণুগুলি আমাদের দেহের ভেতর প্রভাব বিস্তার করে এবং রোগ প্রকাশ পায়। বেশীর ভাগ সময়ই হঠাৎ রোগটি প্রকাশ না হয়ে আগে রোগের লক্ষণ দেখা দেয়, তবুও যদি এই আরাধ্য দেহের প্রতি মানুষের হুঁসিয়ার ভাব জাগে। যখন প্রকৃতির এই হুঁসিয়ারীকেও মানুষ অবহেলা করে, তখন তার শাস্তি স্বরূপ প্রাপ্ত হয় রোগ।

কিশোর জীবনটাই হ'ল জগতের সর্ব্বপ্রকার ধর্ম্মকর্ম্মের ভিত্তি-ভূমি; আর স্বাস্থ্যরক্ষা আর দেহ সবল করা—এই দুটো হ'ল ঐ কিশোরের অন্যতম ধর্ম্ম বা কর্ম্ম। তাই শরীরটাকে চেন, ওকে ভালবাসতে শেখ।

দেহের সর্ব্বস্ব রক্ত, মাংস, অস্থিতেই সীমাবদ্ধ নয়, এদের যে পরিচালনা করে তারই বাহাদুরী বেশী—তাই নয় কি? সেই যে পরিচালক তাকেই বলা হয় গ্রন্থি এবং শিরা। আমাদের শরীরের প্রতিটি অঙ্গের পরিপুষ্টির জন্য যতটুকু রসের প্রয়োজন, তার চাহিদা পূরণ করাই হ'ল শিরা এবং গ্রন্থির প্রধান কাজ।

যেমন ধর—তোমার বাড়ীতে ফুলের গাছ আছে তো? ফুলের গাছটাকে বাঁচাতে তুমি কি কর—মাথায় জল দাও না গোড়ায় জল ঢাল? গোড়ায় জল পেলে প্রয়োজনীয় রস শেকড় দ্বারা কাণ্ডে যায়, তার থেকে পাতায় প্রয়োজনমত রস গিয়ে গাছটিকে বেশ হৃষ্টপুষ্ট করে তোলে এবং চমৎকার ফলফুলের সৃষ্টি হয়। চিন্তা করে দেখো সত্যি নয় কি?

ঠিক সে রকম আমাদের এই দেহটি। এই দেহ-গাছটির শেকড় এবং কৈশিক শেকড় (গ্রন্থি ও শিরা-উপশিরা) গুলি যদি উপযুক্ত খাদ্য না পায়, বা খাদ্য সরবরাহ করার কোন ব্যবস্থাই না হয় তো দেহ-গাছটির শাখা-প্রশাখা কেমন করে মজবুত হবে? শুধু কি তাই? গাছপালা মাত্রেরই আশে পাশে কত পোকা-মাকড় আসে; কিন্তু সেই পোকা-মাকড় গাছের সর্ব্বনাশ কেন করতে

পারে না জান? তার যে জীবনী শক্তি মজুত রয়েছে তার জোরের সঙ্গে ঐ পোকা-মাকড় যুঝে হার মেনে যায়।

আমাদের দেহও ঠিক তেমনি; সাধারণ রোগ-শোক দেহকে টলাতে পারে না যদি দেহে প্রচুর পরিমাণে জীবনী শক্তি মজুত থাকে।

একটি নিছক সত্য দৃষ্টান্ত দিচ্ছি এই আসন ব্যায়ামের উপকারিতার। আমাদের শ্রীঅরবিন্দের মৃত্যুর পর সাতদিন পর্য্যন্ত দেহ অবিকৃত ছিল। অধুনা প্রকাশ স্বামী যোগানন্দ আমেরিকায় দেহ রেখেছেন। আমার গুরুদেব যোগাচার্য্য বিষ্ণুচরণ ঘোষের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ইনি। তাঁরও মৃত্যুর পর ২০ দিন পর্য্যন্ত দেহ অবিকৃত ছিল এবং আমেরিকাবাসীরা বলেছেন, তাদের জীবনে এরূপ অপূর্ব্ব অবস্থা দেখেন নি। এ নিয়ে বহু বৈজ্ঞানিক গবেষণা চলছে। এ কেমন করে হ'ল?

খুব ছোট করে তোমাদের এবার গ্রন্থির সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিই। গ্রন্থি দু রকম—একটা নলওয়ালা, অপরটি হ'ল নলবিহীন। এই গ্রন্থির কাজ হ'ল রস প্রস্তুত করা। কাজেই আমাদের শরীরে প্রধানতঃ যে নয়টি গ্রন্থি আছে, তার প্রত্যেকটির মধ্যে নিজস্ব শক্তির রস নিঃসৃত হয়। এই নয়টি গ্রন্থির উপকার কিন্তু এক রকম নয়; কারও তৎপরতায় শরীর বাড়তে থাকে, কারও উত্তেজিত অবস্থায় শরীর অস্বাভাবিক বৃদ্ধি পায়, কেউ বুদ্ধিবৃত্তি বজায় রাখে, কেউ বা ছেলেমেয়েদের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য বজায় রাখতে সাহায্য করে, কারও দুর্ব্বলতায় টনসিল বাড়ে বা ভয়ানক রোগা হয়, কেউ মোটা হয়ে যায়; এরকম আরও কত কি! বড় হলে সব জানতে পারবে।

নামগুলি কি রকম অদ্ভুত দেখো—

ইংরেজী নাম:	থাকে কোথায়:
থাইরয়েড (Thyroid)	গলার সামনে এবং ঠিক কণ্ঠার নিচে।
প্যারা থাইরয়েড (Para Thyroid)	থাইরয়েডের ঠিক পিছন দিকে।
পিটুইটারি (Pituitary)	করোটীর (Skull) হাড়টির মাঝখানের ঠিক গর্ত্তের মধ্যে এবং মাথার তলে।
পিনিয়াল্ (Pineol)	মাথার মধ্যে।
থাইমাস্ (Thymus)	বুকের গর্ত্তের মধ্যে উরঃফলকের ঠিক পিছন দিকে এবং বুকের নিচেকার চারটি হাড়ের স্থান পর্য্যন্ত।
প্যানক্রিয়াস্ (Pancreas)	পেটের ভেতরে।

এইরূপ আরও কয়েকটি আছে। যেগুলির কথা বললাম তাদের নাম আর শরীরের কোথায় কোথায় থাকে আপাততঃ মনে রাখ; ক্রমশঃ এদের এবং অপরগুলির পরিচয় জানতে পাবে। তবে

এগুলি মুখস্থ থাকলে আসন ব্যায়ামগুলি অভ্যাসকালীন যখন তাদের সম্বন্ধে নানা রকম আলোচনা করব তখন খুব সাহায্য করবে, মানে বুঝতে সহজ হবে।

ডাক্তাররা আমাদের রোগ নিবারণের ঔষধ দেন। জিজ্ঞেস করে দেখো, অনেক ঔষধই জীব-জন্তুর গ্রন্থির রস দ্বারা তৈরী; অবশ্য তার মধ্যে আরও অনেক সব রাসায়নিক পদার্থ মিশান থাকে। আর এমনও সব ডাক্তার আছেন যাঁরা শুধু গ্রন্থির নিঃসৃত রস ঔষধরূপে প্রয়োগ করেন এবং এই চিকিৎসার নাম দিয়েছেন 'অর্গ্যানোথেরাপি' (Organotherapy), আর বাংলায় তার নাম দিয়েছেন 'অন্তঃরস চিকিৎসা'।

মনীষী মোহিতলাল

শ্রীভুবনেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়

গত ৩রা শ্রাবণ (ইং ১৯শে জুলাই) বাঙ্গালীর এবং বাঙলা সাহিত্যের এক অপূরণীয় ক্ষতির দিন। বাঙ্গালার অন্যতম শ্রেষ্ঠ মনীষী, কবি এবং সমালোচক মোহিতলালের শেষশয্যা রচনা হয়েছে ঐদিন কবিগুরুর চিতাপার্শ্বে। শ্রাবণের ঝরঝর বরিষণের মধ্যে এতদিন রবীন্দ্রনাথকে হারানোর হাহাকার ব্যক্ত হ'ত আমাদের; এবার তাঁর স্মৃতির সঙ্গে সঙ্গে কবি মোহিতলালকেও মনে পড়বে সকলের।

মোহিতলালের পিতৃভূমি হুগলী জেলার জিরাট বলাগড়ে। তাঁর মামারা থাকতেন কাঁচড়াপাড়ায়। সুপ্রসিদ্ধ কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ছিলেন মামাদের সম্পর্কে মোহিতলালের আত্মীয়। কবি দেবেন্দ্র সেনও পিতার সম্পর্কে মোহিতলালের আত্মীয় ছিলেন। মোহিতলালের বংশের ধারার মধ্যে এইভাবে সাহিত্য-সাধকের বীজ লুকিয়েছিল। ছোটবেলা থেকেই তিনি কবিতা লেখা এবং সাহিত্য সাধনা সুরু করেন। স্কুলের গণ্ডি কাটিয়ে ক্রমে তিনি বি. এ. পাস করে স্কুলের শিক্ষক হিসাবে তাঁর কর্ম্মজীবন সুরু করেন। মেট্রোপলিটন্ স্কুল, তালতলা স্কুল প্রভৃতি কয়েকটি স্কুলে শিক্ষকতা করার পর তিনি ঢাকায় চলে যান। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁর মনীষা এবং প্রতিভার পরিচয় পেয়ে তাঁকে সেখানকার অধ্যাপক হিসাবে নিযুক্ত করেন। বারো-তেরো বছর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করার পর অবসর গ্রহণ করে তিনি কলিকাতার কাছাকাছি বেহালা, কোন্নগর প্রভৃতি জায়গায় এসে বসবাস করতে সুরু করেন। শেষের দিকে আচার্য্য গিরিশচন্দ্র সংস্কৃতি ভবনের পোষ্ট গ্রেজুয়েট বিভাগের অধ্যাপক হিসাবে তিনি নিযুক্ত ছিলেন। মৃত্যুর কয়েক মাস আগে কলিকাতা বেতারকেন্দ্র থেকে তাঁর বক্তৃতা এবং আবৃত্তি শোনা গিয়েছিল কয়েকবার।

রবীন্দ্রনাথকে ঘিরে যখন সত্যেন দত্ত, যতীন বাগচী, মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়, প্রভাত

মুখোপাধ্যায়, করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি কয়েকজন বিশিষ্ট কবি এবং সাহিত্যিক সাহিত্য সাধনায় মগ্ন ছিলেন, মোহিতলালের তখন অল্প বয়স। তিনি সেই অল্পবয়সেই যোগ দিয়েছিলেন দলটিতে এবং পর পর স্বপনপসারী, বিস্মরণী, স্মরগরল, হেমন্ত গোধূলী প্রভৃতি কবিতার বই রচনা করে সাহিত্যজগতে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন। এছাড়া বিদেশী সাহিত্যের অনুবাদও বহু করে গেছেন তিনি। পরে কিন্তু সবিশেষ খ্যাতি লাভ করেন তিনি তাঁর নির্ভীক সুন্দর সমালোচনা সাহিত্যের জন্যে। মধুসূদন, বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ এবং অন্যান্য বহু কবি ও সাহিত্যিকের বিভিন্ন পুস্তকের ওপর সমালোচনার বই রয়েছে তাঁর। বইগুলির মধ্যে বঙ্কিমবরণ, শ্রীমধুসূদন, আধুনিক সাহিত্য, সাহিত্যকথা প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। প্রবন্ধের বইগুলির মধ্যে বাংলার নবযুগ, বাঙ্গলা ও বাঙ্গালী প্রভৃতির নাম করা যেতে পারে। মোহিতলাল বঙ্কিমচন্দ্রের বঙ্গদর্শন পত্রিকাটির পুনঃ প্রকাশের চেষ্টা করেছিলেন এবং সম্প্রতি বঙ্গভারতী মাসিক পত্রিকার সম্পাদনার ভার নিয়েছিলেন।

ব্যক্তিগত জীবনে তিনি ছিলেন নির্ভীক এবং স্পষ্টবক্তা। অপ্রিয় সত্যকথা নিঃসংকোচে সকলের উদ্দেশ্যে বলতেন বলে তাঁর অন্তরঙ্গের সংখ্যা নিতান্তই কম ছিল। মানুষ মোহিতলাল কিন্তু কবি বা সমালোচক মোহিতলালের চেয়ে কম আকর্ষণীয় ছিলেন না। দূর থেকে তাঁর কথা শুনে এবং তাঁর লেখা পড়ে বা বক্তৃতা শুনে অনেকেরই ভুল ধারণা জন্মাত তাঁর সম্বন্ধে। সমালোচনা যখনই কিছুর করতেন, তখনই তিনি হয়ে যেতেন বজ্রের মত কঠোর। নির্ভীক ভাবে তাঁর মত ভালমন্দ বিচার করার ক্ষমতা বর্ত্তমানে আর কারও আছে কিনা সন্দেহ। মোহিতলালের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বহু কৃতী ছাত্রের মুখ থেকে তাঁর মধুর ব্যবহার এবং আন্তরিকতার কথা শুনেছি। তাঁর গুণমুগ্ধ যে কোন লোক যখনই তাঁর বাড়ীতে গেছেন, তিনি সব কাজ ফেলে তাঁর সঙ্গে প্রাণ খুলে গল্প করেছেন, কবিতা পাঠ কিংবা তাঁর নিজের লেখা পাঠ করেছেন, এবং অনেক সময় বাংলার মনীষীদের জীবনী আলোচনা করে প্রায় অর্দ্ধেক রাত কাটিয়ে দিয়েছেন। সম্প্রতি কলিকাতার যেখানে অধ্যাপনা করতেন তিনি, সেখানকার ছাত্র আমি একজন। তাঁর সংস্পর্শে এসে তাঁর বক্তৃতা শুনে তাঁকে অদ্ভুত প্রতিভাসম্পন্ন লোক বলেই মনে হয়েছে। তাঁর কণ্ঠে মধুসূদনের, রবীন্দ্রনাথের কিংবা তাঁর নিজের লেখা কবিতার আবৃত্তি যেই শুনেছে সে-ই পুলক বিস্ময়ে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছে। তাঁর সেই উদাত্ত গম্ভীর কণ্ঠস্বর চিরদিনের মত নীরব হয়ে গেল!

জীবনের শেষদিকে বাঙ্গালীর ওপর ভয়ানক অভিমান হয়েছিল মোহিতলালের। তিনি আক্ষেপ করে অধ্যাপনার ফাঁকে ফাঁকে প্রায়ই আমাদের উদ্দেশ্য করে বলতেন, 'তোমরা মধুসূদন, ঈশ্বরচন্দ্র, বঙ্কিমচন্দ্র, বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ—এঁদের বংশধর—এ যেন আমার বিশ্বাস হয় না।···আজ আমার বাংলার রাস্তায় দাঁড়িয়ে চিৎকার করে কাঁদতে ইচ্ছা করে!—ঈশ্বরচন্দ্র, বঙ্কিমচন্দ্র, বিবেকানন্দ, রবীন্দ্র-নাথ, প্রফুল্লচন্দ্রের সোনার বাংলাদেশ পুড়ে শ্মশান হয়ে যাচ্ছে, বাঙ্গালীর এখনও চৈতন্য হচ্ছে না!'

বাঙ্গালীর চৈতন্য সঞ্চারের জন্যে একদিন আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র যেমন তিরস্কার করতেন বাঙ্গালীকে,

কবি মোহিতলালের মধ্যেও তাঁর শেষ জীবনে আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রের সেই বাণীর প্রতিধ্বনি শুনতে পেয়েছিলুম আমরা।—শুনতে পেয়েছিলুম ঠিকই, কিন্তু গ্রাহ্য করি নি কেউ।—বাঙ্গালীকে গভীরভাবে ভালবাসতেন প্রফুল্লচন্দ্র এবং মোহিতলাল দুজনেই, তাই শাসনের বাণী তাঁদের মুখে যোগ্যতম বাণী ছিল—এটা আমাদের অনেকেই ভুলে যান বা গিয়েছেন। মোহিতলালের শেষের দিকের বইগুলির মধ্যে 'বাঙ্গলা ও বাঙ্গালী' বইখানির মধ্যেই বাঙ্গালীর চৈতন্য সঞ্চারের চেষ্টা করেছেন তিনি। বাংলাদেশ, বাঙ্গালী জাতি এবং বাংলা সাহিত্য পৃথিবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করুক—এইটাই ছিল মোহিতলালের জীবনের একমাত্র স্বপ্ন।

মোহিতলাল গোড়ার দিকে 'সত্যসুন্দর দাস' এই ছদ্মনামে লিখতেন কয়েকটি কাগজে। বর্ত্তমানকালের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় একটা খুব সুন্দর কথা বলেছেন এই প্রসংগে। তিনি বলেছেন, 'সত্যসুন্দর' নামটি সার্থক হয়েছিল মোহিতলালের জীবনে।' তিনি সত্য এবং সুন্দরের উপাসনাই করেছেন সারা জীবন ধরে।

মোহিতলালের চিরদিনের আক্ষেপ এবং অভিমান ছিল যে, তাঁর কবিতা বা সমালোচনার পাঠক খুব অল্প, তাঁকে কেউ চিনলে না, তাঁর কথা কেউ কানে নিলে না। জীবিত অবস্থায় এক রবীন্দ্রনাথ ছাড়া যোগ্য সম্মান খুব কম লোকই পেয়েছেন এদেশে। মধুসূদন দত্তের কাব্যের যোগ্য আদর হয় নি মধুসূদনের যুগে, এ যুগে সে কাব্যের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করছে সকলে একবাক্যে। কবি মোহিতলাল আজ যোগ্য সমাদর না পেলেও আগামী যুগ মোহিতলালের প্রতিভাকে অস্বীকার করবে না—এ কথা আমরা জোর করেই বলতে পারি। আজকের যে শোক মোহিতলালের জন্মে সেটা মাত্র কয়েকজনের অন্তরই স্পর্শ করতে সক্ষম হয়েছে, সমগ্র বাঙ্গালী জাতির প্রায়শ্চিত্ত সুরু হবে সেইদিন—যেদিন দেশের অধিকাংশ লোক চিনবে মোহিতলালকে, তাঁর সাহিত্যকে এবং তাঁর প্রতিভাকে। সেদিন যত শীগ্‌গির আসে দেশের ততই মঙ্গল।

খেলাধূলা

—অষ্টাবক্র—

ইউরোপের স্ক্যাণ্ডিনেভিয়া উপদ্বীপের মধ্যে নরওয়ে সুইডেনের পাশে যে দেশ তার নাম ফিনল্যাণ্ড। ফিনল্যাণ্ডের উত্তরাংশ উত্তর মেরুর মধ্যে বলে এখানে মধ্যরাত্রে সূর্য্য দেখা যায়। ফিনল্যাণ্ডকে তাই নিশীথ সূর্য্যের দেশ বলা হয়। ফিনল্যাণ্ডের হেলসিঙ্কি সহরে পঞ্চদশ বিশ্ব অলিম্পিক প্রতিযোগিতার সমাপ্তি হ'ল সবে মাত্র। অলিম্পিকের বিরাট ষ্টেডিয়ামে বসে দেশ-বিদেশের সত্তর হাজার দর্শক বিমুগ্ধ নেত্রে প্রতিযোগীদের নৈপুণ্য দেখে উৎফুল্ল হয়েছেন। এই অলিম্পিকে

যে ভাবে রেকর্ড ভঙ্গ হয়েছে, তাতে একে রেকর্ড ভাঙা অলিম্পিক বলা চলে। বিভিন্ন বিভাগে প্রতিযোগীরা দেড় শতাধিক রেকর্ড ভঙ্গ করে বুঝিয়ে দিয়েছেন যে, প্রতিদিন ক্রীড়ামানের উন্নতি সাধিত হচ্ছে। প্রতিযোগিতার স্থান দখল করতে হলে কঠোর অনুশীলন ও সাধনা দ্বারা প্রস্তুত না হলে কারও পক্ষে আর তা সম্ভব হবে না।

হেলসিঙ্কি অলিম্পিক প্রতিযোগী দেশের সংখ্যাতেও রেকর্ড করেছে। ১৯৪৮ সালে লণ্ডন অলিম্পিকে ৫৯টি দেশ যোগ দিয়েছিল, এবার ৬৯টি দেশ যোগ দিয়েছে এবং মোট প্রতিযোগীর সংখ্যা সাত হাজার। প্রতিযোগিতার বেসরকারী হিসেবে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র ৬১৫ পয়েণ্ট পেয়ে শীর্ষস্থান, রাশিয়া ৫৪১· পয়েণ্ট পেয়ে দ্বিতীয় ও হাঙ্গেরী ৩০৫ পয়েণ্ট পেয়ে তৃতীয় স্থান দখল করেছে। ভারত মোট ১৭৷৩৫ পয়েণ্ট পেয়েছে। পাকিস্থান প্রভৃতি ২১টি দেশ একটিও পয়েণ্ট পায় নি। আমেরিকা দৌড় ঝাঁপ প্রভৃতি দ্রুততার বিষয়গুলিতে এবং রাশিয়া জিমন্যাষ্টিক প্রভৃতি শক্তিমত্তার বিষয়গুলিতে আবার সকল দেশকে টেক্কা দিয়েছে। ফুটবল ও ওয়াটার পোলোতে হাঙ্গেরী ও যুগোশ্লোভিয়ার মধ্যে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতায় হাঙ্গেরী উভয় বিষয়েই প্রথম ও যুগোশ্লোভিয়া দ্বিতীয় হয়েছে।

মেডেলের সংখ্যার হিসেবে দেখা যায়, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র চল্লিশটি সোনার মেডেল, আঠারটি রূপোর মেডেল ও সতেরটি ব্রোঞ্জ মেডেল পেয়েছে। রাশিয়া বাইশটি সোনার, ত্রিশটি রূপোর ও পনেরোটি ব্রোঞ্জ মেডেল পেয়েছে। হাঙ্গেরী ষোলটি সোনার, দশটি রূপোর ও পনেরোটি ব্রোঞ্জ মেডেল পেয়েছে। ভারত পেয়েছে একটি সোনার ও একটি ব্রোঞ্জের মেডেল।

অলিম্পিকে এবার যত কিছু রেকর্ডকে ছাপিয়ে একটি লোকের কৃতিত্ব সকলকে বিস্ময়-বিমুগ্ধ করেছে। এই লোকটি চেকোশ্লোভাকিয়ার এমিল জ্যাটোপেক। তিনি অলিম্পিকে দূর পাল্লার তিনটি দৌড়েই—ম্যারাথন (২৬ মাইল ৩৮৫ গজ), দশ হাজার মিটার ও পাঁচ হাজার মিটার রেসে বিজয়ী হয়ে অবিনশ্বর কীর্ত্তি স্থাপন করেছেন। এ পর্য্যন্ত কোন দৌড়-বীরই একই অলিম্পিকে এই তিনটি দৌড়ে প্রথম স্থান অধিকার করতে পারেন নি। শুধু তাই নয়, তিনি দু ঘণ্টা তেইশ মিনিট ৩·২ সেকেণ্ডে ম্যারাথনের নির্দ্দিষ্ট দূরত্ব অতিক্রম করে বিশ্বে রেকর্ড স্থাপন করেছেন।

বিশ্ব অলিম্পিকে ভারত অন্যান্য বারের তুলনায় এবার ভাল ফল দেখিয়েছে। ভারতের হকি দল এবারও বিশ্ব-বিজয়ী আখ্যা অর্জ্জন করে বিশ্বের বিস্ময় উৎপাদন করেছে। হেলসিঙ্কি অলিম্পিকে জয় লাভের ফলে ভারত বারবার পাঁচটি অলিম্পিকে বিশ্ব-বিজয়ী হয়েছে। বিশ্বের অপর কোন দেশের পক্ষে কোন বিভাগেই একাদিক্রমে ২৫ বৎসর কাল একাধিপত্য করা সম্ভব হয়নি। আমষ্টারডম, লস-এঞ্জেলেস, বার্লিন আর লণ্ডনের পর হেলসিঙ্কি অলিম্পিক মণ্ডপে যখন ভারতের জাতীয় সঙ্গীত বেজে ওঠে তখন ভারতের প্রতিনিধি ক্রাড়ামোদীর বুক নিশ্চয়ই গর্ব্বে ফুলে উঠেছিল। ভারত এবার অষ্ট্রিয়াকে ৪-০ গোলে, বৃটেনকে ৩-১ গোলে পরাজিত করে ফাইন্যালে হল্যাণ্ডকে ৬-১ গোলে পরাজিত করে চ্যাম্পিয়ানশিপ অর্জ্জন করেছে। ফাইন্যালের দিন বলদেব সিং একাই পাঁচটি এবং

অধিনায়ক বাবু (দিগ্বিজয় সিং) একটি গোল করে দিগ্বিজয় সম্পন্ন করেন। পাকিস্থান সেমি-ফাইন্যালে হল্যাণ্ডের কাছে পরাজিত হয়ে তৃতীয় স্থান দখলের প্রতিযোগিতায় বৃটেনের কাছে হেরে যায়। এ বছর তৃতীয় স্থান দখল করে বৃটেন।

হকিতে সোনার মেডেলের সঙ্গে এবারকার অলিম্পিকে ভারত আর একখানা মেডেল নিতে পেরেছে কুস্তিগীর কে. ডি. যাদবের মারফতে। যাদব ফ্রি ষ্টাইল কুস্তিতে তৃতীয় স্থান অধিকার করে এই মেডেল পেয়েছেন।– ভারতীয় প্রতিযোগীদের মধ্যে যাদবই ব্যক্তিগতভাবে প্রথম মেডেল জয়ের গৌরবের অধিকারী হয়েছেন।

দৌড়-বীর লেভিপিণ্টো একশত মিটার ও দুইশত মিটার দৌড়ে এবং মোহন সিং আটশত মিটার দৌড়ে কোন স্থান অধিকার করতে না পারলেও বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়ে সকলের প্রশংসাভাজন হন। ম্যারাথন রেসে সুরযসিং সমগ্র পথটি অতিক্রম করে নৈপুণ্য প্রদর্শন করেন।

হকিতে ভারত বিশ্বজয়ী হলেও ফুটবলে ভারত শোচনীয় ব্যর্থতার পরিচয় দেয় এবং প্রথম খেলাতেই যুগোশ্লোভিয়ার নিকট ১০-১ গোলে পরাজিত হয়ে বিদায় নিতে বাধ্য হয়। স্থলের এই ব্যর্থতার সাথে জলের ব্যর্থতা ভারতের ক্রীড়ামোদীদের লজ্জায় অধোবদন করেছে। ওয়াটার পোলোতে ভারত ইতালীর কাছে ১৬-১ গোলে এবং রাশিয়ার কাছে ১২ গোলে হেরেছে।

ফুটবল খেলাতে ভারতের মান যখন এত নিম্নস্তরের, তখন টাকাপয়সা খরচ করে অলিম্পিকে পাঠানোর কোন সার্থকতা আছে বলে আমরা মনে করি না।

তৃতীয় টেষ্ট ম্যাচে ভারতের শোচনীয় অবস্থা—প্রথম দুটো টেষ্ট ম্যাচ হারার পর ভারতের ক্রীড়ামোদীদের কেউ কেউ যখন তৃতীয় টেষ্ট ম্যাচে ভারতীয় দলের জয়লাভ সম্পর্কে ক্ষীণ আশা পোষণ করছিল, ভারতীয় দল তখন তৃতীয় টেষ্টে ইংলণ্ডের নিকট এক ইনিংস ও ২০৭ রাণে পরাজিত হয়ে তাদের সে আশা চূর্ণ করার সঙ্গে সঙ্গে ভারতের মাথা হেঁট করে দিয়েছে। খেলাতে জয় পরাজয় আছেই, কাজেই তাতে মাথা হেঁট করবার কোন প্রশ্ন ওঠে না। কিন্তু বিদেশে প্রতিনিধিমূলক খেলাতে যদি খেলোয়াড়রা কাঁপতে কাঁপতে ফিরে আসে, তা'হলে তার চেয়ে লজ্জার কি আছে! তৃতীয় টেষ্ট ম্যাচে ভারতের খেলোয়াড়রা ইংলণ্ডের ফাষ্ট বোলিংয়ের বিরুদ্ধে খেলতেই পারেন নি এবং দু'-একজন ছাড়া বাকী খেলোয়াড়রা এমন ভয়ে ভয়ে খেলেছেন যে, অপর কোন দেশ হলে এই সকল খেলোয়াড়ের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা হ'ত।

তৃতীয় টেষ্টে টসে জয়লাভ করেন ইংলণ্ডের অধিনায়ক বাটন এবং ভিজে মাঠে প্রথম ইনিংসে ৯ উইকেটে ৩৪৭ রাণ করে দান ছেড়ে দেন। এর উত্তরে ভারতের খেলোয়াড়রা প্রথম ইনিংসে ৫৮ রাণে এবং ফলো অন করে দ্বিতীয় ইনিংসে ৮২ রাণে আউট হয়ে যান। একমাত্র হাজারে ছাড়া আর কোন ব্যাটসম্যান ফাষ্ট বোলার ট্রুম্যানের বলে খেলতেই পারেন নি। ফলে ভারতকে এক ইনিংস ও ২০৭ রাণে পরাজয় বরণে বাধ্য হতে হয়

ইষ্টবেঙ্গলের লীগ বিজয় সুনিশ্চিত—কলকাতায় ফুটবল লীগের খেলাগুলি শেষ হয়ে এল। দ্বিতীয় ও তৃতীয় ডিভিসন লীগে বর্ত্তমান বছরের চ্যাম্পিয়ান স্থির হয়ে গেছে এবং প্রথম ডিভিসনেও ইষ্টবেঙ্গলের চ্যাম্পিয়ানশিপ সুনিশ্চিত হয়ে গেছে। তৃতীয় ডিভিসনে এবার চ্যাম্পিয়ান হয়েছে জোড়াবাগান এবং দ্বিতীয় ডিভিসনে চ্যাম্পিয়ান হয়েছে খিদিরপুর। ইষ্টবেঙ্গল ২৫টি খেলে ৩৮ পয়েন্ট পেয়েছে। এখন বাকী খেলাটিতে একটি পয়েন্ট পেলেই তারা চ্যাম্পিয়ান হয়ে যাবে।

এবার রাণার্স আপ হবে ভবানীপুর। তারা ২৪টি খেলে পেয়েছে ৩৪ পয়েন্ট। কাজেই বাকী দুটো খেলাতে জিতলেও তারা ইষ্টবেঙ্গলকে ধরতে পারবে না। গত বৎসরের লীগ-চ্যাম্পিয়ান মোহনবাগান দল এবার কোথায় তলিয়ে গেছে।

লীগ তালিকার তলার দিকে উয়াড়ী, স্পোর্টিং ইউনিয়ান ও পুলিস প্রথম ডিভিসনে টিকে থাকার দ্বন্দ্বে ব্যতিব্যস্ত। এই তিন দলের অবস্থাই প্রায় সমান। তবে পুলিসের অবস্থা তারই মধ্যে অপেক্ষাকৃত খারাপ বলে মনে হয়।

নিম্নে ৭ই আগষ্ট পর্য্যন্ত খেলার ফলাফলের তালিকা দেওয়া হ'ল:—

	খেলা	জিত	ড্র	হার	গোল দিয়েছে	গোল খেয়েছে	পয়েন্ট
ইষ্টবেঙ্গল	২৫	১৬	৬	৩	৩০	৫	৩৮
ভবানীপুর	২৪	১৪	৬	৪	৩৪	১৫	৩৪
রাজস্থান	২৫	১১	৮	৬	২৩	১৭	৩০
এরিয়ান্স	২৪	৯	৯	৬	২০	১২	২৭
বি. এন. আর	২৫	১০	৬	৯	৩০	২৯	২৬
কালীঘাট	২৩	৮	৯	৬	১৩	১৮	২৫
মহঃ স্পোর্টিং	২৪	৮	৯	৭	১৯	১১	২৫
মোহনবাগান	২৫	৮	৯	৮	২৩	১৩	২৫
জর্জ টেলিগ্রাফ	২৬	৫	১৪	৭	১৩	১৭	২৪
ই. আই. আর	২৩	৯	৬	৮	২৪	১৮	২৪
উয়াড়ী	২৪	৭	৬	১১	১৭	২০	২০
স্পোর্টিং ইউনিয়ান	২৪	৪	১২	৮	১৫	২১	২০
পুলিস	২২	৫	৮	৯	১৯	১৬	১৮
ক্যালঃ গ্যারিসন	২৬	০	৪	২২	৫	২৩	৪

সম্পাদক—শ্রীআশুতোষ ধর
৫নং বঙ্কিম চাটার্জ্জি ষ্ট্রীট, কলিকাতা, শ্রীনারসিংহ প্রেস হইতে
শ্রীপরেশনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

ডিরেক্টর বাহাদুর কর্তৃক সমগ্র বঙ্গের বিদ্যালয়সমূহের লাইব্রেরীর জন্য অনুমোদিত

প্রতিষ্ঠিত—বাং ১৩২৯ সাল ; ইং ১৯২২ সন

৩১শ বর্ষ
৫ম সংখ্যা

শিশু সাথী

ভাদ্র,
১৩৫৯

বার্ষিক মূল্য ৪৲ টাকা] [প্রতি সংখ্যা ।৵০ আনা

সূচী

সূচী

নিম টুথ পেষ্ট
মায়ের পরামর্শে ছেলেমেয়েরা ছোটবেলা থেকেই ক্যাল-কাটা কেমিক্যালের নিম টুথ পেষ্ট দিয়ে দাঁত মাজে, কারণ, তারা জানে যে এই টুথ পেষ্টই তাদের দাঁত ও মাড়ীর পক্ষে সব চেয়ে উপকারী
Neem TOOTH PASTE
Neem TOOTH-PASTE
ক্যালকাটা কেমিক্যাল

ফুটবল ব্লাডার সহ	৫নং	৪নং	৩নং
ডিলুকস্ "T"	২৭৲	২২৲	১৮৲
ডুরেকস্ "T"	২৪৲	২১৲	১৭৲
আর্ম্মী ম্যাচ (মেগ্রিগর)	২২৲	১৯৲	১৭৲
স্পেশাল সারভিস	২০৲	১৮৲	১৫৲
আর, এ, এফ "T"	১৮৷৷০	১৬৲	১৪৲

ফুটবল ব্লাডার সহ	৫নং	৪নং	৩নং
অল ইণ্ডিয়া "T"	১৫৷৷০	১৩৲	১১৷৷০
লীগ উইনার (১২ প্যানেল)	১৩৷৷০	১১৷৷০	৯৷৷০
চ্যালেঞ্জ " "	১৩৲	১১৲	৯৲

ফুটবল বুট (প্রতি জোড়া)

উৎকৃষ্ট ১৮৲ মধ্যম ১৬৲ সাধারণ ১৪৲

ফুটবল মোজা

উৎকৃষ্ট (পা কাটা) ১৸০ ঐ পা সহ ২৲

উলের " ৪৷৷০ " ৫৲

ফুটবল ব্লাডার

	৫নং	৪নং	৩নং	২নং	১নং
উৎকৃষ্ট	২৲	১৸৵০	১৸০	১৷৷৵০	১৷৷০
সাধারণ	১৸৵০	১৸০	১৷৷৵০	১৷৷০	১।৵০

ভলিবল ব্লাডার সহ

উৎকৃষ্ট ১৬৲ ১৪৲ ১২৲ ১০৲ ও ৮৲

ভলিবল নেট ৫৲ ৬৲ ৭৲ ৮৲ ও ১০৲

ছোটদের ফুটবল ব্লাডার সহ
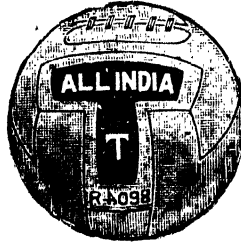
	২নং	১নং
লীগ উইনার	৬৲	৫৷৷০
চ্যালেঞ্জ	৫৲	৪৷৷০
উইনার	৪৷৷০	৪৲
প্রাকটিস	৪৲	৩৷৷০

ইনফ্লেটর বা হাওয়া দেবার যন্ত্র

	ছোট	মাঝারি	বড়
উৎকৃষ্ট (পিতলের)	৩৲	৪৷৷০	৬৲
নিকেল বা কাল	২৲	৩৲	৪৲

ঘোষ এণ্ড কোম্পানী

টেলিগ্রাম—খেলাঘর ৯বি, রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৯ টেলিফোন বি.বি. ৫৬০৭

ক্যাপ্টেন ম্যারিয়াটের

মাস্টারম্যান রেডি ১৲

এ্যালেকজাণ্ডার ডুমা'র

দি ব্ল্যাক টিউলিপ ১৷৷০

হেমেন্দ্রকুমার রায়ের

ঝুণু-টুনুর এ্যাডভেঞ্চার ১৸০

বিশালগড়ের দুঃশাসন ২৲

সুলুসাগরের ভুতুড়ে দেশ ১৷৷০

হত্যা এবং তারপর ১৲

নীহাররঞ্জন গুপ্তের

অদৃশ্য কালো হাত ১৲

অমিয় চক্রবর্তীর

ব্ল্যাকমেল ১৲

দ্বীপান্তরের কয়েদী ৷৷৵০

এইচ্ জি ওয়েল্সের

দি ওয়ার অব্ দি ওয়ার্লডস্ ২৲

দি আইল্যাণ্ড অব্ ডক্টর মোরো (২য় সং) ২৲

দি ইন্‌ভিজিবল্ ম্যান্ ১৷৷০

ওয়েল্সের গল্প ২৸০

ব্যালাণ্টাইনের

কোর‍্যাল আইল্যাণ্ড ১।০

গরিলা হাণ্টার্স ১।০

চার্লস্ ডিকেন্সের

নিকলাস নিক্‌লবি ১৲

শিবরাম চক্রবর্তীর

আমার ভালুক শিকার ১৷৷০

সুকুমার দে সরকারের

ময়ূরকণ্ঠী বন ২৲

২৪শে এপ্রিল, চুপ ১৲

নিশাচর ১৲

মণিলাল অধিকারীর

ভ্যাম্পায়ার ১৲

রক্তাভ-বুদ্ধ ১।০

খোকাখুকুর আসর ।৵০

রবি সেনের

রক্তপিপাসু ১৲

সুনির্মল বসুর

রঙীন হাসি ৷৷০

অভ্যুদয় প্রকাশ-মন্দির, ২৪বি লেক রোড, কলিকাতা—২৯

সূচী

রিপাবলিক D. G. B. ফুটবল ভারতীয় ফুটবল জগতে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকারী

রেজিষ্টার্ড নং ১৪৫, ২৭৭, মূল্য ৩৭।।০ প্রত্যেকটী
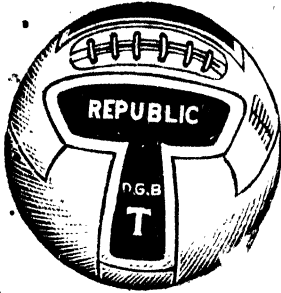
১৯৫০ ও ১৯৫১ সালের I. F. A. Shield final ১৯৫০ ও ৫১ সালের ১ম ডিভিসন লীগ চ্যারিটী ম্যাচ সমূহ ১৯৫১ সালের I. F. A. Shield এর চ্যারিটী ম্যাচ সমূহ ১৯৫১ সালের আন্তঃ-প্রাদেশিক খেলায় বাঙ্গালা দল কর্ত্তৃক ও ১৯৫১ সালের সুদূর প্রাচ্য সফরে নিখিল ভারত ফুটবল একাদশ কর্ত্তৃক খেলা হইয়াছে।

আমাদের প্রস্তুত অন্যান্য ফুটবল।

	৫নং	৪নং	৩নং	২নং
ওরিয়েণ্টাল T ১৯৫২	৩৫৲	২৮৲	২০৲	১৬৲
IMP ইণ্ডিয়ান T	৩৩৲	২৬৲	১৮৲	১৪৲
বেঙ্গল স্পেশাল T	৩০৲	২৪৲	১৮৲	১৪৲
বেঙ্গল টাইগার	৩০৲	২৪৲	১৮৲	১৪৲
স্পেশাল ইম্প্রুভড T	২৮৲	২২৲	১৬৲	১৩৲
স্পেশাল ইংলিশ T	২৫৲	২০৲	১৫৲	১২৲

ব্লাডার—	৫নং	৪নং	৩নং	২নং	১নং
D.G.B.	১৸০	১।।৵০	১।।০	১।৶০	১।০
Bengal Tiger	২।।০	২৲	১৸০	১।।৵০	১।।০

	৫নং	[illegible]	৩নং	২নং
বেষ্ট ইংলিশ T ১৯৫২	[illegible]	১৬।।০	১২।।০	১০।।০
D. G. B. T	২০৲	১৪।।০	১২৲	১০৲
কহিনুর T ১৯৫২	১৮৲	১৪৲	১০।।০	৯৲
ইম্পিরিয়েল ১১ প্যাঃ	১৬৲	১৪৲	১০৲	৮৲
I. F. A. „	১২।।০	১৪৲	৮৲	৭।।০
Improved T" Best	১২৲	১০।।০	৮৲	৭৲

ফুটবল বুট :—
রিপাবলিক—২৩।।০ বেঙ্গল স্পেশাল—২১।।০
ডিজিবি—১৮।।০ ইণ্ডিয়া স্পেশাল—১৬।।০

নীক্যাপ ও এঙ্কলেট :—
ভারলগ—৬৲ বিলাতি—৪।।০ দেশী—৩।।০

গোলকিপার গ্লাভস :—উৎকৃষ্ট—১০।।০ মধ্যম ৮।।০ সাধারণ—১নং ৭।।০ ২নং ৫।।০ জোড়া

পাম্পার :—পিতল বড় ৫৸৴০ মধ্যম ৪।।০ ছোট ৩৸৴০ নিকেল বড় ৫৲ মধ্যম ৪৲ ছোট ৩৲ লেসিং অল ।৵০ পুসার ৸০ কেস ৵০ হুইসেল দেশী ৸০ বিলাতী ২।।০ গোলকিপার জার্সি ৭।।০ ৬।।০ ৪।।০ প্রত্যেক **ফুটবল প্যাণ্ট**—৫।।০ প্রত্যেক

সিনগার্ড :—মধ্যম ৩৲ উৎকৃষ্ট ৩।।০

ফুটবলের বাংলা নিয়ম আই. এফ. এ সম্পাদকের ভূমিকা সহ—২৲

সস্তা কাপ

৫"—১৲
৬"—১।০
৭"—১৸৴০
৮"—৩৲
৯"—৩।।০
১০"—৪।।০

বেষ্ট কাপ—৫"—১।।০, ৬"—২৲ ৭"—৩৲ ৮"—৪।।০ ৯"—৫।।০ ১০"—৬।।০ ১১"—৮।।০ ১২"—১০৲ ১৪"—১৫৲ ১৫"—১৮৲ ১৮"—২০৲

দাশ গুপ্ত ব্রাদার্স এণ্ড কোং

১৩৯বি, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, পোঃ শ্যামবাজার, কলিকাতা ; ২০৫এ রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা
অফিস ও কারখানা—৩২বি নলিন সরকার ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৪ হাতিবাগান বাজারের পিছনে
ব্রাঞ্চ—৭৭।১ হ্যারিসন রোড, কলিকাতা—৯ ফোন বি, বি ৬৭৪৫, টেলিগ্রাম, ক্যারমবোর্ড

ডিরেক্টর বাহাদুর কর্তৃক সমগ্র বঙ্গের বিদ্যালয়সমূহের লাইব্রেরীর জন্য অনুমোদিত

প্রতিষ্ঠিত—বাং ১৩২৯ সাল ; ইং ১৯২২ সন

৩১শ বর্ষ
৪র্থ সংখ্যা

শিশু সাথী

শ্রাবণ,
১৩৫৯

বার্ষিক মূল্য ৪৲ টাকা]

[প্রতি সংখ্যা ।৵০ আনা

সূচী